বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় বর্ষ

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০

বিষয়সূচী

মন্ত্রানুবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	৯
তত্ত্ববোধিনী সভা	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী	১৫
'সদুক্তিকর্ণামৃত'	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৩
যুগসংকটের কবি ইকবাল	শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী	৩৮
রশ্মির রূপ	শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	৪৯
চীনের শিক্ষাব্যবস্থা	শ্রীঅনাথনাথ বসু	৫৫
এ-যুগের সাহিত্যজিজ্ঞাসা	শ্রীগোপাল হালদার	৬৩
স্মৃতিচিত্র	শ্রীপ্রতিমা দেবী	৬৯
অশোকের ধর্মনীতি	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	৭৯
রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৮৮
চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৮
স্বরলিপি	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	১০৮

চিত্রসূচী

রূপকথার দেশ	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
রবীন্দ্রনাথ	সর্ ম্যুরহেড বোন	৮
রবীন্দ্রনাথ	আলোকচিত্র	৮৮
প্রচ্ছদপট	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য — শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন — শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বর্তমান সংখ্যা হইতে বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রৈমাসিকে পরিণত হইল।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৷৷০, বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৩৷৷০

চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় :

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বিশ্বভারতী কার্যালয়

৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা টেলিফোন : বড়বাজার ৩৯৯৫

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ১লা বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতি মাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে ছয় আনা ও আট আনা।

সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ

কুটিরশিল্প—শ্রীরাজশেখর বসু। ছয় আনা।

ভারতের সংস্কৃতি—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। আট আনা।

বাংলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আট আনা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০

মন্ত্রানুবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা হে দেব দূর করে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার।

২

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে
যিনি সকল ভুবনতলে
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

৩

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

৪

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই
জ্ঞান রূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।
তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কতরূপে কত বেশে—
তিনি প্রশান্ত তিনি কল্যাণহেতু—,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

৫

আপনারে দেন যিনি,
　　সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে
　　পূজে যাঁরে দেবতাসকল—
অমৃত যাঁহার ছায়া
　　যাঁর ছায়া মহান্ মরণ—
সেই কোন্ দেবতারে
　　হবি মোরা করি সমর্পণ।

যিনি মহামহিমায়
　　জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
　　সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
　　বহিতেছে যাঁহার শাসন
সেই কোন্ দেবতারে
　　হবি মোরা করি সমর্পণ!

এই সব হিমবান
　　শৈলমালা মহিমা যাঁহার
মহিমা যাঁহার এই
　　নদী সাথে মহাপারাবার
দশদিক যাঁর বাহু
　　নিখিলেরে করিছে ধারণ
সেই কোন্ দেবতারে
　　হবি মোরা করি সমর্পণ।

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল—
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ।

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়
যাঁর মাঝে সূর্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

সত্যধর্মা দ্যুলোকের
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন না করুন পিতা!
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

৬

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,
তবে দয়া কোরো হে দয়া কোরো হে দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে,
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া করে লও তুলে।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও হৃদয় সুধায় ভরি॥

৭

হে বরুণদেব
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ করে
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে ক্ষমা কোরো হে
বিনাশ কোরো না মোরে।

৮

হে বরুণ তুমি দূর করো হে দূর করো মোর ভয়—
ওহে ঋতবান, ওহে সম্রাট্
মোরে যেন দয়া হয়
বাঁধন-ঘুচানো বৎসের মত
ঘুচাও পাপের দায় ;—
তুমি না রহিলে একটি নিমেষও
কেহ কি রক্ষা পায়!

বিদ্রোহী যারা তাদের, হে দেব,
যে দণ্ড কর দান—
আমার উপরে হে বরুণ তুমি
হানিয়ো না সেই বাণ।
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না
রাখো রাখো মোর প্রাণ।
তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত
আজো করি তব গান—
আগামী কালেও, সর্বপ্রকাশ,
গাব আমি তব গান।
হে অপরাজিত যত সনাতন
বিধান তোমার কৃত
স্খলনবিহীন রয়েছে অটল
পর্বতে আশ্রিত।
ওহে মহারাজ দূর করে দাও
নিজে করেছি যে পাপ!
অন্যের কৃত পাপফল যেন
আমারে না দেয় তাপ!
বহু উষা আজো হয়নি উদিত
সে সব উষার মাঝে
আমার জীবন করিয়া পালন
লাগাও তোমার কাজে॥

৯

সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর
　　সব দেবতার পরমদেব,
সকল পতির পরমপতি
　　সব পরমের পরাৎপর।
তারে জানি তিনি নিখিলপূজ্য
　　তিনি ভুবনেশ্বর।
কর্ম বাঁধনে নহেন বাঁধা
　　বাঁধে না তাঁহারে দেহ,
সমান তাঁহার কেহ না, তাঁ হতে
　　বড়ো নাই নাই কেহ।
তাঁর বিচিত্র পরমাশক্তি
　　প্রকাশে জলে স্থলে—
তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
　　আপনা আপনি চলে।
জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ
　　কলেবর নাই কভু
তিনিই কারণ, মনের চালন,
　　নাই পিতা, নাই প্রভু।
ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
　　আছেন বিশ্বকাজে
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
　　ইঁহারি আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
　　ইঁহাকে জানেন যাঁরা
　　জগতে অমর তাঁরা।

১০

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাঁই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের
তিনি পতি মানবমনের—
তিনি প্রভু নিখিল জনার
আপনিই প্রভু আপনার।
বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অনন্তকাল ধরি—
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলি উঠিছে ভরি ভরি।

১১

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়।
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়।
ঊর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।
বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়
রজনী অভয় হোক দিবস অভয়—
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।

এই অনুবাদগুলির মধ্যে ১, ৫ ও ৬ সংখ্যক অনুবাদ পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য সেগুলিও মুদ্রিত হইল। অনুবাদগুলির পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সংগ্রহে আছে; পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রবন্ধে তিনি এগুলি সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন বাংলাদেশে এই কথা তো সবাই জানেন। ইহার চেয়েও বড় সত্য তিনি জন্মিয়াছিলেন তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্রে। বৈদিক ঋষিদের বিশেষত উপনিষদের বাণীতে মহর্ষির সাধনাকাশ ছিল ভরপূর। উপনয়নের পরই বৈদিক মন্ত্রগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় চলিল। তাই সংহিতা ও উপনিষদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হইল আগে, লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল পরে। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলিই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনব্যাপী সাধনায় জপ ও ধ্যানের মন্ত্র। এই সব মন্ত্রের সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে তিনি চিরদিনই ছিলেন মুগ্ধ এবং তাহাদের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে ডুবিতে এবং এই মহাবাণীর অনন্ত আকাশে আপনাকে উদারভাবে ব্যাপ্ত করিতে তিনি চিরজীবন যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা নাই। এই আবহাওয়াতেই তাঁহার চিন্ময় জীবন বিকশিত হইয়াছে।

এই আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায়। কখনো এই বেদ-উপনিষদের যুগের ভাব, কখনো তাহার ভাষা, কখনো তাহার ছন্দ, কখনো তাহার ব্যঞ্জনা নানা ভাবে তিনি ব্যবহার করিয়া অপূর্ব ফল লাভ করিয়াছেন। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ" তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনায় বক্তৃতায় নাটকে ধর্ম-দেশনায় তিনি এই সব বাণী চিরদিনই ব্যবহার করিয়া আমাদের চিত্তকে সমূলে নাড়া দিয়াছেন।

বৈদিক বাণীর মধ্যে যে একটি সংহত গাম্ভীর্য ও গভীরতা আছে তিনি বলিতেন তাহা আমাদের ভাষাতে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার "ব্রাহ্মণ" কবিতায় সত্যকামের যে বিবরণ আছে তাহা তিনি ছান্দোগ্যের (৪, ১০) সত্যকাম কথার অযোগ্য রূপ বলিয়া মনে করিতেন। বলিতেন, "ছান্দোগ্যের মধ্যে অল্পের মধ্যে যে ড্রামাটিক মহত্ত্ব আছে এত তাহা প্রকাশ করা আমাদের অসাধ্য।"

তবু বৈদিক ঋষিদের বাণী তিনি বিস্তর অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব একত্র সংগৃহীত হইলে তাহাই একখানি সুন্দর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতে পারিত। তবে সবগুলি এখন পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বলিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের এই বৈদিক বাণীর অনুবাদকে তিন কিস্তিতে ভাগ করা চলে।

১৯০৮ সালের আগে অর্থাৎ গীতাঞ্জলি লেখার পূর্বে তিনি কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা আমিও দেখি নাই। তিনি কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। ইহাকে তাঁহার প্রথম কিস্তি বলা চলে। ইহার একটি মন্ত্রের অনুবাদে "আত্মদা বলদা যিনি" কবিতাটি ১৮৯৪ সালের ফাল্গুনে তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের বৈদিক অনুবাদ বিষয়ে আজ আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নহে।

তাহার পরে ১৯০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্ধে কোনো একটি বিশেষ দাবির জোরে তাঁহার কাছে কিছু বেদবাণীর অনুবাদ প্রার্থনা করা হয় এবং তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এই বিষয়ে আরো কিছু

খবর গত বৈশাখের বিশ্বভারতী পত্রিকায় "বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে বাহির করিয়াছি। ৭ই পৌষের পূর্বে যাহাতে অনুবাদগুলি পাওয়া যায় এই জন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার প্রিয় কয়েকটি বেদমন্ত্রের অনুবাদ তিনি করিলেন। সেগুলির দুই-একটি সুর দিয়া গান রূপে তিনি পরে প্রকাশিত করেন[১]। বাকি কয়েকটি অনুবাদ সুরের অপেক্ষায় তিনি আমার কাছে রাখিয়া দেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়াছি কিন্তু তাঁহার মনের মত সরল অথচ গম্ভীর বেদোচিত সুর দিতে না পারায় তিনি সেগুলি তাঁহার জীবিতকালে বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রয়াণের পরে সেগুলি আমি শ্রীমান নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান পুলিনবিহারী সেনকে দেখাই। এই অনুবাদগুলিকে দ্বিতীয় কিস্তি ধরিয়া লইতে পারি। এগুলির আবির্ভাব গীতাঞ্জলির সময়ে।

বেদোচিত সুরপ্রাপ্তির এই বিপদ দেখিয়া ১৯১০ সালের পরে তাঁহাকে আর কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদের জন্য ধরি। সেগুলি হইবে কবিতা, গান নয়। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদের উষা, পর্জন্য প্রভৃতির স্তুতি ও বসিষ্ঠের মন্ত্র আছে। অথর্ববেদের কতকগুলি মন্ত্র দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন। অথর্বের নৃসূক্ত, সূক্তস্কম্ভ, মহীসূক্ত, ব্রাত্যসূক্ত, বিরাটস্তুতি, উচ্ছিষ্টস্তুতি, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র তাঁহার চিত্তকে এমন নাড়া দিয়াছিল যে তিনি সেগুলির অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেগুলি তিনি একটি স্বতন্ত্র খাতায় লেখেন। এইগুলি তিনি দেখিবার জন্য কাহাকে দেন। কিন্তু পরে তাহা আর ফেরত পান নাই। এইগুলি হইল তাঁহার তৃতীয় কিস্তি।

প্রথম ও তৃতীয় কিস্তির অনুবাদ আমার হাতে না থাকায়, আমি এখন তাঁহার দ্বিতীয় কিস্তির অনুবাদ কয়টিই সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১৩১৬ সালের ২০ অগ্রহায়ণ তাঁহার রচিত গান, "আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।" তাহার পর কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত বেদমন্ত্রেরই অনুবাদ চলিল।

গীতাঞ্জলির গানগুলি তিনি যে খাতায় লেখেন তাহারই ২৭শ পৃষ্ঠায় তিনি বেদ-অনুবাদের প্রথম গানটি লেখেন। তাহা লেখা ১৯০৯ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে। সেই গানটি "পিতা নোঽসি" মন্ত্রের অনুবাদ, "তুমি আমাদের পিতা"। ইহার প্রথম অংশের মূল বাণী শুক্লযজুর্বেদ বাজসনেয়ি সংহিতার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ মন্ত্র:

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ :

এই মন্ত্রের পরেই দ্বিতীয় অংশ বাজসনেয়ির সংহিতায় ৩০শ অধ্যায়ের :

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ —বাজসনেয়ি, ৩০,৩

তার পরের অংশটুকু বাজসনেয়ির ষোড়শ অধ্যায়ের ৪১শ মন্ত্র :

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

১ যথা, "তুমি আমাদের পিতা" এবং "যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই"।

এই অংশ কয়টি বাজসনেয়ি সংহিতার বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের উপাসনামন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

একবার কে একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, "মহর্ষি যে এইরূপ বেদের নানা অংশের নানা মন্ত্র জোড়াতাড়া দিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কি আমাদের দেশীয় প্রথার অনুগত হইয়াছে?" তখন তাঁহার কথাতে বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, "যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের সব মন্ত্রই নানা স্থান হইতে গৃহীত হইয়া একত্রিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি গায়ত্রী এবং সন্ধ্যার মন্ত্রেরও নানা অংশ বেদের নানা ভাগ হইতে গৃহীত। গায়ত্রীর ব্যাহৃতি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এক স্থানের এবং 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্র অন্য স্থানের। এইভাবে চয়ন করিয়া ব্যবহার করাই ভারতের সনাতন প্রথা। ব্রাহ্মণ এবং সাধক মহর্ষির সেই অধিকার ছিল।" ইহার পর আমি যখন আমাদের সব ক্রিয়াকর্ম নিত্যকৃত্য বৈদিক অনুষ্ঠানের এইরূপ সংগ্রহের নানা বিভিন্ন মূল স্থান দেখাইলাম তখন তিনি নিরস্ত হইলেন।

খাতার ২৮শ পৃষ্ঠায় তিনটি অনুবাদ, তাহার প্রথমটি "যিনি অগ্নিতে।" এই মন্ত্রটির মূল হইল :

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

এই মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (২, ১৭)। যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই মন্ত্রটি আছে।

খাতাখানির ২৮শ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুবাদ হইল "যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে।" অনুবাদটির মূল হইল গায়ত্রী মন্ত্র। তার প্রথম অংশটি হইল ব্যাহৃতি :

ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

ইহা বহু স্থানেই আছে, তবে বাজসনেয়ি সংহিতায় ৩, ৩৭ মন্ত্রেই সাধারণত ইহা দেখি। তার পর

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

এই অংশটুকু ঋগ্বেদের (৩, ৬২, ১০)। কাজেই গায়ত্রী মন্ত্রেও দুই বিভিন্ন স্থান হইতে দুইটি অংশ যুক্ত হইয়াছে।

ঐ ২৮শ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুবাদটি হইল "সত্য রূপেতে আছেন সর্ব ঠাঁই।" ইহার তিনটি ভাগ আছে। 'ব্রাহ্মধর্মে' মহর্ষি তাহা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার মধ্যে

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

এই অংশটুকু তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম মন্ত্র।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

অংশটুকু মুণ্ডকোপনিষদের ২০, ২, ৭ মন্ত্র।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

মন্ত্রটুকুর অনুরূপ মন্ত্র পাই গোতম ধর্মশাস্ত্রের ২০, ১১ মন্ত্রে। সেখানে "অদ্বৈতম্ স্থলে" "অন্তরিক্ষম্" আছে।

খাতাটির ২৯শ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছেন "আপনারে দেন যিনি সদা যিনি দিতেছেন বল।" ইহার মূল হইল :

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ঋগ্বেদ ১০, ১২১, ২
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ঐ, ৩
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ঐ, ৪
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্‌হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ঐ, ৫
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ঐ, ৬
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ঐ, ৯ †

খাতায় ৩২শ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুবাদটি "যদি ঝড়ের মেঘের মতো।" এই অনুবাদটি গান রূপে প্রখ্যাত ও সমাদৃত হইয়াছে। ইহার মূলটি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের। বসিষ্ঠ ইহার ঋষি। মূলটি এই :

† ইহারই পূর্ব অনুবাদ ১৮৯৪ ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য, মল্লিখিত "বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ," বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০; শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম", প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৯। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অনুবাদটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর; এই সর্ব দিক্ যাঁর বাহু
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ; সূর্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি সত্যধর্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা
আমাদের না করুন্ নাশ! স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ঋগ্বেদ, ৭, ৮৯, ২-৪

ঐ পৃষ্ঠার নিচের দিকে মনে হয় যেন আর একটি অনুবাদের আরম্ভ। তাহা ঐ পূর্বানুবাদেরই অনুবৃত্তি—"হে বরুণদেব মানুষ আমরা দেবতার কাছে।" ইহার মূল ঋগ্বেদের ৭, ৮৯, ৫ম মন্ত্র :

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম মানস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥

খাতার ৩৫শ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ-কবিতা তাহার আরম্ভ "হে বরুণ তুমি দূর করো হে দূর করো মোর ভয়"—ইহারও দেবতা বরুণ। তবে ঋষি বসিষ্ঠ নহেন। এই সূক্তের ঋষির নাম গৃৎসমদ অথবা গৃৎসমদের পুত্র কূর্ম। এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত :

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎসম্রালৃতা বোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো
নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে ॥ ঋগ্বেদ, ২, ২৮, ৬
মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টা
বেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥ ঐ, ২, ২৮, ৭
নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্
উতা পরং তু বিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে শ্রিতান্য্
অপ্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥ ঐ, ২, ২৮, ৮
পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি
মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং।
অ ব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সী রুষাস
আ নো জীবান্ বরুণ তাসু শাধি ॥ ঐ ২, ২৮, ৯

খাতার ৩৪শ পৃষ্ঠায় আরম্ভ এবং ৩৫শ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত "সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর" অনুবাদ কবিতাটির মূল দেখা যায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। শ্বেতাশ্বতরের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রখ্যাত মন্ত্র :

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্ ॥ শ্বেতা, ৬, ৭
ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ঐ, ৬, ৮,

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ঐ, ৬, ৯

তার পর একটি মন্ত্র শ্বেতাশ্বতরের ৪র্থ অধ্যায়ের :

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভি ক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ শ্বেতা, ৪, ১৭

খাতায় ৩৬শ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ-কবিতা, "শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার," ইহার মূল হইল ঈশোপনিষদে। এই মন্ত্রটি মহর্ষি তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্মে'ও সংগ্রহ করিয়াছেন :

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশ, ৭, ৮

খাতায় ৩৭শ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ, "অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়, তাহা অথর্ববেদের অভয়মন্ত্র। ইহার মূলটি এই :

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু॥ অথর্ববেদ, ১৯, ২৫, ৫
অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥ ঐ, ১৯, ২৫, ৬

বেদমন্ত্র অনুবাদের সপ্তাহ অবসান হইল। তাঁহারও এই কিস্তির অনুবাদ এইখানেই সমাপ্ত হইল।

ইহার পরে সেই খাতায় আর কোনো মন্ত্রানুবাদ নাই। তাহার পরের কবিতাই তাঁহার আপন ভাষায় :

আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল।

তাহার পরে তাঁহার বাংলা কবিতা ও গানই চলিয়াছে। ৭ই পৌষের উৎসবের পর হইতে সেই বাণীধারা প্রবহমান।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তত্ত্ববোধিনী সভা : শতবর্ষ পূর্বের একটি আন্দোলন

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

১

নানা কারণে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দটি বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর বঙ্গদেশের উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধারাকে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য একটি আন্দোলনের উদয় হইয়াছিল। সে আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন তিন জন,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও প্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত।

বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত অর্ধশত বৎসরকে পর্যায়ক্রমে 'হিন্দু কলেজের যুগ' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভার যুগ' বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Anglo-Indian College (সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাম 'হিন্দু কলেজ') প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পর্যন্ত শিক্ষিত বঙ্গসমাজে ঐ কলেজের শক্তি ও প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল। ঐ কলেজের ছাত্রগণ বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতে প্রকৃত কথাই লিখিয়াছেন—

"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং বঙ্গীয় লেখক-কুলগৌরব অক্ষয়কুমার দত্ত, এই তিন জনের কার্য্য ছাড়িয়া দেখিলে বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সাহিত্য-বিষয়ক যে-কোন প্রকার উন্নতিই হউক প্রধানতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল[১]।"

হিন্দু কলেজের শক্তি ও প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল হয় ঐ কলেজের ডিরোজিওর যুগে (১৮২৬—১৮৩১)। ডিরোজিওর চরিত্র হইতে সত্যানুরাগ, দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা ও সমাজসংস্কারে সাহস তাঁহার ছাত্রদের মনে সংক্রান্ত হইত। তিনি কিশোর বয়স্ক ছিলেন, এবং তাঁহার প্রধান ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই প্রায় তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন। এই কারণে তাঁহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণের প্রগাঢ় হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, এবং তাঁহার শিষ্যগণের মনে তাঁহার প্রভাব প্রবল ও ব্যাপক হইতে পারিয়াছিল। তাঁহার ছাত্রগণ সর্ববিধ ভ্রম ও কুসংস্কার সংশোধনে সাহসের সহিত উদ্যোগী হইতেন। কিন্তু ক্রমে ঐ কলেজের ছাত্রগণের অনেকে উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সেজন্য হিন্দু সমাজে প্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

নব্য ভারতের সর্ববিধ কল্যাণকর্মের অগ্রণী রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে উপনিষদাদি ব্রহ্মজ্ঞানমূলক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরোপাসনা করিবার ও ব্যাখ্যান দান করিবার কার্যে নিযুক্ত করেন। তৎপরে রামমোহন

(১) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ২৮।

রায় ১৮৩০ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ড গমনের পূর্বে ও পরে হিন্দু কলেজের প্রভাবের অকল্যাণের দিকটি অনুভব করিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করা নিজ কর্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা প্রাচীনের প্রতি বিরাগ কিংবা নবীনের প্রতি অনুরাগ, এ উভয়ের কোনটির দ্বারা চালিত হন না। যাহা কল্যাণকর, তাহা প্রাচীনই হউক কিংবা নবীনই হউক, তাহারই অনুসরণ করেন। এজন্য রামমোহন রায় সংস্কার ও সংরক্ষণ উভয় কার্যই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজে হিন্দু কলেজের যুগের পরেই আসিল তত্ত্ববোধিনী সভার যুগ। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ইহা পূর্ববর্তী হিন্দু কলেজের যুগের উন্নতিশীলতা কুসংস্কারবর্জন প্রভৃতি কল্যাণকর ভাবসকলকে রক্ষা করিতে, ঐ যুগের উচ্ছৃঙ্খলতা ধর্মে অবজ্ঞা প্রভৃতি অকল্যাণকর ভাবসকলকে অপসারিত করিতে, এবং শিক্ষিত ভদ্র সমাজে ধর্মে শ্রদ্ধা নীতিমত্তা ও নব জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তার করিতে প্রয়াসী হইল।

তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ: ১৮৩৮ সালে স্বীয় পিতামহীর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ প্রবল ধর্ম-ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া অন্তরে গভীর অশান্তি অনুভব করেন। তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিনি ডিরোজিওর প্রভাবের অকল্যাণকর দিকটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তিই ইহার কারণ। ধর্ম-ব্যাকুলতায় চালিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন; তাহাতে তাঁহার অন্তরের অন্ধকার ও অশান্তি দূর না হইয়া বরং বর্ধিত হইয়া গেল। অবশেষে তিনি নিজে একাকী একাগ্র চিন্তার দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার মন নিজ চিন্তালব্ধ সেই সিদ্ধান্তসকলে অপরের সায় পাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

যখন তাঁহার মনের এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে একদিন দৈবাৎ তিনি ঈশোপনিষদের একটি ছিন্ন পত্র প্রাপ্ত হন। সেই ছিন্ন পত্রে ঐ উপনিষদের প্রথম শ্লোকটি[২] মুদ্রিত ছিল। ঐ শ্লোকের অর্থ দেবেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিতে অন্য কোন পণ্ডিত পারিলেন না; কেবল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন। শ্লোকটির মর্ম দেবেন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গেল এবং তাঁহাকে অতিশয় তৃপ্তি দান করিল।

এইরূপে আকস্মিক ভাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগ সংঘটিত হইল। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাহায্যে তিনি উপনিষদ সকল অধ্যয়ন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

এই অধ্যয়নের ফলে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যে অমৃত সঞ্চিত হইতে লাগিল, ক্রমে তাহা অপরকেও দান করিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; উপনিষদ্-বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান দেশে প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নেতৃত্বে উপনিষদ্ অধ্যয়ন, এই

(২) ঈশা বাস্য মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।

অধ্যয়নে পরস্পরের সহিত বন্ধুতায় ও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় আবদ্ধ একটি ঘনিষ্ঠ দল সৃষ্টি, এবং দেশমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার,—এই সকল উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে প্রথমে তিনি স্বীয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং ভ্রাতৃগণকে লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। দশজন মাত্র সভ্য লইয়া ইহা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বৎসরেই সভ্য সংখ্যা ১০৫ হইল। ক্রমে বর্ধমান-রাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর, নবদ্বীপরাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার সভ্য হইলেন। বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে এই সভা আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লইল। এই সভার প্রথম দুই বৎসর অপেক্ষাকৃত খ্যাতিহীন অবস্থায় কাটে; কিন্তু এই কালের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের যোগ স্থাপিত হয়। ইহা সভার পক্ষে ও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের পক্ষে একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা। উত্তরকালে ইহা হইতে অনেক গুরুতর ফল প্রসূত হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত যে-সকল কার্য ঐ সভাকে শিক্ষিত জনসাধারণের নিকটে প্রসিদ্ধ করিয়া দেয়, তন্মধ্যে প্রথম, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। ১৮৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য তৎকালে যে ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সকল কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়—

> "ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ,—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনাবেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয়প্রকার শিক্ষা প্রদান করা," ইত্যাদি।

এই পাঠশালায় প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত পড়ান হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত ইহাতে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে পড়াইবার জন্য এই দুই বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন; তাহা তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক ১৮৪১ সালে মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় যে কয়েকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশ সাহেবদিগের রচিত ছিল, এবং সে সকলের ভাষা অতি কদর্য ছিল।

যে-সময়ে কলিকাতার সকল লোকের এই আগ্রহ ছিল যে, ছেলেরা যে-কোনরূপে হউক একটু আধটু ইংরেজী শিখুক, যে-সময়ে ইংরেজী জানাই চাকরী পাইবার পক্ষে একমাত্র আবশ্যকীয় গুণ, সেই যুগে দেবেন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সহিত কেবল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্র পর্যন্ত সমুদয় বিষয়ের শিক্ষাদান, এবং সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা ধর্মশিক্ষাকে অধিক প্রাধান্য দান, এই উভয় লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা তাঁহার অপূর্ব মনস্বিতার ও তেজস্বিতার পরিচয় পাই। দেশবাসীর অন্তরে ইহা দেবেন্দ্রনাথের ও তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া দিল।

কিন্তু কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাটি অধিক দিন টিঁকিল না। কলিকাতা বিষয়ী লোকদিগের স্থান। পাঠশালার ছাত্রগণের অভিভাবকদিগের মনে ছাত্রদিগের জ্ঞানধর্ম উপার্জন গৌণ উদ্দেশ্য, এবং অর্থকরী বিদ্যা উপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ছাত্রগণকে তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের খাতিরে সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় পাঠাইতেন; আবার ১০টা হইতে সাধারণ ইংরেজী স্কুলে পাঠাইতেন।"

কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার বহুদিন করা সম্ভব নয়। অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গেল।

তখন দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার পাঠশালাটি তুলিয়া দিয়া, অনুরূপ উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী অবলম্বন পূর্বক ১৮৪৩ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাঁশবেড়ে গ্রামে নূতন একটি 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করিলেন। এটি বেশ ভাল চলিতে লাগিল; ইহার খুব প্রসিদ্ধি হইল। গ্রামটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত-প্রধান, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার কয়েকজন সভ্যের বাড়ী এই গ্রামে ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গ্রামে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ঐ গ্রাম-নিবাসী শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। হিন্দুকলেজের ছাত্র, প্রসিদ্ধ ইংরেজী বক্তা রামগোপাল ঘোষ পাঠশালার পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করিলেন।

এই পাঠশালাতেও বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাতে একশতের অধিক ছাত্র ভর্তি করা হইত না, এবং ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন বালককে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইত না।

সে যুগে কলিকাতার ইংরেজী স্কুলগুলির বার্ষিক পরীক্ষাতে খুব ধূমধাম করা হইত। পরীক্ষা-স্থলে ছাত্রদের অভিভাবকগণ ও কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সেই প্রকাশ্য সভায় ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়া হইত ও কৃতী ছাত্রদিগকে পুরস্কার দান করা হইত। দেবেন্দ্রনাথ বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া সেই বাঁশবেড়ে গ্রামে কলিকাতা হইতে প্রায় ৫০০ সম্ভ্রান্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার যশ ও তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়া গেল।

এদিকে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহচর্যের ফলে দেবেন্দ্রনাথ অল্পকালের মধ্যেই (১৮৪২ সালে) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। ইহার পরেই তাঁহার মনে হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের উদ্দেশ্য পরস্পরের অনুরূপ, এবং উভয়ের সংযোগ হইলে দেশমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপদেশাবলী প্রচার এবং সর্ববিধ উন্নত জ্ঞান বিস্তার করিবার অধিক সুবিধা হইবে। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে রামমোহন রায়ের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ই রক্ষা এবং অর্থানুকূল্যের দ্বারা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। এই কারণে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ এ উভয়ের যোগসাধন করা সহজ হইল।

এই যোগসাধনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার হাতে ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের ভার সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ তখন অতি দুর্বল ভাবে চলিতেছিল; তাহার বলবিধানও তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তব্য হইয়া পড়িল। এইরূপে ক্রমশঃ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৪৩ সালে আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকা যেন এক দিনেই দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইল। এই পত্রিকার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নাম চতুর্দিকে আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

১৮৪৩ সালটি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ বৎসর। এই বৎসরে তিনি (১) এপ্রিল মাসে বাঁশবেড়ের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত করেন; (২) আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্তন করেন; (৩) ডিসেম্বর মাসে (৭ই পৌষ) ২০ জন বন্ধুসহ প্রতিজ্ঞাপূর্বক বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করেন।

এই ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে সমগ্র বঙ্গদেশে দেবেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত উদার ধর্মভাবের প্রচার এবং উন্নত জ্ঞান ও আদর্শের বিস্তার অতি সতেজে চলিতে লাগিল। এ বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাফল্য অতি আশ্চর্য। সে যুগে ঐ পত্রিকার দ্বারা এইরূপ প্রচারকার্য যে-পরিমাণ সফলতার ও তেজস্বিতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাসে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের কোনও প্রচারকের দ্বারা তাহা হয় নাই। শুধু এই পত্রিকাখানির প্রভাবে বঙ্গদেশের বহু নগরে ও গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ অথবা অন্য নামে ধর্মসংস্কার-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল; নগর হইতে দূরবর্তী বহু গ্রামে অনেক নিঃসঙ্গ মানুষ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন অথবা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইলেন; এবং অবশেষে সুদূর মান্দ্রাজ ও বেরিলী সহরে তত্ত্ববোধিনী সভার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অভ্যুদয় হইল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানি প্রথম তিন মাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নেতৃত্বে নানা লোকের লেখনীর সাহায্যে প্রকাশিত হয়। পরে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে ইহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের মন জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণে ও বিতরণে অতিশয় ব্যাকুল ছিল। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে জড়জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করা, এবং দেশের সর্ববিধ কুসংস্কারের ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি এরূপ সুনিপুণ ভাবে ও সতেজে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন যে অচিরকাল মধ্যেই সমগ্র বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রবন্ধ সকলের আকর্ষণে পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ও সভার সভ্যসংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়া গেল। এই সময়ে বঙ্গদেশের উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজে তত্ত্ববোধিনী সভার ও পত্রিকার প্রভাব অতিশয় প্রবল হইল। এই জন্যই হিন্দুকলেজের প্রভাবের পরবর্তী যুগকে তত্ত্ববোধিনী সভার যুগ বলা যায়।

যাহা হউক, এই উভয় যুগের বিষয়ে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের প্রভাব প্রধানতঃ কলিকাতাবাসীদিগের মধ্যে ও ইংরেজী-শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার প্রভাব সমগ্র বঙ্গদেশে, এবং ইংরেজীতে শিক্ষিত অথবা ইংরেজী-অনভিজ্ঞ নির্বিশেষে সমুদয় জ্ঞানানুরাগী লোকদের মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন নিজ জীবনের সফলতা লাভ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ব্যাখ্যান দান করিতে লাগিলেন। পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ ও ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার ব্যাখ্যান উভয়ই অতিশয় লোকপ্রিয় হইতে লাগিল। কেবল লেখক বলিয়া নহে; মনস্বিতা, তেজস্বিতা, জ্ঞানের বিশালতা ও চিন্তার সাহসের জন্য তিনি বঙ্গসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিতে লাগিলেন।

২

দেখা যায় যে তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মসময়ে দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই ইহার প্রধান পুরুষ ছিলেন। কারণ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ লাভই তখন সভার সভ্যদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উত্তর কালে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভা উভয়ের সংযোগের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্তনের পর হইতে, সভার উদ্দেশ্য অনেক বিশালতর এবং কার্যপ্রণালী অনেক বিস্তৃততর হইল। তখন সমগ্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ইহার প্রতি, এবং ইহার দৃষ্টি সমগ্র শিক্ষিত

সমাজের প্রতি পতিত হইল। তখন হইতে নব নব ভাব ও আদর্শ প্রচার করিয়া শিক্ষিত সমাজের সেবা করা ইহার লক্ষ্য হইল।

এই বিশালতর কার্যে ব্রতী হইবার পরই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান পুরুষ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মতামত লইয়া একটি আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই আন্দোলনের বিষয়ে ও অক্ষয়কুমার দত্তের সাহায্যে আন্দোলনের মীমাংসার বিষয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করিতে হইবে।

এই সময়ে সাধারণ লোকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' বলিলে একই দল মানুষকে বুঝিত। একের মতামতকে উভয়ের মতামত বলিয়া মনে করিত। তখন 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ব্রাহ্ম' এই দুটি নাম অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ছিল ; তত্ত্ববোধিনী সভার নামই তখন শিক্ষিত সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সভার (এবং ব্রাহ্মসমাজের) ধর্মমতকে তখন সাধারণ লোকে 'ব্রাহ্মধর্ম' বলিত না, 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম' বলিত ; মানুষগুলিকে 'বেদান্তবাদী' বা সংক্ষেপে 'বেদান্তী' বলিত।

রামমোহন রায় স্বীয় ধর্মমত প্রচারের সাহায্যের জন্য বেদান্তের ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং শঙ্করাচার্যের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, ইহা সত্য বটে। কিন্তু 'বেদান্তের মত' বলিয়া বিশেষতঃ শঙ্করাচার্যের মত বলিয়া, সাধারণের মধ্যে যে সমুদয় মত প্রচলিত ছিল, তাহা সমগ্র ভাবে রামমোহন রায় কখনই গ্রহণ করেন নাই। যে একান্ত অদ্বৈতবাদে উপাসনা অসম্ভব হয়, যে মায়াবাদে জগৎকে ও সাংসারিক সম্বন্ধ সকলকে মিথ্যা ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, যে সন্ন্যাসবাদ গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্ভব বলিয়া প্রচার করে, এবং মানুষকে সংসারের ভাল মন্দ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তোলে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে রামমোহন কখনও কুণ্ঠিত হন নাই [৩]। এই প্রচলিত বেদান্তবাদের মতে ব্যক্তিগত উপাসনাই অসম্ভব, রামমোহন রায় প্রবর্তিত সামাজিক উপাসনা তো আরও অসম্ভব।

এই কারণে রামমোহন রায়ের সমসাময়িক সাধারণ লোকেরা তাঁহার প্রচারিত বেদান্তকে প্রকৃত বেদান্ত বলিয়া স্বীকার করিত না ; বেদান্তের বিকৃত রূপ (caricature) বলিয়া মনে করিত[৪]।

রামমোহন রায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের অতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন বটে ; কিন্তু রামমোহন রায়ের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভা ও নানা ধর্মের আলোচনাজনিত চিন্তার উদারতা ও দৃষ্টির প্রসার তাঁহাতে ছিল না। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডীড লিখিবার সময় তাহার মত বা উপাসনা-প্রণালীকে কোনও রূপে সীমাবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদ হইবে। এজন্য ব্রাহ্মসমাজে কেবল উপনিষদ্ বা বেদান্ত-সম্মত প্রণালীতে উপাসনা হইবে, অথবা অপর কোনও একটি বিশেষ প্রণালীতে উপাসনা হইবে, এরূপ কোন কথা তিনি ট্রস্টডীডে নিবদ্ধ করেন নাই। তিনি নিজে

(৩) "Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better."—Rammohun Roy's **Letter to Lord Amherst, Dec. 11, 1823.**

(৪) **History of the Brahmo Samaj** by Pandit Sivanath Sastri, Vol 1., 2nd Edn., p.73.

একেশ্বরবাদ প্রচারের **একতম** উপায় মাত্র বলিয়া বেদান্তকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকেও সেই ভাবে প্রণোদিত হইয়াই বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কিন্তু রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর ব্রাহ্মসমাজ উপযুক্ত কর্ণধারের অভাব বশতঃ ক্রমশঃ সংকীর্ণ পথে চলিতে লাগিল। বিদ্যাবাগীশের হাতে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' আর সার্বভৌমিক ধর্ম রহিল না; তাহা একান্তভাবে বেদান্তধর্মেই পরিণত হইয়া গেল। রামমোহন রায়ের বিদেশ যাত্রার পর এবং দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পূর্বে এমন কোনও মনস্বী চিন্তাশীল মানুষ ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন না, যিনি ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যাহা বলা হইতেছে তাহা যুক্তিসংগত কি না। এমন কি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহকারী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন একদিন (সম্ভবতঃ ১৮৪২ সালে) ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিলেন; বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন না, তাঁহাকে নিবৃত্ত ও পদচ্যুত করিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতার প্রেরণায়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ বশতঃ, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের, বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচারের ও কুসংস্কার পরিহারের আকাঙ্ক্ষায়। এই দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষার সমাবেশ বশতঃ ইঁহাদের দুই জনের যোগ তত্ত্ববোধিনী সভার ও ব্রাহ্মসমাজের উভয়ের পক্ষে সুমহৎ কল্যাণের কারণ হইল। দুই জনের যোগের ফলে তখন হইতে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজ যুগপৎ সরস ধর্মজীবনের দিকে, এবং বিশুদ্ধ মত ও রামমোহন রায়ের উদার ধর্মভূমির দিকে অগ্রসর হইতে পারিল।

অক্ষয়কুমার যত শীঘ্র মতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইলেন, দেবেন্দ্রনাথ তত শীঘ্র হন নাই। দেবেন্দ্রনাথ নিজ প্রবল ধর্মাকাঙ্ক্ষাজনিত মানসিক সংগ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া উপনিষদের আশ্রয় লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; সেই উপনিষদ্ অধ্যয়নে তাঁহার প্রধান গুরু বলিয়া আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। বিদ্যাবাগীশের মতামতকেও পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, এ ভাব অক্ষয়কুমারের মনে প্রথমে উদিত হইল; দেবেন্দ্রনাথের মনে এ ভাব অক্ষয়কুমারের পরে আসিল।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্তনের সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বয়স ৫৭ বৎসর; দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের বয়স যথাক্রমে ২৬ ও ২৩ বৎসর মাত্র; এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর অপেক্ষাও ৮ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে কেবল একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেন না। কিন্তু "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়", এবং "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তৎ ত্বম্ অসি, ইত্যাদি মহাবাক্য-প্রতিপাদ্য জীবাত্মা পরমাত্মার যে অভেদ চিন্তন, ইহা মুখ্য উপাসনা হয়," প্রভৃতি বৈদান্তিক মত সকলও প্রচার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর্যন্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুসরণে দেবেন্দ্রনাথও এই প্রকার মত ব্যক্ত করিতেন[৫]।

---

(৫) ১৮৪৪ সালের ১১ই মাঘে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত ব্যাখ্যানে এই বাক্যগুলি পাওয়া যায়:— "ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিকালে পূর্ণানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং ব্যবহারকালে সাংসারিক সমূহ সুখে সুখী হইয়া অন্তকালে পরব্রহ্মের

অক্ষয়কুমার দত্ত দু-একবার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদানের পরই দেবেন্দ্রনাথকে বুঝাইতে লাগিলেন যে এ সকল মত অতি অযৌক্তিক। অবশেষে যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যাতে এইরূপ উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং লোকে ধরিয়া লইল যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ সকলেই উহা বিশ্বাস করেন, তখন অক্ষয়কুমারের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

"শেষে একদিন [অক্ষয়কুমার] দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে বৈকালে তাঁহার পুষ্করিণীর নিকটে একটি একতলা ছোট কুঠরীতে বসিয়া [দেবেন্দ্রনাথের সহিত] শেষ বিচার করেন। তাহাতে তাঁহাকে অনেক যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায় তিনি উহা বুঝিতে পারিয়া অক্ষয়বাবুর মত স্বীকার ও অবলম্বন করিলেন। সেইদিন অক্ষয়বাবু বড় সুখী হইলেন।......ঐ মত [অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ] তৎকালে সমাজে প্রবল ও প্রচলিত ছিল বলিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইলেও কতক সংখ্যক তত্ত্ববোধিনীতে উহা মুদ্রিত হয়। অতঃপর ঐ মত তত্ত্ববোধিনীতে প্রচার হওয়া রহিত হইয়া যায়[৬]।"

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। একেশ্বরবাদ প্রচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার, সর্ববিধ কুসংস্কার বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের সমান উৎসাহ ছিল। তাই এ বিষয়ে সুমীমাংসা হইয়া গেল। অতঃপর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও সভা উভয়ই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ হইতে মুক্ত রহিল।

এইরূপে শতবর্ষ পূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত উন্নতিশীল শিক্ষিত বঙ্গসমাজের চিন্তাধারাকে ভ্রান্ত মত হইতে মুক্ত রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

যে চিন্তা-প্রণালীর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহিত যোগের পূর্বেই ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, দ্বৈতবাদ তাহার অনুকূল বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ শীঘ্রই অদ্বৈতবাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের দ্বারা প্রচারিত অপর একটি মত (বেদ-বেদান্ত ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট ও অভ্রান্ত) পরিত্যাগ করিতে দেবেন্দ্রনাথের ও তত্ত্ববোধিনী সভার আরও বিলম্ব হয়। সেই মতটি লইয়াও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। তাহা ১৮৪৩ সালের পরবর্তী ঘটনা বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়।

সহিত লীন হয়েন।" এই ব্যাখ্যান সকল কয়েক বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'মাঘোৎসব' নামক পুস্তকে নিবদ্ধ হয়। সেই পুস্তকে দেবেন্দ্রনাথ ফুটনোটে বলিয়া দেন যে ঐ বাক্য অদ্বৈতবাদ দুষ্ট, উহা ব্রাহ্মধর্ম সম্মত নহে।

(৬) মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত, পৃ. ৮২।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'

ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক হাজার বছর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রচনা যাহা এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতেছে নেপালে রক্ষিত প্রাচীন পুথিতে নিবদ্ধ ও ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৭টী বৌদ্ধ চর্য্যাপদ। এগুলির রচনা-কাল আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্বে, "বাঙ্গালা ভাষা" বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোনও নিদর্শন মিলিতেছে না। বাঙ্গালা দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। যখন বাঙ্গালা ভাষা সৃজ্যমান, মগধ হইতে আগত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যখন ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ৮০০-১২০০-র মধ্যে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিতেছে, তখন ও তাহার পূর্বেও অবশ্য বাঙ্গালা দেশের লোকেরা কবিতা রচনা করিত, পদ্য-বন্ধ করিত, অর্থাৎ গান বাঁধিত। সে-সব গান কি ভাষায় রচিত হইত? নিশ্চয়ই তখনকার দিনে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষায়, এবং কতকটা লোকমুখে প্রচলিত মৌখিক ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার রূপ লইয়া দানা বাঁধিবার পূর্বেকার তরল অবস্থার গৌড়-বঙ্গ অপভ্রংশে। গৌড়-বঙ্গে প্রচলিত এই অপভ্রংশ যখন মৌখিক বা কথ্য ভাষা মাত্র ছিল, তখন ইহাকে কেহ কবিতা বা পদ রচনা করিলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ছিল না; এবং এই কথ্য ভাষায় রচিত কোনও গান বা পদ বা শ্লোক এখনও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালা-ভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে, সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা-দেশে চলিত এই কয়টী ভাষা—(১) সংস্কৃত, (২) বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত, এবং (৩) পশ্চিমা- বা শৌরসেনী-অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষা তখনকার দিনের শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে (এবং ভারতের বাহিরে বৃহত্তর-ভারতের নানা দেশেও) আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইহার প্রচলন ছিল, বর্ণজ্ঞানযুক্ত লোক তখন সকলেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জানিত; আর্য্যভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতে সংস্কৃত ও বিভিন্ন লোক-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা তখনকার দিনে খুব বেশী বলিয়া লোকে মনে করিত না; লোকের মনে সাধারণতঃ এই ধারণা ছিল যে, প্রাকৃত ও লোক-ভাষার শুদ্ধ ও 'সংস্কৃত' রূপই হইতেছে সংস্কৃত-ভাষা; এই ধারণায় কিছু ভুল ছিল না। চলিত বা কথ্য ভাষার শুদ্ধ, ব্যাকরণ-সঙ্গত 'পাঠ' বা রূপ বলিয়া সংস্কৃতের আদর ও প্রচলন সর্বত্র ছিল; এবং শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা ছিল, শুদ্ধ সংস্কৃতে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করা—কি বিজ্ঞানে কি শিল্পে, কি দর্শনে কি বিচারে, কি জ্ঞান-বিস্তারে কি কাব্য-সাহিত্যে। লেখকের পক্ষে প্রকাশ-পথ সংস্কৃতে ছিল সহজ; দেড় হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বহু কবি ও অন্য লেখক সংস্কৃতে ভাব-প্রকাশের জন্য যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, অল্প একটু ব্যাকরণ-জ্ঞান হইলেই লোকে অবলীলা-ক্রমে সেই পথে নিজ রচনা-রথ পরিচালিত করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে কিছু রচিত হইলে নিখিল-ভারত ও বৃহত্তর-ভারতের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সহজ-সাধ্য হইত। এই হেতু, সংস্কৃত-রচনার এতটা জন-প্রিয়তা ছিল, এতটা প্রতিষ্ঠা ছিল। এক জৈনদের বাহিরে প্রাকৃত-সাহিত্য-রচনার ধারা তেমন প্রচলিত ছিল না; পশ্চিম

ভারতের জৈনেরা সংস্কৃতে একটী বিরাট্ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতে এবং প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ অপভ্রংশে-ও বহু পুস্তক, গদ্যগ্রন্থ কাব্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে জৈনদের প্রভাব তত বেশী ছিল না, এখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী আর বৌদ্ধদেরই আধিক্য ছিল, সেইজন্য প্রাকৃতে সাহিত্য-রচনার ধারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই—নাটকে অল্প-বিস্তর প্রাকৃতে কথোপকথন যাহা থাকিত তাহার বাইরে প্রাকৃত-ভাষার পঠন-পাঠন ও রচনা এদেশে বড় একটা হইত না বলিয়াই মনে হয়। হীনযানের থেরবাদী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা পালি-ভাষা (ইহা এক প্রকার প্রাচীন প্রাকৃত) ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেই পালির চর্চা ও পালিতে রচনার রীতি বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এই থেরবাদী সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। ইহাদের কেন্দ্র ছিল (অন্ততঃ খ্রীষ্ট-জন্মের পরের শতক-সমূহ হইতে) সিংহলে, পরে সিংহল হইতে ব্রহ্মে ও ব্রহ্ম হইতে চট্টলে এই হীনযান থেরবাদী বৌদ্ধ-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা দেশের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ বৌদ্ধগণ ছিলেন মহাযান মতের ; ইহাদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল, হয় শুদ্ধ সংস্কৃত, না হয় প্রাকৃত-ঘেঁষা মিশ্র-সংস্কৃত, যাহা "বৌদ্ধ-সংস্কৃত" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দেখা যায়,—সংস্কৃতের এই সর্বজন-স্বীকৃত ও সর্বজনানুমোদিত প্রতিষ্ঠা, আর পালি-প্রাকৃতের চর্চা বা প্রতিষ্ঠার অভাব ; তার পরে দেখা যায়, পশ্চিমা- বা শৌরসেনী-অপভ্রংশের প্রচার। মথুরা-অঞ্চল ছিল শৌরসেনী-প্রাকৃতের কেন্দ্র ; এই প্রাকৃত, খ্রীষ্টীয় ৪০০-৫০০-র মধ্যে, সমগ্র পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশে, পূর্ব-পাঞ্জাবে, মালবে ও রাজপুতানায় প্রসৃত হয় ; কোসলে এবং গুজরাটেও ইহার প্রভাব পড়ে। এই প্রাকৃত ছিল মধ্যদেশের—আর্য্যাবর্তের—হৃদয়-দেশের ভাষা ; এইজন্য ইহার একটা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে উচ্চ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী যাঁহারা সংস্কৃত বলেন না তাঁহারা এই শৌরসেনী-প্রাকৃতেই কথা কন। শৌরসেনী-প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ শৌরসেনী-অপভ্রংশ ; ইহা খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত (ও তাহার পরেও) উত্তর-ভারতের রাজপুত রাজাদের সভায় সাহিত্যের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত ; সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায়, গুজরাটে ও সংযুক্ত-প্রদেশে, তুর্কী-আক্রমণের পূর্ববর্তী কালে, ইহা তখনকার দিনের হিন্দীর মত প্রচলিত ছিল ; কোসলে, কাশীতে, মগধে, মিথিলায় ও গৌড়-বঙ্গেও ইহার প্রসার ঘটে ; ওদিকে মহারাষ্ট্রে ও সিন্ধু-প্রদেশেও ইহা বিস্তৃত হয় ; মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সারা উত্তর-খণ্ডে, তখনকার দিনের হিন্দীর মত, এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ এক অখণ্ড উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্র-ভাষা বা লোক-ভাষার স্থান গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় কথ্য-ভাষার দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হইলেও, শৌরসেনী-অপভ্রংশ মোটামুটী একটী অখণ্ড ভারত-ব্যাপী সাহিত্যের উপজীব্য কথ্য ভাষা রূপে ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বিরাজ করিতে থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কবিরাও এই ভাষায় পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাহ্নু, সরহ প্রভৃতির পদ এই ভাষায় পাওয়া গিয়াছে ; ইহাতে বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষা সৃজ্যমান প্রাচীন বাঙ্গালার ছাপ একটু-আধটু পাওয়া গেলেও, কাহ্নু সরহ প্রভৃতির অপভ্রংশকে শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশই বলিতে হয়। এই অপভ্রংশে সাহিত্য-রচনার জের পরবর্তী তুর্কী বা মুসলমান যুগের কয়েক শতক পর্য্যন্ত চলিয়াছিল ; আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁহার 'কীর্তিলতা' কাব্য এই শৌরসেনী-অপভ্রংশেই রচনা করিয়া গিয়াছেন—যদিও তাঁহার ব্যবহৃত শৌরসেনী-অপভ্রংশে বহু স্থলে তাঁহার মাতৃভাষা মৈথিলের সহিত মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৮০০-৯০০-র দিকে বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা-দেশে সাহিত্যের জন্য দুইটী প্রধান ভাষার

প্রচলন ছিল—সংস্কৃত, এবং শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ। গৌড়-বঙ্গের লোক-ভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিকার, ধীরে-ধীরে প্রাচীন বাঙ্গালায় তখন ইহা রূপান্তরিত হইতেছে। সমগ্র-উত্তর-ভারত-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা হেতু, শৌরসেনী-অপভ্রংশ এই পরিবর্তনশীল মাগধী-অপভ্রংশের সাহিত্যিক প্রতীক রূপে, আংশিক ভাবে অন্ততঃ, দাঁড়াইয়া যায়—কারণ বাঙ্গালা-দেশের কবিরা সহজেই ইহাকে পদ-রচনার জন্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, এবং বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষার সঙ্গে ইহার মিলও খুব ছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কবিগণ, সকলেই শৌরসেনী-অপভ্রংশ অল্প-স্বল্প ব্যবহার করিতেন; কিন্তু সকলেই বেশী করিয়া ব্যবহার করিতেন সংস্কৃত। বাঙ্গালা-ভাষা তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাতে বৌদ্ধ সিদ্ধগণ পদ-রচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল, বর্ণজ্ঞান-হীন জন-সাধারণের নিকট তত্ত্ব-কথা বা দেবতা-কথা পহুঁছাইয়া দেওয়া; এইজন্য তৈয়ারী শৌরসেনী-অপভ্রংশই ইহারা লইলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে উদীয়মান, নিজ বিশিষ্ট সত্তায় পৃথগ্‌ভূত প্রাচীন বাঙ্গালাকেও ইহারা বর্জন করিলেন না।

কিন্তু শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন-বাঙ্গালাকে লইয়া বাঙ্গালা-দেশে তখন অর্থাৎ তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দুই তিন শতক ধরিয়া অল্প-স্বল্প experiment অর্থাৎ পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র; দেশের সমগ্র শিক্ষিত (অর্থাৎ সংস্কৃতে-শিক্ষিত) পণ্ডিত ও কবিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র গণতান্ত্রিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অথবা প্রগতিশীল পণ্ডিত ও কবি এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন না; ইঁহাদের অনেকের কাছেই কবিতা অপেক্ষা ধর্মপ্রচারই বেশী গরজের জিনিস ছিল। সুতরাং বলিতে পারা যায়, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের যুগের বাঙ্গালা-দেশের কবি-মনের পূর্ণ পরিচয়—কল্পনোজ্জ্বল শিক্ষিত মনের পরিচয়—এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালার পদের ছিটাফোঁটা যাহা আমরা নিতান্ত সৌভাগ্য-ক্রমে পাইয়া গিয়াছি, তাহার মধ্যে পাইব না; পাইব অন্যত্র—তখনকার দিনের গৌড়-বঙ্গের কবিদের সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ রচনায়।

এইরূপ সংস্কৃত-রচনা, ইহার সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ধারণ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পরবর্তী কালের, মুসলমান-যুগের, বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র বা ঐতিহাসিক পটভূমিকা হিসাবে, তাহার তেমন আলোচনা হয় নাই। কেবল শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার অতি মূল্যবান্, তথ্য-পূর্ণ ও উপাদেয় গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ সার্থক ভাবে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম সাহিত্য-দৃষ্টি সাধুবাদের যোগ্য। মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া ইতিপূর্বে মূল্যবান্ আলোচনা ও বিচার করিয়া গিয়াছেন পরলোকগত মনোমোহন চক্রবর্তী ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর নিবন্ধ-ও এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য; এবং সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাঙ্গালা-দেশের বিরাট্ ইতিহাসের হিন্দু-যুগ-সম্পর্কীয় প্রথম খণ্ডের ৭৩-পৃষ্ঠাব্যাপী ১১-শ অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের যুগের গৌড়-বঙ্গে রচিত সংস্কৃত-সাহিত্যের অতি সুন্দর ও ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন অনুশাসনগুলিতে যে-সমস্ত সুন্দর মঙ্গলাচরণ ও অন্য শ্লোক পাওয়া যায়, সাহিত্যের দিক্ হইতে প্রিয়বর, সুকুমার বাবু তাঁহার পুস্তকে সেগুলির-ও বিচার করিয়াছেন, মুসলমান-পূর্ব যুগে গৌড়-বঙ্গে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'গীতগোবিন্দ' লইয়া আলোচনা-ও করিয়াছেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 'সদুক্তিকর্ণামৃত'

নামে সংস্কৃত-কবিতা-সংগ্রহের কথাও বলিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তির যুগে, মুখ্যতঃ সংস্কৃত-ভাষা এবং অংশতঃ পশ্চিমা-অপভ্রংশ কেন বাঙ্গালা-দেশের কবিদের ও অন্য লেখকদের উপজীব্য হইয়াছিল, সুকুমার বাবু তাহারও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। সুকুমার বাবুর লেখা পড়িয়াই 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়, এবং এই অতি মূল্যবান্ সংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পত্তনের যুগের ইতিহাসে ইহার যে একটী বড় স্থান আছে তাহা আমার মনে বিশেষ করিয়া প্রতিভাত হয়।

পণ্ডিতেরা ধর্ম, দর্শন, ব্যবহার, বৈদ্যক প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লইয়া যে-সব বই লিখিতেন, তাঁহারা পণ্ডিতদের জন্যই মুখ্যতঃ লিখিতেন। সেখানে সংস্কৃত ছাড়া কথ্য-ভাষায় (অথবা কথ্য-ভাষার সাহিত্যিক রূপ অপভ্রংশে) লিখিবার কথা তাঁহাদের মনে হইত না। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের রসিক, নিছক পণ্ডিতদের বাহিরে ও পাওয়া যাইত; তখনকার দিনে এইরূপ অপণ্ডিত সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে, সংস্কৃত জানা অনেকটা ভাল রকমে মাতৃভাষা জানারই শামিল ছিল। একটি সংস্কৃত শ্লোক অথবা একটী-একটী করিয়া বহু শ্লোকে গ্রথিত পূরা একখানি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া বুঝিয়া শ্লোকটীর অথবা সমগ্র কাব্যটীর রস আস্বাদন করা, তখনকার যুগের সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল না। তাঁহাদের জন্যও সংস্কৃত শ্লোক বা কাব্য রচিত হইত, কেবল বড়-বড় পণ্ডিতের জন্য নহে। বাঙ্গালা-দেশে সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল, নতুবা "গৌড়ী-রীতি" নামে সংস্কৃত-রচনা-শৈলী সংস্কৃত-সাহিত্যে দাঁড়াইয়া যাইত না। গৌড়-বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি কালিদাসের কাব্য ও নাটক পড়িয়া সেগুলির রস-গ্রহণ করিতে পারিতেন, ভবভূতি ভারবি রাজশেখর বাণভট্ট প্রভৃতিও বুঝিতেন; তাঁহাদের জন্যই বাঙ্গালা-দেশের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন, গৌড় অভিনন্দ ইঁহাদের সুবিধার জন্য পদ্যে 'কাদম্বরী-কথা-সার' লেখেন, শান্তিদেব ইঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'বোধিচর্য্যবতার' প্রণয়ন করেন, এবং দ্বাদশ শতকে ইঁহাদের আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন, ধোয়ী কবি 'পবন-দূত' লেখেন, গোবর্ধনাচার্য্য তাঁহার 'আর্য্যাসপ্তশতী'-র শ্লোক প্রণয়ন ও সংকলন করেন, এবং সামসময়িক অন্য কবিগণ নিজ-নিজ কাব্য ও প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। সংস্কৃত কবিতার অনুরাগী পাঠকদের জন্য সংগ্রহ-পুস্তক প্রণয়ন করার রীতি বোধ হয় সর্ব-প্রথম বাঙ্গালা-দেশেই দেখা দেয়। এইরূপ কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকা সুপরিচিত—তন্মধ্যে বোধ হয় সর্ব-প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতেছে 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়;' এখানি খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালা-দেশে কোনও সময়ে গ্রথিত হইয়াছিল; দ্বাদশ শতকের অক্ষরে লেখা ইহার একমাত্র পুঁথি হইতে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এফ্ ডব্লিউ টমাস্ মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার অতি সুন্দর একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহ-কারের নাম জানা যায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। প্রাপ্ত পুস্তকখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, ইহাতে মাত্র ৫২৫টী শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, ও ১১১ বিভিন্ন কবির নাম ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ১১১ জন কবির মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি আছেন, আবার এমন অনেক কবি আছেন নাম হইতে যাঁহাদের সেই যুগের গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বলিয়া মনে হয়—যেমন, অচলসিংহ, অপরাজিতরক্ষিত, গৌড় অভিনন্দ, কুমুদাকর মতি, ডিম্বোক বা হিম্বোক, ধর্মকর, বৈদ্য ধন্য, বিম্বোক, বুদ্ধাকরগুপ্ত, ভ্রমরদেব, মধুশীল, বাগোক, লক্ষ্মীর, ললিতোক, বন্দ্য তথাগত, বিতোক, বিদ্যাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, বীর্য্যমিত্র, বৈদ্যোক, শুভংকর, শ্রীধরনন্দী, সিদ্ধোক,

সোনোক বা সোন্নোক, হিঙ্গোক। অবশ্য, সংস্কৃত-সাহিত্যের একটা বড় অংশ এইরূপ কবিতা বা সূক্তি সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া; ঋগ্বেদ-প্রমুখ চার বেদ, সংগ্রহ-গ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কাব্য-রসিকদের জন্য যতগুলি সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রাচীতম দুইখানি গৌড়-বঙ্গে গ্রথিত হইয়াছিল ('কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর লিপি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ দিকের অথবা দ্বাদশ শতকের প্রাচীন নেপালী হইলেও, বইখানি বাঙ্গালা-দেশে সংকলিত হইয়া নেপালে নীত হইবার পক্ষে অনুমানের কারণ আছে)। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী জমিদার কর্তৃক সংকলিত হয়। 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'র পরে এই সংগ্রহগুলির নাম করিতে হয়—কাশ্মীরীয় কবি জহ্লণ সংকলিত 'সুভাষিত-মুক্তাবলী' বা 'সূক্তি-মালিকা' অথবা 'সূক্তি-মুক্তাবলী' (১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' (খ্রীষ্টীয় ১৩৬৩ সালের মধ্যভাগে রাজপুতানার কবি বৈদ্য শার্ঙ্গধর কর্তৃক গ্রথিত), 'সুভাষিতাবলী' (বল্লভদেব কর্তৃক পঞ্চদশ শতকে সংকলিত), ও শ্রীধর কৃত 'সুভাষিতাবলী' (পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ); এতদ্ভিন্ন আরও পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 'পদ্যতরঙ্গিণী' (ব্রজনাথ কৃত), 'পদ্যবেণী' (বেণীদত্ত কৃত), 'পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী' (হরিভাস্কর কৃত), 'সভ্যালঙ্করণ' বা 'সারসংগ্রহসুধার্ণব' (ভট্ট গোবিন্দজিৎ), 'সুভাষিত-প্রবন্ধ', 'সুভাষিত-শ্লোক', 'সুভাষিত-রত্নকোশ' (ভট্ট শ্রীকৃষ্ণ), 'সুভাষিত-হারাবলী' (হরি কবি) প্রভৃতি নানা সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। কিন্তু এইরূপ সংগ্রহের সূত্রপাত সম্ভবতঃ গৌড়-বঙ্গেই হইয়াছিল; এবং পরবর্তী কালেও বাঙ্গালা-দেশে এই সংগ্রহের ধারা লুপ্ত হয় নাই; ষোড়শ শতকের মধ্য-ভাগে শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে একখানি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ সংকলিত করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে এখানি একখানি সুপরিচিত পুস্তক। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এইরূপ ২০০-র অধিক শ্লোক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্লোক-মঞ্জরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। বাঙ্গালা-দেশে ভাষা-কবিতার এইরূপ সংগ্রহ গোড়া হইতেই আরব্ধ হয়; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদের সংগ্রহ হইতেছে বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদি পুস্তকে, এবং চৈতন্যদেবের পরে বহু বহু বৈষ্ণব পদ বাঙ্গালা-ভাষায় ও ব্রজবুলীতে রচিত হইয়া যখন আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল, তখন, সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেকগুলি পদ-সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখা দিল—'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি', 'পদামৃত-সমুদ্র' (রাধামোহন ঠাকুর কৃত), 'পদকল্পতরু' (গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস কৃত), 'কীর্তনানন্দ' (গৌরসুন্দর দাস কৃত), প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন উপরে উল্লিখিত তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার সংস্কৃত শিলালেখ ও তাম্রলেখ সমূহের যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির সাহিত্যিক মূল্যের বিচার করিয়াছেন, সেই শ্লোকগুলিও একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মত।

নানা দিক্ হইতে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' একখানি লক্ষণীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং বাঙ্গালাদেশের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। বইখানি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়; তখন পশ্চিম বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন, তুর্কী সেনানী বখ্‌ত্যার খল্‌জীর আক্রমণে নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া পূর্ব-বঙ্গে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। গ্রন্থ-সংকলয়িতা শ্রীধরদাস, গ্রন্থারম্ভ-শ্লোকে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্বক, পঞ্চ-শ্লোকময় 'প্রস্তাব' অর্থাৎ ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন। শৌর্য্য, তপ, জ্ঞান, দান, ইন্দ্রিয়জয়, শত্রুজয়, যোগ, ক্ষমা প্রভৃতি নানা গুণের আকর জীবন্মুক্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের 'প্রতিরাজ'

অর্থাৎ লেখক, অথবা বিশ্বস্ত খাস-মুন্‌শী (সম্ভবতঃ ইঁহাকে রাজার প্রতিনিধি হইতে হইত বলিয়া এই উপাধি) এবং তৎকর্তৃক মহাসামন্তপদে বৃত ও তাঁহার অনুপম প্রেমের একমাত্র পাত্র-স্বরূপ, সখার পদবীতে উন্নীত, শ্রীবটুদাস ছিলেন অক্ষয় ও সুনৃতপূর্ণ চন্দ্র-স্বরূপ ; তাঁহার পুত্র ছিলেন শ্রীধর দাস ; ইনি লক্ষ্মীমন্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন, এবং শ্রীপতিপদে ইঁহার ভক্তি ছিল। কবিদের অকারণ-মিত্র-স্বরূপ শ্রীধরদাস পঞ্চ প্রবাহে 'সূক্তিকর্ণামৃত' বা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে এই সংকলন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে তিনি গ্রন্থে সংগৃহীত শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন, এবং 'সদুক্তির্ণামৃত' সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন;—শকাব্দ 'সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেতদশশত' অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দ, ২০শে ফাল্গুন,—খ্রীষ্টাব্দ ১২০৬, ১১ই ফেব্রুয়ারী। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ১৯১২ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মার সম্পাদনায় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের চারিখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং বইখানি কতকটা লোক-প্রিয় হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৩৩ সালে ইংরেজী ভূমিকাদি সমেত এই বই লাহোরের মোতীলাল বনারসীদাসের সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বই লইয়া ১৮৭৬ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আলোচনা করেন, এবং ১৮৮০ সালের পরে জর্মান পণ্ডিত Aufrecht আউফ্‌রেখ্‌ট্ 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র দুইখানি পুঁথি লইয়া এই বইয়ের বিচার করেন, ও জর্মান ভাষায় রচিত দুইটী প্রবন্ধে পণ্ডিত-মহলে ইহাকে পরিচিত করিয়া দেন। আউফ্‌রেখ্‌ট্-এর কাগজ-পত্রর মধ্যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ ছিল, অধ্যাপক টমাস স্বীয় 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই কাগজ-পত্র হইতে অনেক তথ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ বইটী বাহির হইয়া যাইবার পরে আমাদের দেশে এখন উহার আলোচনা সুগম হইয়াছে।

'সদুক্তিকর্ণামৃত' পাঁচটী 'প্রবাহ' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটী করিয়া 'বীচি' অর্থাৎ তরঙ্গ বা শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটী করিয়া শ্লোক। শ্লোকের শেষে রচয়িতার নাম দেওয়া আছে, নাম যেখানে সংকলয়িতার জানা ছিল না সেখানে "কস্যচিৎ" অর্থাৎ 'কাহারো' বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রবাহের নাম 'অমর (বা দেব)-প্রবাহ'—ইহার বিভিন্ন 'বীচি'তে নানা দেবতার ও তাঁহাদের লীলা বিষয়ক পাঁচটী করিয়া শ্লোক আছে ; সর্ব-সমেত ৯৫ বীচি এই প্রবাহে মিলিত মিলিতেছে। দ্বিতীয় প্রবাহ হইতেছে 'শৃঙ্গার-প্রবাহ', ইহাতে ১৭৯টী 'বীচি' ; এই প্রবাহে প্রেম ও নায়ক-নায়িকা বিষয়ক এবং প্রেমিক-প্রেমিকার নানা ভাব ও অবস্থা, ও তদ্ভিন্ন ষড়্‌ঋতুর ও প্রকৃতির নানা অবস্থার বর্ণনাত্মক পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক বিদ্যমান। তৃতীয় প্রবাহের নাম 'চাটু-প্রবাহ', ইহাতে ৫৪ 'বীচি' ; বিষয়-বস্তু রাজা, বা বীরের্ দেহ ও শক্তি, চতুরঙ্গ সেনা, অস্ত্র, বীরত্ব, তূর্য্যধ্বনি, যুদ্ধ, শত্রু, কীর্ত্তি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা। চতুর্থ 'অপদেশ-প্রবাহ' হইতেছে ৭২ 'বীচিময়, ইহাতে নানা দেবতার দোষগুণ ও বহুবিধ পার্থিব প্রাকৃতিক বস্তু, বৃক্ষলতাপুষ্পাদি, পশু-পক্ষী প্রভৃতির বর্ণনাময় শ্লোক আছে। শেষ 'উচ্চাবচ-প্রবাহ', ইহার ৭৪ বীচিতে নানাবিধ বিষয়ের শ্লোক আছে—মনুষ্য, অশ্ব, গো, নানা পক্ষী, দেশ, কবি প্রভৃতি বহু প্রকীর্ণ বস্তু, স্থান, গুণ ও অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা। সংকলয়িতা গ্রন্থ-শেষে 'বীচি'-সমূহের সংখ্যা দিয়াছেন ৪৭৬, ও শ্লোকের সংখ্যা ২৩৮০ ; কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকের অভাব-হেতু মাত্র ৪৭৪ বীচি ও ২৩৭২ শ্লোক মিলিতেছে।

এই-সমস্ত শ্লোক বা কবিতার রচয়িতা হিসাবে ৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকগুলি শ্লোকের রচয়িতার নাম শ্রীধরদাস জানিতেন না বা পান নাই। এই কবিদের মধ্যে অমরু, কালিদাস, দণ্ডী, পাণিনি, প্রবরসেন, বাণ, বিহ্লণ, ভর্তৃহরি, ভবভূতি, ভামহ, ভারবি, ভাস, ভোজদেব, মুঞ্জ, রাজশেখর, বরাহমিহির, বাক্‌পতিরাজ, বিশাখদত্ত, শিহ্লণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের কতকগুলি প্রথিতনামা কবি আছেন; কিন্তু এই ৪৮৫ জন কবির মধ্যে—বহুস্থলে তাঁহাদের নাম দেখিয়া মনে হয়—অর্দ্ধেকের উপর গৌড়-বঙ্গেরই কবি, এবং শ্রীধরদাসের সামসময়িক অথবা তাঁহার কিছু পূর্ব্বেকার কালের কবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভার প্রথিতনামা কবি জয়দেব (৩১টী শ্লোক), উমাপতিধর (৯২), শরণ (২০), আচার্য্য গোবর্দ্ধন (৬) ও ধোয়ী কবিরাজ (২০টী শ্লোক)—ইঁহাদের 'সদুক্তি'র বিভিন্ন প্রবাহে পাইতেছি। তখনকার দিনে, তুর্কী-বিজয়ের পূর্ব্বেই, বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ভদ্রজাতির মধ্যে দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, পালিত, চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দেব, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর প্রভৃতি নামাংশ অনেকটা আজকালকার পদবীর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ব্রাহ্মণের নামের পূর্ব্বে গ্রামের নাম (গাঞি) ব্যবহারেরও রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে (যেমন 'বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, কেশরকোণীয় নাথোক, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক' প্রভৃতি)। 'ওক'-প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া প্রচলিত ভাষা-শব্দের নামকে বাহ্যতঃ সংস্কৃত ক-কারান্ত পদ করিয়া দেখাইবার রেওয়াজ-ও আসিয়া গিয়াছে (যেমন, 'গাঙ্গোক, গোসোক, জয়োক, জিয়োক, বিম্বোক, দনোক, পুণ্ড্রোক, শুঙ্গোক, হীরোক' ইত্যাদি)। এই প্রকার নামের ধরণ দেখিয়া, এবং কতকগুলি কবির সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের বলে, 'সদুক্তি'-র কবিদের অনেকেই যে গৌড়-বঙ্গের ছিলেন, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীধরদাসের সংগ্রহ হইতে তাঁহার সময়ের বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিক আব-হাওয়ার কতকটা ইঙ্গিত পাইতেছি। জয়দেব কবির ৩১টী শ্লোকের মধ্যে ৫টী তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে মিলিতেছে; বাকী ২৬টী শ্লোক এতাবৎ আমরা জানিতাম না। এগুলি হইতে দেখা যায় যে, জয়দেব যুদ্ধেরও কবি ছিলেন, বীর-রস ও রাজপ্রশস্তি লইয়া তাহার ১৮টী শ্লোক এই গ্রন্থে পাইতেছি; তাঁহার রচিত মহাদেবের বন্দনাময় একটী শ্লোক-ও শ্রীধরদাস উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি সম্ভবতঃ পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব কল্পনায় তিনি যে বৈষ্ণব সাধক বা মহাজন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশস্তি-কারক রাজকবি জয়দেব সম্ভবতঃ তাহা ছিলেন না। শ্রীধরদাস-ধৃত লক্ষ্মণসেন-রচিত একটী শ্লোক হইতে ও তৎপুত্র রাজকুমার কেশবসেন-রচিত আর একটী শ্লোক হইতে দেখা যায় যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের জবাবী বা পালটা শ্লোক রাজা ও রাজকুমার রচনা করিতেছেন, এবং এই দুই শ্লোক (দুইটীই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে ধরিয়া গিয়াছেন, তবে তিনি দুইটীই লক্ষ্মণসেনের বলিয়া লিখিয়াছেন) হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে যে "নন্দনিদেশতঃ" পদ আছে, তাহার সরল অর্থ 'নন্দরাজার নিদেশ অনুসারে', ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে, পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের কাহারো-কাহারো এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত 'নন্দ অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে' এই কষ্ট-কল্পিত অর্থ নহে। [জয়দেব-সম্পর্কিত সমস্ত পদগুলির মূল সংস্কৃত দিয়া এ বিষয়ে এই বৎসরের (১৩৫০ সালের) শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীজয়দেব কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।]

'সদুক্তি'র এই লক্ষণীয় শ্লোক দুইটী নীচে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

"আহূতাদ্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা ;
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ ; কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ?
বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্", ইতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ (কেশবসেনদেবস্য)
"কৃষ্ণ ! ত্বদ্বনমালয়া সহকৃতং", কেনাঽপি "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া, গৃহ্যতাম্ ।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে, ত্রপা-নম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ (লক্ষ্মণসেনদেবস্য) ।

এই দুইটীর সহিত 'গীতগোবিন্দ'র প্রথম শ্লোক তুলনীয়—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্ ;
নক্তং ; ভীরুরয়ং,—তদেব ত্বমিমং রাধে ! গৃহং প্রাপয় ।"
—ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥

বাঙ্গালা-দেশের ভাষা-সাহিত্যের ধারা খ্রীষ্টীয় ৯-১২ শতাব্দীর উৎস-মুখ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, 'সদুক্তি'-ধৃত শ্লোক ও সামসময়িক অন্য সংস্কৃত-রচনা হইতে তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটী মুখ্য বিভাগ—(১) কথাত্মক 'মঙ্গল' কাব্য ও (২) গানময় 'পদ', তুর্কী-পূর্ব যুগেই পাইতেছি ; এবং এই দুই বিভাগের অদ্ভুত মিলন-ক্ষেত্র জয়দেবের গীতগোবিন্দে দেখিতেছি,—ইহা শ্রীকৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক উজ্জ্বল বা প্রেম রসের গীতিময় 'মঙ্গল'-ও বটে, আবার ইহাতে মধুর-কোমল-কান্ত 'পদাবলী'-ও নিহিত আছে। গীতগোবিন্দের প্রভাব বরাবর-ই বাঙ্গালা-সাহিত্যে ছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত এই প্রভাব চলিয়া আসিয়াছে ; বাঙ্গালার বাহিরে অন্য ভাষায়, যথা উড়িয়া হিন্দী গুজরাটীতেও, এই প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়। মধ্য-যুগের বা মুসলমান-যুগের বাঙ্গালার প্রথম প্রধান কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের একাধিক পদের অনুবাদ আছে, গীতগোবিন্দের অনেক বাক্যাংশের প্রতিধ্বনিও এই কাব্যে মিলে। শ্রীচৈতন্যোত্তর-যুগে যে বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য্য হঠাৎ আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়, তাহার পিছনে গীতগোবিন্দ-যুগের সংস্কৃত কবিতার একটী অনুপ্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও অন্যান্য পুস্তকের সংস্কৃত শ্লোকের আধারে যে বহু বাঙ্গালা ও বজবুলী পদ রচিত হইয়াছে, তাহা দেখা যায় ; এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর মত কবি ও পণ্ডিতের মার্জিত সাহিত্য-রুচি যে মুসলমান-পূর্ব যুগের কবিদের রচনা দ্বারা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও গঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সংকলিত 'পদ্যাবলী' হইতে অনুমান করা যায়। ভাষার দিক্ দিয়া, এবং সহজিয়া ও দেহতত্ত্বের পদের অনুরূপ ভাবের দিক্ দিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত চর্য্যাপদগুলি যেমন মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিতে, তেমনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও তাঁহার সামসময়িক গৌড়-বঙ্গের সংস্কৃত কবিদের শ্লোকাবলীকে (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীকে) বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি সংস্কৃতময় রূপ বলা যায়। 'সদুক্তি'-র কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক শ্লোকের অনুরূপ বা সমশ্রেণিক শ্লোক, পরবর্তী সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায় ; যেমন ষোড়শ শতকের 'পদ্যাবলী'তে, যেমন মহারাষ্ট্রীয়

পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব কর্তৃক উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে সংকলিত 'সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগার' মধ্যে; আভ্যন্তর প্রমাণে, এগুলিকেও 'সদুক্তি'-র যুগেই লইয়া যাইতে হয়। যেমন, নিম্নের শ্লোকটী; এটী 'সদুক্তি'-তে 'দেব-প্রবাহ' মধ্যে 'গোবর্ধনোদ্ধার' নামে ৬০-সংখ্যক 'বীচি'-র দ্বিতীয় শ্লোক ('সদুক্তি' ১।৬০।২), ইহার রচয়িতার নাম 'সদুক্তি'-তে কেবল 'কস্যচিৎ' বলিয়া উক্ত, কিন্তু শ্রীরূপের 'পদ্যাবলী'-তে এটীকে জয়দেবের সামসময়িক 'শরণস্য' অর্থাৎ শরণ-কবির বলিয়া পাইতেছি (পদ্যাবলী ২৬৫):—

"একেনৈব চিরায়, কৃষ্ণ! ভবতা গোবর্ধনোঽয়ং ধৃতঃ—
শ্রান্তোঽসি; ক্ষণম্ আস্স্ব; সাম্প্রতম্ অমী সর্বে বয়ং দধ্মহে।"
—ইত্যুল্লাসিতদোষ্ণি গোপনিবহে, কিঞ্চিদ্ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চৎ-শৈলভরার্দিতে বিরমতি, স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এটীর সহিত তুলনীয়, 'পদ্যাবলী'-র ২৪৮ সংখ্যক শ্লোক, 'বাসব'-নামক কবির বলিয়া উল্লিখিত; এটী 'সদুক্তি'-তে নাই,—'সদুক্তি'-তে 'বাসব' বলিয়া কোন কবির শ্লোক নাই :—

"কা ত্বং?" "মাধব-দূতিকা।" "বদসি কিং?" "মানং জহীহি, প্রিয়ে!"
"ধূর্তঃ সোঽন্যমনা—", "মনাগপি, সখি! ত্বয্যাদরং নোজ্ঝতি।"
—ইত্যন্যোন্য-কথারসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেশবান্
নাত্মা কুঞ্জগৃহং প্রকাশিততনুঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এই দুইটী শ্লোকের চতুর্থ-পাদের শেষ অংশ "স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ" লক্ষণীয়,—মনে হয়, যেন একই সময়ে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় সমস্যাপূর্তি-শ্লোক হিসাবে এই দুইটী দুইজন বিভিন্ন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। 'সদুক্তি', 'পদ্যাবলী' ও অন্য সংগ্রহে "হরিঃ পাতু বঃ" এইরূপ আশীর্বচনাত্মক শেষাংশযুক্ত অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোক পাওয়া যাইতেছে; এগুলিকে একসঙ্গেই ধরিতে হয়। উপরে দেওয়া বাসব-রচিত শ্লোকটীর ভাব, সখীবেশে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য-বিষয়ক বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের আধার স্বরূপ। আবার ভাব-সাম্যের দিক্ হইতে উপরে প্রদত্ত শরণের গোবর্ধন-ধারণ-বিষয়ক শ্লোকটীর সহিত তুলনীয় জয়দেব-রচিত একটী শ্লোক ('সদুক্তি', ১।৬০।৫)—

"মুগ্ধে!" "নাথ, কিমাত্থ?" "তন্বি! শিখরিপ্রাগ্ভারভুগ্নো ভুজঃ।"
"সাহায্যং, প্রিয়! কিং ভজামি?" "সুভগে! দোর্বল্লিমায়াসয়।"
—ইত্যুল্লাসিত-বাহুমূল-বিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ (? পতিতাঃ) কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

আবার ইহার শেষ ছত্রের শেষাংশের সহিত উমাপতিধরের এই শ্লোকের অনুরূপ অংশ তুলনীয় ('সদুক্তি', ১।৫৫।৩; বিষয়, 'হরিক্রীড়া')—

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিস্ফুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়-শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশটুকুর মিল দেখিয়া উপরে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের দুইটী অনুরূপ শ্লোককে ও তেমনি একত্র গ্রথিত বা সম্পর্কিত বলিতে হয়।

একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিলে, এই-সব শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক ও পরবর্তী বাঙ্গালা পদের মধ্যে একটা সংযোগ বাহির করা যায়।

'সদুক্তি'-ধৃত অন্যবিধ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়া ও বিভিন্ন প্রবাহের অন্তর্গত লক্ষণীয় কতকগুলি বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করিয়া, এই বইয়ের পরিচয়ের সমাপ্তি করিব। এই-সকল শ্লোক এবং কবিদের উপজীব্য বিষয়-বস্তু হইতে, সাত আট শ' বা হাজার বছর পূর্বের গৌড়-বঙ্গের শিক্ষিত কবি-মনের ও কবিত্ব-শক্তির দিগ্‌দর্শন করিতে পারা যাইবে।

দেব-প্রবাহে পর পর ব্রহ্মা, সূর্য্য, শিব ও শিবের পরিকর এবং শিবের গুণাবলী ও কার্য্যাবলী, নারায়ণের দশ অবতার (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীকৃষ্ণলীলা) ও নারায়ণের পরিকর এবং গুণ ও ক্রিয়াবলী, সরস্বতী, চন্দ্র (বিবিধ অবস্থায়), বায়ু (বিভিন্ন প্রকারের বায়ু, যথা দক্ষিণবায়ু, নদীবাত, সমুদ্রবাত, প্রাভাতিক বাত), মদন—এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনে ও বিভিন্ন ছন্দে রচিত ৪৭৫টী শ্লোক আছে। জয়দেব-রচিত মহাদেব-বিষয়ক একটী শ্লোক আছে, সেটী এইরূপ—

> ভূতি-ব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্
> ললাটাক্ষি-ব্যাজেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্।
> বিস্তীর্ণাঘোর-বক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
> বিশ্বং শশ্বদ্বিতন্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥ ১।৪।৪ ॥

উমাপতিধর, জলচন্দ্র, যোগেশ্বর ও বৈদ্য গঙ্গাধর, শিব-বিষয়ক ইঁহাদের অনেকগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস দিয়াছেন। বৈদ্য গঙ্গাধরের একটী মহাদেব-স্তুতি—

> পীযুষেণ বিষেণ তুল্যমসনং, স্বর্গে শ্মশানে স্থিতির্
> নির্ভেদা, পন্নগোঽনলস্য বহনে যস্যাবিশেষাগ্রহঃ।
> ঐশ্বর্য্যেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্ কালং সমঃ সর্বতো
> দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসার-পাশং হরঃ ॥ ১।৪।৫ ॥

'বিবাহ-সময়-গৌরী'র এই সুন্দর বর্ণনাটী এক অজ্ঞাতনামা কবির; সম্ভবতঃ তিনি গৌড়-বঙ্গেরই ছিলেন—

> ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ—লোকপালাস্তথৈতে;
> জামাতা কোঽত্র? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী!
> হা বৎসে! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভির্
> দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী ॥ ১।২৩।৩ ॥

এই শ্লোকটী পাঠে যুগপৎ ভারতচন্দ্রের পার্বতীর বিবাহের বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতাটী মনে আসে।

কালী-সম্বন্ধে ৫টী শ্লোক আছে—এগুলিতে কালীর ধ্যান বা চিত্র আমাদের আজকালকার কালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এবিষয়ে, ১২০০ শতকের পরে বাঙ্গালী শাক্তের দেব-কল্পনায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়। কার্ত্তিকেয়ের বর্ণনায় পাঁচটীর মধ্যে দুইটী শ্লোকে কার্ত্তিকেয়ের শিশুলীলার সুন্দর চিত্র আছে; জলচন্দ্র (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী) রচিত শ্লোকে ক্রীড়োন্মুখ শিশু স্কন্দ পিতার জটাজূট লইয়া খেলা করিতেছেন (১।৩০।৪), এবং উমাপতিধরের শ্লোকে শিশু কার্ত্তিকেয়

বেশভূষায় পিতা শিবের অনুকরণ করিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছেন (১।৩০।৫)। ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শিশুলীলা শিবের ঘরে দেখা দিয়াছে। ১।৪১ বীচিতে ভৃঙ্গীর বর্ণনায় কয়েকটী শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর কথা কবিগণ বর্ণনা করিতেছেন ; এই গৃহী ও ভিখারী শিবের চিত্র একেবারে বাঙ্গালা দেশের, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিত্র বহু কবি আঁকিয়া গিয়াছেন ; এই চিত্রের সূত্রপাত যে মুসলমান-পূর্ব যুগে, তাহা 'সদুক্তি'-র শ্লোকগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

বাঙ্গালীর গঙ্গা-প্রীতি ও গঙ্গা-ভক্তি থাকিবেই। গঙ্গা-বিষয়ক দশটী শ্লোক দেব-প্রবাহে আছে ; তন্মধ্যে কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট-জাতীয় কবি পপীপ রচিত শ্লোকটী এই—

বদ্ধাঞ্জলি নৌমি—কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে !
অন্তে বয়স্তক্ষগতায় মহ্যম্ অদেহবন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ ॥

অন্যত্র পঞ্চম বা উচ্চাবচ-প্রবাহে (৫।৩১।২), 'বাণী' অর্থাৎ বাক্ বা ভাষা অথবা কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বর্ণনায়, কেবল 'বঙ্গাল' অর্থাৎ বাঙ্গাল বা পূর্ব-বঙ্গীয় এই আখ্যায় উল্লিখিত অজ্ঞাতাপরনামা কোনও কবি, নিজ বাণীকে গঙ্গার সহিত উপমিত করিয়াছেন (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই শ্লোকটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ ॥ (বঙ্গালস্য)

অর্থাৎ, প্রচুর-জল-বিশিষ্ট (বাণী-পক্ষে—বিভিন্ন-রস-যুক্ত), গভীর (বাণী-পক্ষে—গভীর অর্থময়), বঙ্কিম বা আঁকাবাঁকা (বাণী-পক্ষে—সুন্দর), মনোহর, এবং কবিদের দ্বারা উপজীবিত গঙ্গাতে তথা "বাঙ্গালের বাণীতে, এই উভয়ে অবগাহন করিলে পবিত্র করে। এখানে আমরা অসঙ্কোচে "বঙ্গাল-বাণী" এই সমস্ত-পদটীকে, আমাদের সুবিধার জন্য "বাঙ্গালের বাণী" অর্থাৎ 'বাঙ্গাল-ভাষা' অথবা "বাঙ্গালা-ভাষা" অর্থে লইতে পারি। "বাণী" এখানে ভাষা-অর্থে লওয়া চলে ; বিদ্যাপতি-ও 'কীর্ত্তিলতা'তে নিজ ভাষার প্রশস্তি করিয়া গিয়াছেন—

বালচন্দ, বিজ্জাবই ভাসা—দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন-হাসা।
ও পরমেসর হর-সির সোহই, ঈ নিচ্চয় নাঅর-মণ মোহই ॥ * * *
দেসিল বঅণা সব-জণ-মিট্ঠা। তেঁ তৈসণ জম্পওঁ অবহট্ঠা।

হিন্দীর সাধক-কবি কবীর (পঞ্চদশ শতক) তাঁহার ব্যবহৃত লোক-ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল-কবির এই শ্লোক পাঠ কালে স্মরণীয়—

সংস্কৃত কূপজল, কবীরা ! ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌ তবহিঁ ডূবৌ, শান্ত হোয় শরীর ॥

বিষ্ণুর দশাবতার বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার-লীলাই ৬০টী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলির বৈশিষ্ট্য এবং পরবর্তী বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের সঙ্গে এগুলির যোগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। মনে হয়, পরম ভাগবত ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভার সহিত এই শ্লোকাবলীর অনেকগুলিই বিজড়িত। 'গীতম্' শীর্ষক শ্লোক-পঞ্চকের মধ্যে অজ্ঞাতনামা কোনও (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী) কবির এই শ্লোকটী শুদ্ধভক্তির আকর-স্বরূপ, ইহাতে যেন শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়াবেগ ধ্বনিত হইতেছে—

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রশনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধানুবন্ধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিতয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥

কুলশেখর কবি রচিত (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না—তবে মনে হয়, ইহাঁর শ্লোকে যেন চৈতন্য-চরিত্রের পূর্বাভাস পাইতেছি) 'হরিভক্তি' সম্বন্ধে চারিটী, এবং অজ্ঞাতনামা আর একজন কবির একটী, এই পাঁচটী শ্লোক-ই যে কোনও স্তোত্র-সংগ্রহে গৃহীত হইবার যোগ্য। এই সমস্ত শ্লোকে খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র পূর্বেই আমরা চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হরিভক্তি যেন চাক্ষুষ করিতে পারিতেছি।

দেব-প্রবাহে অন্যতম দেবতা বাত বা বায়ুর প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি রোচক শ্লোকের মধ্যে, দক্ষিণ-বায়ুর বর্ণনায় দুইটী শ্লোকে সুদূর দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জাতি সমূহের তরুণীদের কথা আনিয়া দুইজন অজ্ঞাত কবি একটু রোমান্টিক বা রমন্যাস ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

'শৃঙ্গার-প্রবাহ'টী বিশেষ দীর্ঘ। পুরুষ ও নারী, নায়ক ও নায়িকা, বিভিন্ন অবস্থার ও দেশের স্ত্রী, প্রেম, অভিসার, মিলন, বিরহ, গীত বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি কলা, প্রাকৃতিক দৃশ্য (যথা—প্রত্যুষ, সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা), ঋতু-বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের, বিশেষ করিয়া গৌড়-বঙ্গের কবিদের মনের ভাব-সম্পুট এই প্রবাহের ৮৭৫টী শ্লোকের মধ্যে পাইতেছি। মাঝে-মাঝে বাঙ্গালার জনগণের যে-সব চিত্র শ্লোক-সমূহে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর, অন্যত্র দুর্লভ; সেইজন্য এগুলির মূল্য অসাধারণ। বাঙ্গালী কবি উমাপতিধর উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলের স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া শ্লোক লিখিলেন; বাঙ্গালী কবি অমৃতদত্ত নাগরিকতার সহিত তাহাদের প্রশস্তি গাহিলেন,

উত্তরাপথ-কান্তানাং কিং ব্রূমো রামণীয়কম্?
যাসাং তুষার-সংভেদে ন ম্লায়তি মুখাম্বুজম্॥ (২।২০।৩)

আবার উত্তর-ভারতের কবি রাজাশেখর দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদের, পাশ্চাত্য স্ত্রীদের ও গৌড়াঙ্গনাদের-ও বেশ-ভূষার বর্ণনা করিয়া যে-সব শ্লোক বাঁধিয়াছিলেন, শ্রীধরদাস তাঁহার 'সদুক্তি'তে সেগুলি দিয়াছেন। কোনও অজ্ঞাত কবি—সম্ভবত ইনি বাঙ্গালী ছিলেন—বঙ্গ-দেশের অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের মেয়েদের সজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন—

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি-মসৃণৈ র্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং—
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গণানাম্॥ (২।২০।৫)

ঢাকাই-কাপড়ের দেশের মেয়েরা তো সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিবেই; তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা পশ্চিম-বঙ্গেও কচি সাদা তাল-পাতার পাকানো গোঁজ কানে মাকড়ীর বদলে পরিত, ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতে সুহ্ম-দেশ বা মেদিনীপুর জেলার মেয়েদের সম্বন্ধে একথা জানা যায়। এই তাল-পাতার কর্ণভূষণ এখনও সুদূর বলিদ্বীপে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কবি চন্দ্রচন্দ্র (নিশ্চয়ই ইনি বাঙ্গালী ছিলেন—প্রথম 'চন্দ্র' ইহাঁর ব্যক্তি-গত নাম, দ্বিতীয় 'চন্দ্র' পদবী) গ্রাম্য তরুণীর বর্ণনায় (২।২১।২) কপালে কাজলের টিপ, দুই হাতে পদ্ম-ডাঁটার বালা, কানে শলাটু-ফলের (? কচি ছোট-ছোট বেলের) দুল, স্নানের পরে বাঁধা খোঁপায় তিল-পল্লব গোঁজা, এই চিত্র পাওয়া যায়। অভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, দুর্দিনাভিসারিকা—

অভিসার-পর্য্যায়ে এতগুলি বিভাগ হইতে আমাদের বাঙ্গালা-পদাবলী-সাহিত্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বনবিহার-কালে একটী সুন্দরী পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গাছ হইতে ফুল পাড়িতেছে, উমাপতিধর তাহার চিত্র দিয়াছেন—

দূরোদঞ্চিতবাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশস্তনা-
ভোগব্যায়তমধ্যলম্বিবসনান্নির্মুক্তনাভিহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্পমঞ্জরিরজঃপাতাবরুদ্ধেক্ষণা
চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্র-দুস্থা তনুঃ ॥ (২।১০৭।২)

বিবিধ প্রকারের নায়কের মধ্যে 'গ্রাম্য-নায়ক'-এর বর্ণনা-প্রসঙ্গে, সেকালের কৃষক যুবকের জীবনে সুখের চিত্র (কবি, যোগেশ্বর)—

ব্রীহিঃ স্তম্বকরিঃ প্রভূতপয়সঃ, প্রত্যাগতা ধেনবঃ ;
প্রত্যুজ্জীবিতমিক্ষুণা ভূশমিতি ধ্যায়ন্নপেতাস্বধীঃ।
সান্দ্রোশীরকুটুম্বিনীস্তনভর-ব্যালুপ্তঘর্মক্লমো,
দেবে নীরমুদারমুজ্ঝতি, সুখং শেতে নিশাং গ্রামণীঃ ॥ (১।৮৪।৩)

প্রচুর জলের জন্য ধান বেশ গজাইয়া উঠিয়াছে, গোরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, আখও হইবে প্রচুর, অন্য চিন্তা আর নাই ; ঘরের স্ত্রীও এই অবসরে স্নিগ্ধ উশীর বা বেনামূলের রসে প্রসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আকাশ থেকে খুব জল পড়িতেছে, এই অবস্থায় গ্রামীণ যুবক আরামে নিদ্রা যাইতেছে। এই শ্লোকে আমরা পালি 'সুত্ত-নিপাত' গ্রন্থের প্রাচীন-ভারতীয় কৃষকের আনন্দ-গীতের প্রতিধ্বনি পাইতেছি—

পক্কোদনো দুদ্ধ-খীরোঽহমস্মি, অনুতীরে মহিয়া সমান-বাসো ;
ছন্না কুটী, আহিতো গিনি ;— অথ চে পৎথয়সি, পৎসস, দেব ॥ ইত্যাদি

'আমার ঘরে ভাত রাঁধা হইয়া গিয়াছে (অথবা আমার সব ধান পাকিয়া উঠিয়াছে), আমার গোরুর দুধ দোহা হইয়া গিয়াছে ; চিরকাল আমি মহী-নদীর তীরে বাস করি ; আমার কুঁড়ে' ঘরটী বেশ ছাওয়া, ঘরে আগুনও জ্বালা আছে ; যদি চাও, দেবতা, তো এখন যত ইচ্ছা জল বর্ষণ করো।'

'শিশির-গ্রাম' অর্থাৎ শীতকালে গ্রামের শোভা অজ্ঞাতনামা গৌড়ীয় কবি এইভাবে দেখাইয়াছেন—

শালিচ্ছেদ-সমৃদ্ধ-হালিকগৃহাঃ সংসৃষ্ট-নীলোৎপল-
স্নিগ্ধ-শ্যাম-যবপ্ররোহ-নিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্ত-ধেন্বনডুহচ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্ত-ধ্বনদিক্ষুযন্ত্র-মুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ ॥ (২।১৩৬।৫)

শীতকালে হালিক অর্থাৎ হালিয়া বা কৃষকের ঘর কাটা ধানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; গ্রামের সীমান্তের ক্ষেত্র-সমূহে যে প্রচুর যব হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর, পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের নীলপদ্মের মত স্নিগ্ধ-শ্যাম ; গাভী, বলদ ও ছাগ-সমূহ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত ; ক্রমাগত আখ-মাড়া কলের শব্দে মুখরিত গ্রাম-সকল এখন নূতন ইক্ষু-গুড়ের সৌরভে আমোদিত।

দ্বিতীয় বা 'শৃঙ্গার-প্রবাহে' সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দৈনিক জীবন, ঋতু-চর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ের শ্লোকের সংগ্রহ ; তৃতীয় 'চাটু-প্রবাহ' রাজা ও মহাপুরুষ, যুদ্ধ, কীর্ত্তি প্রভৃতি লইয়া। এই প্রবাহে বেশী নয়, ২৭০টী শ্লোক মাত্র। ইহার মধ্যে জয়দেব কবির যুদ্ধ- ও শৌর্য্য-বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক আছে ; এগুলি হইতে বুঝা যায় যে, জয়দেব কেবল বিলাস-কলায় কুতূহল ও সঙ্গে-সঙ্গে হরিচরণ-স্মরণে সরস-মন কবি ছিলেন

না, রাজার শৌর্য্য ও বীর্য্য, যুদ্ধক্ষেত্র, তূর্য্য-নিনাদ, ধর্ম-সংস্থাপন, খড়্গ-ঝঞ্ঝনা, সংগ্রাম, কীর্ত্তি প্রভৃতি বিষয়ও তাঁহাকে দিয়া শ্লোক লিখাইয়াছিল। জয়দেবের এই-সকল শ্লোক হইতে (এগুলি আমার উপরে উল্লিখিত জয়দেব-বিষয়ক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে দিয়াছি) ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এগুলি তাঁহার রচিত মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের শৌর্য্য-প্রশস্তি-মূলক কোন বীররস-প্রধান সংস্কৃত কাব্য, যাহা অধুনা-লুপ্ত, তাহা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এই অনুমানের স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, শ্রীধরদাসের উদ্ধৃত জয়দেব-নামাঙ্কিত ৩১টী শ্লোকের মধ্যে ৫টী 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত; অবশিষ্ট ২৬টীর মধ্যে কয়েকটী অন্ততঃ তাঁহার রচিত অন্য কোনও কাব্য হইতে গৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে। ধোয়ী কবির 'পবন-দূত' এই রূপ অনুমানের সমর্থন করে। লক্ষ্মণসেনের প্রশংসায় রচিত জয়দেবের এই শ্লোকটী লক্ষণীয়—

লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ (=লক্ষ্মীনায়ক, লক্ষ্মীকান্ত)! জঙ্গমহরে (=চলন্ত নারায়ণস্বরূপ)! সংকল্প-কল্পদ্রুম!
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ! সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয় (=যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম)! বঙ্গপ্রিয়!
গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজ-রাজক (=লেখক-শ্রেষ্ঠ)! সভালংকার! কারাপিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল! পালক সতাং! দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম্॥ (৩।১১।৫)

'চাটু-প্রবাহে' নানাবিধ বিষয়ের কথা আছে; যেমন, চাটু, বিদ্যা, গুণ, ধর্ম, রূপ, দৃষ্টি, দেহাংশ, অত্যুক্তি, চিত্রোক্তি, কার্য্য-গর্ব, দান, দরিদ্র-পালন, বিক্রম, পৌরুষ, শৌর্য্য, প্রতাপ, হস্তী অশ্ব নৌকা সেনা, বিবিধ খড়্গ, যুদ্ধ-যাত্রা, যুদ্ধক্ষেত্র, দিগ্বিজয়, শত্রু, শত্রুনারী, শত্রুদেশ, যশ প্রভৃতি সাধারণ জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এইরূপ নানা বিষয়ের অবতারণা, যাহার জন্য মানুষকে সকলে চাটুবাদ বা প্রশংসা করিয়া থাকে; সেই-সব বিষয় এই প্রবাহের শ্লোকাবলীর মধ্যে আছে।

চতুর্থ, 'অপদেশ-প্রবাহ'। 'অপদেশ' অর্থে 'স্থান', তদনন্তর 'ব্যাজ' অর্থাৎ 'ছল' অথবা 'লক্ষ্য'; 'ব্যাজ-স্তুতি' অর্থাৎ 'স্তুতিচ্ছলে নিন্দা', অথবা 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতি', কিংবা 'দ্ব্যর্থ-বাক্য', এই অর্থেও এই শব্দ গ্রহণ করা যায়। কতকগুলি দেবতা ও প্রাকৃতিক বস্তুর এই প্রকার নিন্দা ও স্তুতিময় বর্ণনার শ্লোক লইয়া এই প্রবাহের আরম্ভ; বাসুদেব, মহাদেব, শিবগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র (সমুদ্রের গুণ ও নিন্দা লইয়া ৬টী বীচিতে ৩০টী শ্লোক), অগস্ত্য ঋষি, জল, শঙ্খ, মণি, নানা রত্ন, ও স্বর্ণ; নদ-নদী, সরোবর (বিভিন্ন প্রকারের), মীন, সর্প, ভেক, পদ্ম, ভ্রমর, পর্বত, মলয়; বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন অবস্থার সিংহ গজ মৃগ ও অন্য পশু; নানা প্রকারের বৃক্ষ; মরুভূমি; মেঘ, চাতক; হংস, কোকিল, শুক ইত্যাদি; কবি-প্রসিদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট বস্তুগণের বর্ণনার সমাবেশে এই অপদেশ-প্রবাহ। ইহাতে ৩৬০টী শ্লোক আছে।

শেষ, 'উচ্চাবচ' অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ক বা প্রকীর্ণ প্রবাহ। ইহাতে মনুষ্য; তুরঙ্গ, গো প্রভৃতি পশু, পারাবত বক আদি পক্ষী; গিরি, বন, নদ-নদী, তড়াগ, চক্রবাক প্রভৃতি কবি-স্তুত বস্তু; ধনুর্ভঙ্গ, হনুমান্ প্রভৃতির বীরত্ব, দশমুখ রাবণের শিরচ্ছেদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার; কবি, বিভিন্ন কবির যশ ও গুণ, কাব্যচৌর; সজ্জন, দুর্জন, মনস্বী, সেবক, কৃপণ, ক্ষুদ্রোদয়-দুঃখিত, দারিদ্র্য, দরিদ্র-গৃহিণী, দরিদ্র-গৃহ প্রভৃতি অবস্থার মানুষ; জরা, বৃদ্ধ; অনুশয়, বিচার, নির্বেদ, প্রভৃতি মনোভাব; কারুণিক, বনগমনোৎসুক, তপস্বী প্রভৃতি ভাবের মানুষ; ভবিতব্যতা, দেব, কাল, শ্মশান; সমস্যা; ইত্যাদি নানা অনপেক্ষিত বিষয়ের শ্লোক-সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রবাহের শেষে শ্রীধরদাস, পিতা "প্রতিরাজ" বা রাজার লেখক বা খাস-মুনশী বটুদাসের প্রশস্তিময় পাঁচটী শ্লোক দিয়াছেন, এগুলির মধ্যে চারিটীর কবি বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন সাঞ্চাধর (? সাঁচা = সত্য + ধর), বেতাল, উমাপতিধর ও কবিরাজ ব্যাস। এই প্রবাহে ৩৮০টী শ্লোক আছে।

বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা দেখিয়া এই কবিতা-চয়নিকা পুস্তকখানির বিশ্বন্ধরত্ব বা সর্বগ্রাহিতা অনুধাবন করা যায়—ইহাকে Poetic Encyclopædia of Life অর্থাৎ সমগ্র জীবনের কাব্যময় বিশ্বকোষ বলা যায়। শ্রীধরদাস যে একজন সংস্কৃতি-পূত চিত্তের মানুষ ছিলেন, জীবনের সব দিক্ তিনি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই অপূর্ব সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট। এই বই ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকের বাঙ্গালার সংস্কৃতির এক গৌরবময় নিদর্শন।

এতাবৎ-উপলব্ধ প্রাচীনতম মৈথিল বই, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত কথকতার পুঁথি 'বর্ণরত্নাকর' (খ্রীষ্টীয় ১৩২৫ সালের দিকে প্রস্তুত) এক হিসাবে এই ভাবের সর্বগ্রাহী গ্রন্থ—জীবনের সব কিছু লইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা ইহাতেও আছে।

আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই বইয়ের সহিত পরিচয় হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে চাই—বাঙ্গালা অক্ষরে বঙ্গানুবাদের সহিত এই বইয়ের একটী সংস্করণ। সঙ্গে-সঙ্গে, অন্য সংগ্রহ-পুস্তক-সমূহ হইতে গৌড়-বঙ্গের কবিদের রচিত, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র বাহিরে যে-সব শ্লোক পাওয়া যায়, সেগুলি, এবং বাঙ্গালার প্রাচীন লেখমালায় প্রাপ্ত কবিত্বপূর্ণ নমস্কার- বা মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-সমূহ,—এগুলিও দেওয়া চাই। 'গীতগোবিন্দ'-র বহু বাঙ্গালা সংস্করণ আছে; তদনুরূপ ধোয়ীর 'পবন-দূত' এবং গোবর্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যা-সপ্তশতী'র-ও বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ সংস্করণ সাহিত্য-রসিক বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। 'আর্য্যাসপ্তশতী'-তে আর্য্যাচ্ছন্দে ৭০০ প্রেম-বিষয়ক শ্লোক বা কবিতা আছে। বহু পূর্বে সংবৎ ১৯২১-এ অর্থাৎ ৮০ বৎসর পূর্বে ঢাকা হইতে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল 'আর্য্যাসপ্তশতী' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে বাঙ্গালীর সংস্কৃত-জ্ঞানের কীর্তিস্বরূপ এই বই বাঙ্গালা-দেশে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই সমস্ত বই প্রকাশিত হইবার পরে, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের রচিত সংস্কৃত কাব্য-কবিতার আস্বাদন এবং আলোচনা, বাঙ্গালী সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্যামোদী এবং সাহিত্য-বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। ইংরেজী-যুগের পূর্বেকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাব-ধারা যে এই-সব সংস্কৃত কবিতায় বহুল পরিমাণে গিয়া পঁহুছায়, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের, সংস্কৃত-ভাষার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল একটী পটভূমিকা স্বরূপ বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের উপমা আশ্রয় করিয়া বলা যায়, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের যুগে দেশ-ভাষায় অজ্ঞাত ও অশিক্ষিত কবিরা যে গান বা পদ বা কবিতা লিখিতেন, সেগুলি ছিল যেন মাটীর প্রদীপ; সেই-সব মাটীর প্রদীপ ক্ষণিকের কাজ সারিয়া মাটীর মধ্যে কালের গর্ভে আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই-সব সংস্কৃত শ্লোক যেন ভাষার গৌরবে স্বর্ণ-প্রদীপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নিখিল-ভারতের কাছে সেগুলির মূল্য হইবে বলিয়া শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির কবিগণ সেই প্রদীপগুলি গড়িয়া গিয়াছেন, যেন সেগুলির বর্তিকা চিরকাল ধরিয়া জ্বলে। এই-সমস্ত উজ্জ্বল স্বর্ণ-প্রদীপ হইতে যদি সে যুগের ভাষা-কবিতার মৃৎপ্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতির কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেকালের জন-সাধারণের জীবনের চিত্র, আমাদের পূর্বপুরুষ সেকালের বাঙ্গালা-দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার, 'দৃষ্টি-ভঙ্গীর' ও কার্য্য-রীতির কিছু-মাত্রও প্রতিফলন হয়, এবং আধুনিক মানুষ আমরাও যদি ইহা হইতে কিছু পরিমাণে রসোপভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীধরদাসের এই সংগ্রহ চিরকালের জন্য সার্থক সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, ' "বিশ্বজন" যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' ॥

যুগসংকটের কবি ইকবাল

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

১

ভূমিকা

যাকে বলে কস্‌মোপলিটান মন তা য়ুরোপের চেয়ে ভারতবর্ষে প্রবল। দুর্যোগের মধ্যেও আমরা বিচিত্র বিশ্ব সম্বন্ধে উদার মানস রক্ষা করেছি তার প্রমাণ আজও এই দেশে চতুর্দিকে পাওয়া যাবে। পশ্চিম য়ুরোপের বৃহৎ মানবিকতা এর তুলনায় গ্রহণের চেয়ে গ্রাস করবার দিকে উন্মুখ; যড়যন্ত্রবাহন প্রতাপের রাজনৈতিক বসুধৈব কুটুম্বকং নানাকারণে আমাদের অনায়ত্ত। প্রধান একটি কারণ আমাদের সভ্যতার ধারণাশক্তি, যা ভারতীয় মাটিতে বহুযুগের বিবিধ জাতীয় সংমিশ্রণের ফলে একটি স্থায়ী মৈত্রীসংস্কারে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর পরিচয় পাই।

উত্তর-ভারতের প্রহরী খাইবর-বোলানের দরজা বারেবারে খুলে দিয়েছে বল্লমের ভয়েই নয়, আতিথ্যের তাগিদেও; লধক-চিত্রালের তোরণ দিয়ে এসেছে চীন-মঙ্গোল; অন্যদিকে বেলুচ-প্রান্ত হুজ্‌দাব, বালুময় কলাৎ রাজ্য, পস্‌নি-র সমুদ্রতট পর্যন্ত ভূমিখণ্ডে বহুতর কারাভানের পথ ডেকেছিল ইরানী তুরানী প্রতিবেশীকে। প্রাক্‌-ইসলামীয় আরব সভ্যতা এদেশে বাধা পায় নি; দীর্ঘ পরবর্তী কালে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এসেছিলেন উৎকর্ষের কৌতূহলী মন নিয়ে, ভারতবর্ষের উদারনীতির পরিচয় তাঁরা পেয়েছিলেন। যোগবিরুদ্ধ সামরিক অধ্যায় এই বড়ো যোগাযোগকে নষ্ট করতে পারেনি। হিন্দুকুশের গিরিসংকট প্রাচীনতর কালে কেবল যে আক্রমণকারীর ঘোড়ার খুরকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল তা নয়—সেরকম সংকটও বহুবার ঘটেছে—অশ্ববাহী আর্যেরা ভারতের চিত্তদুর্গকে জয় করেছিলেন। তার কারণ আফগানিস্তানের পথ বেয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা এলেন তাঁরা শতঘ্নীর চেয়ে দিব্যাগ্নির সন্ধান ভালো জানতেন, যে-আগুন হোমের, দাবানলের নয়। উত্তর-ভারতে তাঁদের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সহযোগিতার ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রাচীনতার অর্ধব্যক্ত স্তরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা স্মরণ করেছি।

সমুদ্রের নীল তোরণ দিকে দিকে অবারিত ছিল। ঢেউয়ের রাস্তায় মালয়, যবদ্বীপ, পূর্বতর দ্বীপাবলী হতে, চীন এবং প্রশান্ত সমুদ্রের প্রত্যন্ত আদিম লোকালয় হতে পণ্যবাহী ভারতীয় নৌকা যাতায়াত করেছে; দক্ষিণাবর্তের ঘাটে ঘাটে তখন নৌ-বন্দর; ক্রমে দেখা দিয়েছিল তমলুক থেকে আরাকান আকেয়াব পর্যন্ত জাহাজের ঘাঁটি। জ্ঞানের পণ্য, ধনের পণ্যবাহীরা আরব্যসাগর দিয়ে আফ্রিকা, আয়োনিয়া, এবং আরব উপকূল থেকে ভারতের দীর্ঘরেখায়িত পশ্চিমতটে এসে পৌঁছত। তারা নিয়েছে এবং দিয়েছে, ভারতের আন্তর্জাতিক সত্তার স্তরে স্তরে নানামানবিক ঐশ্বর্যের পলি পড়েছে দেখতে পাই। ভীষণ নৌযুদ্ধ বা কলোনিয়ল লুব্ধতার সংঘর্ষে ভারতবর্ষ প্রবৃত্ত হয়েছিল বলে জানা নেই। গোটের উপর এই আদান প্রদানের সহায়তা করেছে আমাদের মহাপ্রাদেশিক স্বভাব। নেপাল-ভুটান-সিকিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

বিবিধ পূর্বীয় সভ্যতার মধ্যে আত্মীয়যোগ আমাদের ঐতিহাসিক অন্যতম একটি অধ্যায়। ভৌগোলিক সংস্থান আমাদের দেশে বৃহৎ ঐক্যের ভূমি প্রস্তুত করে রেখেছিল, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে সভ্যতার যে উৎকর্ষনাট্য অভিনীত হোলো তাতে একটি অখণ্ড ভারতীয় ধারা দেখতে পাই। শত বিচ্ছিন্নতার আঘাতে তা লুপ্ত হয়নি, আজও জেগে আছে; প্রশস্ত সূক্ষ্ম দেশাত্মশক্তির বলেই ভারতবর্ষ নির্ভয়ে বহুকে আপন করেছে, বাহিরকে ডেকেছে। এর জন্যে আমাদের ক্ষতিস্বীকার যাই হোক, আজ পর্যন্ত পশ্চিম-য়ুরোপ, দুই আমেরিকা, জাপান অথবা ঔপনিবেশিক ন্যুজীলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো আমরা মানুষকে ঠেকিয়ে রাখিনি। বলিনি, প্রবেশ নিষেধ।

ভারতবর্ষ বহিরাগতদের সঙ্গে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করেনি তা নয়—কুরুক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্রের প্রদাহ সব দেশেই অত্যুজ্জ্বল—কিন্তু খরকরবালের ধর্মকে আমরা বড়ো করিনি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই মাহাত্ম্যকে স্বীকার করতেই হবে; ক্ষাত্রধর্ম তার কাছে মাথা নীচু করেছে। সেটা সংখ্যা-গরিষ্ঠের বাহুবলে সাধিত হয় নি, যারা সংখ্যায় এবং বলেই গরিষ্ঠ সেই সকল যোদ্ধজাতির স্বপ্রবৃত্ত একটি আদর্শিক স্বীকৃতির দ্বারাই ঘটেছিল। এই স্বীকারকেই ভারতীয় গ্রহণপন্থী সভ্যতার মূলে জান্‌তে হবে। তৈমুর-জেঙ্গিস-আলেকজণ্ডর-নেপোলিয়ান প্রমুখ পরস্বাপহারী বৃহৎ দস্যুর ভারতীয় সংস্করণ আমাদের পথে ঘাটে বইয়ের পৃষ্ঠায় উদ্ধত মূর্তিতে, ঘোড়ায় চড়ে খাঁড়া ধ'রে দাঁড়িয়ে নেই—তলিয়ে গেছে। য়ুরোপের রাস্তায় হাঁটলে বা তাদের প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরমণ্ডিতদের নাম পড়লে প্রভেদ বোঝা যায়। রাষ্ট্রিক ইতিহাসের কথা নয়, সভ্যতার প্রতীকস্থানীয় আদর্শিক চরিত্রমালার কথাই বলছি। অন্যের দেশ লুঠ ক'রে কোনো বীরপুরুষ মহাপৌরুষের আখ্যা পায়নি ভারতীয় সভ্যতার কাছে। শ্রেষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠত্ব অথবা পরধর্মদ্বেষীকে স্তবনীয় প্রাধান্য দিতে আমাদের ধর্মে বেধেছিল। বহু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতির সাক্ষ্য তাই। অবশ্য এ-কথা আজ বলা চলে গৌরবের চেয়ে মুখ্যত আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করবার জন্যেই।

কিন্তু য়ুরোপের বুদ্ধিমন্তেরা যখন কস্‌মোপলিটান্ অর্থাৎ বিশ্বদরদী উদার মানসের একমাত্র দখলি স্বত্ব দাবি করেন যেহেতু তাঁরা নানা বন্দরে হোটেল খুলেছেন, ঘাটে ঘাটে তাঁদের বৃত্তিভুক্ দালালেরা বহু ভাষায় সস্তা মাল বিক্রি করতে সুদক্ষ—সেই পণ্যদ্রব্য অন্যের পক্ষে সস্তা বা উপযোগী নাই হোক—তখন অন্তত বন্ধুমহলে বসে আমাদের ঐতিহাসিক পাল্টা জবাবটা দেওয়া দরকার। দখলি স্বত্বের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক, বৈজ্ঞানিক যে-সকল দাবি উপস্থিত হোলো তারও বিচার করতে হয়।

কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে অন্যদেশীয় সুর এবং রাষ্ট্রবাক্যের প্রতিধ্বনি করলে ভারতীয় সক্রিয়তা নয়, কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পাবে। সৃষ্টিশীল ভারতীয় কবি ভাব-নায়কেরা, সমস্ত যুগের মানসে প্রবিষ্ট হয়ে কী উত্তর দিচ্ছেন সেইটে আলোচ্য।

কবি ইকবালের কাব্যরচনাবলীকে এই নূতন যুগসংকটের ভূমিকায় ধরে দেখলে তার একটি বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে মনে করি।[১]

তাঁর কাব্যের প্রথম পর্বে ভারতীয় সচেতনার সংগীত বেজেছিল; য়ুরোপের বিশ্বভুক্ ঔদার্য তখনো আফ্রিকায় এশিয়ায় চরম হয়ে ওঠেনি; কিন্তু চতুর্দিকের প্রচ্ছন্ন আয়োজন অগোচর ছিল না।

---

(১) এই প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহ এবং তর্জমার জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী। কিন্তু ভ্রমের জন্য দায়িত্ব আমার নিজের। কবি ইকবালের কাব্যালোচনায় আমি অনধিকারী। বিশেষ একটি প্রসঙ্গসূত্রে খণ্ড তর্জমাকে একত্র করেছি; নানাদিক থেকে বাংলাভাষায় তাঁর রচনার বিশদ আলোচনা হবে এই আশা রইল।

সংকটের সেই প্রদোষকালে ভারতের মৈত্রীভাবনা সমগ্র ভারতবর্ষকে আরো আপন ক'রে চেয়েছিল; তখন আমাদের বৃহৎ জাতীয়তা অসাম্প্রদায়িক, সর্বপ্রাদেশিক একটি সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত। কাব্যের সেই অরুণযুগে ইকবাল ললিতে ভৈরবে গান বেঁধেছিলেন। ভারতবর্ষের বড়ো আকাশে তার সঞ্চরণ।

ক্রমে এশিয়া-য়ুরোপের নানাদিকে অন্ধকার ক'রে এল। মানবসম্বন্ধের এই নূতন দুর্যোগকে বলা চলে আধুনিক আন্তর্জাতিকতার দুর্যোগ। এর প্রকৃতিটা আমাদের অকল্পিত, ইতিহাসে এরকম মৈত্রীর পরীক্ষা পূর্বে ঘটেনি। সহমরণের ডাক এল য়ুরোপ থেকে এশিয়ায়, সহজীবনের নয়। ধনে প্রাণে সাড়া না দিলে প্রমাণ হবে আমাদের যুগবিরুদ্ধ স্বভাব, যেটা বর্বরের; যারা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে যথেষ্ট মরছে তাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে মরে দেখাতে হোলো তারা বাঁচবার যোগ্য। যোগ্যতা প্রমাণের জন্য আমাদের উপর নূতন দাবি উপস্থিত হতে লাগল, শুধু আধুনিক তীব্র আন্তর্জাতিকার দাবি নয়, আমাদের প্রাক্তন সংস্কারে যাকে মানবিক আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলাম সেই আদর্শকেও ত্যাগের দ্বারা বীর্যের দ্বারা সপ্রমাণ করবার জন্য য়ুরোপীয় নেশনেরা আমাদের দায়িক করলেন। দেখা গেল যে-সব জাতি বিকিয়ে রয়েছে, তাদেরই কাছে প্রবল গ্রহীতা 'আরো-চাই' রবে আতিথ্যধর্মের দোহাই পাড়েন; সে-ধর্ম নিজের নয়, দাতার। যে-আদর্শ আমরা স্বীকার করি তার দ্বারা অন্যে আমাদের বিচার করবে সে-কথা সত্য, কিন্তু বিচারকও বিচার্য এই প্রশ্ন মনে থেকে যায়। অথচ বিচারকই যেখানে জুরি, জজ, এবং দণ্ডদাতা সেখানে প্রশ্নটা অব্যক্ত রাখতে হয়; না রাখলেও পৃথিবীর কানে পৌঁছয় না। পূর্বদেশগুলির একতরফা মৈত্রীক্ষমতা সম্বন্ধে সকলেরই উৎসাহ বেড়ে উঠল। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই বিশ্বসুদ্ধ জেনে যায় তলে তলে আমাদের প্রাচ্য কূটস্বভাব ঘোচেনি। কোটাপাক্সির ভূমিকম্পিতদের সাহায্য না করলে প্রমাণ হয় আমরা কূপমণ্ডুক ওরিয়েণ্টাল; মেদিনীপুরের নানাবিধ মহামারীতে মেক্সিকো বেদনা প্রকাশ করবে আমরাও ভাবতে পারি না, তারাও নয়। এই উদাহরণ অনেকাংশে কাল্পনিক; সর্বৈব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অভাব ইকবালের সময়েও ছিল না। দেখতে দেখতে দৃষ্টান্তের জালে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়ল।

এরকম অবস্থানে প'ড়ে আমাদের দেশে অনেকে বললেন পূর্বীয় আদর্শই তাই, বিশ্বের জন্যে নিঃস্ব হওয়া। অপেক্ষাকৃত নিরাপদও বটে। নূতন আন্তর্জাতিকতার চর্চায় প্রবল জাতিরা খুঁজুক ধন, আধ্যাত্মিক দুর্বল জাতিরা নিঃস্বার্থ বাহন হয়েই মায়ার সংসারে জয়ী হবে। অন্যে যারা নূতন বা সনাতন ভারতীয় মানবিকতায় ঘোর অবিশ্বাসী তাঁদের উগ্র কর্মে অবশ্য পশ্চিমী যুগধর্মই প্রাচ্যমূর্তিতে ব্যাখ্যাত হোলো। সেই ব্যাখ্যার জন্যে কাব্যের দরকার হয় নি; তাঁদের কর্মবিধি কাব্যবিচারের প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু কাব্যলেখকেরাও প্রকৃতি অনুসারে সংকটের প্রথম পর্যায়ে রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন; তাঁদের দৃষ্টিতে দেশ আপনাকে চিনেছিল। য়ুরোপীয় নেশনগুলির নব্য ন্যায়শাস্ত্রের রহস্যে ইকবাল অভিনিবিষ্ট ছিলেন, অনেকদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে লেখেন নি। লিখতে বসে ক্রমে তাঁর রচনার সুর গেল বদ্‌লিয়ে।

কিন্তু তাঁর স্বভাব বদলায়নি।

২

কবি ইকবালের বাড়ির দরজাটা খুলে মনে হোলো মধ্য-এশিয়ার বিস্তৃত অঙ্গনে এসে পৌঁছেছি যেদিকে লাহোরের কাবুলী দরোয়াজা খোলা। উত্তর-ভারতের মুক্ত হাওয়া ইকবালের কথাবার্তায়, তাঁর

দরাজ ব্যবহারে, ঘরের পঞ্জাবি-আফগানি সরঞ্জামে। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল[১]। কৌচে ঈষৎ হেলান দিয়ে উঠে বসলেন, হাতে গড়গড়ার নল ; পরনে তাঁর ধবধবে পিরান, ফুলো পাজামা। তাঁর সৌজন্য সুন্দর বললে সব বলা হয় না, যেন ব্যবহারের একটি শিল্পকাজ ; এইরকম আভিজাত্য পুরোনো পশ্‌মিনার উপরে কাশ্মীরী ফুলের মতো, দুর্লভ সামগ্রী। অথচ প্রখর যুগচেতন মন, হাস্যোজ্জল ; একেবারে ভারতীয় এবং আধুনিক তাঁর চিন্তার সৌকর্য। জানতাম এই কবি দামাস্‌কুস্‌-কাইরো থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত পারসিক উর্দু ভাষায় লোকের মন নাড়িয়েছেন ;[২] ভারতবর্ষব্যাপী তাঁর "হিন্দোস্তান হমারা" গানের চল ; কেম্‌ব্রিজের ইনি মেধাবী পণ্ডিত ; এঁর মতো চোস্ত ইংরেজি গদ্য কম ভারতীয় লিখেছেন। অথচ কত হাল্কা তাঁর জ্ঞানের ভার, সহজ দিলদরিয়া ভাব। বুঝলাম একেই আমরা কস্‌মোপলিটান মন বলি, যা স্বদেশী অথচ প্রসারী, যেখানে লেনদেন চলছে বড়ো চত্বরে, নানাদেশীয় আধুনিকে-প্রাচীনে সমন্বয়।

তাঁকে বললাম, আপনি ভারতীয় কবি, কোনো জাতির বা সাম্প্রদায়িক পরিচয় আপনার গৌণ। তিনি হেসে বললেন, আমার কবিতার বই "বাং-ই-দারা"-র ভূমিকাটা অতিধার্মিকের ভয়ে লুপ্ত, প্রথম সংস্করণে জানিয়েছিলাম ভগবদ্‌গীতার প্রভাব আমার উপর কতটা গভীর, এখনো খুঁজলে দুটো-একটা বই বেরোবে। কিন্তু—এই ব'লে দীর্ঘশ্বাসে কথাটা শেষ করলেন। একটু পরে বললেন, ভারতে ইসলামী সংস্কৃতিকে অনেকে চিনল না, তাই ভূমিকাটা সরাতে রাজি হয়েছিলাম। বললেন, হয়তো আমি নিজেও কিছু মত বদ্‌লিয়েছি।

মনে পড়ে গেল প্রাচীন ইকবালের কথা। প্রথম পর্যায়ে তাঁর কবিতাগুলিতে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যময় রূপ কত স্পষ্ট, এবং সেই কারণে বহির্ভারতকে গ্রহণ করতেও তিনি কীরকম উৎসুক। "বাং-ই-দারা" (কারাভানের ডাক) বই বেরিয়েছিল ১৯২৪ সালে, উর্দু ভাষায় ; তাতে তাঁর স্বাদেশিক চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই। প্রসিদ্ধ একটি কবিতায় বলছেন, মাটিতে মিলেছি আমরা একই টানে :

ধর্ম আমাদের শেখায়নি কলহ, ভারতীয় আমরা
মাতৃভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ।

বলছেন, সম্মিলিত ভারতীয় স্বাধীনতার তপস্যা আমাদের ভিত্তি, ব্যর্থবেদনার মধ্য দিয়েও আমাদের যোগ। তার পরে ;

হায় রে ইক্‌বাল, পৃথিবীতে কেউ জানে না আমাদের গোপন কথা,
কে দেখতে পায় আমাদের বেদনা ?

---

(১) ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে ইকবালের সঙ্গে লেখকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

(২) ইকবালের একটি ছোটো কবিতা মনে পড়ে যায় :

নির্বোধ আমি কিন্তু কৃতজ্ঞ,
তোমার সঙ্গে আমার আছে তো সম্বন্ধ।
নূতন চঞ্চল করেছি আমি অনেকের দিল্‌
লাহোর থেকে বুখারা সমরখন্দ্‌ পর্যন্ত।
প্রাণবায়ুর আমার এই পেয়েছি পরিচয় : হেমন্তেও
ভোরের পাখী খুসি হয় আমার আসঙ্গে।
কিন্তু জন্মেছি সেই দেশে আমি, যেখানে মানুষেরা
দাসত্বে রয়েছে তৃপ্ত।… "যুকায়-ও-সকিয়দ্‌"

ইকবালের ভারতীয় উদ্যানে নানক গাইলেন তাঁর ঐক্যের গান, প্রাচীন ভারতের স্তোত্র উঠল আকাশে, ইসলামের সাম্যবাণী ধ্বনিত হোলো মুয়েজ্জিনে ভক্তগাথায়, মিলল তারি সঙ্গে। "হিন্দোস্তানি বাচ্চোকা" কবিতাটিতে কাউকে বাদ দেননি। সারা ভারতের ছেলেমেয়েরা তা আবৃত্তি করতে পারে, তাদেরই জন্যে লেখা।

এগারো বৎসর পরে ইকবাল দ্বিতীয় উর্দু কাব্যগ্রন্থ রচলেন, কিন্তু "বাল্-ই-জিব্রাইল" ("গেব্রিয়েলের পাখা") বেরোবার মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে পারসিক ভাষায় লেখা গ্রন্থগুলিতে তিনি শুধু উচ্চাঙ্গের মিস্টিক কাব্য সৃষ্টি নয়, ভারত-সংস্কৃতির পটভূমিকায় তাঁর গভীর সর্বজাতীয় বোধকে প্রকাশ করেছেন। য়ুরোপীয় সংঘশক্তির আঘাতে তাঁর স্বাদেশিকতা জেগে উঠেছিল; সমস্ত দেশকে এক ক'রে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াব, মানবমহাযাত্রায় যোগ দেব এই তাঁর সংকল্প।

সবাইকে দেখাব তোমাতে বিশ্বাস কাকে বলে
হে হিন্দোস্তান,
নিবৃত্ত হব না যতদিন জীবনের ত্যাগ পূর্ণ হয়নি তোমার কাছে।
আমার এই একমুঠো প্রাণধূলি করব বপন,
অঙ্কুরিত বেরবে তাতে নূতন হৃদয়, প্রাণে-ভরা, জাগবে কুঁড়ি হয়ে।
ধর্মান্ধতা বাসা বেঁধেছে আমার এই দেশের মাটিতে,
আমি সেই ঝড় যাতে ভাঙবে ধুলোয় সেই ইমারত।

পারসিক ভাষায় রচিত এই কবিতাটির অন্যত্র বলছেন:

এই যে বিভিন্ন ছড়ানো রুদ্রাক্ষ, সব নিয়ে গাঁথব জপমালা,
হোক কঠিন, এই হবে আমার কাজ।
অবগুণ্ঠন ঘোচাব আমি প্রিয়ার মুখ থেকে,
প্রিয়া আমার "একতা",
লজ্জা দেবো আমি গৃহবিবাদকে।
সারা দুনিয়াকে দেখাব আমি কী দেখেছি মুগ্ধ চোখে॥

আশ্চর্য নয়, যে, ভারতীয় ঐক্যের এই মুগ্ধ ধ্যান কবি ইকবালকে নিয়ে গেল বিশ্বলোকালয়ে, সেখানে নেশনের চেয়ে সত্য জনসাধারণ, জাতীয়তা সর্বজাতীয়, সেখানে মিলনের বাধা ঘুচে যায়:

নেশনগুলির থামাও ঐ বেসুরো ঝংকার,[৩]
তোমারই সংগীতে আমাদের কানকে করো স্বর্গীয়,
ওঠো, বাঁধো সুর ভ্রাতৃত্বের বীণায়,
ফিরে দাও পেয়ালা ভরে প্রেমের সুরা!

যৌবনশেষ পর্য্যন্ত ইকবালের গীতিকাব্যে এই একটা মূল ধুয়ো, তাঁর কল্পনার প্রসঙ্গ কত সহজ, মাটির কত কাছাকাছি, অথচ সূক্ষ্ম ভাবনায় শিল্পিত; নির্বিশেষে গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন প্রাদেশিক

---

(৩) নেশন্-এর উপর তাঁর দৃষ্টি সতর্ক ছিল—
"প্রকৃতি কখনো ছেড়ে দিতেও পারে ব্যক্তিবিশেষকে,
কিন্তু ক্ষমা সে করে না নেশন্-দের কৃত পাপকে।"
—"দিন্-ও-তা'লিম" (ধর্ম ও শিক্ষা; ১৯৩৭)

স্বদেশীয়কে। কবিতার পাত্রটি গড়েছিলেন ভারতীয় ধাতু দিয়ে, তাতে বসল ইস্পাহানী নীলা, ভাষার মিশ্রিত কত রং, মুসলিম আরবীয় উজ্জ্বল চিন্তার মণি। কাব্যের শাশ্বতকে তিনি কোনোদিনই ভোলেননি, বড়ো করেছেন প্রেরণার দৈবকে ; জানতেন সংকীর্ণ স্বার্থের সাধনায় প্রকাশ নেই।

মহাজাতি বেঁচে থাকে চিন্তার ঐক্যে,
ধার্মিক অনুষ্ঠানও যদি ভাঙে সেই এককে
জানব তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ।

"হিন্দি-ইস্‌লাম" নামক এই কবিতাটি ১৯৩৭ সালে বেরোয়: "জর্ব্‌-ই-কালিম্‌" ("মোসেস্‌-এর দৈবাঘাত") গ্রন্থের অন্যান্য রচনাতেও ইকবাল এই "কালিম্‌"—"দৈবাঘাত" বলতে দিব্যপ্রেরণার অনিবার্য ক্রিয়া বোঝায় কি না জানি না—এবং প্রাণশক্তিকে মানুষের সকল সৃষ্টির মূলে দেখিয়েছেন।

প্রাগ্রসর হয় না জাতি পৃথিবীতে দিব্যশক্তি বিনা,
ব্যর্থ হয় আর্ট যদি তাকে না ছোঁয় কালিম্‌-এর শক্তি।
—"ফানুন-ই-লতিফা"—"শিল্পকলা"

কালিম্‌-এর প্রসঙ্গে আরো বলছেন :

আর্টের চরম উদ্দেশ চিরন্তন জীবনে জ্বলে ওঠা।
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গে তার পরিচয় কোথায়।

পরবর্তী তাঁর কাব্যে চিত্তের সংঘর্ষ বিদ্যুতাভ হয়ে দেখা দিয়েছিল, শাণিত বাক্যের আঙ্গিকে মাধুর্যের চেয়ে কঠিন ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ে কিন্তু এরকমের শিল্পধ্যানময় প্রসঙ্গ হঠাৎ জাগেনি তা নয়। কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে তাঁর খণ্ডকবিতার মালা গৌরবের অধিকারী কিন্তু বিশেষ একটি বিষয়ের যোগে তাঁর রচনার আলোচনা করব।

য়ুরোপীয় রাষ্ট্রিক শক্তিমত্ততা ইকবালকে "খুদি" অর্থাৎ আত্মশক্তির চর্চায় প্রবৃত্ত করল। প্রাচীন আরবিক এবং নীট্‌শে-হেগেলিয়ান দর্শন তাঁকে পূর্বেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। তাঁর "আশ্‌রার-ই-খুদি" গ্রন্থ নিকল্‌সন কৃত তর্জমায় ("Secrets of the Self") সমগ্র য়ুরোপে বহুখ্যাত। সেই আত্মশক্তির দর্শনকে তিনি ক্রমে এশিয়ার নানান সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ক'রে, বিশেষ ভাবে ইসলামীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষে তাঁর আপন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। আশ্চর্য প্রাঞ্জল তাঁর একটিমাত্র গদ্যগ্রন্থ "The Reconstruction of Religious Thought in Islam"-এ শক্তিসাধক কবির পরিণত চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে কোরানশরিফ এবং ইসলামীয় বিজ্ঞানদর্শনের প্রগাঢ় সুন্দর আলোচনা আছে, তর্জমাগুলিও চমকপ্রদ। মোটের উপর তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়, যা বিস্তৃত হয়েছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত, তাঁর দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তাকেই প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে গীতিকাব্যের লাবণ্যের চেয়ে বিদ্রূপজ্বলন্ত মতামতের পরিচয় সুস্পষ্ট।

একদিকে উদ্যত পশ্চিম রাষ্ট্র; অন্যদিকে পূর্ব সভ্যতার অন্তর্বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, নির্জীবন। দুই হাতে ইকবালকে বাক্যের তলোয়ার খেলাতে হোলো। তখ্‌বির অর্থাৎ অদৃষ্টকে মেনে যারা শায়িত তাদেরকে দীক্ষা দিলেন তদ্‌বির, পুরুষার্থের মন্ত্রে, এবং কর্মে ; য়ুরোপীয় মুখোশকে লক্ষ্য করে ছুটল ব্যথিত ক্রুদ্ধ শ্লেষাত্মক বাক্য।

৩

লেনিন-এর জবানিতে ইক্‌বাল ঘোষণা করলেন ঃ

যুরোপে আলো, জ্ঞান এবং শিল্প দেখো আজ অপর্য্যাপ্ত।

তার প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

স্থাপত্য চাও তো দেখো ব্যাঙ্কগুলির দিকে,
ধনিকের সৌধগুলি চর্চের চেয়ে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন।
বাণিজ্য—নিশ্চয় আছে, বস্তুত সেটা জুয়োখেলা,
একজনের লাভে হাজারজনের মৃত্যু।
যে-মহাজাতি হারালো ভগবানের প্রসাদ,
চরম তা'র উৎকর্ষ দেখো ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং স্টীম।...
লক্ষণ স্পষ্ট,—তক্‌দির [১] নামক দাবা-খেলিয়ে
করল বাজি-মাৎ তদ্‌বির[২]-দাবারুকে।...
সরাইখানার ভিতে লাগল ধাক্কা,
সরাইরক্ষকেরাও ব'সে ভাবছে ভাগ্যের কথা।...
রাত্রে পথের লোকের মুখে দেখছ স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা
তার কারণ ওদের সরাব-পান, অথবা কস্‌মেটিক।

বণিকসভ্যতার এই বর্ণনায় এশিয়াকে লক্ষ্য ক'রে বলা হোলো ঃ

য়ুরোপের সাদা মানুষ পূর্বদেশের উপাস্য দেবতা,
পশ্চিমের উপাস্য দেবতা চক্‌চকে সোনারূপো। [৩]

লেনিন-এর কথা ব্যক্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু য়ুরোপীয় ধনতান্ত্রিকতার উপর আঘাত সুস্পষ্ট। "ফিরমান্‌-ই-খুদা" ("ঈশ্বরের আজ্ঞা") কাব্যে ইকবাল পুরোপুরি বিদ্রোহী ; লুব্ধদের কষাঘাত ক'রে বলছেন ঃ

পুড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও সেই শস্যক্ষেতকে
চাষীকে যা দেয় না অন্ন...

ঐ কবিতাটির "জলা দে, জলা দে" ধুয়ো জনচিত্তে আগুন ধরাবার মতো।

সাম্রাজ্যব্যবসায়কে কেন্দ্র ক'রে ধনিকসভ্যতার নির্লজ্জ বিক্রম ইকবালের কাছে অপরিসীম ঘৃণার্হ ছিল। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠানকে তিনি বর্জন করতে চাননি, ধর্মকে তো নয়ই ; কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে তাঁর প্রভেদের এইটে মূল কারণ মনে হয়। [৪]

কিন্তু এ বিষয়ে ইক্‌বালের রচনায় স্থির নির্দেশ নেই। তাঁর চিত্তের পরিচয় স্পষ্টতর দেখতে পাই ইসলাম্‌ সম্বন্ধে তাঁর আদর্শিক ছবিতে, যে-আদর্শ পৃথিবীকে নূতন ক'রে মৈত্রী এবং মুক্তির বিশেষ সন্ধান দেবে। পূর্বদেশ হতে জাগবে সেই উত্তর; অন্য উত্তরের মধ্যে একটি ; কিন্তু য়ুরোপ সম্বন্ধে তিনি আশার কথা ব'লে যান নি। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোনো প্রবল শক্তিমান নেতা অন্যদের সাময়িক পরাভূত

---

১ ভাগ্য (দৈব)। ২ পুরুষকার। ৩ ধাতুদ্রব্য। চক্‌চকে ইস্পাত প্রভৃতিও হয়তো উপাস্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

৪ অন্যত্র বলেছেন, "ঐ যে ধর্ম, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেনি এমন প্রফেট-এর স্থাপিত,
উদরের ঐক্যে মানুষের ঐক্য স্থাপন..."
—সেই ধর্মকে তিনি সাম্যের ভিত্তিরূপে মানেননি।

দণ্ডিত করলে তিনি আকৃষ্ট হতেন, কিন্তু অন্তরের আকর্ষণে নয়। ইকবাল কোনো এক সময়ে মুসোলিনির দিকে ঝুঁকেছিলেন জানা আছে, কিন্তু তখনো প্রশস্তিরচনার মধ্যে যোগ করতে ভোলেন নি :

ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর দেহটা প্রকাণ্ড,
হৃদয়টা অন্ধকার...

তার পরে আবিসিনিয়ার দুঃখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হোলো ; ১৮ই আগস্ট ১৯৩৫ তারিখে তিনি লিখলেন, :

য়ুরোপীয় শকুনদল এখনো জানে না
কত বিষাক্ত ঐ শবদেহ আবিসিনিয়ার।...
সভ্যতার শীর্ষ হচ্ছে মহত্ত্বের অধঃপতন,
নেশনের প্রাত্যহিক জীবিকা দস্যুবৃত্তি।
নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে প্রত্যেকে নির্দোষ এক-একটি মেষশাবকের সন্ধানে।
বিলাপ করো, চর্চের স্বমহিমার আয়নাটি ভাঙল
রাস্তার মাঝখানে ঐ রোমানেরা ;
হায়রে চর্চের মানুষ, হৃদ্‌বিদারক এই ঘটনা।

মোটের উপর ইকবালের মন সমস্ত য়ুরোপকে সমীকৃত ক'রে এবং অবিচিত্ররূপে দেখেছিল। পশ্চিমসভ্যতার তলে যে-সকল বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া চলছে, নূতন সভ্যতার উদ্যোগ এবং আগমনের সেদিকটায় তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। সেখানেও যারা পূর্বদেশীয় অত্যাচরিতদের মতোই সাম্রাজ্যবাদী ধনিকের পদপিষ্ট, এবং যারা আক্রান্ত হয়েও অপরিসীম বীর্যের দৃঢ়তায় সমস্ত মানুষের দায়িত্ব বহন করছে তাদের পরিচয় ইকবালের লেখায় পাইনি। পূর্ব-য়ুরোপ এবং পশ্চিম-য়ুরোপের সকল শ্রেণীকেই তিনি খরশরবিদ্ধ করেছেন, অফুরন্ত ছিল তাঁর তূণ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারালো দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্ :

১

য়ুরোপীয়েরা আবিষ্কার করেছিল গোপন রহস্য
যদিও বিজ্ঞ লোকেরা তা প্রকাশ্যে বলে নি—
ডেমোক্রাসি হোলো সেই রাষ্ট্রবিধান
যাতে মানুষকে গোনা হয় ওজন করা হয় না।

—জম্‌হুরিয়ৎ="ডেমোক্রাসি"

২

রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত হোলো চর্চের হাত থেকে,
য়ুরোপীয় পলিটিক্‌স্‌ সেই দানব যার শিকল কেটেছে ;
কিন্তু অন্যের সম্পত্তি যখন দানবের চোখে পড়ে,
চর্চের দূতেরা চলে যুদ্ধবাহিনীর আগে আগে। —দিন্‌ সিয়াসৎ="রাষ্ট্রনীতি"

৩

য়ুরোপের দার্শনিককে প্রশ্ন করা দরকার,
—কেননা হিন্দুস্তান এবং গ্রীসও তার অনুসরণ করছে :
"তোমাদের সভ্যতার চরম কি এই, যে, পুরুষেরা চাকরি পায় না
আর মেয়েরা পায় না স্বামী ?" —"এক সওয়াল"="এক প্রশ্ন"

৪

হে ভগবান, য়ুরোপীয় পলিটিকস্‌ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ;
তবে তাদের শিষ্যেরা ধনী এবং বলবান।--
"সিয়াসৎ-ই-ফিরাঙ্গ" = "য়ুরোপীয় পলিটিকস্‌"

শেষের ছত্রটিতে আশ্বাস দেবার উপায় অভিনব বটে।

ইকবালের মন দূরে সরে গিয়েছিল পশ্চিম থেকে। কিন্তু অন্তরের জ্বালা কোনোদিন নেবেনি। পূর্বদেশীকে বারেবারে বলেছেন সাবধান, নিয়তপ্রসারী বিশ্বভুক্‌ সভ্যতার দ্রংষ্ট্রা হতে এখনো নিজেকে বাঁচাও ; লজ্জা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আঘাত ক'রে যেমন ক'রে হোক তিনি শক্তি ফিরিয়ে দেবেন শক্তিহীনদের।

১

ভয় পেয়েছ তুমি জীবনের সংগ্রামকে
জীবনই মৃত্যু যদি তা হারায় সংগ্রামের স্বাদ।
নূতন শিক্ষায় ভুলেছ তোমার প্রবল সেই ক্ষ্যাপামি
যা জ্ঞানকে আজ্ঞা করত: কৈফিয়ৎ সৃষ্টি কোরো না।
বিদ্যালয় ঢেকেছে তোমার চক্ষে মর্মের সত্যগুলি
যা খোলা ছিল তোমার কাছে মরুভূমিতে, পর্বতে। —"মাদ্রাসা"

২

সভ্যতা আজকে কারখানা প্রবঞ্চকদের,
শেখাও ক্ষ্যাপামির নীতি পূর্বীয় কবিকে। —"ফির্‌মান্‌-ই-খুদা" = "ঈশ্বরের আজ্ঞা"

প্রবল উন্মুক্ত যথার্থ মানব সভ্যতার কথা বলতেই আরব্য দিগন্ত জাগত ইকবালের চিত্তে, আহ্বান এসে পৌঁছত মরুবেষ্টিত মরূদ্যান থেকে। আধুনিক মন নিয়েই তিনি ফিরে যেতেন রৌদ্রপ্রখর প্রাচীন ইসলামীয় ইতিহাসে ; সেই ইতিহাস বিশেষ ধর্মসাধনার এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তার ক্রিয়া বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্গত। নূতন তেজস্ক্রিয়তার বাণী তিনি শুনেছিলেন দূরে বেদুয়িনের তাঁবুতে, কারাভানের আদিম তাম্র-পার্বত্য পরিবেশে ; পথের উপরে প্রজ্জ্বলিত স্বচ্ছ মরু-রাত্রির নক্ষত্র দৃষ্টিতে।

ফিরে চলো তুমি আরবের কাছে।
তুলেছ ইরানী বাগানে গোলাপ,
দেখেছ বসন্তের জোয়ার ইন্দোস্তানে ইরাণে।
আস্বাদন করো এবার মরুভূমির তাপ,
পান করো পুরানো মদ খেজুরের।
বাসা বেঁধে রইবে কতদিন উদ্যানে,
বাঁধো নীড় উঁচু পর্বতে
বিদ্যুৎ এবং বজ্রের মাঝখানে।
ঈগলের নীড়ের চেয়েও উঁচুতে।
যোগ্যতা হোক তোমার জীবনযুদ্ধের,
শরীর-আত্মায় জ্ব'লে উঠুক্‌ জীবনের আগুন॥ —"আস্‌রার-ই-খুদি"

ঈগল পাখির উপমা তাঁর কাব্যে বারম্বার দেখা যায়। শক্তির পাখায় তার গতি তেজের গগনে, বাসা তার রুক্ষ, হতাশ্বাসের বহু উর্ধ্বে তার নীলিম সঞ্চরণ। প্রাচীন আরব-সংস্কৃতির প্রতীক এই ঈগল।

হোয়ো না নিরাশ, সেটা জ্ঞানের অপমান।
মুসলমানের খাঁটি আশা চেনে ঈশ্বরকে।
তোমার বাড়ি নয় সম্রাটের প্রাসাদ-গম্বুজের তলে,
ঈগল তুমি, থাকবে পাথুরে-পাহাড়ে।

য়ুরোপীয় শক্তির প্রতীকরূপেও ঈগল তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কচিৎ। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে :

তপ্ত করো রক্ত দাসদের, বিশ্বাসের আগুনে,
দুর্বল চড়ুইকে প্রবৃত্ত করো লড়তে ঈগলের সঙ্গে। — ফিরমান্-ই-খুদা" — "ঈশ্বরের আজ্ঞা"

সেই বিশ্বাসের আবাহন করছেন যার বলে দুর্বল পাখিও আকাশে উড়ে গিয়ে ঠেকায় শিকারী বাজপাখিকে।

মুসলিম ঐতিহ্যের স্মরণে স্বপ্নে, ভবিষ্যতের ছবিতে ইকবালের মন স্তরে স্তরে অভিষিক্ত ছিল। উপমায়, অনুশাসনে, কল্পনায় তিনি তাঁর একান্তপরিচিত অন্তরঙ্গ সভ্যতাকে তাঁর কাব্যে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি বলতেন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হোক, তারই গভীরে কবির চৈতন্য প্রবিষ্ট হলে বিশ্বাশ্রিত সত্যকে স্পর্শ করা যায়। য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি শেষের রচনায় কোনো চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করেছিলেন ব'লে জানি না কিন্তু সেটা গভীরতার অভাবে নয়, অস্বীকার করবার ইচ্ছাতেই। মানবসভ্যতার উপর তার বিশ্বাস অটুট ছিল, হয়তো ভেবেছিলেন ইসলামীয় আদর্শ যথার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারলে পশ্চিমদেশেও পরিবর্তন ঘটবে। পূর্বদেশের কোনো উৎকর্ষকে তিনি আঘাত করেননি, ছোটো ক'রে দেখেননি। নিজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি নিয়ত সতর্ক ছিলেন, বারেবারেই তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতের শত্রু ব'লে ঘোষণা করেছেন। "মুল্লা-ঔর-বহীস্ত" ("মুল্লা ও স্বর্গ") কবিতাটি সকল ধর্মেরই সংকীর্ণ বক্তাদের পড়া দরকার; তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আশ্চর্য কবিতাসংগ্রহ "আরমিঘান-ই-হিজাজ"[১] ("হিজাজের দান") অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি, বা আলোচিত হয় নি এটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। ১৯৩৬ সালে রচিত তাঁর উর্দু কবিতা "ইব্লিজ কি মজলিশ-ই-সৌরাউ" ("সয়তানের মজ্লিশ্")—বিদ্রূপাত্মক রচনার একটি চরম সৃষ্টি-কাজ; তাতে আধুনিক নানা সমস্যাকে হাস্যের আলোয় জ্বালিয়ে দেখানো হয়েছে; কাউকেই তিনি বাদ দেননি।[২] তাঁর আপন সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন ব'লেই সমালোচনার ভয় তাঁর ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিরোধকে তিনি লজ্জিত করেছেন প্রধানত বিরোধের অতীতকে প্রকাশ ক'রে, তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশলোকে সকলেরই প্রবেশাধিকার। ব্যতিক্রমের তালিকা প্রস্তুত ক'রে বিরুদ্ধ প্রমাণ হয় না, ইকবালের কাব্যের স্বরূপ দেখতে হবে। স্বধর্মের উপলব্ধিকে যেখানে তিনি তর্কের অতীত সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেইখানে তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ, সেখানে তা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে কোথায় ছাড়িয়ে গেছে।

---

(১) হিজাজ—আরব্য দেশের পুণ্যভূমি।

(২) 'দিন্-ও-তালিম" (ধর্ম ও অনুষ্ঠান) কাব্যে বলেছেন—
"চিনি আমি ধার্মিক অনুষ্ঠানের সব পদ্ধতি; আন্তরিকতা যদি না থাকে অন্তর্দৃষ্টির দাবি মিথ্যা।" (১৯৩৭)

শিশু পুত্র জাওইদ্‌কে আশীর্বাদ ক'রে লেখা তাঁর গীতিকবিতাগুলিতে ইকবালের প্রচ্ছন্ন কারুণ্য যেন শানবাঁধানো পথের ধারে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিদ্রূপসজাগ বুদ্ধিকে এড়িয়ে উর্ধ্বে তুলছে মৃদু রঙিন কবিতার গুচ্ছ। কিছু কবিতা "গোলটেবিল বৈঠক"-এর সময়ে ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন,[১] বাকি কয়েকটি মৃত্যুর অনতিপূর্বে রচিত। এপিগ্রাম এবং দ্রুত রসাত্মক বাক্যের বাহনে যিনি রূপক ও তথ্যবহুল কাব্য লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর রচনায় এমনি ক'রে কখন একটি সহজ বেদনার বাঁশি বেজে উঠত, যাঁরা ইকবালের ধারালো কাব্যের দরজা থেকে ফিরে এসেছেন তাঁরা সেই সুর শোনেননি। বিনম্র সাধক কবি তাঁর পুত্রকে ডেকে বলছেন:

খুঁজে নাও তোমার স্থান প্রেমের রাজ্যে,
সৃষ্টি করো নূতন যুগ, নূতন প্রভাত, নূতন সন্ধ্যাগুলি।
ঈশ্বর যদি দিয়ে থাকেন তোমায় প্রকৃতিকে বোঝবার চিত্ত,
বিনিময় কোরো টুলিপ-গোলাপের নীরবতায় তোমার অন্তরঙ্গিতা।
আমার এ পথ নয় ধনীর, গরিব মানুষের পথ আমার;
বিকিয়ো না আপনকে, গরিব হয়েই হোক তোমার নাম।

নিজেকে তিনি অনেক সময় বলতেন মুসাফির, গান-গাইয়ে, আর কিছু নয়। ধন বা প্রতাপের পথ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কখনো মাড়াননি।

মিলের চুমকি-বসানো, অনুপ্রাসবহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদরচনার মাঝখানে গীতিকাব্যরসের পরিপূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর। ধরা পড়ত ইকবাল শুধুমাত্র শিল্পদক্ষ পরিবেশধর্মী এমন কি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠপ্রচারী কবি নন, সংকটযুগের দ্বন্দ্বকেই তিনি আশ্চর্য প্রকাশ করেন নি, তাঁর প্রথম পর্বের সূর্যকাল শেষ পর্যন্ত অন্তরে অনাচ্ছন্ন ছিল, কাব্যের সূত্রে গাঁথা হয়েছিল তারি অম্লান রাগিণী। আসন্ন দুর্যোগের পারে মুস্কিল আসান্‌-এর বাণী তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু ঝড়ের দোলায় তিনি ভয় করেননি; তাঁর কাব্যতরী ঘাটে এসে নোঙর বেঁধেছিল পশ্চিমী আসন্নতায় নির্ভয় দেবার জন্যে। তাঁর কাব্যকে দেখে শেষ পর্যন্ত চেনা যেত তার গড়ন দূর-উজানী, তাতে ছুঁয়ে আছে উত্তাল দিগন্তরেখা।

তীব্র অশান্তির মধ্যে ইক্‌বাল শান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। একটি ছোটো কবিতা এখানে উদ্ধৃত করি:

গেলাম শেখ-ই-মজাদিদ্‌-এর সমাধিতে,
সেই স্থানে যা আকাশের তলে আলোয় ভরা।
নক্ষত্রগুলি পর্যন্ত সেখানে ধূলিকণার কাছে লজ্জিত,
গুণী শুয়ে আছেন যে-ধূলিতে নিদ্রিত। —"যুকার-ও-সাকিয়াদ"

---

(১) লণ্ডনে রচিত একটি কবিতায় বলছেন—
"য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে হোয়ো না ঋণী
গড়ো তোমার পানপাত্র হিন্দি মাটি দিয়ে।" —"জাওইদ কে নাম"
এখানে "ঋণী" কথাটিকে যথার্থ বোঝা চাই।

রশ্মির রূপ

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

যে-সকল দূত বাহির হইতে এই পৃথিবীতে সংবাদ বহন করিয়া আনে আলোক তাহাদের মধ্যে প্রধান। আমরা মনে করি আমরা দূরের কোন বস্তু দেখিতেছি, তাহার রং এই, তাহার ঔজ্জ্বল্য এই রকম, কিন্তু আলোক চক্ষুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শুধু এই কথাগুলি আমাদিগকে জানাইতেছে—"আমি ঐ দিক হইতে আসিতেছি, আমার কম্পনসংখ্যা এই, আমি এইরূপ জোরে কাঁপিতেছি, আমার বেগ এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, আমি বাহির হইবার পর আমার পিছনে কি কি ঘটনা ঘটিতেছে আমি জানি না, তোমার চক্ষুর পিছনের পর্দায় গিয়া পৌছিলেই আমার মৃত্যু।"

আলোকের জন্ম হইল একস্থানে, মৃত্যু হইল অন্যত্র। জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যে এই অল্প বা দীর্ঘ কাল আলোক কিরূপে যাপন করিল? সূর্য হইতে যে আলোক নির্গত হইল আট মিনিট পরে তাহা পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিল। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নয় কোটি মাইলেরও উপর দূরত্ব আলোক কি ভাবে অতিক্রম করিয়া আসিল? নিউটন বলিলেন আলোকিত পদার্থ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বাহির হইয়া প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে ছুটিতেছে। ঐ কণিকা আসিয়া চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের মধ্যে দৃষ্টির অনুভূতি জাগাইতেছে। এ মতবাদকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইল; কারণ দেখা গেল বিশিষ্ট অবস্থাতে দুই আলোক রশ্মি আপনা আপনি কাটাকাটি করে, দেখা গেল আলোকের গতিপথ যে সোজা বলা হইয়াছিল তাহা ঠিক নয়, আলোক-রশ্মি বাঁকে, তবে অতি অল্প পরিমাণে। এইবার কল্পনা করা হইল যে আলোক তরঙ্গ দ্বারা প্রবাহিত হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে তবেই সেই তরঙ্গ আমাদিগের মধ্যে আলোকের অনুভূতি জাগায়; পৃথক পৃথক দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন রঙের চেতনা আনে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপিবার বিভিন্ন উপায় স্থিরীকৃত হইল। তরঙ্গ তো স্থির হইল, কিন্তু প্রশ্ন উঠিল, কিসের তরঙ্গ? পৃথিবীর উপরে কিছুদূর অবধি গিয়া তো বায়ু শেষ হইয়াছে, তাহার পর শূন্য; কল্পনা করিতে হইল যে যাবতীয় পদার্থ ব্যাপিয়া, সকল শূন্য স্থান ব্যাপিয়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এরূপ কিছু আছে যাহার মধ্য দিয়া তরঙ্গ পরিচালিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হইল ঈথর। এই ঈথর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু ধরিয়া লওয়া হইল যে উহা কাঁপে, কিন্তু ঐ অবধি, উহার আর কোন খবর জানা রহিল না। আলোক সম্বন্ধে সকল রকম পরীক্ষা এই মতবাদকে সমর্থন করিল। ক্রমে দেখা গেল এক্স্‌-রশ্মি, গামা-রশ্মি, তাপ-রশ্মি সবই ঈথর-তরঙ্গ; যাহা দ্বারা বিনা তারে বার্তা প্রেরিত হয় তাহাও ঈথর তরঙ্গ; সকলেই এক জাতীয়, পার্থক্য যাহা-কিছু সে শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে এক-একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠার এক-একটি যুগ আসে; বিজ্ঞানী উহাকে লইয়া খুব হইচই করেন; চারিদিকে উহার জয়জয়কার হয়; তাহার পর এমন-সব ঘটনা দেখা যায় যাহার ফলে বিজ্ঞানী তাহার এই সাধের অট্টালিকাকে নিজ হাতেই চূর্ণ করেন। সুদীর্ঘ দুইশত বর্ষ কাল ধরিয়া এই তরঙ্গবাদ আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল; তাহার পর এমন সব ঘটনা দেখা দিল যাহাতে বিজ্ঞানী বলিল—"তাই তো।"

মনে করা যাক, একটি মস্ত হ্রদ আছে। এপারে ২০ ফুট উঁচু হইতে জলের উপর একটি ঢিল ফেলা হইল। জলে তরঙ্গ উত্থিত হইল; তরঙ্গ অগ্রসর হইতে লাগিল; জলকণা প্রতিস্থানেই উঠানামা করিতেছে; কিন্তু তরঙ্গ যতই অগ্রসর হইতেছে জলকণার উঠানামা ততই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; ওপারে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন উঠানামা খুবই অল্প হইয়া গিয়াছে। এইরূপ তরঙ্গ এখানে পৌঁছিয়া, একটি ঢিলের গায়ে লাগিয়া ঐ ঢিলটিকে ২০ ফুট উঁচুতে তুলিবে, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু দেখা গেল প্রকৃতিতে এই রকমেরই ব্যাপার ঘটিতেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক্স্-রশ্মির উদ্ভব কি ভাবে হয় আমরা স্মরণ করি। প্রায় বায়ুশূন্য এক গোলকে ধাতব পদার্থের উপর কতকগুলি ইলেকট্রন প্রচণ্ডবেগে আসিয়া ধাক্কা দেয়, সংঘাতের ফলে এক্স্-রশ্মি বাহির হইয়া আসে। ঐ ইলেকট্রনের বেগ কত তাহা সঠিক ভাবে মাপা যায়। এক্স্-রশ্মি উদ্ভুত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; যত অগ্রসর হইল, রশ্মি ততই ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। খুব ক্ষীণ অবস্থাতেও ইহা যদি কোন ধাতব পদার্থের উপর পড়ে তবে উহা হইতে ইলেকট্রন বহির্গত হয়। এই ইলেকট্রনেরও বেগ মাপা গেল; দেখা গেল কাচের গোলকে যে বেগে ইলেকট্রন আসিয়া এক্স্-রশ্মি উৎপন্ন করিয়াছিল, কোন পদার্থের উপর এক্স্-রশ্মি আসিয়া পড়ায় তাহা হইতে ঠিক সেই একই বেগে ইলেকট্রন বাহির হইয়া আসিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ঐ এক্স্-রশ্মি বাহির হইয়াই তীব্র অবস্থায় কিছুর উপর পড়ুক বা অনেকদূর যাইয়া মৃদু হইয়া তাহার উপর পড়ুক, একই বেগে ইলেকট্রন ছিটকাইয়া বাহির হইবে, পার্থক্য এই, তীব্র অবস্থায় সংখ্যায় বেশি ইলেকট্রন বাহির হইবে, এই অবধি; নির্গত ইলেকট্রনের বেগ ঠিক থাকিবে। এই রকমের বহু পরীক্ষা হইল। দেখা গেল নীল রশ্মি, অতি-বেগনি রশ্মি, এক্স্-রশ্মি, গামা-রশ্মি যদি নির্দিষ্ট ধাতব পদার্থের উপর পড়ে তবে উহা হইতে ইলেকট্রন বাহির হইবে। কত বেগে ইলেকট্রন বাহির হইবে তাহা নির্ভর করিবে যে ঈথর-তরঙ্গ পড়িতেছে সেকেণ্ডে তাহার কম্পনসংখ্যা কত তাহার উপর, তাহার ঔজ্জ্বল্যের উপর নয়; ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করিবে সংখ্যায় কতগুলি ইলেকট্রন বাহির হইল। এক্স্-রশ্মির, গামা-রশ্মির কম্পনসংখ্যা বেশী, সুতরাং উহাদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ইলেকট্রন খুব বেশী বেগে বাহির হইবে; নীল আলোকের কম্পন সংখ্যা কম, উহা দ্বারা উত্থিত ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত কম বেগে বাহির হইয়া আসিবে। রশ্মির সাহায্যে ইলেকট্রন উৎপাদন ব্যাপারটার নাম দেওয়া হইল রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়া। বহু পরীক্ষাগারে অনেক বিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার কোন ভুল নাই, কিন্তু ইহার মূল কারণ কি?

আইনস্টাইন ইহার কারণ নির্দেশ করিলেন। এজন্য তিনি বর্তমান কালের পদার্থবিদ্যার একটি বিপ্লবকারী মতবাদ গ্রহণ করিলেন। তাপ, দৃশ্য আলোক, অতি-বেগনি আলোক, এক্স্-রশ্মি, গামা-রশ্মি সবই তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, তরঙ্গের একটা অবিচ্ছিন্নতা, একটা ধারাবাহিকতা আছে, এই কথাই এতদিন বলা হইতেছিল। উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ হইতে যে-সব কিরণ নির্গত হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে প্ল্যাঙ্ক দেখিলেন যে অনেকগুলি ঘটনা তরঙ্গবাদ দ্বারা মীমাংসিত হয় না। প্ল্যাঙ্ক বলিলেন যে তেজ বিচ্ছিন্নভাবে, খণ্ড খণ্ড আকারে বাহির হইয়া যায়, অবিচ্ছিন্নতা নাই, ধারাবাহিকতা নাই; শক্তি এক-একটি প্যাকেটে, এক-একটি বাণ্ডিলে, বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নূতন কথা এই যে শক্তির একক (unit) সর্বত্র ঠিক নাই; কম্পনসংখ্যা যেখানে কম বাণ্ডিলটা সেখানে ছোট, কম্পনসংখ্যা

সেখানে বেশী বাণ্ডিলটা সেখানে বড়। শক্তির গুচ্ছকে লাল আলোর জন্য যদি এক ধরা হয়, বেগনি আলোর পক্ষে উহা হইবে ২, অতি-বেগনির পক্ষে ৮, এবং এক্‌স্‌-রশ্মির পক্ষে ৮০০০, গামা-রশ্মির পক্ষে আরো বেশী। একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন, হাইড্রোজেনেই থাকুক বা সোনাতেই থাকুক সর্বত্র সমান; কিন্তু এখানে শক্তির এক নূতন কল্পনা আনা হইল কম্পন সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির এক একটি গুচ্ছের পরিমাণ বদলাইতেছে। এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া আইনস্টাইন বলিলেন যে শুধু রশ্মিনির্গম ব্যাপার নয়, রশ্মি যখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিচালিত হয় তখনও উহা বিচ্ছিন্নভাবে গমন করে। এই 'কোয়ানটাম'-বাদ গ্রহণ করিয়া বোর হাইড্রোজেনে প্রোটনের চারিদিকে ইলেকট্রনদিগের ভ্রমণ করিবার বিভিন্ন কক্ষের ব্যাস নির্ণয় করিলেন; এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে লাফাইয়া যাইতে কতটা শক্তির প্রয়োজন তিনি কষিয়া বাহির করিলেন। এই মতবাদ অনুসারে দাঁড়াইল যে আলোক বা যে কোন রশ্মি কোথাও কদাচ মসৃণ তরঙ্গ নয়, সর্বত্রই উহা বিচ্ছিন্নভাবে, কাটাকাটা রকমে, প্রবাহিত হইতেছে। ধাতব পদার্থের উপর রশ্মি নিপতিত হইলে যে ইলেকট্রন বহির্গত হয়, এই রশ্মি-তড়িৎক্রিয়া আইনস্টাইন 'কোয়ানটম'-বাদ দ্বারা মীমাংসা করিলেন। রশ্মির এক একটি প্যাকেটের নাম দেওয়া হইল 'ফোটন'; ইহা যেন প্রোটন, ইলেকট্রনের সহোদর। গোলকের মধ্যে একটি ইলেকট্রন আসিয়া ধাক্কা খাইয়া যখন এক্‌স্‌-রশ্মি উৎপাদন করিল তখন এই ইলেকট্রনের সমস্ত শক্তি 'ফোটনে' চালিত হইল। এই 'ফোটন' আলোকের বেগে বাহির হইয়া আসিল; আসিয়া যখন আবার একটি ধাতব পদার্থের উপর পড়িল তখন উহা হইতে ইলেকট্রন বাহির হইল; এখানে ব্যাপারটা উল্টাইয়া গেল, ফোটনের মৃত্যু হইল ইলেকট্রনের জন্ম হইল; ফোটন তাহার সমগ্র শক্তি ইলেকট্রনকে দিয়া দিল। যুক্তির কোথাও কোন গলদ রহিল না। এই কল্পনায় যেন বহুকাল পূর্বের নিউটনের কণাবাদ অন্যভাবে দেখা দিল। যাহা হউক বোর একটি পরমাণুর বাহিরের গঠন পরিকল্পনায় এই মতবাদ প্রয়োগ করিলেন; হাইড্রোজেনে বিভিন্ন কক্ষ আছে, বাহিরের কক্ষ হইতে ভিতরের কক্ষে যখন একটি ইলেকট্রন লাফাইয়া পড়ে তখন এক ঝলক শক্তি রশ্মিরূপে নির্গত হয়।

প্ল্যাঙ্কের হিসাব সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। প্ল্যাঙ্কের গণনা কতক তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধীয় প্রাচীন সিদ্ধান্তের উপর কতক নূতন কোয়ানটমবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সমষ্টিগত এক নূতন হিসাব পদ্ধতি স্থির করিলেন; ইহাতে সম্পূর্ণরূপে কোয়ানটমবাদ গৃহীত হইল। ইহা দ্বারা প্লাঙ্কের পূর্বগণনার ফলাফল রক্ষিত হইল, অনেক নূতন কথা আসিল। পরে আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই গণনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া খুব নিম্ন শৈত্যে গ্যাসের ব্যবহার সম্পর্কীয় অনেক ব্যাপার মীমাংসা করিলেন। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীর নিকট বসু-আইনস্টাইন পদ্ধতি নামে পরিগণিত হইল। পরে ফার্মি ও ডিরাক সমষ্টিগত গণনা ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া এক পরিবর্তিত-পদ্ধতি গঠন করেন। এখন দেখা যায় যে ফোটনের ব্যবহার হয় বসু-আইনস্টাইন না হয় ফার্মি-ডিরাকের পদ্ধতি দ্বারা মীমাংসিত হয়।

যাহা হউক শেষ অবধি কি বুঝিতে হইবে যে তরঙ্গবাদ একেবারে পরিত্যক্ত হইল। তাহাও তো ঠিক বলা যায় না। নির্দিষ্ট অবস্থায় দুইটি আলোক-রশ্মি কাটাকাটি করে, অন্ধকার হয়, ইহা তো পরীক্ষালব্ধ সত্য; পরীক্ষায় এখনও তো ইহা দেখা যায়। এই জাতীয় বহু পরীক্ষার মীমাংসা করিতে তরঙ্গবাদকে আনিতে হয়, কোয়ানটমবাদ চলে না। তবে? দেখা যাইতেছে যে কতকগুলি ঘটনার মীমাংসা করিতে একটি মতবাদ সমর্থ, অপরটি অক্ষম; কিন্তু অপর জাতীয় ঘটনার জন্য প্রথমটি ত্যাজ্য, দ্বিতীয়টি গ্রহণীয়।

এ যেন বিজ্ঞানী তাহার এক পকেটে একটি মতবাদ এবং অন্য পকেটে আর একটি মতবাদ রাখিয়া দিয়াছেন, যখন যেটি কাজে লাগে বাহির করেন ; যেন সোম, বুধ, শুক্রবার একটি মতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিবার আর একটি। এই দুইটি বাদের কি সামকুল্য হয় না ?

পরমাণুর বাহিরের গঠন সম্বন্ধে বোর-মতবাদের প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এই মতবাদের জয়-পরাজয়ের একবার হিসাবনিকাশ করা যাক। পূর্ব হইতে বামার, রাইডবার্গ প্রভৃতি হাইড্রোজেনের বর্ণালীতে যে-সব রেখা দেখিয়াছিলেন বোরের মতবাদ তাহার কারণ বলিল ; বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে যে আণবিক সংখ্যায় সাজান হইয়াছিল এই মতবাদ তাহার সুস্পষ্ট চিত্র দিল। কমটন, রমনের সূক্ষ্ম পরীক্ষাও ইহার দ্বারা মীমাংসিত হইল। মাঝে একটি একটি করিয়া জটিলতা যেমন দেখা দিতে লাগিল অমনি মতবাদটির একটু আধটু অদল বদল করিয়া থাপ খাওয়ান হইল। যখন দেখা গেল বামার রেখার পার্শ্বে অন্যান্য সূক্ষ্ম রেখা আছে অমনি কল্পনা করা হইল যে বৃত্তীয় কক্ষ ব্যতীত উপবৃত্তীয় কক্ষও আছে। আপেক্ষিকতা-বাদ প্রয়োগ করিয়া গতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের ভরের পরিবর্তন হয় তাহা হিসাবে আনা হইল ; তজ্জন্য গতিপথের পরিবর্তনও কল্পিত হইল। হিসাবে যতগুলি রেখা দৃষ্ট হইবার কথা সবগুলি পাওয়া গেল না ; তজ্জন্য স্থির করিতে হইল যে ইলেকট্রনেরা যাওয়া আসার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট পথ নির্বাচন করিয়া লয়। কক্ষে ভ্রমণ ব্যতীত ইলেকট্রনদের আবর্তনও কল্পনা করিতে হইল। যতই নূতন নূতন ঘটনা লক্ষিত হইতে লাগিল ততই মতবাদটির উপর জোড়াতালি চলিল ; ইহার পূর্বতন সরলতার আর রহিল না, ক্রমেই ইহা জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। তার পর মনে হইতে লাগিল যেন ইহার সুদিন চলিয়া গেল, আবার এক নূতন মতবাদ না হইলে চলিতেছে না।

হাইড্রোজেন সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাপার বোরের মতবাদ দ্বারা কোন রকমে না হয় মীমাংসিত হইল। হাইড্রোজেনের পর হিলিয়ম ; বোরের মতবাদ এখানে আসিয়া হার মানিল। গোড়া হইতে বোরের মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা প্রাচীন বলবিদ্যা ও নূতন কোয়ানটমবাদের এক জগাখিচুড়ি। এই সব কারণে কিছুদিনের মধ্যেই আবার এক মতবাদ মাথা খাড়া দিয়া উঠিল ; কোয়ানটমবাদের উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন বলবিদ্যা গঠিত হইল। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সমষ্টিগত গণনা ইহার সূচনা ; এই নূতন বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিলেন ডি. ব্রগলি, হাইসেনবার্গ, শ্রডিংগার ও ডিরাক।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে পদার্থ যেন কতকগুলি কণিকার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু আলোকের যদি দুই মূর্তি হয় তবে পদার্থের উপাদান ইলেকট্রন কি দুইভাবে আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, কণিকা ও তরঙ্গ? ডি. ব্রগলি এই কথা ভাবিলেন, জটিল আঁকজোখের অবতারণা করিলেন, হিসাবে দেখাইলেন যে একটি ইলেকট্রনের সহিত তরঙ্গ জড়িত আছে ; প্রচণ্ড গতিমুক্ত ইলেকট্রনের পক্ষে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণত এক্‌স্-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমপর্যায়ে। ডি. ব্রগলি আরো বলিলেন যে ইলেকট্রনের ঘুরিবার কক্ষ-দৈর্ঘ্য সব সময় উহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গুণিতক। ক্রমে দেখা গেল এক্‌স্-রশ্মি ও ইলেকট্রনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। পরীক্ষায় ডেভিসন ও জারমার ইহা প্রথম প্রতিপন্ন করিলেন ; নিকেলের উপর ইলেকট্রন ফেলিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে উহার প্রতিফলন ব্যাপারটা দানাযুক্ত পদার্থের উপর এক্‌স্-রশ্মির প্রতিফলনের তুল্য। জে. জে. টমসনের পুত্র জি. পি. টমসন কেলাসিত পদার্থের ভিতর দিয়া ইলেকট্রন পাঠাইয়া এক চিত্র পাইলেন ;

বহু বৎসর পূর্বে ব্র্যাগ ঐসব পদার্থের মধ্যে একস্-রশ্মি পাঠাইয়া অনুরূপ চিত্র পাইয়াছিলেন। শেষ অবধি তরঙ্গ দাঁড়াইল পদার্থে, পদার্থ দাঁড়াইল তরঙ্গে।

স্রডিংগার এই মতবাদকে আর এক ধাপ উপরে তুলিলেন; তিনি বলিলেন স্থূল ইলেকট্রনকে বাদ দেওয়া যাক; শুধুই তরঙ্গ আছে, আর কিছু নয়। কিন্তু নলে যে ক্যাথোড-রশ্মি বাহির হয়, তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যে বিটা-রশ্মি বাহির হয়, উহারা তো ইলেক্ট্রন; স্রডিংগার বলিলেন, না, উহারাও তরঙ্গ। কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেক্ট্রন ঘুরিতেছে, বোর এই কল্পনা করিয়াছিলেন; স্রডিংগার ব্যাপারটিকে এইভাবে দেখিলেন। কেন্দ্রের চারিদিকে তড়িৎ বিস্তৃত হইয়া আছে; এই তড়িতের প্রাখর্য নির্দিষ্ট হারে বাড়িতেছে কমিতেছে; ইহার ফলে তরঙ্গের উৎপত্তি হইতেছে; ইলেকট্রন লাফাইয়া পড়িতেছে বলিয়া বোর ইহার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। স্রডিংগার তরঙ্গবাদের উপর স্থাপিত করিয়া এক নূতন বলাবিদ্যা গঠিত করিলেন। বোরের কল্পনা অনুসারে যে সব ব্যাপার নির্ণীত হইতেছিল এই নূতন তরঙ্গ-বলবিদ্যা দ্বারা তাহা তো হইলই, অধিকন্তু ইহা আরো ব্যাপক হইল। বর্ণালী রেখার ঔজ্জ্বল্যও ইহার দ্বারা সুমীমাংসিত হইল।

স্রডিংগার যখন তাঁহার এই মতবাদ প্রচার করিলেন তাহার কিছু পূর্ব হইতে হাইসেনবার্গ কোয়ানটম বাদের উপর স্থাপিত বলবিদ্যাকে এক নূতন রূপ দিলেন। ইহাতে পরমাণুর চিত্রের কোন কল্পনা নাই; ইহাতে আছে কতকগুলি আঁকজোখ কতকগুলি হিসাব, কতকগুলি ব্যবস্থাপত্র, যদ্দ্বারা প্রাচীন বলবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনা সমূহ নিখুঁতভাবে মীমাংসিত হইতে পারে। হাইসেনবার্গের যুক্তির ধারা পদার্থবিদ্যাকে দর্শনশাস্ত্রের কিনারায় লইয়া যাইল। যুক্তির মধ্যে যন্ত্রপাতির কোন স্থান নাই, থাকিতে পারে না; ইহার একমাত্র সম্বল হইল মানবের অন্তরস্থ বুদ্ধি। যুক্তির ধারা মোটামুটি এই। মনে করা যাক দূরে একখানা পাথর রহিয়াছে, আমি উহাকে দেখিব, উহার মাপজোখ লইব। দেখিবার জন্য উহার উপর আলোক ফেলিলাম। আলোক পাথরের উপর পড়িয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিবে না, সুতরাং আমার মাপজোখে কোন ভুল হইবে না। তারপর কোন বস্তুর যদি গোড়াকার অবস্থা জানা থাকে এবং উহার চলিবার নিয়মকানুন যদি জ্ঞাত হওয়া যায় তবে যে কোন সময় পরে উহার অবস্থিতি আমরা নির্ধারণ করিতে পারি। হাইসেনবার্গ বলিলেন যে পরমাণু সম্বন্ধে এসব নিয়ম খাটিতে পাবে না; পরমাণুর পূর্ব অবস্থা তো আমরা রশ্মির সাহায্যে নির্ধারণ করিব। রশ্মি ও পরমাণুর মধ্যে যদি ক্রিয়া চলে তবে মাপজোখ হইবে কিরূপে? অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যেসব যুক্তির ধারা গৃহীত হইয়াছে পরমাণু-জগতে সেসব যুক্তি চলে না। বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি তবে কি একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তবে কি বিজ্ঞান ভবিষ্যতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না, এবং যদি পারে তো গোড়াকার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া একেবারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে। হাইসেনবার্গের মতে শেষ অবধি কি এই দাঁড়াইল যে পরমাণু-জগৎ সম্বন্ধে আমরা কোনদিন কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারিব না। একথা কোন নির্দ্দিষ্ট পরমাণু সম্বন্ধে ঠিক; তবে আমরা সোজাসুজি একটা সমষ্টিগত হিসাব পাইব, বাহির জগতের কোন নিয়ম খাটাইয়া পাইব না, ইহার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে সেই হিসাব আসিবে। প্রাচীন পদার্থবিদ্যায় যে গড় হিসাব লওয়া তাহার সহিত পার্থক্য এই যে সেখানে প্রত্যেকটির উপর নিয়ম খাটাইয়া ফলাফলের একটা গড় লওয়া হয়; এখানে সমষ্টিগত হিসাব সোজাসুজি আসে, প্রত্যেকটির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই।

পরীক্ষামূলক ঘটনায় তরঙ্গবলবিদ্যা প্রয়োগে দুইটি আপত্তির কারণ দেখা দিল। ইলেকট্রনের

আবর্তন হইয়াছে ধরিয়া যেসব ঘটনা মীমাংসিত হইয়াছিল ইহা সে সব ব্যাপার নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইল। তারপর প্রাচীন বলবিদ্যা ইহার ভিত্তি হওয়ায় আপেক্ষিকতাবাদ হইতে যে সব সিদ্ধান্ত আসে সে সব এখানে খাপ খায় না।

১৯২৮ সালে ডিরাক একসঙ্গে এই দুই আপত্তির খণ্ডন করিলেন। স্রডিংগারের গণনাসমূহে *ডিরাক যে পরিবর্তন আনিলেন তাহাতে উহা সত্যে পৌছিবার পথে আরো কতকদূর অগ্রসর হইল।*

কিন্তু পূর্ণসত্য কতদূরে? যত দিন যাইতেছে ততই মানব বিশ্ব সম্বন্ধে নব নব জ্ঞান, গভীরতর জ্ঞান আহরণ করিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু ততই যে তাহার অজ্ঞানতার অন্ধকার উপলব্ধি করিতেছে। বহুকাল পূর্বে নিউটন বলিয়াছিলেন—"আমি বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ডের সংকলন করিতেছি, জ্ঞান-মহার্ণব পূরোভাগে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।" নিউটনের পরে দীর্ঘ দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে; বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখিয়া সাধারণ মানব আজ স্তম্ভিত, কিন্তু তবুও আজ বিজ্ঞানী নিউটনের ঐ বাক্য একইভাবে উচ্চারণ করিতেছে।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

চীনের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীঅনাথনাথ বসু

১

চীনদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই। শুধু যে আয়তনে, জনসংখ্যায়, ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বে এই দুই দেশের তুলনা করা চলে তাহা নয়, চীন ও ভারতবর্ষের শিক্ষাসমস্যার অনেকখানি মিল আছে। দুই দেশেই এখন যে শিক্ষাব্যবস্থা চলিতেছে তাহার আরম্ভ বেশিদিন হয় নাই; দুই দেশেই শিক্ষাপ্রসারের বাধা অনেকটা অনুরূপ। ১৯৩০ সালে চীনদেশের ৪২ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৮০ জন ছিল নিরক্ষর আর ভারতবর্ষের ৩৪ কোটি লোকের মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯০ জন। দুই দেশেই বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে; সেখানে কৃষিকর্ম ও ছোটখাটো কুটীরশিল্পের সাহায্যে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর অন্য কোথাও মেলা কঠিন। দুই দেশেই যান্ত্রিক সভ্যতার ও নব্য বিজ্ঞানের প্রসার অল্পই হইয়াছে আর দুই দেশেই জনসাধারণের মন ও জীবনযাত্রার ধারা অতি প্রাচীন ও অভ্যস্ত সংকীর্ণ খাতে বহিয়া যাইতেছে। দুই দেশেই জনসাধারণের ঔদাসীন্য ও অর্থের অভাব সমান। আর দুই দেশেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বড় সমস্যা কিভাবে এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এই অতিপ্রাচীন দুইটি জাতির জীবনধারাকে নূতন যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা যায়। এই সমস্যার বিরাটত্ব দুই দেশে যে কতখানি তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

তবে একটা ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ, চীন স্বাধীন ও ভারতবর্ষ পরাধীন। কিন্তু এ-কথা তুলিলে আর কোন কথাই বলা চলে না, সুতরাং সে-কথা তুলিব না। চীনের বর্তমান ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা জানেন, সে-দেশের স্বাধীনতা নানা দিক দিয়া কতখানি সীমাবদ্ধ।

১৯১২ সালে প্রাচীন চীন-সাম্রাজ্যের পতন ও চীন-গণতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু সে গণতন্ত্র নামে গণতন্ত্র ছিল; দেশের জনসাধারণের তাহাতে কোন স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া বস্তুত তখনও শক্তিশালী কোন কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তখন কোন্ দল প্রভুত্ব করিবে তাহা লইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলে। এইভাবে দলাদলি ও আত্মকলহে বহু বৎসর কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে সান-ইয়েত সানের নেতৃত্বে কুওমিংটাঙ নামে জাতীয় দলের আবির্ভাব হয়। সান-ইয়েত সানই নব্যচীনের জন্মদাতা। ১৯২৩ সালে তাঁহার চেষ্টায় ক্যাণ্টনে জাতীয় গবর্নমেণ্টের ভিত্তিপত্তন হয়; কিন্তু উত্তরের দলপতিগণ, আর বিশেষ করিয়া কম্যুনিস্ট নেতৃগণ, তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। ১৯২৭ সালে ক্যাণ্টন গবর্নমেণ্ট ন্যাংকিঙে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে প্রথম শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কুওমিংটাঙ

দল সেই গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে। সান-ইয়েত সানের তখন মৃত্যু হইয়াছে, চিয়াং কাই-শেক তখন ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া সান-ইয়েত সানের শূন্যস্থান অধিকার করিতেছেন। কিন্তু তখন গৃহবিবাদ থামে নাই, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বিরোধ চলিয়াছে। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া ও জিহোল গ্রাস করিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে অন্য অনেক ক্ষতি হইলেও একটা সুবিধা হইল; চীনের গৃহবিবাদ আপাতত বন্ধ হইল এবং ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইল; সকলেই ন্যাংকিঙ গবর্নমেণ্টের ও চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করার পর হইতে জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি চীনের উপর হইতে অপসারিত হয় নাই, জাপান ক্রমশই চীনের উপর তাহার প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে; অবশেষে ১৯৩৭ সালে সে চীন আক্রমণ করিয়াছে এবং তাহার বহু অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে; ন্যাংকিঙ গবর্নমেণ্ট এখন চুংকিঙে স্থানান্তরিত হইয়াছে; জাপান ন্যাংকিঙে এক শিখণ্ডী চীনা গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এ গেল চীনদেশের গত ত্রিশ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস। এই দুঃখদুর্দিনের মধ্যেই চীনের জাতীয় জীবন গঠনের ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ চলিতেছে; সে কাজ বন্ধ হয় নাই।

২

১৯০২ সালের আগে, রাষ্ট্রীয় সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেরূপ কোন ব্যবস্থা চীনে ছিল না। তখন শিক্ষার ভার ছিল পরিবারের উপর; যে পরিবার পারিত গৃহশিক্ষক রাখিয়া সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিত, যাহারা পারিত না তাহারা করিত না। সরকারী খরচে ও পরিচালনায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। স্বভাবতই তখন শিক্ষা উচ্চবর্গের ও অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; এবং তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রাচীন চীনাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ, যে সে-শাস্ত্রে পারদর্শী হইত সে প্রতিষ্ঠা, পদ ও অর্থ লাভ করিত। সরকারী চাকরি লাভেরও ইহাই একমাত্র পথ ছিল। প্রাচীন চীনাভাষার সহিত আমাদের সংস্কৃতের তুলনা করা চলে। দেশের লোক সে-ভাষায় কথা বলে না—কিন্তু জ্ঞানের অনুশীলন ও বিদ্যার চর্চা তাহারই সাহায্যে চলে। বস্তুত এই কারণেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কঠিন হইয়াছিল, তাহারা সে-ভাষায় কথাও বলে না, কেহ বলিলেও বোঝে না। তাহার পর চীনাভাষা হইল ছবির ভাষা, তাহার প্রত্যেকটা কথা এক-একটা আলাদা ছবি, তাহা পড়াও যেমন কঠিন লেখাও তেমনই। আর তাহাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা করিয়া মনে রাখিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই রকম অন্তত তিন হাজার ছবি মনে না রাখিতে পারিলে কোন লোককে সাধারণভাবের লেখাপড়া-জানা লোক বলা চলে না। আর পণ্ডিত হইতে হইলে যে কত ছবি মনে রাখিতে হইবে তাহার হিসাব না করাই ভাল।

বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় এবং সাহিত্যে প্রাচীন চীনার ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই ব্যাপারে

অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু চীনের বিখ্যাত দার্শনিক লেখক হু সি। তিনিই সাহিত্যে আধুনিক কথ্য ভাষার প্রবর্তন করেন এবং নবীনপন্থীদের অনেকেই তাঁহার পন্থা অনুসরণ করেন। অবশেষে ১৯১৭ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সাহিত্যে সরকারীভাবে প্রাচীন ভাষার ব্যবহার বন্ধ এবং পেই-হুয়া অর্থাৎ চলতি ভাষার চলন হয়। চীনের এই ঘটনার সহিত মধ্যযুগে ইউরোপে লাটিনের পরিবর্তে বিভিন্ন কথ্য ভাষার ব্যবহারের তুলনা করা চলে। উভয়েরই গুরুত্ব অনুরূপ। বস্তুত নব্য চীনের জন্ম তখনই হয়; তখনই জনসাধারণের শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় বাধা অপসারিত হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ সম্ভব ও সহজ হইয়া ওঠে।

পেই-হুয়া পিকিন অঞ্চলের কথ্য ভাষা; ইহার সহিত ভাগীরথী অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য বাংলার তুলনা করা যাইতে পারে। দেশের সর্বত্র এই ভাষা কথাবার্তায় চলে না বটে কিন্তু সকলেই অল্পবিস্তর এই ভাষা বুঝিতে পারে এবং ধীরে ধীরে ইহাই সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে।

এই সময়ে ভাষা-সংস্কারের জন্য আর একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়; ইহার লক্ষ্য ছিল চীনা অক্ষরের সংস্কার-সাধন। পূর্বেই বলিয়াছি কম পক্ষে তিন হাজার অক্ষর বা ছবি না চিনিলে চীনা ভাষা মোটামুটি রকমের আয়ত্ত করা যায় না। গত মহাযুদ্ধের পর চেষ্টা চলে এই ধরনের অক্ষর-সংখ্যা কমাইয়া হাজার করা যায় কি না। সেটা করিতে পারিলে দেশের লোককে লেখাপড়া শেখান আরও সহজ হইয়া ওঠে। এই আন্দোলন বহুল পরিমাণে সফল হওয়ায় শিক্ষাপ্রসারের আর একটি বাধা অপসারিত হয়।

৩

১৯২৭ সালে জাতীয় গবর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠার পর চীন-সরকার পর পর দুইটি জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলন আহ্বান করিয়া নিজেদের শিক্ষানীতি স্থির করেন। প্রথম সম্মেলন হয় ১৯২৮ সালে। নব্য চীনের জন্মদাতা সান-ইয়েত সান মৃত্যুর পূর্বে যে নীতিত্রয়ীর আদর্শ প্রচার করেন এবং যে আদর্শকে মূর্ত করিয়া তোলাই তাঁহার ও তৎপ্রতিষ্ঠিত কুওমিংটাঙ দলের লক্ষ্য ছিল, নব্য চীনের শিক্ষানীতিও সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। এই নীতিত্রয়ী ছিল সাম্য, জাতীয়তা, এবং সামাজিক ন্যায়বিধান। ১৯২৮ সালের জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষার নিম্নলিখিত আদর্শ গৃহীত হয়:

To promote nationalism education shall seek to instill into the minds of youth, a national spirit, to keep alive the old cultural traditions, to raise the general level of moral integrity and physical vigour, to spread modern scientific knowledge and to cultivate aesthetic tastes.

To attain democracy education shall seek to inculcate such civic virtues as law-abidingness and loyalty, to teach organising ability and a spirit of service and cooperation, to disseminate political knowledge and to inform the people of the true meaning of liberty and equality.

To realise social justice, education shall seek to develop the habits of manual labour and productive skill, to teach the application of science to everyday life and to enlighten the people on the interdependence and harmony of economic interests of various classes.

এই আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় গবর্নমেণ্ট ১৯২৯ সালে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন :

Based upon *Three Principles of the People* education in the Republic of China shall aim to enrich the life of the people, to foster the existence of society, to extend the means of livelihood and to maintain the continuity of the race, to the end that national independence may be attained, exercise of political rights may be made universal, conditions of livelihood may be developed and in so doing the cause of world peace and brotherhood may be advanced.

দ্বিতীয় জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলন হয় ১৯৩০ সালে। প্রথম সম্মেলনে শিক্ষার যে আদর্শ ও বিস্তারিত পরিকল্পনা গৃহীত হয় সেই অনুযায়ী কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ও জনশিক্ষার বিশেষ করিয়া বয়স্থশিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে মুখ্যত সেই বিষয়ে আলোচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রথম সম্মেলনেই করা হইয়াছিল। এই দুই সম্মেলনে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় গবর্নমেণ্ট নিম্নবর্ণিত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন :

(১) ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা। ইহার জন্য দুই শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে ; এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রথম চারি বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শেষ দুই বৎসরের অথবা পুরা ছয় বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

১২ বৎসর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ হয় সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা বিভিন্ন বৃত্তিমূলক নিম্ন-বৃত্তিশিক্ষালয়ে প্রবেশ করিবে। যাহাদের সে সুযোগ ঘটিবে না অর্থাৎ যাহাদের তখনই জীবিকা অর্জন করিতে হইবে তাহাদের আংশিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ধরনের বিদ্যালয় থাকিবে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার পর ছয় বৎসরের সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক এই দুই শ্রেণীর হইবে ; প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তিন বৎসর জন্য শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা উচ্চ-বৃত্তিশিক্ষালয়ে শিক্ষা লাভ করিবে ; যাহারা শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিবে তাহারা নর্মাল বিদ্যালয়ে যাইবে। বিভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী বৃত্তিশিক্ষালয়ে (উচ্চ ও নিম্ন দুই শ্রেণীরই) এক, দুই বা তিন বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও নানারকমের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ও সাধারণ শিক্ষার জন্য কলেজের ব্যবস্থা। সেখানে চার-পাঁচ বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহার পর উচ্চতর স্নাতকোত্তর (পোস্টগ্রাজুয়েট) শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থা।

(৪) বয়স্থশিক্ষার ব্যবস্থা ; ১২ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের নরনারীর শিক্ষার জন্য নানাশ্রেণীর গণবিদ্যালয়ের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকিবে। সেখানে সময় ও সুযোগ মত জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিবে।

প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারি বিদ্যালয়ের আয়োজন সরকারী সাধারণ ব্যবস্থার অন্তর্গত না হইলেও ধীরে ধীরে সেই ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪

চীনদেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটা রেখাচিত্র এই সঙ্গে দিলাম, তাহাতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায়তনগুলির পরস্পরের সহিত যোগ ও শিক্ষাধারার পরিণতি স্পষ্ট ধরা যাইবে।

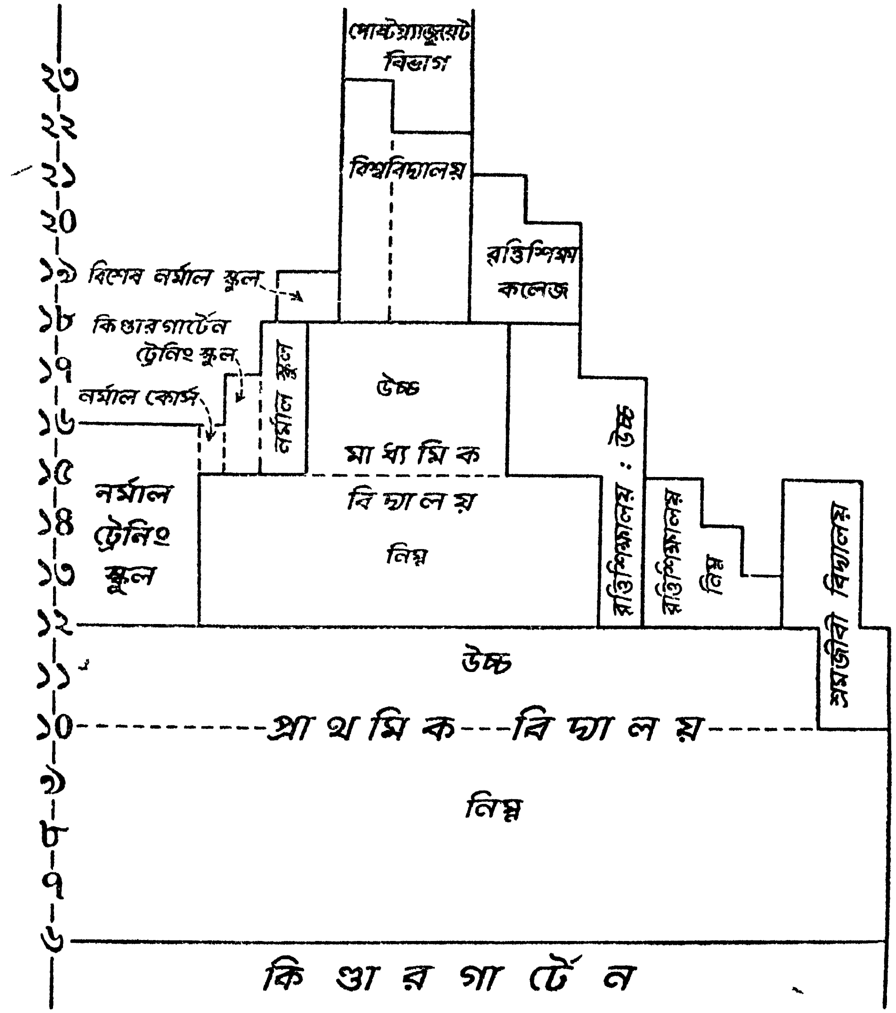

সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী চীনদেশের বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যার একটা হিসাব এখানে দিতেছি।

শিক্ষায়তনের প্রকারভেদ		শিক্ষায়তনের সংখ্যা
উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ		
	সরকারী	৪৫
	বেসরকারী	৩৮
টেকনিকাল বিদ্যালয়		
	সরকারী	৩২
	বেসরকারী	১৪
মাধ্যমিক শিক্ষা		
সাধারণ বিদ্যালয়		১৯০০*
বৃত্তিশিক্ষালয়		৩৩২*
নর্মাল শিক্ষালয়		৩৭৪*
প্রাথমিক শিক্ষা		
প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৩২,১৪৫
বয়স্কশিক্ষা		
গণবিদ্যালয়		৭৭,৬৫২
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান		৫৬,০১২

৫

এইবারে চীনা শিক্ষাব্যবস্থার ও সেখানকার বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায়তনগুলির কয়েকটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করি।

চীনদেশে শিক্ষাপ্রচেষ্টার দুইটি কেন্দ্র, এক প্রাথমিক শিক্ষা, দুই বয়স্কশিক্ষা। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই দুই প্রকারের শিক্ষার বিস্তারের জন্যই সেখানকার গবর্নমেণ্ট বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। আইনত চীনে ছয় হইতে বারো বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আবশ্যিক। কিন্তু অর্থাভাবে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইয়া ওঠে নাই। চীনের বিভিন্ন অংশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বিভিন্ন পরিমাণে হইয়াছে, কোথাও (যেমন শেন্‌সি প্রদেশে) এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা সত্তর জন লেখাপড়া শিখিতেছে, কোথাও হয়ত এখনও পর্যন্ত শতকরা বিশ জনেরও শিক্ষার সম্পূর্ণ আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় পুরাপুরি ছয় বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে কখন যে প্রবর্তন করা যাইবে তাহা বলা যায় না, তাই ১৯৩২ সালে চীন সরকার এক বৎসরের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প করেন। ইহার জন্য বিশ বৎসরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই

* এইগুলি ছাড়া অন্য কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেই মাধ্যমিক শ্রেণী আছে এবং সেখানে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ধরণের অনেকগুলি নর্মাল শ্রেণীও আছে। ইহাদের সংখ্যা যথাক্রমে সাধারণ মাধ্যমিক শ্রেণী ১২,০০০, বৃত্তিশিক্ষা শ্রেণী ১৬০০ ও নর্মাল শ্রেণী ২০০০।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স ক্রমে ছয় হইতে বাড়াইয়া দশ করা হইবে। ১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে সারা দেশের দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এক বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকরূপে প্রবর্তন করা হইবে। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ এর মধ্যে আবশ্যিক শিক্ষার মেয়াদ এক বৎসরের বদলে দুই করা হইবে; অর্থাৎ তখন দশ বৎসরের ছেলেমেয়েদের দুই বৎসর লেখাপড়া শিখিতে হইবে। চীন-সরকার আশা করেন এইভাবে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর শিক্ষার মেয়াদ এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া ১৯৫০ হইতে ১৯৫৫ সালের মধ্যে তাঁহারা চার বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া তুলিতে এবং দেশের সকল ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিবেন। এটা করিতে পারিলে দেশের নিরক্ষরতা-সমস্যারও একটা পাকাপাকি সমাধান হইয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথার উল্লেখ করা উচিত। অল্প বয়স হইতে বেশি বয়সের দিকে না গিয়া বেশি বয়স হইতে ক্রমে কম বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যিক করায় একটা ভাল ফল আছে। বেশি বয়সের ছেলেকে লেখাপড়া সামান্যভাবে শিখাইলেও সে ভোলে কম,—কিন্তু অল্প বয়সের ছেলেমেয়েকে কিছুদিন লেখাপড়া শিখাইয়া যদি পরে শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে অতি সহজেই অর্জিত বিদ্যা হারাইয়া ফেলে। ছয় বৎসরের চেয়ে দশ বৎসরের একটা ছেলে বা মেয়ে বিদ্যার কদর বোঝে বেশি সুতরাং এক বৎসরে তাহার যেটুকু শিক্ষা হয় সেটুকু থাকিয়া যায়, নষ্ট হয় না।

এক বৎসর আবশ্যিক শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তাহাতে এই বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে—পড়া, লেখা, রচনা, হিসাব, পৌরশিক্ষা ও দৈহিক শিক্ষা। অর্থাৎ ইহার লক্ষ্য মোটামুটি নিরক্ষরতা দূর করা আর ছেলেমেয়েদের সামাজিক জীবনের উপযুক্ত করিয়া তোলা। এক বৎসরের শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কিনা জানি না। তবে যেখানে পুরা সময়ের জন্য আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা অর্থাভাবে সম্ভব হইতেছে না সেখানে এই ধরনের একটা কোন ব্যবস্থা না করিয়া উপায় কি?

চীনদেশের শিক্ষাপ্রণালীর বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রম খুঁজিয়া দেখিলাম, সর্বত্রই পৌর বা সামাজিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোথাও ধর্মশিক্ষার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। চীনদেশে কনফুশীয়, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি নানামতের লোক আছে; তাহারা যে আমাদের চেয়ে কম ধার্মিক তাহা মনে হয় না; তবুও দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কোথাও ধর্ম শিখাইবার আয়োজন নাই। অবশ্য চীনে অনেক মিশনারি ইস্কুল আছে সেখানে খ্রীষ্টান ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু সেগুলি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত নয় সুতরাং তাহাদের কথা এখানে ধরা হয় নাই। আমি সাধারণ সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার কথাই বলিতেছি। সে শিক্ষায় চরিত্রগঠনের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ধর্ম শিখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই।

পৌরশিক্ষার উদ্দেশ্য মুখ্যত দেশের জনসাধারণের পৌরচেতনা জাগ্রত করিয়া তোলা। যে দেশে ঐক্যের অভাব সেখানে এই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতে পারি। প্রতি সোমবার বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে চীনদেশের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া জাতীয় সংগীত গান করে ও সান-ইয়েত সানের উইল আবৃত্তি করে। এই উইলে সান-ইয়েত সান তাঁহার নীতিত্রয়ীর পরিকল্পনা দেশকে

দিয়া গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রত্যেক চীনা ছাত্রছাত্রী সপ্তাহে একটি দিন শ্রদ্ধাভরে রাষ্ট্রগুরুর মুক্তি বাণী উচ্চারণ ও স্মরণ করে।

প্রাথমিক শিক্ষার পরেই চীনে বয়স্থশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য প্রায় ১,৩০,০০০ প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় আশি হাজার গণবিদ্যালয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পাঠকেন্দ্র, গ্রন্থাগার হইতে থিয়েটার, রেডিও, সিনেমা সব কিছুই আছে। চীনের এই ব্যবস্থার সঙ্গে রুশিয়ার বয়স্থশিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনা করা যায়। উভয় দেশেই এই ধরনের শিক্ষার প্রসার দ্রুত হইয়াছে। পনের বৎসরের মধ্যেই চীনে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা শতকরা আশি জন হইতে কমিয়া প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি আসিয়াছে। বয়স্থশিক্ষার বিস্তারে চীন-গবর্নমেণ্ট দেশের ছাত্রছাত্রীগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন ; বস্তুত তাহারাই শিক্ষার অগ্রদূতরূপে দেশের সর্বত্র গিয়াছে—শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছে।

বোধ করি এইজন্যই আক্রমণকারীর রোষ তাহাদের উপর গিয়া পড়িয়াছে। ১৯৩৭ সালে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন পেইপিং, ন্যাংকিঙ, টিয়েনৎসিনে ও অন্যান্য স্থানে প্রথমেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধ্বংস করে। কিন্তু চীনা অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাহাতে দমেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি আততায়ীর আক্রমণের গণ্ডীর বাহিরে দূর দূর প্রদেশে স্থানান্তরিত করেন। এই সকল দেশে রেলের অভাব। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই এইজন্য অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের দেড় হাজার দু-হাজার মাইল পদব্রজে পুঁথিপত্র এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। জগতের শিক্ষার ইতিহাসে অধ্যবসায়ের ও জ্ঞানস্পৃহার এরূপ উদাহরণ আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

চীনা ছাত্রছাত্রীগণ যে শুধু জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিতেছে তাহা নহে, দেশের সর্বত্র যখনই যে-কোন কাজে প্রয়োজন হইতেছে তাহারা সাহায্য করিতেছে। ফসল কাটার জন্য চাষীদের মজুরের অভাব হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরাই সে কাজ করিয়াছে। যুদ্ধের ব্যাপারেও তাহারা অগ্রণী হইয়া আসিয়াছে। বহু বহু চীনা ছাত্রছাত্রী আজ সাময়িকভাবে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া জাতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে এবং দেশের জন্য প্রাণ দিতেছে। কে বলিবে চীনদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হয় নাই ?

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

এ-যুগের সাহিত্যজিজ্ঞাসা

শ্রীগোপাল হালদার

প্রশ্নটা পুরোনো—লেখা কি ব্যাপার? এত পুরোনো যে, মহর্ষি বাল্মীকি নাকি প্রথম শ্লোক আবৃত্তি করেই চমকে উঠেছিলেন—তাই তো, এ আমি কি বললাম? বোধ হয় উত্তরকাণ্ড শেষ করেও তিনি তার উত্তর পান নি—এ আমি কি বললাম? লেখকের দিক থেকে এই প্রশ্ন তাই বরাবর চলে এসেছে। কিন্তু অ-লেখকের দিক থেকেও কি প্রশ্নটা তখন থেকেই ওঠেনি—কেন আবার লেখা বাজে লেখা হয়? আর সেই প্রশ্নটাও শুধু কি অ-লেখকেরই? হাজার হাজার শ্লোক লিখতে লিখতে মহর্ষি বাল্মীকিও কি এক-একবার চমকে ওঠেননি—তাই তো, এ আমি কি বাজে কথা বলছি? প্রশ্নটা তখন থেকেই উঠেছে—খুব পুরোনো প্রশ্ন। বোধ হয় ওর মীমাংসা নেই,—শুধু সময়মতো এক-একটা উত্তর মেলে। তাতে লেখাও থেমে থাকেনি, বাজে লেখাও বহরে কমেনি। মানুষের পৃথিবীর রূপান্তর ঘটছে, নতুন ভাব মানুষের জুটেছে, নতুন কথা ফুটেছে, নতুন রূপ উঠেছে লেখায় ফুটে—এই তো মানুষের মনের একটা দিকের ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে মানুষও নতুন করে ভেবেছে—তাই তো, লেখা তা হলে কি? কেনই বা তা কখনো ফোটে, আর কখনো বোঁটাতেই ঝরে যায়? এক যুগ যা উত্তর দিয়েছে, সে-যুগের মতো করেই তা সে দিয়েছে—তা মিথ্যাও নয়। কিন্তু আর-যুগের লেখা এল নতুন স্বাক্ষর নিয়ে। পুরোনো উত্তরে আর কুলোয় না। নতুন করে সে-যুগ বসল তার উত্তর খুঁজতে। একটা উত্তর পেলও। পুরোনোর পুঁজি তাতে বেড়েই গেল, ফাঁকা হয়ে গেল না। কিন্তু তার পরে আবার আরো নতুন যুগ এল, নতুন কথা ফুটল, আবার প্রশ্নটারও উত্তর তেমনি নতুন থেকে নতুনতর হয়ে চলল। পুরোনো বলে কোনো উত্তর মিথ্যা নয়, আর নতুন বলেও কোনো উত্তর শেষ কথা নয়। জীবন এগিয়ে চলছে, তার সাহচর্য রক্ষা করছে লেখা; তাই নাম তার সাহিত্য। এক-এক নতুন কোঠায় জীবন পা দেয়, সাহিত্যেরও এক-একটা নতুন রূপ দেখা দেয়—নতুন যুগের নতুন লেখা নিয়ে বিচারকরা বসে করেন বিচার—এ কি লেখা না বাজে লেখা? কিন্তু বাজে না হলে ততক্ষণে নতুন যুগের নতুন রূপকে সহজেই স্বীকার করে নেয় জীবনরসের রসিকেরা।

এ-যুগের সাহিত্যজিজ্ঞাসুও এ-যুগের মতো করে ভাবতে বসেছে—সাহিত্য কি, কিই বা সাহিত্য নয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে পুরোনো যুগের সাহিত্যজিজ্ঞাসা বা সে উত্তর সব বাতিল হয়ে গিয়েছে। রসাত্মক বাক্য যে কাব্য এ-কথা কি মিথ্যা? না মিথ্যা অ্যারিস্টটলের কথা যে, সাহিত্য 'অনুকৃতি'? কিংবা এই সেদিনকার ম্যাথু আর্নল্ডের কথা যে, কাব্য 'জীবনের ব্যাখ্যা'? এ-সব কথা বাতিল হয়নি। তবু এ-যুগে রসের ও জীবন-রসের নিবিড়তর সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা সচেতন হয়েছি। দেখছি, জীবনযাত্রায় এক বিপুল ব্যাপ্তি, এক আশ্চর্য গভীরতা, অসম্ভব উদ্দামতা। তাতে জীবনও আমাদের চোখে একটা অপূর্বতর জিনিস হয়ে উঠছে। যে অর্থে পুরোনো মনস্বীরা সাহিত্যকে 'অনুকৃতি' বলেছেন তা যেন আমাদের কাছে আজ আর যথেষ্ট মনে হয় না। 'জীবনের ব্যাখ্যা' বলে যেন আমরা মোটেই তৃপ্তি পাই না। ওঁদের সঙ্গে আমাদের তফাত ঘটেছে এখানে যে, জীবনের বিচিত্র রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। আর বুঝতে পেরেছি যে, জীবন-যাত্রার রূপান্তর ঘটছে, জীবনে অনেক জটিলতা জুটছে, আর সাহিত্যও তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন হচ্ছে, তার

নতুন রূপ, নতুন ভঙ্গিমা জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ফুটছে। এই ঐতিহাসিক বোধই এ-যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার একটা প্রধান কথা। পূর্ব পূর্ব যুগের মানুষ জীবনের এই গতিধর্মের সম্বন্ধে এভাবে সচেতন ছিল না—তখন জীবনও মনে হয়েছে স্থাণু, সাহিত্যও সুস্থির। সেদিনের মহাজ্ঞানী বা মহর্ষিদের পক্ষেও তাই এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি পাওয়া সুসম্ভব ছিল না। অথচ আজকে আমাদের অনেকের কাছেই তা সুলভ। তাঁরা জেনেছেন রসকে রহস্য হিসাবে, শিল্পকে দেখেছেন জীবনের অনুকৃতিরূপে, কাব্যকে ভেবেছেন ব্যাখ্যা বলে। আমরা দেখছি একে সৃষ্টি হিসাবে; দেখছি মানুষের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় হিসাবে, দেখছি জীবন ও জীবনযাত্রার স্বাক্ষর হিসাবে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি আর এই জীবন-বোধের জন্যই এ-যুগের চোখে সাহিত্যজিজ্ঞাসা হচ্ছে জীবনজিজ্ঞাসারই একটা অধ্যায়।

জীবন, জীবিকা ও সাহিত্য

সাহিত্য যে জীবনজিজ্ঞাসারই একটা রূপ, এই কথা অনেকেই মুখে মানবেন। কিন্তু তাঁরাও সকলে ওর এক মানে করবেন না; আর কার্যত দেখা যাচ্ছে, কথাটা কেউ মানছেনই না। কার্যত দেখব, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের একটা ছেদ পড়ছে—কোথাও বেশি কোথাও কম, কিন্তু ছেদ পড়ছে। এর কারণ আর কিছু নয়,—জীবন, জীবিকা ও সাহিত্য এ তিনের মূল সম্পর্ক আমরা গুলিয়ে ফেলছি, তিনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি। কিন্তু আসলে সেরূপ ছেদ টানা সম্ভব নয়। জীবনের গোড়ার কথা জীবিকা, এটা সাহিত্যিকরাও মানবেন। আর সাহিত্য জীবনেরই 'সহিত' চলে, তার সহগামী, তার সহায়ক—এইজন্যই বোধ হয় গোড়াতে আমাদের দেশে মানুষের এই মানস-সৃষ্টির নাম হয়েছিল 'সাহিত্য', তাও দেখেছি। (অবশ্য তত ব্যাপক অর্থে আজ আমরা এই কথাটি আর ব্যবহার করি না, ব্যবহার করি 'সংস্কৃতি'; তাতে শিল্প-বিজ্ঞানের সব বিভাগই বোঝায়)। কিন্তু রূপকর্ম বিশেষ করে মনের সৃষ্টি, জীবিকা অত্যন্ত বাস্তব ব্যাপার। আর মন ও বস্তুকে আমরা মনে করি একেবারে দুই জগৎ—পরস্পরের নিয়ত শত্রু। তাই জীবিকার সঙ্গে সাহিত্যের এ তফাতটা আমরা বড় করে দেখি, সম্পর্কটা ভুলে যাই। এমন কি মনে করি জীবিকার সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধিতা আছে,—জীবিকা-প্রয়াস এক জিনিস, আর সাহিত্য-সৃষ্টি আর-এক জিনিস। ইকনমিক্স এক জিনিস আর আর্ট অন্য জিনিস।

কিন্তু জীবিকাই জীবনের গোড়ার কথা। জীবন তারই উপর ফুটেছে, তারই বিকাশে ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। জীবন নইলে শুধু হত জীবনযাত্রা, যেমন জীবজন্তুর জীবন। তাদেরও ক্ষুধার তাগিদ মেটাতে হয়—কিন্তু তা প্রকৃতির প্রসাদে তারা মেটায়। মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে সে প্রসাদ আদায় করে নেয়। সে নতুন করে আপনার প্রাণধারণের উপায় আবিষ্কার করে—তারই নাম জীবিকা। মানুষের এই নিজে গড়া জীবন-প্রণালীর নাম ইকনমিক্স আর জীবজন্তুর প্রকৃতি-ধরা জীবন-প্রণালীর নাম একলজি। এই জীবিকা-প্রণালী করায়ত্ত করতে পেরেছে বলেই মানুষ হয়েছে মানুষ—তার জীবন হয়েছে প্রকৃতির বন্ধন-মুক্ত; আর এই জীবিকার প্রণালী তার সাধ্যাতীত বলেই জীবজন্তু রয়েছে জীবজন্তু। জীবিকা তাই মানুষের আসল কথা। তাতেই তার সমাজের বিন্যাস হয়, জীবনের রূপরহস্য বিকশিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগে মনে ও চেতনায়, দেখা দেয় মনের ফসল। জীবিকার বাস্তব অধিকার আয়ত্ত করাতেই মানুষের মনের এলেকাও বিস্তৃত হয়েছে—আবার এই বাস্তব অধিকার বিস্তৃত করতেও মানুষের মনের শক্তি

সাহায্য করছে—এই তাদের সম্পর্ক—মানুষের জীবন বরাবর বস্তু ও মনের এই মিলন-বিরোধের সংগ্রাম-ক্ষেত্র, উৎসব-ক্ষেত্র। জীবিকা, জীবন ও সংস্কৃতির (বা সাহিত্যের) এই হল সম্বন্ধ, ইকনমিক্স আর আর্টের এমনি নিবিড় বন্ধন। মানুষের economic life আছে বলেই একটা art life বা cultural life আছে, আর এই cultural life আসলে economic life-এরই সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলে—ঐতিহাসিকের চোখে দেখলে তা বেশ বোঝা যায়।

কথাটা তবু ইতিহাসের নামেই স্বীকার করতে আমরা চাই না। তার কারণ বোঝা সহজ: আমরা ভদ্রলোক—খেটে খাই না। অন্তত যাকে ঠিক জীবিকা বলে তা আমাদের নেই—চাষও করি না, যন্ত্রপাতিও গড়ি না। আমাদের জীবিকা নেই, অর্জন নেই; যা আছে তাকে বলব উপজীবিকা, আর যা করি তা উপার্জন। অথচ—এইবার আমরা ইতিহাসের দোহাই পাড়ব—এই আমরাই না চিরদিন কালচার গড়েছি, আর্ট সৃষ্টি করেছি, সাহিত্য রচনা করেছি। জীবিকার বোঝা যারা বয়েছে তাদের এই শক্তিই বা কই, সময়ই বা কই? তারা উৎপাদনই করেছে, তা-ই দেহ-জীবনের ধর্ম; আমরা করেছি সৃষ্টি, তা-ই মনোজীবনের ধর্ম। জীবিকাই যদি মানস-সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য কারণ হত, তাহলে পৃথিবীতে এ সব সুকুমার কলার সম্ভবই হত না, বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ থাকত। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি অকাট্য। সত্যই আমরা এতে বিশ্বাসও করি। করব না কেন? ইতিহাস যে আমাদের সপক্ষে।

সৃষ্টির দুই ক্ষেত্র

কিন্তু ইতিহাস আমাদের সপক্ষে নয়। এইটাই আসল কথা।

ইতিহাসের মূল সাক্ষ্য এই—শিল্পী অবশ্য অসামান্য প্রতিভা জন্ম থেকেই পান। জীবে জীবে যেমন অফুরন্ত বৈশিষ্ট্য, তেমনি মানুষে মানুষেও বৈশিষ্ট্য। হয়ত মূলত তা জনিক- (genes) গত, রঞ্জনিকের (chromosome) বিন্যাসের ফল। তার পরে ফল দৈহিক-মানসিক পরিবেশের। মোটের উপর অসামান্য মানসিক শক্তির মানুষ আছে এটা ঠিক। তাদের সেই মানসিক শক্তি বিকাশ লাভ করে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কে এসে, তার ঘাতপ্রতিঘাতে। তাতেই অসামান্য মানুষদের শক্তি সৃষ্টিমুখী হয়, আবার তা পরিবেশেও নিজের সৃষ্টি দিয়ে জোগায় নূতন বাস্তব সৃষ্টির শক্তি। পরিবেশ আসলে সমাজেরই নাম—জীবিকারই যা বিশেষ বিন্যাস। তাই পরিবেশের সঙ্গে শিল্পীর ঘাতপ্রতিঘাত হচ্ছে জীবিকা-বিন্যাসের সঙ্গে তার দেওয়া-নেওয়া—জীবিকার বাস্তব শক্তি থেকে শিল্পীর নিজের নেওয়া, আর জীবিকার শক্তিকে আবার তাঁর মানস শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া। আর যেখানে শিল্পী জীবিকার প্রধান শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ সেখানে সে নিতে পারে তত বেশি, ফিরিয়েও দিতে পারে তত বেশি; সৃষ্টি করতে পারে তত বেশি, আর জীবিকাকে সৃষ্টিমুখীনও করতে পারে তত বেশি।

ইতিহাসে এই জীবিকার শক্তি বাড়ছে—শিল্পীরও সৃষ্টির এলেকা বাড়ছে। জীবিকাক্ষেত্রের স্রষ্টারাও পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই শিল্পীরও সঙ্গে সঙ্গে দরকার হয়েছে নূতন স্রষ্টাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করে তোলার—নইলে জীবিকাশক্তি সৃষ্টিমুখী হবে না, নিজেও শিল্পী সৃষ্টিক্ষম হবেন না। একদিন জীবিকাক্ষেত্রে প্রধান ছিল সামন্তরা—সেদিন শিল্প সেই ক্ষত্রিয় ও সামন্তদের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা বলেছে। শেষ হল সেই দিন; এল বুর্গোর্সের যুগ—কত বড় বিপ্লব সে! দেখি বিপুল প্রয়াস, সুমহৎ স্বপ্ন, অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা, দেখি শেক্‌স্পীয়র!

বুর্গারের ছেলে সে নয়—স্ট্রাটফোর্ডের ছোটলোকের ছেলে, হরিণ চুরি করে বেত খেয়েছে, পালিয়ে গেছে শহরে। কিন্তু শহরে এসে সে দেখল বণিকদের, বুঝল নতুন শক্তির মর্মকথা—আর ছিল তার অসামান্য প্রতিভা। তার পর, জীবিকাক্ষেত্রে সৃষ্টিশক্তি আরও প্রবল হয়ে উঠল যন্ত্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তার জন্ম-বেদনা আবার রোম্যান্টিক রিভাইভেলের কবিদের সহজ হওয়ার চেষ্টায়, তাঁদের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায়, তাঁদের বিপ্লবী স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়। আমাদের দেশে ঢিলেঢালা আয়েসি সামন্তযুগ হঠাৎ ঘা খেয়ে জেগে উঠল এই বিজয়ী বণিকরাজের স্পর্শে। আর সেই বিজয়ী বণিক্-সংস্কৃতির স্পর্শে মহাকাব্যের আকাঙ্ক্ষায় মাতাল হলেন মধুসূদন, জীবনরসে উন্মত্ত হলেন বঙ্কিম—কত বড় বিপ্লবের স্বপ্ন তাঁদের চোখে। কিন্তু জীবিকার ক্ষেত্রে দেশী বণিক্‌শক্তির উদ্বোধন চাপা পড়ে রইল বিলাতী সাম্রাজ্যবাদের দাপটে। তবু তারই মুক্তির আশায় আমাদের আকাশ এতদিন মুখর রয়েছে। আজ আমরা নিরাশ হয়েছি, পালাতে চাই—থাকতে চাই জীবনের দায়িত্ব থেকে দূরে। আর পৃথিবীতেও আজ জীবিকাশক্তির ধনিক অধিকারীরা সৃষ্টির ভার আর বহন করতে পারছে না—জীবিকার ক্ষেত্রে স্রষ্টা আজ শ্রমিক ও কৃষক। সৃষ্টির বাস্তব ক্ষেত্রে তারাই প্রধান। অথচ এখনও তাদের হাতে আসেনি সেই সমাজের প্রাধান্য, মুক্তি পায়নি জীবিকার নূতন শক্তি। মানস ক্ষেত্রের স্রষ্টাদের তাই দরকার আজকের দিনে যারা বাস্তব ক্ষেত্রের স্রষ্টা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা। তাদের বাস্তব শক্তি থেকে নেওয়া নিজের মানস সৃষ্টির প্রেরণা, আর তাদের বাস্তব সৃষ্টিতে জোগানো নিজের মানস-শক্তির দান ; চাই পৃথিবীতে বিপ্লবী জনতাকে চেনা, আর চাই এদেশে বিপ্লবী জনশক্তির ভাষা বোঝা। এইটাই ইতিহাসের মর্মকথা—সমাজের যে-স্তর থেকেই আসুন শিল্পী বা বৈজ্ঞানিক,—হোন তিনি বুর্গর্স যুগের শেক্‌স্‌পীয়র, আর বাংলার বিপ্লবকামী যুগের রবীন্দ্রনাথ—জীবিকাস্রষ্টাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অচ্ছেদ্য, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষারও তিনিই জোগান বাণী।

শ্রম ও সৃষ্টি, কর্ম ও কল্পনা, বাইরের সৃষ্টিশক্তি আর মনের সৃষ্টিশক্তি,—মানুষের ইতিহাসে এ দুই ধারাই বরাবর যোগাযোগ রেখেছে—জীবিকার 'সহিত' চলেছে 'সাহিত্য'। কথাটা শুনেই তা হলে এক দল তাল ঠুকে বলবেন, "অতএব, ওহে রবীন্দ্রনাথ! তুমি **বুর্জোয়া** (না আধা-সামন্ত জমিদার ?), যতই গেয়ে থাক মানুষের গান,—তার জীবনের, মরণের, আশা-আনন্দের,—একদিন যখন আমাদের শ্রমিক-বিপ্লব সার্থক হবে তুমি হবে বরবাদ।" মানে, বিপ্লবটা বিকাশ নয়, শুধুই বিনাশ, সংস্কৃতির পরিণতি নয়, পরিনির্বাণ ?

এ হল তাদেরই পাল্টা জবাব যারা বলে—"তোমরা শ্রমিক-বিপ্লবে বিশ্বাসী, তোমরা কে হে এসেছ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতে ? কিংবা শেক্‌সপীয়রকে, কিংবা টলস্টয়কে ? ওঁরা **আমাদের**—আমরা যাঁরা এ বুর্জোয়া সভ্যতা সৃষ্টি করেছি।" তার মানে, বণিকের একচেটে মালিকানার লোভ (monopolistic tendency) রবীন্দ্রনাথ, শেক্‌সপীয়র টলস্টয়কেও একচেটে (monopoly) সম্পত্তি করবার ফন্দি খুঁজছে।

বণিকের বর্বরতা ও অতিবিপ্লবীর বর্বরতা ছাড়াও প্রশ্ন তবু আছে : "জীবিকা মানে জীবন নয় ; জীবিকার বেসাতি বাসি হয়ে যায়, আজকের জিনিস কাল বিকোয় না। জীবিকাই যদি শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণ জোগাত, তাহলে সে-যুগের লেখা এ-যুগে কেউ বুঝত না। গ্রীক নাটক বুঝত না ইংরেজ, চীনা চিত্রকলা বুঝতেন না লরেন্স বিনিয়ন, শেক্‌সপীয়রই হতেন আমাদেরও কাছে

অগ্রাহ্য। জীবিকা নয়, জীবনের পরিবর্তমান পট নয়—সৃষ্টির প্রেরণা জোগায় জীবনের অপরিবর্তনীয় ভাবধারা, আত্মার আকুতি। সাহিত্য জীবিকার স্বাক্ষর নয়, আত্মার স্বাক্ষর।”

সৃষ্টি ও প্রাণবেগ

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ওই আত্মা কথাটা গোল বাধায়,—তা মনে রাখা দরকার। আত্মা তো মানুষের (বা পুরুষমানুষের) একচেটে নয়—জীবমাত্রেরই আছে। তাহলে ওই আত্মার স্বাক্ষর জীবজন্তুর বেলা দেখি না কেন? আসল কারণ এই যে—জীবজগতের শ্রমশক্তি নেই—জীবিকা-সৃষ্টির শক্তি নেই, সৃষ্টিশক্তি নেই। জীবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার তফাত আছে—কারণ মানবাত্মা আপনাকে জানতে পারে, সে সচেতন। সৃষ্টি সে করতে পারে, আর তাতেই আত্মা সচেতন হয়। মানুষের সঙ্গে এইখানেই জীবজগতের তফাত—মানুষের জীবিকা আছে,—সংস্কৃতি তারই উপর গড়া;—আর মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, জীবজন্তুর এই সাধ্য নেই। অবশ্য পাখিও বাসা বাঁধে, মৌমাছিও পরিশ্রম করে, আর তা দেখে আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হই। ভাবি, কি আশ্চর্য সৃষ্টিনিপুণতা পাখির আর সমাজ সৃষ্টি মৌমাছির। বিস্ময়ের জিনিস বটে। কিন্তু সে সৃষ্টি হল জীবের জৈব ধর্ম। প্রকৃতিবশেই পাখি তার বাসা বাঁধে, মৌমাছি মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে,—এর নড়চড় করবার ক্ষমতা তাদের নেই, অন্ধ প্রাণধর্মের দাস তারা। সে প্রাণধর্ম আমাদেরও আছে, কারণ আমরাও জীব; ক্ষুধার তাড়না আছে, বাঁচবার সাধ আছে, মরণের ভয় আছে, আছে বংশবৃদ্ধির কামনা, মিলনের বাসনা। এ-সব আমাদেরও সহজাত ধর্ম; মৌলিক প্রাণধর্ম আমাদেরও সকলের এইরূপ। তবে তা ঠিক অন্ধ নয়। আমরা তাকেও আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি, তাই ঠিক তার জৈবিক রূপও আর তেমন নেই। ক্ষুধা পেলে অনেকটা ক্ষেপে যাই, কিন্তু কাঁচা মাংস খেতে পারি না,—সেই শক্তিও নেই। পরস্পরের রুটি ছিনিয়ে নিই, কাড়াকাড়ি করি, মারামারি করি, খুনোখুনিও করি। ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস খাই, পাতা খাই, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকি, শুয়ে থাকি সারের জায়গা দখল করে, হয়ত সন্তানকে বিক্রী করে দিই, বিক্রী করে দিই দেহ মান ইজ্জত—এ-সব আজ চোখের সামনেই দেখছি। বুঝছি প্রাণধর্ম কত দুর্বার। তবু দেখছি—আমরা নিজেদের এই ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ের রদবদলও করতে পারি; নূতন উপায় উদ্ভাবনও করি, পুরানো উপায় পুনর্গ্রহণও করি আবার। ঘাস খাই রেঁধে, চাল পেলে ফুটিয়ে নিই; দোকানে কিনতে না পেরে সারে এসে দাঁড়াই, দরকার হলে সারে এসে শুয়ে থাকি—প্রয়োজন বুঝে চলি, প্রয়োজন বুঝলে স্নেহও বিসর্জন দিই, বিসর্জন দিই মান আর ইজ্জত—তাতেই জানি প্রাণ বাঁচবে। জৈবী প্রবৃত্তি আমাদেরও লোপ পায়নি। তা মানুষের জীবনযাত্রার ও সমাজযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভঙ্গিতে নতুন রূপে প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। এইটাই বলতে পারি মানবাত্মার আর জীবাত্মার তফাৎ। জীবাত্মা অনেকটাই অচেতন, আর মানবাত্মা সচেতন, আপনাকে জানতে পারে। আর তাই প্রবৃত্তি একেবারে অন্ধ নেই, তাকেও আমরা একটু একটু করে এই জীবনযাত্রার কাজে লাগিয়েছি, তা সমাজযাত্রার উপযোগী হয়ে উঠেছে। আর তা করেছি আমাদের সংস্কৃতির স্পর্শ দিয়ে, সৃষ্টিশক্তির সহায়ে, মানে, মূলত আর্থিক-সামাজিক জীবনের বিকাশে।

এই ভাবে বরং আমাদের জৈবী প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে অদ্ভুত প্রাণধর্ম, সবল আর সুন্দর; আর তার শক্তিতে সমাজও হয়েছে আবার আরও সবল ও সক্রিয়।

এই প্রাণধর্মকে যে সমাজ ঠেকাতে যায়, সেখানে প্রাণাবেগের (instinct-এর) সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার বাধে টক্কর। তাতে প্রাণাবেগ তার সামাজিক সৌন্দর্য হারায়, বিকৃত হয়ে ওঠে, জৈবী প্রবৃত্তি একেবারে পশুপ্রবৃত্তি হয়ে পড়তে পারে। এই তো ক্ষুধার জন্য চাই চাল। পাচ্ছি না, তাই কত ভাবে প্রাণধর্ম আপনাকে মানিয়ে নিতে চাইছে—অখাদ্য খুঁজেও খাদ্য করি, সারে দাঁড়াই, রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, গুণ্ডার লাঞ্ছনা সই, পুলিশের লাঠিও সই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি, আবার ব্যবস্থা করে অবস্থা ফেরাই। যখন তা পারি না তখন মারামারি করি। আরও না পারলে হয়ত পশুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠবে—অ্যান্টি-সোশ্যাল প্রবণতা বেড়ে চলবে, বন্ধুত্ব ভুলব, স্নেহ ভুলব, মমতা ভুলব—পশুর মতো হয়ে উঠব। আসলে পশুর থেকেও বীভৎস হব, কারণ পশু চলে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায়। আমরা মানুষ, আমাদের প্রবৃত্তি অন্ধ নয়, তার দৃষ্টি বিকৃত হয়; সে বিকৃত দৃষ্টির বশে আমরাও হব বিকৃত ও বীভৎস। প্রাণাবেগকে সমাজে ঠাঁই না দিলে এই হয় অবস্থা। প্রাণাবেগকে সমাজ তাই কাজে লাগিয়ে নেয়—তাকেই বলে 'সাবলিমেশন'। তার মানে আবেগ-সংবরণ নয়,—সংহার তো নয়ই, কারণ সংহার হয় না, সংহারের চেষ্টায় হয় বিকৃতিসাধন;—আর সাবলিমেশনের মানে হচ্ছে তার সংস্কৃতি-সাধন—তাকে সৃষ্টিমুখী করে তোলা।

মানুষের শিল্প ও সাহিত্য এই প্রাণাবেগেরই কথা, তারই সৃষ্টি। আবার সেই প্রাণাবেগকে পুষ্ট করে, সৃষ্টিমুখীও করে শিল্প ও সাহিত্য। এই জন্যই ক্ষুধা, জন্ম, মৃত্যু, কামনা, যৌবন, জীবন পিপাসা, এ হল জীবনের চিরন্তন বৃত্তি, তার প্রাণধর্ম;—শিল্প ও সাহিত্য তাকেই পরিপুষ্ট করছে। আর নূতন নূতন অবস্থার মধ্যে এই সহজ বৃত্তির যে নূতন নূতন বিচিত্র ভঙ্গি প্রকাশ পায় শিল্পী তাকেই প্রকাশ করে, সেই জীবনরসই 'পরিবেশন' করে—মানে, শিল্পীর উপলব্ধিকে 'পরিবেশের ভাণ্ডারে দান' করে।

হয়ত এই রসসৃষ্টিও মূলত সেই জৈব গ্রন্থিরস নিঃসরণের ফল। জীবের বেলা gland secretions দেহগত প্রকাশেই তৃপ্ত হত। জীব তা তৃপ্ত করত মারামারি করে, আর দেহ-মিলনে; পরিতৃপ্ত করত ছুটে, দৌড়ে, খেলে—পাগল হয়ে বনে বনে ফিরে। মানুষের বেলা সে আরও নতুন প্রকাশপথ চায়—দেহগত প্রকাশ ছাড়াও মানসিক প্রকাশের ক্ষেত্রেও চায় তৃপ্তি। হয়ত তা-ই রসের পিপাসা; আর তাই মানুষের চাই সেই রসপিপাসা তৃপ্ত করা, তা সমৃদ্ধ করা, সৃষ্টিতে তাকে প্রবুদ্ধ করা। আর তাই রসাত্মক বাক্য বর্ণ রূপ রেখা ধ্বনি, এ-সবে সৃষ্টি হয় কাব্য, সৃষ্টি হয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত প্রভৃতি। এবং হয়ত গ্রন্থিরসবিজ্ঞান বা 'এণ্ডোক্রিনোলজি'ও ভাবী দিনে আবার শিল্পজিজ্ঞাসায় নূতন তত্ত্ব জোগাবে।

স্মৃতিচিত্র

শ্রীপ্রতিমা দেবী

…একদিকে বনেদী সাতমহলা বাড়ির প্রকাণ্ড ছাদ আর একদিকে নিস্তব্ধ ঠাকুরদালানের লম্বা থামগুলো। সেই দালানে কত মানুষই না নিদ্রামগ্ন। এ-বাড়িতে কত লোকের বাসা চিনিও না, কিন্তু রাতে দেখি সকলে এক-একটা জায়গা দখল করে শুয়ে পড়েছে, দালানটা যেন সাধারণের শোবার ঘর। সকালবেলা আবার ঐ সব পরিচিত-অপরিচিতরা কে কোথায় চলে যাবে কাজের তল্লাসে, কারো খোঁজ থাকবে না; একই গাছে যেমন সন্ধ্যার সময় দিনের পাখিরা ফিরে আসে, দালানটি তেমনিতর মানুষের বাসা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের এক কোণে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে অতীতের কত কাহিনী মনে আসছিল, বিস্মৃত সব দিনকে নতুন করে অনুভব করছিলুম। দূরে গলির কোনো উপরতলার ঘর থেকে বাইজীর গলায় বেহাগ শোনা যাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় ভেসে আসছে স্বর নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করে। অন্ধকারের মধ্যে ভিটার মুমূর্ষু আত্মাটা যেন মাথা নাড়া দিয়ে বলে উঠল, "জানো ঐ ছিল ইলাইজান বিবির বাড়ি, তার গলাও একদিন এমনি করেই উঠত। বিবির বেড়ালের বিয়েতে যে ধুম হয়েছিল তা তখনকার দিনে বড়োলোকদের হার মানিয়েছিল, আর এখনকার দিনের তোমরা তা তো চোখেও দেখবে না।" সেকালে শৌখিন মেয়েমহলে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল বাতিক এবং ঘুড়ির প্যাঁচ খেলায় অনেক কিছু কাহিনী তৈরী হত। ইলাইজান বিবিও বিকেলবেলা ঘুড়ি ওড়াতেন, সেই নিয়ে মুখে মুখে প্রতিবেশীরা খোশ-গল্প তৈরি করত। এই সব বিচিত্র জীবনধারার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সেই বনেদী ভিটা দাঁড়িয়ে ছিল নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে মাথা উঁচু ক'রে। বাড়ির সামনে গলিটিও অদ্ভুত স্থান, তাতে কতরকম লোকেরই না আড্ডা। গলির দুধারে বাড়ির চেহারা অতি নোংরা, নোনাধরা দেয়াল, বাইরের থেকে দরজার ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরের একটা রহস্যাচ্ছন্ন চেহারা চোখে পড়ে। ফুটপাথের অপর প্রান্তে মস্ত বটগাছ, শিবমন্দির ফুঁড়ে বেরিয়েছে গলির উপরে খানিকটা ছায়া বিস্তার করে। প্রায়ই দেখা যেত শিবের প্রকাণ্ড বুড়ো বলদ, নিশ্চিন্তমনে নিচের তলার অধিবাসীদের পরিত্যক্ত আবর্জনা তরকারির খোসা খেয়ে ঘুরে বেড়াত। নিচের তলায় নানাপ্রকার ব্যবসায়ীর বাসা, একঘর সেকরা দরজি, তেলের গুদাম আরো কত কী। উপরের তলায় সন্ধ্যা হতেই চোখে পড়ত বিচিত্র সাজগোজ করে নর্তকীর দল দোতলার সরু বারান্দায় নানা ভঙ্গিতে পুতুলের মতো বসে। এদের জীবনের ধারা সব অদ্ভুত, বাইরের লোক এদের ঘৃণা করে, যারা এদের বন্ধু তারাও দেখে এদের হীন চোখে। গলির চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে খোলা উঠোনে এসে গলি শেষ হয়েছে, সেই খোলা জমির দুদিক ঘিরে উঠেছে তিনতলা দালান। সেখানে পৌছলে জনসমুদ্রের কথা ভুলে যেতে হয়। বাড়িটি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো। সেই প্রাসাদের মধ্যে তখন চলেছিল বাংলার নতুন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবেশনের পালা। যাঁদের শিশুচিত্তের মধ্য দিয়ে এই নতুন খেলার আয়োজন হচ্ছিল, ভাগ্য তখনো তাদের গড়ছিল অজ্ঞাত লোকে। তাদের মধ্যে একজন তখনো অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিচরণ করছিলেন, যাঁর শক্তির প্রকাশ বাইরের জগতে ছিল

তখনো নিরুদ্ধ, কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে বিচিত্র স্বপ্নলোকে তাঁর অপ্রতিহত গতি জীবনযাত্রার পরিবেষ্টন থেকে অহরহ আহরণ করছিল পাথেয়।

এ-বাড়ি আর ও-বাড়ির জীবনধারা তখন দুই পথে বইছে। মহর্ষিদেবের বাড়িতে চলছে তখন নতুন সৃষ্টির কাজ, সনাতনী প্রথা ও প্রাচীন সংস্কারকে পরিমার্জন করে তৈরি হচ্ছে সভ্যতার নতুন রূপ। সেকালে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সে কেবল ও-বাড়িতেই সম্ভব হয়েছিল। সমাজের পাথরের দেয়াল ভেঙে ফেলে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। তখনকার দিনেও ও-বাড়ির মেয়েরা ঘোড়ায় চেপেছেন স্টেজে নেবেছেন বক্তৃতা দিয়েছেন গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। সমাজ আতঙ্কিত চিত্তে তাকিয়ে থাকত তাদের দিকে একটা উদ্ভট কিছু দেখবার জন্য। তাদের চালচলন সমাজের চোখে তাক লাগিয়ে দিত। শেষে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না করতে পেরে সাধারণ লোকে বলত, "ওঁরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী।" অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের পক্ষে সবই সম্ভব। এই যুগান্তর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত নব সংস্কৃতির এই বিকাশ ঘটেছিল বাংলার একমাত্র পরিবারের মধ্য দিয়ে এবং মেয়ে পুরুষ উভয়ের মিলিত চেষ্টায়। সেই প্রভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে।

এদিকে সৌদামিনী দেবীর সংসারও নতুন-পুরাতনের দোটানায় দোল খাচ্ছিল। এ-বাড়ির গিন্নি সৌদামিনী দেবীর জীবনেও সেই সময় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংসারের চলতি পথে তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে নিয়ে তখন দাঁড়িয়েছেন। সৌদামিনীই তখন তাঁদের একমাত্র অভিভাবিকা। অর্থ থাকলে পরামর্শ দেবার লোকের অভাব হয় না, অনেক আত্মীয়স্বজন গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখালেন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বুদ্ধির গুণে সেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের দূরে ঠেকিয়ে রাখলেন। তার এমন একটি দূরদর্শিতা ও স্থির সংকল্প ছিল সকলেই তাকে মানতে বাধ্য হত। আশ্রিতদের প্রতি তাঁর ছিল তেমনি অসীম স্নেহ। তিনি তখনকার সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী যথার্থই মাতৃমূর্তি ছিলেন। তখনকার দোটানার মধ্যে ছেলেদের তিনি আঁকড়ে রাখতে চাইলেও সম্পূর্ণ আগলানো সম্ভব ছিল না। জ্যাঠামশায়ের বাড়ির প্রভাব এসে পড়ছিল তাদের শিক্ষাদীক্ষায় কিন্তু তখনো একেবারে খসে পড়েনি পুরোনো চালচলন। সৌদামিনীর ঘরে পুজোপার্বনের জের চলেছিল তখনো সমভাবেই, তার মধ্যে বসন্তপঞ্চমী দুর্গোৎসব বেশি করে মনে পড়ে।

প্রতি উৎসবেই মেয়েদের তখন বিশেষ সাজ ছিল। বাসন্তী রঙে ছোপানো কালাপেড়ে শাড়ি-মাথায় ফুলের মালা, কপালে খয়েরের টিপ এই ছিল বসন্তপঞ্চমীর সাজ। দুর্গোৎসবে ছিল রংবেরঙের উজ্জ্বল শাড়ি, গাভরা গয়না ও চন্দনও ফুলের প্রসাধন।

দোলপূর্ণিমারও একটা বিশেষ সাজ ছিল, সে হোলো হালকা মসলিনের শাড়ি, ফুলের গয়না আর আতরগোলাপের গন্ধমাখা মালা। দোলের দিন সাদা মসলিন পরার উদ্দেশ্য ছিল যে আবীরের লাল রং সাদা ফুরফুরে শাড়ির উপর রঙিন বুটি ছড়িয়ে দেবে। শৌখিন লোকেরা তাই সন্ধ্যাকালে ঢাকাই বা শান্তিপুরী ধুতিচাদর আর মেয়েরা ঢাকাই মসলিন পরতেন। দুর্গোৎসব দেখতে যেতেন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। দস্তুরমত লাল বা নীল ঘেরাটোপওয়ালা পালকি চড়ে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হত। প্রতি বাড়ির পালকির ঘেরাটোপের রং ছিল এক-একরকম। জোড়াসাঁকোর ছিল লাল জমি আর হলদে পাড় আর পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির ছিল নীল জমি আর সাদা পাড়। এই ঘেরাটোপের রঙ দেখে বাইরের লোক বুঝতে

পাবুত কোন্ বাড়ির পালকি যাচ্ছে, এমন কি গঙ্গাস্নান করতেও মেয়েরা যেত ঢাকাওয়ালা পালকির ভিতর। সেই অসূর্যম্পশ্যাদের চোবানো হোতো ঘেরাটোপ সুদ্ধ গভীর পবিত্র জলে, পুণ্য অর্জন করা তো চাই। তবে যতই অদ্ভুত লাগুক তখন ওই উড়ে বেহারাদের হুমকি-হুয়ার মধ্যে ভারি একটা রহস্যজনক আনন্দ অনুভব করা যেত, বিশেষত যখন দুর্গোৎসব দেখতে পুজোবাড়ি যেত মেয়েরা, মনে পড়ে পালকির ভিতর থেকে জনতিনেক ছোটো ছোটো মেয়ে সন্তর্পণে পর্দা সরিয়ে রাস্তার চেহারাটা কৌতুকভরে দেখে নিচ্ছে। একপাশে দরওয়ান চলেছে, লাঠি হাতে, মাথায় মস্ত লটকান রঙের পাগড়ি, গলায় সোনার বড়ো বড়ো দানাওয়ালা মালা, ইয়া চাপদাড়ি। একদিকে পুজোয় পাওয়া রঙিন শাড়ি পরনে, হাতে অনন্ত, গলায় মোটা বিছেহার, দর্পভরে বাহু দুলিয়ে চলেছেন, "লিচুর মা", দরওয়ানের সঙ্গে তার গল্প জমেছে বেশ, তারই মাঝে উড়ে বেহারাগুলো তাদের হুমকী-হুয়া স্বর খাদ থেকে পঞ্চমে তুলে গতিকে দ্রুত করছে, তখন ঝিয়ের মুখে বেরিয়ে পড়ছে মধুর সম্ভাষণ "মর মিনসেগুলো এত দৌড়োস কেন?" ওদিকে লিচুর মার মুখঝামটা খেয়ে দরওয়ানের চাপদাড়ি উঠত ফুলে, সেই বা চাল দিতে ছাড়বে কেন, গাল ফুলিয়ে হাঁক দিয়ে উঠত, "সামাল যাও।" ধমক খেয়ে বেহারাদের গতি মন্দ হয়ে আসত, হুমকি-হুয়ার বদলে শুরু হত গালি। মেয়েদের মধ্যে কোনো কৌতুকপ্রিয়া ফিক করে হেসে বলত, "দেখেছিস ভাই, এইবার ওরা ঝিকে গাল দিচ্ছে। লিচুর মা বুঝতেও পারছে না ওদের উড়ে ভাষা কী মজার।" এদিকে চলেছে রংবেরঙের ঘোড়ার গাড়ি, ফিরিওয়ালার টানা স্বরে নানাপ্রকার হাঁক আসত একটা অজানা জগতের সাড়া নিয়ে। তবুও পালকি চড়াটা তখনকার দিনে একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। এই সময় মেয়েরা সর্বসাধারণের সঙ্গে পথে এসে দাঁড়াতে পারত, ঘেরাটোপের ব্যবধানের মধ্যেও একটা মুক্তির স্বাদে উঠত তাদের মন ভরে। কৌতূহলবশত পর্দা বেশি সরালেই দাসীর ধমক খেতে হত "কাণ্ড দেখো মেয়েদের, গাভরা গয়না রাস্তার লোকগুলো সব দেখে ফেলুক", ঝি পর্দা বন্ধ করে দিত, তখন 'মোরা যে তিমিরে মোরা সে তিমিরে।' কেবল রাস্তার লোকের পায়ের আওয়াজ আর ছোটেখাটো টুকিটাকি গল্পগুজব, নানা ছবি মনে আনত। এমনি করে জনসমুদ্র পার হয়ে পূজাবাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে পালকি এসে নামত উঠানে। আরতির বেলা তখন শুরু হয়েছে, অষ্টমীপূজার হৈ হৈ চলছে পূজার দালানে, নাটমন্দিরে বাজছে সানাই। এরি মধ্যে আরো কত দর্শক এসেছে, প্রত্যেকের দৃষ্টি প্রত্যেকের গয়না-কাপড়ের দিকে। প্রতিমার সামনে বসল সব ছেলেমেয়ের দল। পুরোহিত এক হাতে প্রকাণ্ড গাছপ্রদীপ আর এক হাতে সাদা চামর নিয়ে শুরু করলেন আরতি। তারি সঙ্গে কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ, কানে তালা লাগাবার জোগাড়। তার পর মায়ের প্রসাদী বাতাসা ছেলেমেয়েদের হাতে বিলোনো হত, সন্তুষ্টমনে শিশুরা তাই নিয়ে পালকি চড়ে বাড়ি ফিরত। রাস্তায় তখন গ্যাসের মিটমিটে আলো জ্বলছে, তারি আবছায়াতে মানুষ ভালো করে নজরে পড়ে না, কাজেই পর্দা ফাঁক থাকলে দাসী আপত্তি করত না। এই সুযোগে ঘেরাটোপের বন্ধন এড়িয়ে খোলা হাওয়াতে নিশ্বাস ফেলে বাঁচত তারা।

এই সব দিন অনেক কালের স্বপ্নের মতো ঝাপসা হয়ে এসেছিল এমন সময় হঠাৎ দেখা হল মামার সঙ্গে, মনে পড়ে গেল সেই সব দিন—জিজ্ঞাসা করলুম, "বলো তো মামা, তোমার ছোটবেলার গল্প, কেমন করে তুমি আর্টিস্ট তৈরী হলে, লোকে বলে দাদামশায় তোমার জন্য বড়ো বড়ো মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন তোমাকে আর্টিস্ট করে তুলবেন বলে।"

মামা বললেন, "লোকের ভুল ধারণা, শুনিস কেন? তাঁদের কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না যে আমি আর্টিস্ট হই। হাল আমলের বাপমায়ের মতো নানা শিক্ষাপদ্ধতির চিন্তা করে ছেলেকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার কথা কোনো চেষ্টা তাঁরা করেননি। বাবার শখ ছিল বাগানের, তিনি একখানা মস্ত বাগান তৈরী করেছিলেন। তাঁর মাথায় সব সময় কিছু-না-কিছু গড়ার প্ল্যান ঘুরত। পশুপক্ষী ভালোবাসতেন তাই তাদের পুষেছিলেন, আমরা ছেলেরা ছিলুম তাদের শামিল হয়ে। গাছপালার মধ্যে ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতুম— কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুই করিনি। বাবার রং তুলি পেনসিল চুরি করে ছবি আঁকতুম। পটুয়া হবার বাসনা বা কল্পনা কিছুমাত্র সে-সময় মনে ছিল না, সে শুধু ছোটো ছেলের শখ। তবে দেখতুম, চারিদিক দেখেছি তুই চোখ ভরে—অপর পারের গাছগুলো, লাল ছোটো জানলাওয়ালা বাড়ি, ঝাপসা হয়ে আসত গোধূলির ধূসরতায়, ঘাটের উপর ছায়া আসত নেমে, জলের রঙ হয়ে আসত কালো, তার পর এক-একটি করে বাতি জ্বলে উঠত, গাছের ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ উঠত বেজে, তখন তাকিয়ে থাকতুম। এই দেখাই ছিল আমার শিশুকালের একান্ত আকর্ষণ—গাছপালা পশুপক্ষীকে অনুরাগ নিয়ে দেখতুম, জানতে চাইতুম।

"চাঁপদানির বাগানবাড়ি এই হিসাবে আমার মনের খোরাক জুগিয়েছিল।

"একটি টাট্টু ঘোড়া আর ফিটিন গাড়ি, এই নিয়ে রোজ যেতুম বেড়াতে। প্রতিদিন কুমোরের বাড়ি গিয়ে মাটির বাসন তৈরী দেখে আসতুম। তাদের চাক ঘুরিয়ে যখন মাটির গড়ন তুলত, তখন আমার ভারি মজা লাগত, ইচ্ছে করত, অমনি করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমিই বা না কেন মনের মত ঘটিবাটি তৈরী করব। তাই দেখতে রোজ ছুটতুম কুমোরবাড়ি। পথে উতোরপাড়ার মুখুজ্যেদের জুড়ি প্রায়ই আমার গাড়ির পাশপাশি এসে মিলত, মুখুজ্যে হাঁক দিয়ে বলতেন, কার গাড়ি যায়, কার ছেলে? আমার সহিস বলে উঠত জোড়াসাঁকোর গুন্নুঠাকুরের বাড়ির। টগবগ টগবগ করতে করতে মুখুজ্যের তেজী জুড়ি তীরের মতো পাশ কাটিয়ে চলে যেত, আমার নধরদেহ টাট্টু বেচারা তার দাপটের পাশে খাটো হয়ে পড়ত।

"বাবামশায় তুটি সাউথ আমেরিকান বাঁদর পুষেছিলেন, ছোট্টো পশমের পুতুলের মতো তুটি প্রাণী। তাদের জন্য নানারকম ফল আসত নিউমার্কেট থেকে, তারা আরাম করে সেই ফলগুলি খেত। আমার ভারি হিংসে হোতো তাদের দেখে।

"আর বাবার কামিনী কুকুরটাও ছিল তেমনি বাবু—তাকে চান করিয়ে, লোমগুলো আঁচড়ে পাউডার আতর মাখিয়ে ছেড়ে দিত। সে আমাদের কেয়ার করত না। বাবা মশায়ের সোফার উপর বেশ আরামে বসে থাকত। সে ছিল জাপানী পুড্‌ল, আর হরিণের নাম ছিল গোলাপী, বাগানের কচি ঘাস খেয়ে সে ঘুরে বেড়াত।

"কাকের ডাকে সকালের আকাশ যখন ঘোলা হয়ে এসেছে ঝোটনওয়ালা কাকাতুয়া লম্বা শিক বেয়ে উপরে উঠে কাক তাড়িয়ে আসত ছাদে। তার পর চলে যেত যেখানে মা পান সাজতে বসেছেন। সেখানে গিয়ে পানের বোঁটা খেয়ে ঝোটন ফুলিয়ে পিসিমাদের হাতের সন্দেশ খেত তার পর সকলের আদর কুড়িয়ে ফিরে যেত বাবামশায়ের টেবিলে। এদের যত্ন-আদর আমাদের চেয়ে বেশি ছিল তো কম নয়। বাবা ছিলেন শৌখিন লোক। ছোটোবেলা থেকেই দেখতুম তাঁর প্ল্যান করা বাতিক। জ্যোতিকাকামশায়ের সঙ্গে কলকাতায় তখনকার আর্ট স্কুলে ড্রইং শিখেছিলেন তার পর নিজের ইচ্ছেমত শখ করে আঁকতেন। আসলে

বাড়িঘর সাজানো, বাগান তৈরী, এই সব ছিল তার শখ। নানাপ্রকার প্ল্যান করতে তিনি আনন্দ পেতেন। পশুপক্ষী খুবই ভালোবাসতেন, তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানবারও তাঁর রীতিমত আগ্রহ ছিল। রথীর বাগান তৈরির শখ দেখে বাবামশায়কে আমার মনে পড়ে। তাঁর টেবিলের উপর ক্যানারি পাখি এবং অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্যমূলক বই দেখতে পেতুম। দুষ্প্রাপ্য গাছের সন্ধান পেলেই সেটি তাঁর বাগানে আনা চাই। কৃষিপ্রদর্শনীতে সেখানে একটি বিশেষ দুর্লভ গাছ দেখে তার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তখনি ক্যাটলগ খোঁজ কোরে দেখলেন তার দাম পাঁচশো টাকা। তাই সই। পাঁচশো টাকার উপর নিজের নাম সই করে রেখে এলেন। তিনি চলে আসবার পর তখনকার দিনের ছোটোলাট সেই একজিবিশন দেখতে যাঁন। এই গাছটির দিকে নজর পড়তেই তিনিও সেটি কিনতে চাইলেন। সেক্রেটারি বললেন, এটি এরি মধ্যে বিক্রী হয়ে গেছে। সাহেব তো অবাক্। তখনকার দিনে বাংলাদেশে গাছের প্রতি অনুরাগী এমন মানুষটি কে, তাঁকে জানবার জন্য সাহেব কৌতূহলী হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি গুণেন্দ্রনাথ। পরদিন বাবামশায়ের কাছে সাহেবের চিঠি এসে হাজির—সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এদিকে গাছ একজিবিশন থেকে ঘরে এনে গাছঘরে সাজানো হয়েছে।

"বাবামশায় চিঠি পেয়ে তাঁর দুই ভগ্নীপতিকে ডেকে বললেন 'ওহে নীলকমল, যোগেশ, দেখো তো কী ব্যাপার, লাটসাহেব দেখা করতে আসতে চান, বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল, একটু চায়ের ব্যবস্থা ঠিক রেখো।' লাটসাহেবের চিঠির উত্তরে তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ পাঠান হোলো।

"মনে পড়ে লাট ঘোড়ায় চেপে বেলভিডিয়ার থেকে এসেছিলেন জোড়াসাঁকোয়, কোনো 'ফর্মালিটি' ছিল না। এখনকার আর তখনকার রাজপুরুষদের সঙ্গে এই ছিল পার্থক্য। সাহেবকে চা খাইয়ে বাবা-মশায় গাছঘরে নিয়ে গেলেন, গাছটির উপর লাটসাহেবের এত বেশি টান দেখে সেটি তাঁকেই উপহার দিয়ে পাঠালেন।

"তখনকার দিনের সংসারযাত্রার আরো একটি ছবি মনে পড়ে। সেটি হোলো চাকরবাকরদের। তারা যেন বাবুদেরই শামিল ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের এক-একটি পরিবেশ থাকত আর অন্দরে দাসীদেরও ছিল একটি মজলিশ। পরিবারের মধ্যে এদের প্রত্যেকেরই একটি করে নিজস্ব স্থান। তাদের মধ্যে অনেকেরি ক্যারেক্টার এখনো মনে পড়ে। ঝিদের মধ্যে কেউ ছিল কলহকুশলা, কেউ বা রসিকা, কেউ বা ছিল স্নিগ্ধস্বভাব, এখন মনে করলে ভারি মজা লাগে। চাকরদের দল জমাত তোষাখানায়। সেখানে ছিল বাবুদের অনুকরণে তাদের তাসের আড্ডা। বাবামশায়ের বিপিন চাকর ছিল বেজায় বাবু। বাবুর যা-কিছু অভ্যাস সব সে নকল করতে পারত। তোষাখানায় তাসের আসর জমত, সেই সঙ্গে বাবুদের রুপোর গেলাস-বাটি নিয়ে চা-শরবতের ব্যবস্থা বেশ আরাম করেই করত। বুদ্ধু বলে বাবামশায়ের আর এক পেয়ারের চাকর, সে যেখানেই ল্যাভেণ্ডার-মাখানো রুমাল পেত বাবার রুমাল ভেবে আলমারিতে তুলে রাখত।

"অন্যদিকে দেউড়িতে ভোজপুরী দরওয়ানের আর একটি আড্ডা। সে জায়গাটিও ছিল ভারি মজার। প্রধান জমাদারের নাম মনোহর সিং, আর সব ছিল তার সাঙ্গোপাঙ্গ। তার চেহারাটি ছিল লম্বা গৌরবর্ণ এবং সুদীর্ঘ দাড়ি দেখলে রণজিৎ সিং বলেই ভ্রম হত। সে রোজ দই মাখিয়ে দুবেলা তার দাড়ি সাফ

করত, দেখে আমার ছেলে-বুদ্ধিতে একদিন খপ করে দাড়ি ছুঁয়ে ফেলেছিলুম। আর মনোহর সিং গর্জন করে তলোয়ার রুখেছিল। আমি তো ভোঁ দৌড় তেতলায়। তার পর তিনদিন মনোহর সিং আমাদের সিঁড়ি নাবতে দেয়নি। নিচের সিঁড়িতে এসে উঁকি মারলেই মনোহর তলোয়ার দেখিয়ে গর্জে উঠত, আর আমি দৌড় দিতুম উপরের দিকে।

"কোচোয়ান-সহিসের আস্তাবলের ছিল আর এক চেহারা। বিকেল হলেই ঘোড়া বের ক'রে সামনের উঠনে দৌড় করাত, যখন চাবুকের এক-এক ঘায়ে চক্রবৎ দৌড়ে বেড়াত তখন কী তেজ তার, যেন পক্ষীরাজ। তাদের গাড়িতে জুড়ে শমসের কোচোয়ানকে দাঁড়িয়ে হাঁকাতে হত। তার পর সেই গাড়ি করে বাবামশায়ের সঙ্গে কোন্নগরের বাগানে রওনা হতুম। সেখানে গিয়ে বাবুরা তাস খেলতে বসতেন, আমি চাকরদের সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াতুম। ঠিক সামনেই ওপারে পেনিটির বাগানে তখন রবিকাকা জ্যোতিকাকা মশায়েরা থাকেন। বাবামশায় জ্যোতিকাকামশায়কে কোন্নগরের বাগান থেকে বন্দুকের আওয়াজ করে সিগনলে কথা বলতেন। আবার জ্যোতিকাকামশায়ও প্রত্যুত্তর বন্দুকের আওয়াজেই পাঠাতেন। কিন্তু ধাক্কা সইতে হত আমাকে। আমার কাঁধের উপর বন্দুক রেখে বাবামশায় অনেক সময় বন্দুক ছুঁড়তেন, আমাকে সাহসী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কাঁধের উপর বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ বেরোত, কানের কাছ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যেত, গালের পাশ দিয়ে। টুঁ শব্দ করবার জো ছিল না কিন্তু। তার পর সাঁতারও বাবামশায়ের ছিল একটা আনন্দ, সাঁতরে গঙ্গা এপার-ওপার হতেন। আমাকে সাঁতার শেখাবার জন্য চাকরকে বলতেন গামছা কোমরে বেঁধে ছুড়ে পুকুরে ফেলে দিতে, যাতে সাঁতার শেখা আমার পক্ষে সহজ হয়। মা আর পিসিমারা এই সব দেখে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন, ছেলেটা কোন্‌দিন বেঘোরে প্রাণ হারাবে এই ছিল তাদের উদ্বেগ। তাদের কাতর আবেদনে আমার উপর বাবামশায়ের এই সব শিক্ষার চাপ শিথিল হয়ে এল।

"এই কোন্নগরের বাগানে শিশুকাল আনন্দে কাটিয়েছি, বহুরূপীর নাচ দেখে, পোষা কাঠবিড়ালীর ছানা নিয়ে, খবরের কাগজের নৌকো ভাসিয়ে। স্নানযাত্রায় তখন হত ভারি ধুম। রাতের গতি দিনের গতি বয়ে চলেছে, শত শত নৌকো বজরার সে দৃশ্য এখনো মনে পড়ে শিশুজীবনের সে দিনগুলো ভুলবার নয়।

"আমার বয়স তখন নয়, এই সময় চাঁপদানির বাগানবাড়িতে একদিন যখন আমরা আরামে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলুম এমন সময় এল এক ভয়ংকর দুঃখের রাত্তির। সে যেন কালজ্যৈষ্ঠের কালো মেঘ আমার মায়ের এবং আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে নিমেষেই শেষ হয়ে গেল, বাবার হঠাৎ মৃত্যু হোলো। বড় আঘাত পেয়েছিলেন মা। তার পরদিন কোথায় কী হোলো জানি না কিছু বুঝতেও পারলুম না। দেখলুম সকলে মিলে মায়ের বেশ পরিবর্তন করিয়ে দিলে। মা সেদিন থেকে পরলেন শুভ্র বসন। অল্প বয়সে তাঁর এই সাজ পরিবর্তন আমার শিশুমনে কী যে ব্যথার স্পর্শ দিয়েছিল এখনো তা মনের কোণে থেকে গেছে, তারি দরদ মিশিয়ে পরিণত বয়সে একদিন এঁকেছিলুম মায়ের বৈধব্যমূর্তি।

"এই ঘটনার দু-একদিন পরেই আমরা বাগানবাড়ি ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলুম। বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় মা চোখের জল মুছে আমাদের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, জীবনে মদ যেন না খাই। সেই যে বাগান ত্যাগ করে চলে এসেছিলুম আর সেমুখো কখনো হইনি। সেই সাধের

চাঁপদানির বাগানের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। সেখানকার সুন্দর সুন্দর জীবজন্তুগুলো, সেই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পার্শিয়ান হাউণ্ড সম্বার, হরিণ তাদের যে কী গতি হোলো বলতে পারি না। শহরের স্কুল-কলেজের পড়াশুনা আরম্ভ করে স্বপ্নের মতো সেখানকার জীবন ভুলে গেলুম। মা বোধ হয় সেখানে আর কখন ফিরবেন না বলে, সেখানকার প্রাণীগুলোকে বন্ধুবান্ধবমহলে বিলি করে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ির সামান্যমাত্র স্মৃতি এমন কী আসবাবপত্রও মায়ের মনকে গভীরভাবে পীড়া দিত। যাই হোক, সেই সব জিনিসপত্তর আর পোষা প্রাণীগুলোর খোঁজ আমরা আর কখনো করিনি। তখনকার দিনের জীবনের এবং পরবর্তী দিনের মধ্যে একটা যেন পর্দা পড়ে গেল।

"সতেরো বৎসরে পড়তেই মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। পড়ছিলুম সংস্কৃত কলেজে, বিয়ের পরেই পড়া ছেড়ে দিলুম। ছবি আঁকায় একটু হাত আছে দেখে মেজজ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কুমুদ চৌধুরীকে বলে আমার জন্য আর্ট টিচার ঠিক করে দিলেন। তিনি ছিলেন ইটালিয়ান, তাঁর নাম মিস্টার গিলহার্ডি। এই-রূপে আমার জীবনে শিল্পশিক্ষার গোড়াপত্তন হোলো। বিয়ের পর থেকেই লেখাপড়া কলেজ-জীবন শেষ শেষ হয়ে গেল, এল গানবাজনা, নাচ দেখবার ঝোঁক, তাই নিয়ে থাকতুম মশগুল হয়ে। তারই সঙ্গে চলত চিত্রবিদ্যার চর্চা। এইসময় নানা প্রকারের ভাবালুতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছি। দেখতুম মা অনেক সময় ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন কিন্তু তাঁর আশীর্বাদে জীবনস্রোত বিপথে যায়নি।"

"মামা, তোমার গল্প শুনে মনে পড়ছে সেই ছেলেবেলার কথা সেই যখন বসন্তের সুন্দর সকালে দোলের উৎসব শুরু হয়েছে সেদিন বড়ো ছোটো সকলে মিলে তোমাদের লালে লাল হবার দিন ছিল। আবীরের পুকুর বানানো হয়েছে তার উপর পিচকিরি ছোঁড়া হচ্ছে ফোয়ারার মতো, আত্মীয়স্বজন অনেক এসে জুটত, সেদিনকার উৎসবে অবারিত দ্বার। ছোট ছেলেরা নিজেদের মধ্যে খেলত আবীর। তার পর যেত দপ্তরখানায় সেখানে আধাবয়সী রামলালদাদা চোখে চশমা এঁটে মাথা হেঁট করে হিসাব কষতে নিবিষ্ট। তিনি ছিলেন বাড়ির পুরোনো দেওয়ান, সেকালের কর্মনিষ্ঠা ও প্রভুভক্তির প্রতীক। ছেলেদের হাত থেকে সেদিন তাঁর নিস্তার ছিল না। মাথার টাকটি পর্যন্ত সেদিন তার আবীরে লাল হয়ে উঠত আর বাজেখরচের খাতা ভরে উঠত দুই আনার লম্বা ফর্দে। ছেলেমেয়েরা আবীরে তাঁকে চুবোত। রামলাল দাদা শেষে নিরুপায় হয়ে সাবধানে খাতাপত্র সরিয়ে ফেলতেন, ছেলেদের হাতে খেলনা ও লজেন্স কিনবার জরিমানা দিয়ে তবে সেদিনের মতো বেচারি নিস্তার পেতেন। এইরকম সব উৎসবের দিনে দেখতুম তোমাদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর বা গোপাল উড়ের যাত্রা প্রায়ই হোতো। ছেলেদের মেয়াদ ছিল রাত নটা পর্যন্ত, তার পর তাদের শুতে যাবার হুকুম। কিন্তু যাত্রা চলত সমস্ত রাত। এ-সব জিনিস তখন ছোটো ছেলেমেয়েদের দেখা নিষিদ্ধ ছিল। ছেলেরা কেবলমাত্র যাত্রার দলের বিচিত্র সাজ আর দাড়িগোঁফ জটাজুট এই সব দেখেই সন্তুষ্ট থাকত, সেটা দেখাও ছিল তাদের মস্ত মজা। বাইজীর নাচগান শোনাও তখনকার দিনের শৌখিন লোকেদের বিলাসিতার একটা অঙ্গ ছিল। এই নৃত্যগীত উপভোগ করার জন্য তাঁরা বহুব্যয়ে দিল্লী থেকে বাইজী আনাতেন। বিশেষত শারদীয়া পূজায় তারই মহড়া চলত রাতভোর। বিজয়াদশমীর ভাসানের পালা শেষ হলে শুরু হত কোলাকুলি আর প্রণামের পালা, আর তারি সঙ্গে জলযোগ, গোলাপজলের গন্ধযুক্ত সিদ্ধির শরবত। মনে পড়ে একটা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে আসর সাজানো হয়েছে। নানাপ্রকার ফুলেতে আলোতে বাড়িটা যেন ঝকঝক করছে। বাইজী যারা এসেছেন তারা সকলেই সংগীতবিশারদ, হিন্দুস্থানী সংগীতে তাঁরা সকলেই

সুদক্ষ। তাদের সঙ্গে তিনজন করে ভেড়ুয়া থাকত তাদের কাজ ছিল নাচ ও গানের সঙ্গে সংগত করা। আদবকায়দায় এঁরা সকলেই দুরস্ত, মুসলমানী ভদ্রতা দস্তুরমাফিক রক্ষা করে চলতেন। তাদের পেশা বাদ দিয়ে যদি ব্যক্তিকে দেখা যায় তবে বলতেই হবে অনেকেই তাঁদের মধ্যে গুণী ছিলেন। শ্রীজান বাই এবং সরস্বতীর নাম তখন প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু শুনেছি তাঁদের মধ্যে কেউই সুন্দরী ছিলেন না। গলার দরদই তাদের সঙ্গীতজ্ঞ-মহলে সুপরিচিত করেছিল। গল্প শোনা যায় সরস্বতীর গানের মহড়া যখন বসত, পদের প্রথমাংশ গেয়েই তিনি শ্রোতাদের এত মুগ্ধ করে রাখতেন যে পূর্বদিন রাত দশটায় গানের যে পদ শুরু হত ভোর হয়ে যেত নাকি তার শেষ পদে পৌঁছতে। শ্রীজান শেষ জীবনে শুনেছি সমস্ত সম্পত্তি গরিবদের দান করে মক্কা চলে গিয়েছিল।

"এই সব গানবাজনার মজলিশ কেবল বড়োদেরই জন্য, বউঝিরা জালের পর্দার অন্তরালে বসে অন্দর থেকে গান শোনবার আদেশ শাশুড়ির কাছ থেকে পূর্বেই নিয়ে রাখতেন। গভীর রাতে ছেলেদের কৌতূহলী মন ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠত যখন বৈঠকখানা থেকে নুপূরের আওয়াজের সঙ্গে মিলে ভারি গলার উত্তেজিত "বাহবা" ধ্বনিতে নিদ্রার ব্যাঘাত করত। মজলিশের আবহাওয়া দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত কোরো তুলত, ক্রমে বাইজীর গলার পরজের সুর বাগেশ্রী থেকে ভৈরবীতে গিয়ে পৌঁছত, বোধ হয় আকাশে তখন উঠত শুকতারা, সুর যদিও তখন প্রাণের ক্লান্তিকে ছাপিয়ে রেখেছে তবুও ভাঙতে হত মজলিশের পালা—তখনো আবহাওয়াতে বাজতে থাকতো সুরের আমেজ, আর বাসি ফুলের ফিকে গন্ধে মজলিশের ঘর থাকত ভারাক্রান্ত হয়ে।

"কত দোল, কত উৎসবের বিচিত্র দিন এসেছে এই তোমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আজও তার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে সেকালের কত কথা কত কাহিনীর স্মৃতিই না জড়ানো। সংগীত সাহিত্য শিল্পে একদিন যে গৃহ ছিল পরিপূর্ণ আজ তার সমস্ত দীপ নিবিয়ে দিয়ে গুণীরা চলে গেছেন। সেই হাস্যমুখরিত সংগীতনন্দিত দালান তোমাদের রসানুভূতির স্মৃতি বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন, "সেদিন চলে গেছে, সে আর ফিরবে না। তোরা জানিস না, কী করেই বা জানবি, কী গভীর পিপাসা আমাদের যুবক-চিত্তকে সব সময় উন্মুখ করে রাখত যে মজলিশের আভাস তোর ছেলেবেলার স্মৃতিতে ছায়া ফেলে গেছে তার জের তখন আসছে ক্ষীণ হয়ে। ওর হাসবা দিক মনকে নাড়া দিত না, কিন্তু গান শোনবার আনন্দ এই সব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়েই আমরা পেয়েছি। তখনকার দিনে এই উৎসবগুলিই ছিল কলারসোপভোগের পথ।

"যদিও বনেদী ঘরের ভালো মন্দ নানা প্রথার ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছি তবু তখনকার দিনে অন্য ধনীপরিবার থেকে আমাদের বাড়ির আবহাওয়ার বিশেষত্ব ছিল এই যে জ্ঞানচর্চা সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুণ নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণ করবার রুচি তৈরি হয়েছিল।

"নাটোরের মহারাজার সঙ্গে এই সময় আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রায় তার বাড়িতে নাচগানের আসরে আমাদের নিমন্ত্রণ হত। এসব আসরে রবিকাকাও কখনো কখনো নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। তখন সংগীতের পিপাসা মনে এত জেগেছিল যে ভালো গান শুনবার জন্য মন সর্বদাই উৎসুক থাকত; আর হাতে চলত ছবির স্কেচ, স্কেচের পর স্কেচ করে গেছি। এই সময় থেকেই রবিকাকার উৎসাহে স্বপ্নপ্রয়াণ, চিত্রাঙ্গদা এইসব থেকে ছবি এঁকেছি। তখন নতুনকে পাবার জন্য নতুন কিছু আবিষ্কার করবার জন্য মন সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকত।

"নাটোরের মহারাজার বাড়ি একদিন নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ হোলো। একটি তরুণী সুন্দরীর নৃত্য শুরু হোলো প্রথমে। তার নাচের কেরামতি ছিল চমৎকার। কিন্তু দেখলুম তার সঙ্গে একটি বয়স্কা মহিলা। খবর পাওয়া গেল এই মহিলাটি নর্তকীর মা। কন্যার নৃত্যশিক্ষা নাকি মায়ের কাছেই। নাটোরকে বললেম, মেয়ে যখন এত পারদর্শী মা না জানি কী হবে—একবার বলুন না ওকেই নাচতে। নর্তকীর মায়ের বয়স তখন যৌবনের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তাকে নাচের অনুরোধ করাতে সে বললে, সে তো নাচের সাজ আনেনি। তবে আমাদের অনুরোধে মেয়ের যা সাজ ছিল তাই পরে সে উঠে দাঁড়াল। কী তার গতি—পা যেন তার পড়ল না মাটিতে, যেন সে চলেছে হাওয়াতে। সে যে বয়স্কা, সে যে সুশ্রী নয় এ-কথা ভুলে যেতে হোলো। শুধু তার পায়ের গতি আর দেহের চোখের সামনে চিত্রলোক তৈরী করে তুলল। সেই বয়স্কা মহিলার নাচ সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এই হল সত্যিকার আর্ট। কালের স্রোতে দেহ তার রূপ হারিয়েছে কিন্তু আর্ট তখনো আছে বেঁচে, তারই আবেদন দিয়ে সে জ্বালিয়েছিল সেদিনের বাতি। সেই দেখে বুঝেছিলুম যার ভিতর আর্ট থাকে তার শক্তি কতখানি।

"এই সময় শ্যামসুন্দরবাবু এসে একদিন খবর দিলেন, কাশী থেকে এক গাইয়ে এসেছে, নাম সরস্বতী বাই। যদি গান শুনতে চান তবে একদিন সন্ধ্যায় আয়োজন করতে পারেন কিন্তু নেবে তিনশো টাকা। কাশীতে গেলে পঁচিশ টাকা ফেললে গান শোনা যেত। কিন্তু এমন সুযোগ আর নাও হতে পারে। গানের পিপাসা মনে ছিল প্রবল। শ্যামসুন্দরকে হুকুম দিয়ে ফেললুম, বহুত আচ্ছা, তিনশো টাকাই সই। আমাদের নাচঘরে আসর সাজানো হোলো। আগাগোড়া সাদা ফরাস পাতা, সাদা তাকিয়া ছড়ানো। কড়িকাঠের উপর ঝাড়লণ্ঠনের আলো আর দেয়ালে দেয়ালগিরি। নাটোরের রাজা এসেছেন, রবিকাকা এসেছেন আর এসেছেন দীপুদাদা। সরস্বতী বাই যখন ঘরে ঢুকল তখন সকলের চক্ষু স্থির। সভার অনেকেই আস্তে আস্তে তাকিয়া টেনে নিয়ে গালে হাত দিয়ে আড়চোখে চাইতে লাগলেন। নাটোর নেপথ্যে আমাকে ডেকে বললেন "অবনদা করেছ কী, এই লোক কী নাচবে গাইবে, এ যে একেবারে মাংসপিণ্ড।" আমরা যা কল্পনা করেছিলুম সব উবে গেল। নৃত্যের আঙ্গিকে সে খুব পটু, তবুও দেহের স্থূলতার দরুন নৃত্যের দিক্ থেকে বিশেষ সুবিধা হোলো না। নাটোর বললেন, ওকে বসে গাইতে বলো, আমি পাখোয়াজ বাজাব। এইবার সরস্বতী বসে গান ধরলে। বলব কী, প্রথম পদ গাইতে সকলের তাক লেগে গেল। নাটোর পাখোয়াজ খুব মিঠে তালে বাজিয়ে গেলেন। আমি বললুম, পছন্দ হোলো তো? আপনি যে প্রথম দৃষ্টিতেই একেবারে দমে গিয়েছিলেন। নাটোর নীরব। এক গানে সে কাবার করে দিলে দুপুর রাত, সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল।

"রবিকাকাও শুনেছিলেন তার গান, তারিফ করেছিলেন গলা। সকলে আমাকে বললে, একটা গান ফরমাশ করো। ফরমাশ করি কী করে? গাইয়ে যখন নিজের গানে মশগুল হয়ে যায় তখন কী তাকে ফরমাশ করা চলে? সকলের অনুরোধে একটা ভজন গান শুরু হোলো—'আও তো ব্রজচন্দ্র লাল।' সকলে চুপ, আমি ছবি এঁকে চলেছি, কী আঁকছি তা জানিনা—সুর আঁকছি কী গায়িকাকে আঁকছি—সুরকে বাদ দিলে তো গায়িকার দিকে তাকানো যায় না; কিন্তু তার কণ্ঠ কুৎসিতকেই এমন অভিনব করে তুলেছিল যে তার বাইরের কুরূপকে ভুলে যেতে হোলো এই এক গানেই। ঢং ঢং করে রাত দুপুর বাজল, শেষ হোলো গান।

"এমনি সুরের নেশায় আর একদিন এক বীনকারকে সোনার বালা বকশিস দিয়ে ফেলেছিলুম। সে যে কী বীণা বাজাল, ও রকম আর শুনলুম না। দক্ষিণ দেশের শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে বীনকার ছিল সে।

গান ভালোবসেছি চিরকাল, আজও সেই আকর্ষণ সমান আছে, বিশেষ করে রবিকাকার গান আমার মনে বিশেষ করে ছাপ দিয়েছে, কতবার তাঁর গান নিয়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছি তর্ক করেছি। তিনি গানের মধ্যে যে সম্পদ রেখে গেছেন তার মূল্য কজনেই বা বুঝবে, এক-একটি গানের সুরের মধ্যে কথার মধ্যে সেই মানুষ বেঁচে রয়েছে। শুধু রিসার্চ করে এ জিনিস কী লোকে বোঝাতে পারবে। এই তোদের মেয়েদের গলা যখন শুনি তখন মনে হয় পাখির কণ্ঠ। সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার পথে কী একটা ভারি মিষ্টি ফুলের গন্ধ পেলুম, কে যেন বললে পারসিয়ান লাইলক ফুটেছে। সেই গন্ধের সঙ্গে :এই গানের সুরের কিছু কি প্রভেদ আছে। ছবির দিক্ দিয়ে কতটুকুই বা আমি দিতে পেরেছি, কিন্তু রবিকাকা গানের মধ্যে দিয়ে সুরের কথার যে অম্লান মালা রচনা করে গিয়েছেন তার তুলনা কোথাও তো খুঁজে পাইনে। এই দুঃখই কেবল জাগে যে, গাইতে পারি না। এই সব গান যা শুনে শুনে ফুরোতে পারিনে তাদের উপভোগের দিনরাত্রি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল আমার।"

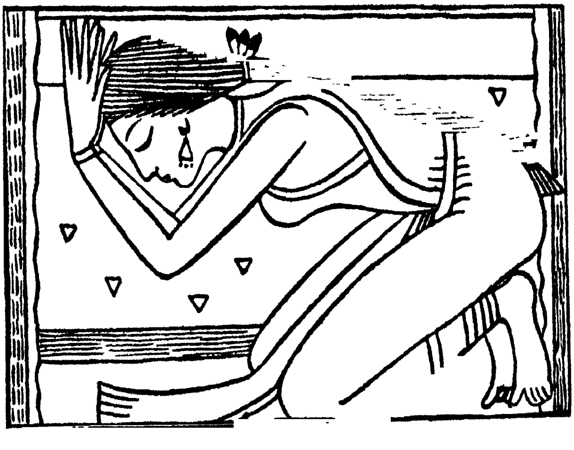

নন্দলাল বসু

অশোকের ধর্মনীতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

১

এ-কথা বলা বাহুল্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে ধর্মসম্প্রদায়গত ; এই সমস্যার শৈলশিখরে আহত হয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনতরী শতধা খণ্ডিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই বিষম সমস্যার সমাধান করতে হলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের ধর্মবিষয়ক অবস্থার ঐতিহাসিক আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ও-বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের অবলম্বিত ধর্মনীতির আদর্শ আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে, এ প্রবন্ধে শুধু সে সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নরপতি হচ্ছেন অশোক, এ-কথা আজ সর্ববাদিস্বীকৃত। প্রাগাধুনিক যুগে গৌতম বুদ্ধ বাদে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করেছেন এবং গৌতম বুদ্ধকেও অশোকই বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, এ-কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। বৌদ্ধদের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্বই অশোককে শ্রেষ্ঠতা দান করেছে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিশ্বাসের অনুকূল নয়। বরং অশোকই স্বীয় মহত্ত্বের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। যে মহাপ্রাণ তার প্রেরণায় দিগ্‌বিজয়লিপ্সু অশোক কলিঙ্গ-যুদ্ধে জয়লাভের পর চিরকালের জন্য অস্ত্রত্যাগ করলেন, সে মহাপ্রাণতা তিনি বৌদ্ধধর্মের কাছে পাননি। কেননা, সে ঘটনা হচ্ছে তাঁর বৌদ্ধধর্ম-গ্রহণের পূর্ববর্তী। বরং এ-কথাই সত্য যে, ওই মহানুভবতার আবেগে অশোক যেদিন বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করলেন সেদিন থেকেই উক্ত ধর্ম নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। কেননা, অশোকের পূর্বে ও-ধর্ম ক্রম-বিস্তারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সুতরাং এই হিসাবে অশোককে যদি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায়, তাহলে বোধকরি কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে উপলক্ষ্য করে ভারতবর্ষের গৌরবকে জগতের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এইটেই যে অশোকের শ্রেষ্ঠতা-স্বীকৃতির একমাত্র কারণ, তা নয়। বস্তুত অশোকের মহত্ত্ব ছিল বহুমুখী এবং তাঁর প্রতিভার এই বহুমুখীনতাও আজ একবাক্যে স্বীকৃত। এ-সব কারণে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমহলে অশোক সম্বন্ধে যত বিস্তৃত ও বিচিত্র রকম আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে ভারতবর্ষের আর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে তা হয়নি। কিন্তু তথাপি অশোকের চরিত্র তথা রাজনীতি সম্বন্ধে গবেষণার বহু অবকাশ এখনও রয়েছে। কেননা, এই আশ্চর্য মানুষটির চরিত্র, নীতি ও কার্যকলাপের মর্মার্থ এখনও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয়নি, এ-কথা মনে করার হেতু আছে। আমার মনে হয় তাঁর অবলম্বিত ধর্মনীতি (religious policy) সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অশোকের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য যেমন নীরব, বৌদ্ধসাহিত্য তেমনি মুখর। এক পক্ষের অতিনীরবতা এবং অপর পক্ষের অতিমুখরতা, কোনোটাই নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানের

সহায়ক নয়। সৌভাগ্যবশত অশোক নিজেই আমাদের জন্য অনেকগুলি শিলালিপি রেখে গিয়েছেন। এই শিলালিপিগুলিকে এক হিসাবে অশোকের আত্মজীবনী বলে মনে করা যেতে পারে এবং অশোকের আধুনিক জীবনীকারদেরও প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ওই লিপিগুলি। এগুলি থেকে অশোকের ধর্মনীতির আদর্শ সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাই হচ্ছে এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

২

আমরা ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়েই শিখে থাকি (এবং কলেজেও এ-শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটে) যে অশোক ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশে এবং বিদেশে উক্ত ধর্মের প্রচারকার্যেই তিনি তাঁর সমস্ত রাজশক্তি ও রাজকোষকে নিযুক্ত করেছিলেন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার আদর্শ রাজা বলেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই দুটি উক্তি যে পরস্পর-বিরোধী, এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয় না। আদর্শ রাজার কর্তব্য হল সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার করা। কেননা, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ন্যায়পরতার অত্যাজ্য অঙ্গ। আর, কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর মাত্র। অশোক যদি বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্মে অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করতে চেষ্টিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে তিনি ভারতীয় ন্যায়পরায়ণ রাজার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্বের যুগে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলেই এত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে বহু রক্তপাত এবং দুঃখকষ্টের পর রাষ্ট্র যখন সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি অপক্ষপাতে সমভাব অবলম্বন করল তখনই ইউরোপে ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রুসেড বা জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের একান্ত অভাব ; গাজী, শহীদ বা martyr-এর আদর্শদ্বারা ভারতবর্ষ কখনও অনুপ্রাণিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমব্যবহারই ছিল ভারতীয় রাজার আদর্শ। সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য-প্রমুখ গুপ্তসম্রাটগণ ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ধর্মাবলম্বী ; কিন্তু তাঁদের আমলে উক্ত ধর্ম কখনও রাজকীয় ধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম (state religion) রূপে গণ্য হয়ে বিশেষ প্রাধান্য বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে শৈব, সৌর, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণ তথা বদান্যতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সৌর, তাঁর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন ও ভগিনী রাজ্যশ্রী ছিলেন বৌদ্ধ, আর হর্ষবর্ধন নিজে ছিলেন শৈব অথচ বুদ্ধ- এবং সূর্য- উপাসনাও করতেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পালরাজারা নারায়ণ, শিব প্রভৃতি দেবোপাসনার এবং এমন কি বৈদিক যাগযজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না শুধু তাই নয়, বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের পরেই যাঁর নাম, সেই কুষাণ-সম্রাট্ কনিষ্কের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনিও বুদ্ধ, শিব, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি বহু দেশী এবং বিদেশী দেবতাগণের প্রতি অপক্ষপাতে সমান সম্মান দেখাতেন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষীয় রাজাদের অপক্ষপাতের চিরন্তন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি একান্তভাবে ঝুঁকে পড়লেন এবং উক্ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারকেই জীবনের ব্রত করে তুললেন, এ-কথা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই অনিচ্ছা হয়। অতএব অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীতে কতখানি সত্য আছে, বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

৩

অশোক যদি সত্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করাকেই তাঁর রাজকীয় কর্তব্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন, তাহলে বহুনিন্দিত মুঘল-সম্রাট্ ঔরঙ্গ্জীবের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ থাকে কোথায়? ইসলামধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশত ঔরঙ্গ্জীব সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার প্রতি সমদৃষ্টির আদর্শকে উপেক্ষা করেছিলেন, প্রধানত এইজন্যই তো তিনি ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দাভাজন হয়েছেন। ঔরঙ্গ্জীব ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম-রাজ্য ("দারু-ল্-ইসলাম") বলেই গণ্য করতেন এবং সে-রাজ্যে অন্য ধর্মের কোনো স্থান আছে বলে তিনি মনে করতেন না। সেইজন্যেই তিনি 'অবিশ্বাসী'দের উপর নানাপ্রকার নিষেধবিধি আরোপ করতে কুণ্ঠিত হননি। এ-সব কারণে মুসলমান হিসাবে ঔরঙ্গ্জীবের স্থান যত উচ্চেই হোক না কেন, রাজা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। আমাদের ইস্কুল ও কলেজ পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ পড়লে মনে হয় অশোকও ঔরঙ্গ্জীবের মতো ধর্মপ্রচারকেই জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সত্যই যদি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার (অর্থাৎ স্বদেশ ও বিদেশের জনগণকে বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত করাই) অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়, তাহলে রাজা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা অবশ্যস্বীকার্য। এ-কথা বলা যেতে পারে যে অশোক জনগণকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করতেন বটে কিন্তু এজন্য তিনি ঔরঙ্গ্জীবের মতো অন্য সম্প্রদায়ের উপর পীড়ন করতেন না। এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলেও ভারতীয় আদর্শের বিচারে অশোককে একজন বিচক্ষণ ও মহান্ রাজা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আসল কথা এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধ প্রচারসাহিত্যে এবং আধুনিক ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস-পুস্তকে যাই থাকুক না কেন, অশোক স্বদেশে বা বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন কিংবা জনগণকে উক্ত ধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করেছিলেন, এ-কথা মনে করার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। অশোকের ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান হচ্ছে তাঁর শিলালিপিগুলি। এগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আজ পর্যন্ত অন্তত পঁয়ত্রিশটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এতগুলি লিপির কোথাও বৌদ্ধধর্মের গৌরব কীর্তিত হয় নি। এজন্যেই ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেছেন, "Though himself convinced of the truth of Buddha's teaching···Asoka probably never sought to impose his purely sectarian belief on others." (*Political History of Ancient India*, ৪র্থ সং, পৃ. ২৮০)। তিনি তাঁর প্রজাগণকে ধর্মাচরণে উৎসাহিত করতেন বটে, তিনি কখনও তাদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে কিংবা 'নির্বাণ'-প্রাপ্তির পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেননি।

৪

মৌর্যরাজাদের আমলে ভারতবর্ষে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে অশোকের লিপিতেই চারটির উল্লেখ আছে। যথা, দেবোপাসনা ও যাগযজ্ঞপরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, মংখলিপুত্ত গোসাল-প্রবর্তিত আজীবিক ধর্ম মহাবীর বর্ধমান-প্রবর্তিত নির্গ্রন্থ বা জৈন ধর্ম এবং গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম। তা ছাড়া, দেবকীপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের কথা অশোকলিপিতে না থাকলেও এটি যে তৎকালে প্রচলিত ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা, খৃষ্টপূর্ব

৩০২ অব্দের পরে লিখিত মেগাস্‌থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থেই যমুনাতীরবর্তী মথুরা প্রভৃতি স্থানে উক্ত-ধর্মাবলম্বীদের কথা পাওয়া যায়। এই ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ 'ভগবদ্‌গীতা' ও অশোকের রাজত্বের (খৃঃ পূ. ২৭৩-৩২) কাছাকাছি সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয় (ডক্টর রায় চৌধুরী-প্রণীত *Early History of the Vaishnava Sect*, ২য় সং, পৃ. ৮৭)।

যা হোক, আজীবিক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বভাবতই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী ছিল। কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যেও যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে। ক্ষত্রিয়প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মও যে মূলত বেদ-ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিল, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। পরবর্তীকালে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে আপস হয়ে গেলেও অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে এর যথেষ্ট বিরোধ ছিল বলেই মনে হয়। অন্তত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে ঐতিহাসিকগণও অনুমান করেন। যেমন, ডক্টর রায় চৌধুরীর মতে "The earlier Brahmanical attitude towards the faith (Bhagavatism) was one of hostility, but later on there was a combination between Brahmanism and Bhagavatism probably owing to the Buddhist propaganda of the Mauryas" (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫-৬)। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও এ সময়ে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি নানা মার্গ এবং সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নানা মতবাদ দেখা দিয়েছিল। আর গীতার সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস থেকেও বোঝা যায় বৈদেশিক ধর্মমতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল না। এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও মতবাদ-গুলির পারস্পরিক বিরোধ ও বিবাদের প্রমাণ যে শুধু তৎকালীন সাহিত্যেই পাওয়া যায় তা নয়, অশোকের শিলালিপিতেও তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে।

বস্তুত যে-সময়ে ভারতবর্ষ এই সমস্ত পরস্পরবিবদমান ধর্ম ও মতবাদের কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, ধর্মপ্রাণ অশোকের আবির্ভাবও ঠিক সে সময়েই। তিনি এই কলহপরায়ণ ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলির প্রতি কি মনোভাব অবলম্বন করলেন তা জানতে স্বভাবতই খুব ঔৎসুক্য হয়। সৌভাগ্যবশত অশোক তাঁর দ্বাদশসংখ্যকপর্বত লিপিতে এ-বিষয়ে তাঁর অবলম্বিত নীতির অতি সুস্পষ্ট পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এ স্থলে সমগ্রভাবেই ওই লিপিটির মর্মানুবাদ দেওয়া গেল।

"দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) সকল সম্প্রদায় ('পাষণ্ড')-ভুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলকেই দান এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে সম্মান ('পূজা') করে থাকেন। কিন্তু দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকের) মতে সকল সম্প্রদায়ের 'সারবৃদ্ধি'-সাধনের মতো দান বা সম্মান আর কিছুই নেই। সারবৃদ্ধিও বহুবিধ। কিন্তু তার মূল হচ্ছে বাক্‌সংযম ('বচগুপ্তি')। আর, বাক্‌সংযম মানে হচ্ছে অকারণেই আপন সম্প্রদায়ের প্রশংসা ('আত্মপাষণ্ড-পূজা') ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা ('পরপাষণ্ড-গর্হা') না করা। বিশেষ কারণে যদি তা করতেই হয় তাহলেও লঘু (বা মৃদু) ভাবেই করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা (অর্থাৎ গুণ স্বীকার) করাও কর্তব্য। এ-রকম করলে স্বসম্প্রদায়েরও উন্নতি ('বৃদ্ধি') হয় এবং পরসম্প্রদায়েরও উপকার হয়। অন্যথা স্বসম্প্রদায়েরও ক্ষতি হয়, পরসম্প্রদায়েরও অপকার হয়। যে কেউ (শুধু) আত্মসম্প্রদায়প্রীতি ('ভক্তি')-বশত, অর্থাৎ তার গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রশংসা ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিই করেন।

"অতএব (সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের) একত্র সমবেত হওয়াই ভালো ('সমবায়ো এব সাধু') তাতে সকলেই পরস্পরের ধর্ম (-তত্ত্ব) শুনতে পারে এবং শুনতে ইচ্ছুক হয়। দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকের) ইচ্ছাও এই যে, সর্বসম্প্রদায়ই বহুশ্রুত (অর্থাৎ সকল ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন) এবং কল্যাণগামী হোক।

"সুতরাং যাঁরা যে ধর্মের প্রতিই অনুরক্ত থাকুন না কেন, তাঁদের সকলের কাছেই এ-কথা বক্তব্য যে, দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকের) মতে কোনো দান বা সম্মানই সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধির মতো নয়। এতদর্থেই (অর্থাৎ উক্তপ্রকার সারবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই) ধর্মমহামাত্র, স্ত্র্যধ্যক্ষমহামাত্র, ব্রচভূমিক ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ ব্যাপৃত আছেন। এর ফল হচ্ছে সকল সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও ধর্মের বিকাশ ('ধংমস দীপনা')।"

এই লিপিটি থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, অশোকের সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিছক স্বধর্মপ্রীতিবশত স্বসম্প্রদায়ের গুণকীর্তন ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং এ-কার্যে অনেক সময়েই বাক্‌সংযমের অভাবও লক্ষিত হত। এই ধর্মকলহের যুগে অশোক যদি রাজাসন থেকে বৌদ্ধধর্মের মহিমাকীর্তনে ব্রতী হতেন তাহলে উক্ত ধর্মকলহ প্রবলতর হয়ে ভারতবর্ষের অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলত।

কিন্তু ওই লিপিটিতেই দেখা যাচ্ছে, অশোক সকলকেই স্বধর্মপ্রশংসায় ও পরধর্মসমালোচনায় বিরত হতে কিংবা বাক্‌সংযম অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন ; শুধু তাই নয়, তিনি পরধর্মের গুণস্বীকার করতে এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও উপদেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। কেননা, ধর্মপ্রচার করার মানেই হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় কোনো বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করা এবং একার্যে আত্মপাষণ্ড-পূজা ও পরপাষণ্ড-গর্হা তথা বাক্‌সংযমের সীমালঙ্ঘনও অনিবার্য। বস্তুত উক্ত লিপিটির গোড়াতেই অশোক জানাচ্ছেন যে, তিনি দানাদি কার্যদ্বারা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলের প্রতিই সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। অন্যান্য লিপিতেও তিনি পুনঃপুন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে সমভাবে সম্মান ও দান করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ-সমস্ত উক্তি যে নেহাত মুখের কথা মাত্র নয়, ঐতিহাসিকগণ তা স্বীকার করেছেন। গয়ার নিকটে 'বরাবর'-পর্বতে তিনি আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্যে যে তিনটি চমৎকার গুহা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর উক্তির আন্তরিকতা ও হৃদয়ের উদারতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীকে নিতান্ত অমূলক বলেই স্বীকার করতে হয়।

৫

আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিটিতে অশোক একাধিকবার সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং সর্বশেষে বলেছেন যে, তাতেই 'ধর্মের বিকাশ ('ধংমস দীপনা') হয়। তা ছাড়া, উক্ত পর্বতলিপিটিতে যাকে বলেছেন 'সারবৃদ্ধি', পঞ্চম পর্বতলিপিতে তাকে তিনি 'ধর্মবৃদ্ধি' বলে অভিহিত করেছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত যে সাধারণ সারবস্তু তাকেই তিনি বলতেন 'ধর্ম' এবং যে-ধর্মের প্রচার তিনি করেছিলেন সে হচ্ছে ওই সর্বধর্মসার। এক স্থানে

(২নং ক্ষুদ্র গিরিলিপি) তিনি এই সারধর্মকে 'পোরাণা পকিতী' অর্থাৎ চিরাগত প্রাচীন নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। ভিনসেণ্ট স্মিথও স্বীকার করেছেন যে "The morality inculcated (by Asoka) was, on the whole, common to all the Indian religions"। ডক্টর রায় চৌধুরীও অশোক-প্রচারিত ধর্মকে "the common heritage of Indians of all denominations" বলেই বর্ণনা করেছেন। যা হোক, এই যে চিরাগত নীতিরূপ সারধর্ম, অশোকের লিপিগুলিতে বহুস্থলেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অশোক-প্রশংসিত এই সারধর্ম আসলে কতকগুলি চিরন্তন ও সর্বজনীন চরিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আত্মা, ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম), পুনর্জন্ম, নির্বাণ (বা মোক্ষ), জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বা অন্য কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের কথা বলেননি। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রজাগণকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও দাসভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার, প্রাণীর প্রতি অহিংসা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দান, দয়া, অনালস্য, সত্যবচন ইত্যাদি চরিত্রনীতি অনুসরণ করতে পুনঃপুন উপদেশ দিয়েছেন এবং এগুলিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। এইজন্যই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "The aspect of *dharma* which he emphasised, was a code of morality rather than a system of religion"।

স্থতরাং এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না যে, অশোক কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম প্রচার করেননি। কিন্তু তথাপি তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হয়ে কোশল-মগধের ক্ষুদ্র গণ্ডি লঙ্ঘন করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত হয়ে উঠেছিল, এ-কথা অনুমান করার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে অশোক পরমনিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন এবং খুব সম্ভবত তিনি ভিক্ষুবেশও ধারণ করেছিলেন। স্থতরাং জনসাধারণ যদি অশোকের প্রচারিত অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ ও আচরণের দ্বারাই বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই, বরং উক্তপ্রকার রাজকীয় আদর্শের প্রভাব এড়িয়ে চলাই কঠিন। তাছাড়া, স্বয়ং রাজা ও ধর্মমহামাত্রাদি রাজপুরুষগণের উদ্‌যোগে আহূত 'সমবায়' বা ধর্মসম্মেলনগুলিতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের এবং তৎসংস্পর্শে আসার বহু স্থযোগও জনসাধারণ নিশ্চয় পেয়েছিল। হিউএন্-ৎসাঙ্‌কে অভ্যর্থনা করা উপলক্ষে হর্ষবর্ধন কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মসমবায়ের কথা স্মরণ করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এ-রকম সমবায় অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে ওভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার স্থযোগ ছিল না। স্থতরাং অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের পথ অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল, এ-কথা মনে করা অসংগত নয়।

যা হোক, উক্তপ্রকার ধর্মসমবায় উপলক্ষে জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার স্থযোগ দিলেও অশোক বৌদ্ধধর্মের গৌরব তথা প্রসার বর্ধনার্থ ও-ধর্মের অযথা প্রশংসা ও অন্য ধর্মের নিন্দার প্রশ্রয় দেননি। তার কারণ এই যে, তিনি যে রাজা এবং রাজা হিসাবে কোনো বিশেষ ধর্মের (ব্যক্তিগত ভাবে সে-ধর্ম তাঁর যত প্রিয়ই হোক না কেন) পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর পক্ষে অনুচিত (অর্থাৎ রাজধর্ম-বিরোধী) এ-কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। 'দেবানং প্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবম্ আহ' তাঁর লিপিগুলির এই সাধারণ মুখবন্ধ এবং 'সবে মুনিসে পজা মমা' (সব প্রজারাই আমার পুত্রস্থানীয়) এই বিখ্যাত উক্তিটি থেকেও বোঝা যায়, তিনি তাঁর 'রাজ'পদ তথা 'রাজ'কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। কোনো শক্তিশালী রাজার পক্ষে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ধর্মমতকে প্রজাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়ে নেওয়া

কম প্রলোভনের বিষয় নয়। অশোক সেই প্রলোভনকে সংযত করেছিলেন বলেই মনে হয় এবং এটাই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের বিষয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত ধর্মমতকে অন্তরালে রেখে এবং তৎকাল-প্রচলিত বহু মতবাদের কোনোটিরই দিকে কিছুমাত্র না ঝুঁকে তিনি যে সর্বধর্মের সাধারণ সারবস্তুরূপ চারিত্রিক নীতির উন্নতিসাধনেই ব্রতী হয়েছিলেন এবং 'সমবায়'-নীতি আশ্রয় করে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এখানেই অশোকের যথার্থ শ্রেষ্ঠতা এবং আদর্শরাজোচিত বিচক্ষণতার পরিচয় পাই।

৬

এ-স্থলে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে ঔরঙ্গ্‌জীব ও আকবর ভারতবর্ষের এই দুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির অবলম্বিত নীতির তুলনামূলক আলোচনা করা অসংগত হবে না। তাতে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হবে বলেই মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে এঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাবে, আশা করি তাতে ঔৎসুক্যহানি ঘটবে না।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রাগাধুনিক যুগে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী মহাসাম্রাজ্যের প্রথম অধীশ্বর হচ্ছেন অশোক এবং শেষ অধীশ্বর হচ্ছেন ঔরঙ্গ্‌জীব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের এই দুইজন মহাসম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। সিংহাসনলাভের জন্য দুজনকেই গৃহযুদ্ধে ও ভ্রাতৃনিধনে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং উভয়েরই রাজ্যাভিষেক হয় সিংহাসনপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে। উভয়েই চরিত্রগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বধর্মানুরাগ। উভয়েই নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঐকান্তিক ধর্মপ্রাণতা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্যে উভয়েই সমকালীন জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ঔরঙ্গ্‌জীবকে তৎকালীন মুসলমান-সম্প্রদায় 'জিন্দাপীর' এবং রাজবেশধারী 'দরবেশ' বলে সম্মান করত। অশোক সত্যসত্যই বৌদ্ধসংঘে যোগ দিয়ে ভিক্ষুবেশ ধারণ করেছিলেন, এ-কথা মনে করার হেতু আছে। সুতরাং একজন ছিলেন রাজবেশী দরবেশ, আরেকজন ছিলেন ভিক্ষুবেশী রাজা। অনালস্য ছিল এঁদের চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য, স্বীয় কর্তব্যপালনে এবং রাজকার্য পরিদর্শনে এঁদের কেউ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাঁদের চরিত্রগত বৈষম্যও কম গুরুতর নয়। ঔরঙ্গ্‌জীব স্বীয় রাজ্যে ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অশোক স্বীয় শাসনকালের ইতিহাস না হোক ঐতিহাসিক উপাদানসমূহকে রাজ্যের সর্বত্র পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তম্ভে চিরস্থায়ীরূপে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। একজন ছিলেন সর্বপ্রকার শিল্পসৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ, আরেকজন ভারতবর্ষের শিল্প-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগের প্রবর্তক। একজন স্বীয় ধর্মের মহিমা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে আকবরের বুদ্ধি ও বীর্যবলে সুপ্রতিষ্ঠিত মুঘলসাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন, আরেকজন ঐকান্তিক ধর্মানুসক্তিবশত সর্বপ্রকার হিংসা তথা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চন্দ্রগুপ্তের স্ববীর্যার্জিত ও সুনীতিশাসিত বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা করলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গ্‌জীব ও অশোকের সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের ধর্মনীতিগত। ঔরঙ্গ্‌জীব ইসলামধর্মকে রাজধর্মের উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আদর্শ অনুসারে মুসলমান হিসাবে তাঁর যা কর্তব্য তাই ছিল মুখ্য এবং রাজকর্তব্য ছিল গৌণ। সুতরাং তাঁর জীবনে যখন ইসলামধর্ম ও

রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হল তখন তিনি স্বধর্মনিষ্ঠার কাছে প্রজাবাৎসল্যকে বলি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি যদি এদেশে নিছক ধর্মপ্রচারক দরবেশরূপে জীবনযাপন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে অসামান্য সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করতে পারতেন। কিংবা তিনি যদি কোনো ইসলামাধর্মাবলম্বী দেশে রাজত্ব করতেন তাহলে হয়তো আদর্শ রাজা বলে গণ্য হতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অমুসলমানপ্রধান দেশের রাজমুকুট শিরে ধারণ করাতেই তাঁর জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই ঔরঙ্গ্‌জীবের তথা মুঘলসাম্রাজ্যের ও ভারতীয় ইতিহাসের ট্র্যাজেডি।

অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ঔরঙ্গ্‌জীবের ন্যায় স্বীয় ব্যক্তিগত ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে (state religion-এ) পরিণত করতে কখনও প্রয়াসী হননি। সুতরাং তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজধর্মের বিরোধঘটিত ট্র্যাজেডি দেখা দেয়নি। তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে পৃথক রেখে তাঁর রাজকীয় কর্তব্যতালিকায় প্রজাবাৎসল্যকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন, এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা যদি না হত তাহলে তৎকালীন অবৌদ্ধপ্রধান ভারতবর্ষে প্রচারলিপ্সু বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের জীবনও ব্যর্থতার মধ্যে অবসিত হত।

পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ধরে বিচার করলে শের শাহ্, শিবাজী, কাশ্মীররাজ জৈন-উল আবিদিন (১৪১৭-৬৭) এবং বিশেষভাবে আকবরের সঙ্গেই অশোকের তুলনা করা সমীচীন। জৈন-উল আবিদিনের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। আকবরের পূর্ববর্তী হলেও ধর্মনীতিগত উদারতা ও বিচক্ষণতায় তিনি আকবরের চেয়ে কিছুমাত্র হীন ছিলেন না। যা হোক, এ স্থলে আমরা পূর্বোক্ত তিনজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে আকবরের সঙ্গে অশোকের তুলনার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করব; কেননা, আমাদের পক্ষে সেইটাই অধিকতর ঔৎসুক্যের ও শিক্ষাপ্রদ।

বস্তুত স্বধর্মনিষ্ঠ ঔরঙ্গ্‌জীবের চেয়ে সর্বধর্মনিষ্ঠ আকবরের সঙ্গেই অশোকের সাদৃশ্য অনেক বেশি। সমরনিপুণ সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবক হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই আকবরের সঙ্গে অধিকতর তুলনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অনালস্য বা শ্রমশীলতা, ইতিহাসরচনা ও শিল্পসৃষ্টির আগ্রহ, আন্তরিক প্রজাবাৎসল্য এবং বিশেষভাবে ধর্মনীতিগত উদারতার হিসাবে অশোক ও আকবরের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের পূর্ববর্ণিত 'আত্মপাষণ্ড-পূজা' ও 'পরপাষণ্ড-গর্হা'-বিষয়ক নীতি এবং আকবরের অনুসৃত 'সুল্‌হ্-ই-কুল্'- (universal toleration, সর্বধর্মসহিষ্ণুতা) নীতি মূলত এক। ঔরঙ্গ্‌জীবের 'দারু-ল্-ইসলাম' (অর্থাৎ ইসলাম-রাজ) নীতি অশোক ও আকবর উভয়েরই আদর্শবিরোধী। অশোকের 'সমবায়ো এব সাধু' এই গুরুত্বময় উক্তিটি আকবরের 'ইবাদৎখানা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবরের ইবাদৎখানায় (উপাসনাগৃহে) হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতগণ একত্র সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। তাতে প্রত্যেক ধর্মের লোকের পক্ষেই 'বহুশ্রুত' হয়ে অপরাপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সহজ হবে, এই ছিল আকবরের অন্যতম অভিপ্রায়। অশোক-কথিত সমবায়ের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক এই রূপেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করা। বহু ধর্মের সংস্পর্শে এসে আকবরের মনে সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এবং তারই উপর জোর দিয়ে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক ঐক্যস্থাপন করার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। তার

ফলেই 'দীন ইলাহী'-নামক নবধর্মের পরিকল্পনা হয়। অশোকও পুনঃপুন সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু আকবরের ন্যায় তিনি এই সারধর্মকে কোনো নবধর্মের আকার দিতে প্রয়াসী হননি। পক্ষান্তরে তিনি তাকে স্পষ্টতই 'পোরাণা পকিতী' অর্থাৎ চিরন্তন ধর্মনীতি বলেই অভিহিত করেছেন। তাছাড়া, আকবরের দীন ইলাহী অশোক-প্রশংসিত ধর্মের ন্যায় নিছক চরিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং তাতে অনুষ্ঠানাদিরও স্থান ছিল। কিন্তু অশোকের ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার স্থান নেই; বরং তিনি নিরর্থক অনুষ্ঠানের ('মঙ্গল') অপ্রশংসাই করেছেন। সর্বশেষ কথা এই যে, ধর্মসমবায়নীতির সাহায্যে সর্বসম্প্রদায় তথা সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এই যে অপূর্ব সাধনা, তা অশোক এবং আকবর উভয়ের ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। সে ব্যর্থতা শুধু অশোক এবং আকবরের পক্ষে নয় পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেই এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। ভারত-ইতিহাসের এই করুণতম ট্র্যাজেডির কথা ভবিষ্যতে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

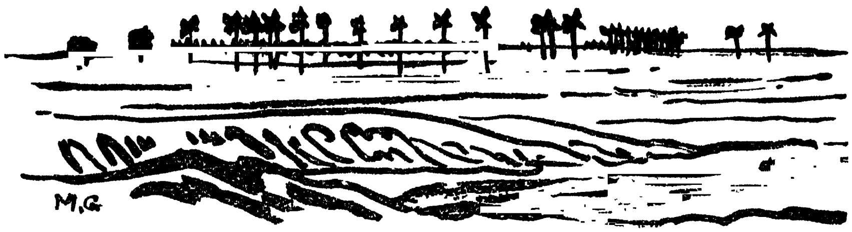

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে এমন একটি রস আছে যা রবীন্দ্রসাহিত্যেও তুর্লভ। এগুলির মধ্যে কবিতা আছে কিন্তু সেটি কাহিনীর অনুবর্তী, গান আছে কিন্তু কাহিনী ও নৃত্যকে ছেড়ে সে গান চলে না, আবার নৃত্য আছে কিন্তু কাহিনী ও গানের সঙ্গে তার সংযোগ সম্পূর্ণ। এর মধ্যে নৃত্য, নাট্য এবং কাব্যের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে, তার মধ্যে এ তিনটিই সমান অপরিহার্য হওয়ার ফলে এর কোন্ অঙ্গটী প্রধান সে-কথা বলা কঠিন। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ-কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।" এর মধ্যে লক্ষণীয় এই যে, কবিতা, সুর এবং নাচ এর মধ্যে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, কোনটিই অপরটির সঙ্গে অবিযুক্তভাবে আলোচনীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির গোড়ার কথা এইটিই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কাব্য, সুর এবং নৃত্যের সম্মিলন অভূতপূর্ব নয়, কিন্তু এখানে কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। কবিতা, গান বা নাচের আলোচনা করতে হলে এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এগুলি একই রস প্রকাশ করতে চাইলেও এদের ভঙ্গীটা অনেক সময় বিভিন্ন, এদের আবেদনের এবং রস-প্রকাশের কৌশল এক নয়। কবিতার মধ্যে ভাষার কৌশল অপ্রধান নয়, বরং সেইটিই প্রধান, কিন্তু গানের মধ্যে ভাষাই প্রধানতম এ-কথা বলা চলে না। বরং কথা ও সুরের সংঘর্ষ গীতরচয়িতাদের চিরন্তন সমস্যা। মহৎ প্রতিভা ছাড়া এই তুইয়ের সুষ্ঠু সম্মিলন সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি কবিতা হিসেবেও বড়ো, এমন কি অনেক সময় তাদের মধ্যে যে একটি নতুন আস্বাদ মেলে তা তাঁর কবিতাতেও অনেক সময় মেলে না,—এ কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সাধারণত এ-রকম সম্মিলন ঘটা কঠিন। তার কারণ আছে। কথা ও সুরের আবেদনের ভঙ্গীটা এক নয়। কথার সঙ্গে নানা স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, স্থানকালপাত্রভেদে একই কথার বিভিন্ন অর্থ। সংস্কৃত আলংকারিকরা শব্দের এই ক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা ও তার মধ্যে জাতি গুণ ক্রিয়া দ্রব্য প্রভৃতি বিভাগ এই হতেই উদ্ভূত। কিন্তু এর গোড়ার কথাটি এই যে, কথার এক-একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে এবং সেই স্মৃতিতে কিছু পরিমাণে সামান্য থাকলেও ব্যক্তিভেদে বিশেষত্বও তার মধ্যে আছে। সেই কারণেই কথা নিয়ে খেলানো চলে, বাচক অর্থ হতে কত ধ্বনি কত ব্যঞ্জনা কত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে এবং শব্দালংকার ও অর্থালংকার তার সহায়তা করে। সে হিসেবে আমরা শব্দের তিনটি প্রধান সম্পত্তির সন্ধান পাই। প্রথমত, তার তুটি প্রধান দিক। একটি বস্তুগত, একটি ব্যক্তিগত। বস্তুগত দিক দিয়ে তার একটি স্থায়ী অর্থ আছে। যেমন 'পর্বত' বললে পাথরওয়ালা

উঁচু জায়গা বোঝায়। এইখানে তার প্রথম প্রতীকিতা। আমাদের স্মৃতিতে পর্বতের যে ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে আছে সেইটিকে মনে করিয়ে দেবার জন্য 'পর্বত' কথাটিই যথেষ্ট। অর্থাৎ পর্বতের স্মৃতির প্রতীক হচ্ছে 'পর্বত' শব্দটি। এই বস্তুগত দিকটি বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, শব্দের অর্থ বাস্তবিক কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়, শব্দের দ্বারা কেবল জাতিই সূচিত হয়।[১] যেমন, 'পর্বত' শব্দে কোন বিশেষ পর্বত সূচিত হয় না, পর্বত জাতিই সূচিত হয়। শব্দের এই বস্তুগত দিকটি দরকারী নিশ্চয়ই, কিন্তু সবটা নয়। সুতরাং তার ব্যক্তিগত দিকটিও অস্বীকার করা চলে না। এইটি অনুভূতির দিক। একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন লোকের কাছে এক নয়। হিমালয়ের অধিবাসীর মনে পর্বত যে চিত্র জাগায়, সমতলবাসীর মনে সে চিত্র জাগায় না। অবশ্য তাদের মধ্যে অনুভূতিসামান্য আছেই, তা না হলে কথাটির প্রতীকধর্মিতা লোপ পেত, কিন্তু তবুও দুই ক্ষেত্রেই ও-শব্দটির অর্থ যে অবিকল এক এমন কথা বলা চলে না।

এ দুটিই শব্দের প্রাথমিক সম্পত্তি। এই দুটি সম্পত্তি স্বীকার করলে শব্দের আর একটি সম্পত্তি চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে শব্দের এই দুটি দিক নিয়ে খেলানো, এবং তার ফলে একটি নতুন রস জমিয়ে তোলা। বিভিন্ন শব্দে ব্যক্তিগত ও বস্তুগত দিক সমান নয়, কোনো শব্দে ব্যক্তিগত দিকটিই বেশী, কোনটিতে বস্তুগত। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতি, অর্থাৎ 'আমি', বড়ো—কোন কোন ক্ষেত্রে তা নয়। একটি উদাহরণ হতে এ-কথাটা স্পষ্ট হয়। "তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত।" এই বাক্যের মধ্যে 'দেখছি' 'শুভবুদ্ধি' 'বিশ্বাস' 'স্পর্ধা' 'কল্যাণ' 'আদর্শ' প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত দিকটি যত বড়ো, 'আপনার পরে' 'আজ' 'করে' 'করতে' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে সেটি তত বড়ো নেই, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই উভয় দিক বর্তমান, তাদের কোনটির উপস্থিতিই একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

এ-কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, কথা ও সুরের পার্থক্যের মূল এইখানে। শব্দের ব্যক্তিগত দিকটির চরম নিদর্শন সুর। অস্বীকার করা চলে না যে সুরের সাহায্যে ভাব-বিনিময় সম্ভব, কিন্তু তার মধ্যে বস্তুগত ভিত্তি প্রায় নেই-ই। তার সামাজিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি তত প্রবল নয়। সুরের কতকগুলি স্মৃতি দীর্ঘকালের অভ্যাসে অনেক সময় গড়ে ওঠে, দরবারী কানাড়া অনেক সময়ই রাত্রির সংস্কার জাগায়, ও-সুরের ভঙ্গীও অবশ্য তার সহায়ক। কিন্তু এ সংস্কার কথার সংস্কারের মত সুদূরপ্রসারী এবং দৃঢ় নয়। সাদা বোঝাতে কালো কথাটার ব্যবহার বিপরীত লক্ষণার ক্ষেত্র ছাড়া

১। কাব্যপ্রকাশকার বলেছেন "সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদি র্জাতিরেব বা ॥" ২।৮॥ "হিমপয়ঃশঙ্খাদ্যাশ্রয়েষু পরমার্থতো ভিন্নেষু শুক্লাদিষু যদ্‌বশেন শুক্লঃ শুক্ল ইত্যাদ্যভিন্নাভিধানপ্রত্যয়োৎপত্তিস্তৎছুক্লত্বাদি সামান্যম্, গুড়তণ্ডুলাদিপাকাদিষ্বেবমেব পাকাদিত্বম্, বালবৃদ্ধ শুকাদ্যুদীরিতেষু ডিংথাদিশব্দেষু চ প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু ডিংথাদ্যর্থেষু বা ডিংথাদ্যস্তীতি সর্বেষাং শব্দানাং জাতিরেব প্রবৃত্তিনিমিত্তম্ ইত্যন্যে।" শব্দ সাধারণতঃ জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যে বিভক্ত। এঁদের মতে গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য সব কয়টিরই প্রবৃত্তি জাতিতে। যেমন হিম, পয়ঃ বা শঙ্খে যে শুক্লতা আছে সেগুলি পরমার্থতঃ ভিন্ন হলেও যে কারণে শুক্ল শুক্ল সেটি (অর্থাৎ শুক্লত্ব) একই এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমান। তেমনি গুড়ের পাক আর তণ্ডুলের পাকের মধ্যেও পাকাদিত্ব সমান। আর বালক, বৃদ্ধ ও শুকপক্ষী যদিও কারুর নাম (ডিংথ) বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করে তাহলেও তার মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডিংথাদি আছে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাতিই আসল বক্তব্য। প্রথমটি গুণ, দ্বিতীয়টি ক্রিয়া এবং তৃতীয়টি দ্রব্য বা নামের উদাহরণ। এ মত কাব্যপ্রকাশকার গ্রহণ করেননি, বস্তুতঃ এ মত গ্রহণীয়ও নয়, তবুও কৌতূহলজনক।

সম্ভবত অচল, কিন্তু সকালবেলাতেও দরবারী কানাড়ার মত বিরাট গভীর রাগ খানিকটা ভাল লাগেই। টোড়ী বিরহের রাগিণী, অন্তত ওস্তাদদের মনের সংস্কার সেই রকম, কিন্তু কোমলতা ছাড়া সকালবেলার সঙ্গে তার সংযোগসূত্র কি, বিরহের মধ্য দিয়ে সেটি সম্ভব কিনা, খুঁজে পাই না। গানের সংস্কার-বোধের আলোচনায় আরও একটি কথা মনে পড়ে। কোন কোন ওস্তাদের বিশ্বাস, সুরের আসল রূপটি ধরা পড়ে শুধু আলাপেই, তানে দুন-চৌদুনে নয়। সে হিসেবে টোড়ীর বিলাপ কেবল আলাপেই ধরা পড়বে, উৎসাহোদ্দীপক তানে নয়। এ-ও একটি সংস্কারের কথা, যা সকলের পক্ষে সমান সত্য নয়। সুতরাং গানেও সংস্কার আছে, কিন্তু তার প্রভাব কথার সংস্কারের মত নয়। কবিতার 'আমি'-র চেয়েও গানের 'আমি' সাধারণত বড়ো। এমন কবিতা আছে, যার মধ্যে কবির চেয়ে কুশীলবেরাই চোখে পড়ে বেশী। এ-কথা গীতিকবিতার বেলাতেও খাটে। কিন্তু গানের বেলা এ-কথা অনেক সময়ই অচল, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের গানে।

কথা ও সুরের এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করলে আরও একটি বৃহত্তর সমস্যা উঠে পড়ে। শব্দের মধ্যে যেমন ব্যক্তি ও বস্তুর খেলা আছে, শব্দসমষ্টির মধ্যে সে খেলা আরও বিচিত্র এবং গভীর। গল্প উপন্যাস ও কবিতার প্রধান পার্থক্য এইখানে। এদের মধ্যে পাঠকসমাজের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম মিলনভূমি সব সময়েই আছে, তা না হলে সাহিত্যরচনাই সম্ভব হত না। কিন্তু তবুও গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সাধারণত বস্তু বড়ো, পাঠক ও রচয়িতা যেন দর্শক হিসেবে সেই চলচ্ছবি দেখছেন। এর ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণত এই কথাই প্রযোজ্য। "অমিত রায় ব্যারিস্টার।" এ-কথাটির মধ্যে যে-পরিমাণ তথ্য আছে "তোমারেই আমি ভালবাসিয়াছি শতযুগে শতবার"-এর মধ্যে 'আমি' তার চেয়ে বড়ো। "অমিত রায় ব্যারিস্টার"—এ-কথাটি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ বলতে পারত না, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সুপরিস্ফুট, কিন্তু তবু সেই ব্যক্তিত্ব ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্ত হয়নি। রসসৃষ্টির উপায়টা তফাত, ঝোঁকটা অন্য জায়গায়।

সুতরাং এই নৃত্যনাট্যগুলির প্রধান সমস্যা এই বিভিন্ন আঙ্গিকগুলির কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে, এই বিভিন্ন ভঙ্গীর আবেদনগুলি কি উপায়ে একটা নূতনতর এবং বিচিত্রতর রস জমাতে পারে। বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি স্বকীয় বিশেষত্ব ছাড়বে না, অথচ তারা পরস্পরবিরোধী না হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে একটি নতুন রস সৃষ্টির সহায়তা করবে—এইটিই এগুলির বড়ো সমস্যা। কিভাবে এই সমন্বয় ঘটল এবং তার ফলে কি ধরনের নতুন রস জমল, তার সার্থকতা একালের পটভূমিকার কতদূর, এই প্রসঙ্গে সেই কথাগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

২

প্রথমে কাব্যরূপের দিক্ হতে কথাটি আলোচ্য। চিত্রাঙ্গদা কবিতা ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য তুলনা করলে কয়েকটা মৌলিক প্রভেদ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কবিতা চিত্রাঙ্গদার মধ্যে যে মহোচ্ছ্বাস আছে নৃত্যনাট্যে তা নেই, এখানে সব সময়েই একটি অদৃশ্য বাঁধন আছে। সে কারণে দীর্ঘ স্বগতোক্তি বা প্রায় স্বগতোক্তির প্রয়োজন নৃত্যনাট্যে হয়নি, সেখানে প্রকাশভঙ্গী আরও সংক্ষিপ্ত অথচ আরও তীব্র। এই সংক্ষিপ্ত ও তীব্রতার সহায়তা করেছে গান। কবিতায় চিত্রাঙ্গদার আক্ষেপ দীর্ঘায়িত—

শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
"ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"
পুরুষের ব্রহ্মচর্য !
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে।
তুমি জানো, মীনকেতু কত ঋষি-মুনি
করিয়াছে বিসর্জন, নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য ! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল ; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু—ছিল যা গর্বের ধন
এতকাল মোর—লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশ ভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমল মৃণালবাহু দুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ !

কিন্তু নৃত্যনাট্যের ভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য। সেখানে সুর ও নৃত্য থাকার ফলে এই দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন হয়নি। মাত্র কয়েকটি লাইন।

অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়,
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী। [প্রস্থান
চিত্রাঙ্গদা। হায় হায় নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর
ধিক্ বাহুবল।
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষ-সাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল॥
(গান) রোদনভরা এ বসন্ত···

যে ভিড়-করে-আসা শব্দসমারোহ, যে উপমাঝংকার রবীন্দ্রকাব্যের একান্ত নিজস্ব লক্ষণ, সেই লক্ষণ এখানে পরিবর্জিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তীব্রতার অভাব ঘটেনি, বরং তা আরও বেড়েছে। এটি সম্ভব হল এই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে, নৃত্যনাট্যের বিশিষ্টতায়। চিত্রাঙ্গদায় তবুও কবিতা ও নৃত্যনাট্যে অনেক পার্থক্য আছে, সেখানে কবিতার অনেক অংশ নৃত্যনাট্যে পরিবর্জিত বা পরিবর্ধিত, ঘটনাসংস্থানেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'শ্যামা'র মধ্যে কবিকর্ম আরও চমৎকার। কবিতার সঙ্গে নৃত্যনাট্যের বাহ্য প্রভেদ সেখানে আরও কম। কবিতার পংক্তিগুলি বহুসময়েই নৃত্যনাট্যে সম্পূর্ণ আসন লাভ করেছে। কিন্তু এত সাদৃশ্য বজায় থাকা সত্ত্বেও আসলে আকাশপাতাল পার্থক্য ঘটেছে। কবিতায় শ্যামার আক্ষেপোক্তি লক্ষণীয়—

সহসা শিহরি'
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, "আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।

নৃত্যনাট্যে এই পংক্তিগুলিই ব্যবহৃত, কিন্তু তবুও তাদের ভঙ্গী আলাদা।

শ্যামা। আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো যা লো;
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।

পংক্তিগুলি প্রায় একই আছে কিন্তু ঠিক এক নেই। মাঝামাঝি ভেঙে দেওয়ার ফলে পংক্তিগুলির সে রুদ্ধশ্বাস প্রবহমানতা নেই, বরং চড়া সুরের সঙ্গে নীচু সুরের সম্মিলন আছে। "মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন,"—এর যুক্তাক্ষরের জমক ও ঝংকারের পর "যা লো যা লো, বল্‌গে"—এর ঘরোয়া সুর একটি বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে যা কবিতায় দুর্লভ। সে হিসেবে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিশেষ লক্ষণীয়—

আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা
বকুলকুঞ্জ
দক্ষিণ বাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থর থর মৃদু মর্মরি'।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।
দিস্‌নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে
উদাসিনী হায় রে।

চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিকবিরহ-কাকলীকূজিত দক্ষিণ বায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুক-শাখা চঞ্চল হোলো দুলে দুলে গো।

প্রথম কয়েক পংক্তির ঠাসবুনানির পর 'দিনে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে' হতে আর একটি সুরের আরম্ভ; তেমনি 'চন্দ্রকরে অভিষিক্ত' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ দীর্ঘ সংস্কৃত লাইনগুলির পর 'মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো' হতে আর একটি সুর আরম্ভ হল। এইরকম বিচিত্রতা পদে পদে। ভাবের একটানা স্রোত নেই, আপনহারা বন্যা নেই, আছে তরঙ্গের নৃত্য, সেইসঙ্গে নৃত্যের তরঙ্গ, আছে ওঠাপড়া। এই বিচিত্রতায় নতুন রস জমছে, যার সন্ধান কবিতায় মেলে না। এ-কথা আরও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। উপরে উদ্ধৃত লাইনগুলির পর দইওয়ালা ও চুড়িওয়ালার গান আছে। সে গান আবার আরও অন্য ভঙ্গীর।

চুড়িওয়ালা। ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে,
এসো এসো দেখো চেয়ে,
এনেছি কাকনজোড়া
সোনালি তারে মোড়া।

এর শব্দঝংকার এবং ভঙ্গী অপর লাইনগুলি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এমন কি 'মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো'—এর মধ্যে যে সুর আছে চুড়িওয়ালার গানের সুর তা নয়। আবার অপমানিতা প্রকৃতির গান এগুলি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মধ্যে যে গভীর ক্ষোভ এবং মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাস আছে, নিরলংকার গাম্ভীর্য এবং স্পষ্ট উক্তি ছাড়া তা ফুটত না। মিল নেই, মিলের আভাস আছে মাত্র।

যে আমারে পাঠাল এই
অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না পূজিব না সেই দেবতারে, পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল তারে
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্কারে।

গভীর অনুভূতি স্পষ্ট উক্তির সাহায্যে প্রকাশিত, তার জন্য ব্যঞ্জনা-লক্ষণার সাহায্য নিতে হয়নি—

যে আমারে দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক,
যে আমারি জেনেছে নাম,
ওগো তারি নামখানি
মোর হৃদয়ে থাক।

লাইনগুলি ঝংকৃত নয়, কঠোর বাঁধন নেই, অলংকার প্রায় অনুপস্থিত—কিন্তু বক্তব্যের ঋজুতায় এবং সুরের দোলায় এরা বহুদূর এগিয়ে গেল—এরা সহজেই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে.
তেমনি তুমি এসো তুমি
এসো এসো।

এর প্রত্যেকটির ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নানা সুরের সম্মিলন আছে কিন্তু এক তন্ত্রীর চড়া সুর নেই। নানা বিচিত্র পর্যায়, নানা বিভিন্ন স্তর, নানা প্রকাশভঙ্গী, ছন্দের মৃদু বা তীব্র দোলা, অলংকারের প্রাচুর্য বা অনুপস্থিতি—এগুলির সমবায়ে যে রস সৃষ্টি হয় সে রস কবিতার রস নয়, সে রস অন্য।

এর মধ্যে সেই কারণে নাটকের দাবি যথেষ্ট মিটবার অবকাশ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সংলাপ নাটকের অন্যতম অঙ্গ। বিভিন্ন পাত্রপাত্রী বা বিভিন্ন স্তরের পাত্রপাত্রী এক ধরনের কথাবার্তা বলে না, সংস্কৃত নাটকেও কোন কোন চরিত্র সংস্কৃতে এবং কোন কোন চরিত্র প্রাকৃতে কথা বলার নিয়ম আছে। কবিতায় এ কৌশলটির ব্যবহার কঠিন। রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা'-র মত একটি নাটকীয় কবিতাতেও এ কৌশল ফোটেনি। রানী এবং পরিচারিকাদের কথাবার্তায় খুব বেশী স্তরবৈচিত্র্যের আভাস মেলে না, ফলে তার মধ্যে একটানা প্রবাহ আছে কিন্তু গভীর স্পন্দন নেই, হৃদয়ের রুদ্ধ প্রতীক্ষা এবং উদ্বেল উচ্ছ্বাস এ দুয়ের সংমিশ্রণ নেই। ফলে তার সার্থকতা এর মত গভীর নয়। কাব্যনাট্য একটি বিশেষ জাতের নাটক না হয়ে শুধু নাটকীয় কবিতা হলেই কাব্যরস ও নাট্যরসের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং অভিনব প্রকাশ হবে এ আশা দুরাশা। আসলে দুটির সংমিশ্রণ চাই, তা না হলে উভয়তই ক্ষতি, লাভের সম্ভাবনা প্রায় নেই-ই। নৃত্যনাট্যগুলির গোড়ার কথা এই যে, সেগুলির মধ্যে শুধু সংমিশ্রণ নেই একটি নতুন সৃষ্টি আছে। সেই কারণেই তার মধ্যে যে রস সৃষ্ট হল সে রসের আস্বাদ বিচিত্র, বহুরসের ঘন সন্নিবেশে একটি নতুন রস গড়ে উঠেছে।

এই বিচিত্রতা অকারণ নয়। পূর্বে কথা ও সুরের যে বিভিন্নধর্মিতার উল্লেখ করেছি, তা হতে বোঝা যায় যে, কবিতা, গান ও কাহিনীর সমন্বয় ঘটানো সহজ নয়, তার সঙ্গে সার্থক নৃত্যের যোগাযোগ আরও দুরূহ। এইখানেই নাট্যরূপের প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়ে। কবিতা বা গানের একমুখীনতা নাটকের পক্ষে সাধারণত স্বাভাবিক নয়। প্রতীকী নাটকের কথা ছেড়ে দিলে সাধারণত নাটকে ঐ বিচিত্র রসগুলির সম্মেলন ঘটে থাকে, সেইটিতেই নাটকের সার্থকতা। বরং একটি সংহতিবোধের মধ্যে নানা বিচিত্রতার সৃষ্টিতেই নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটকের সাফল্য, সেই কারণে, নির্ভর করে সংলাপ গান কবিতা ইত্যাদির সুষ্ঠু সমাবেশের উপর। কিন্তু এক্ষেত্রে যে নাট্য রচিত হল তার প্রধান উপকরণ গান ও কবিতা। পূর্বেই এ-কথা বলবার চেষ্টা করেছি যে গান ও কবিতায় "আমি" অনেক সময়ই বড়ো, নাটকের মত কুশীলবদের প্রাধান্য

সেখানে অপ্রতিহত নয়। সুতরাং গান বা কবিতার সাহায্যে নাটক রচনার অন্যতম বিপদ এই যে, গান বা কবিতার আবেদনভঙ্গীর সঙ্গে নাটকের রসসৃষ্টির কৌশলের সংঘাত বাধতে পারে। সংস্কৃত আলংকারিকের ভাষায়, এখানে গান-কবিতা ও নাটক উপসর্জনীকৃত স্বার্থ না হলে দুয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের প্রধানতম কৃতিত্ব এইখানেই। এর মধ্যে নাট্যরস এবং কাব্যরস এবং গান এমনভাবে স্বার্থ বর্জন করেছে যে ক্ষতির বদলে প্রত্যেকটিই একটি নতুন সম্ভাবনায় প্রাণবান হয়ে উঠেছে। এদের প্রত্যেকটিতে একটী নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

কিছুদিন হতে আমাদের সমাজে যে হাওয়াবদল ঘটেছে তার ফলে ক্রমশ রবীন্দ্রকাব্যেরও সুরবদল হয়েছে। এই সুরবদলের গোড়ার কথাটি হচ্ছে ক্রমিক বন্ধনমুক্তি। এই বন্ধন ভাষার বন্ধন, ভাবের বন্ধন, ছন্দের বন্ধন। বলা বাহুল্য, ভাষা বা ভাব বা ছন্দ তখনই বন্ধন যখন তারা কাব্যের প্রাণসারকে প্রকাশ করার বদলে ঢাকতে চায়। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের পরিবর্তন ভঙ্গীপরিবর্তন সেইজন্য দরকার হয়ে পড়ে। তীব্র ঝংকৃত মহোচ্ছ্বসিত কবিতার পালা কাটবার পর রবীন্দ্রকাব্যে একটি নিবিড় মৃদু মাধুর্যের যুগ এসেছিল,—যার পরাকাষ্ঠা গীতাঞ্জলির যুগে। এর পর বলাকার যুগে নতুন ছন্দ ও বাঁধনভাঙা লাইনের প্রয়োজন ঘটেছিল। কিন্তু ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে শুধু ছন্দ বা পংক্তির নতুন ব্যবহারই যথেষ্ট নয়, আরও মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই কারণেই গদ্যকাব্যের শুরু। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।" কিন্তু তার জন্য "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।" লক্ষ্য করার বিষয়, এই সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাধারণত দুটি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যেমন 'পুনশ্চে' দেখি, কতকগুলি কবিতার মধ্যে সহজ মানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তাদের সুখদুঃখের একটা মানবিক কিন্তু ঝংকারহীন বর্ণনা দেবার চেষ্টা আছে। 'কোপাই' 'খোয়াই' 'দেখা' 'শেষদান' প্রভৃতি কবিতা এই পর্যায়ের। কিন্তু এ ছাড়া অন্য এক ধরনের কবিতার সন্ধান মেলে যেগুলির মধ্যে নাটকীয়ত্ব বা নাটকীয় কথাবস্তুর প্রাধান্য। যেমন, 'ক্যামেলিয়া' 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি। নাটকীয়ত্বের আড়ালে কবি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু সেখানে তাঁর এ চেষ্টা সফল হয়নি তার দ্বিবিধ প্রমাণ আছে। এগুলির দীর্ঘ অলংকার অনেক সময়ই ইঙ্গিত করে যে কবির মনের কথার সঙ্গে বলার ভঙ্গীর মিল নেই। পরে কবি চিহ্ন-মেলানো গদ্যকাব্য আর লেখেননি, ফলে তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থগুলিতে একটি নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান মিলল যার মধ্যে একালের হাওয়া অত্যন্ত সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত, অথচ তার মধ্যে ব্যঙ্গের চেয়ে বাচ্যই প্রধান, কুশীলবদের পরিবর্তে কবিই স্বয়ং উপস্থিত। কিন্তু নৃত্যনাট্যগুলিতে ঠিক এর বিপরীত ঐতিহ্যের সন্ধান মেলে। সেখানে নাটকীয়তারই প্রাধান্য স্থাপিত হল। তার সহায়তার জন্য কবিতাই উপসর্জনীকৃত স্বার্থ। যে পংক্তি ভাঙার কৌশল বলাকায় প্রথম ব্যবহৃত সেই কৌশলটি এখানে আরও বিস্তৃত। সেইসঙ্গে ভাবের পুরোৎপীড় না থাকায় এবং নানা স্তর নানা রস এবং নানা ভঙ্গীর ঘন সম্মিলন ঘটায় কাব্যরস নাট্যরসের বিরোধিতা করার বদলে নাট্যরসের সহায়তা করে, নাট্যরসকে উদ্বুদ্ধ করে। এইটি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এর রসবোধ অখণ্ড। অর্থাৎ, সুরের রস, নাচের রস এবং কবিতার রস পাশাপাশি চলে না, ওগুলির জড়িয়ে যাওয়া অবস্থা,

কে কার সহায়ক বলা কঠিন। এ রকম পরিপূর্ণ সংহতির মধ্যে ওগুলিকে মেলানো রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি।

শুধু যে কবিতার দিক হতেই ঐ কথাগুলি বলা চলে তা নয়। রবীন্দ্রসংগীত সুরে যে বিচিত্রতা এনেছে এই নৃত্যনাট্যগুলিতে তারও প্রকাশ মেলে। আর নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হয়েও বলা চলে, এর মধ্যে যেমন একদিকে শুধু কৌশল দেখাবার উগ্র চেষ্টা নেই অন্যদিকে তেমনি শুধু বাঁধনকে অস্বীকার করার চেষ্টাও নেই। এই সম্মিলনের ফলে যে নতুন ঐতিহ্য স্থাপিত হল একালের পটভূমিকায় সেটি একটি গভীরতর সার্থকতা বহন করে।

৩

কিছুকাল হতে দেখা যাচ্ছে, কাব্যনাট্যের প্রচলন ক্রমবর্ধমান। ইংরেজী সাহিত্যেও এমন নাটক রচিত হচ্ছে যার মধ্যে নাট্যরূপ ফোটাবার জন্য উপসর্জনীকৃত-স্বার্থ কবিতারই শরণাপন্ন হয়েছে। সে হিসেবে এগুলি প্রচলিত নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল বিদ্রোহ। কিন্তু এই কথাটিই যথেষ্ট নয়। কি কারণ ঘটল যে কবিতা-নাটকেই এ-যুগের কথা প্রকাশ পেল, কবিতা ও নাটকের এই সংমিশ্রণের ফলে কি নতুন সমস্যার সমাধান হল? টি. এস এলিয়টের ধারণা:

> . . . the most useful poetry, socially, would be one which could cut across all the present stratifications of public taste—stratifications which are perhaps a sign of social disintegration. The ideal medium for poetry, to my mind, and the most direct means of social 'usefulness' of poetry, is the theatre. In a play of Shakespeare you get several levels of significance. For the simplest auditors there is the plot, for the more thoughtful the character and conflict of character, for the more literary the words and phrasing, for the more musically sensitive the rhythm, and for auditors of greater sensitiveness and understanding a meaning which reveals itself gradually. And I do not believe that the classification of audience is so clear-cut as this; but rather that the sensitiveness of every auditor is acted upon by all these elements at once, though in different degrees of consciousness.

যুগে যুগে দেখা গেছে সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সংযোগের ফলে বিভিন্ন হাওয়ায় বিভিন্ন সুর বাজে। যে যুগের সামাজিক পরিবেশের ফলে কবি বেশী আত্মমুখীন সে যুগে তিনি এমন আঙ্গিক খোঁজেন যার মধ্যে ব্যক্তিক দিকটাই বেশী, এমন কি এমন শব্দও খোঁজেন যার মধ্যে বস্তু অপ্রধান। যেমন, রোমান্টিক যুগে কবিদের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের মিল ছিল না। সুতরাং তাঁদের পলায়নী বৃত্তি এদিক দিয়ে বোঝা সহজ। আরও লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যের বিভিন্ন রূপায়নের মধ্যে কাব্যের উপরই প্রধান ঝোঁক পড়ল, কেননা কাব্যে বস্তুর বন্ধন অপেক্ষাকৃত কম। আবার সেই কাব্যের মধ্যে অধিকাংশই স্বকীয় অভিজ্ঞতা স্বকীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা, 'আমি'-ময় কাব্যের প্রাধান্য। সেই 'আমি'-ময় কাব্যের সাহায্য করল ছন্দের ঝংকার, অর্থাৎ সুর, যার মধ্যে বস্তুর ভার সব চেয়ে কম। সে কারণে, রোমান্টিক কাব্য রোমান্টিক বলেই এই চিহ্নগুলি থাকবে এ-কথা যথেষ্ট নয়। এর পিছনের মানস সংঘাত পর্যন্ত না পৌঁছলে এর আসল স্বরূপ বোঝা যাবে না। তেমনই, একালে ছন্দোবদ্ধ নাটক প্রসার লাভ করছে এটি আকস্মিক নয়। এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে

বর্তমান কালে রুচিবোধ বহুবিভক্ত। দেখা যাচ্ছে, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে আমরা যেমন অগ্রসর হয়ে চলেছি তেমনি তার আস্বাদ ক্রমশই বহুজনলভ্য থাকছে না। একদিকে যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন উদ্ভাবন চলেছে সেগুলির রস গ্রহণের জন্য তেমনি অন্যদিকে বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ শিক্ষার দরকার হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ শিক্ষার সুযোগ ক্রমশ মুষ্টিমেয় বিদগ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে চলেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। কোন সমালোচকের ভাষায় একালের সভ্যতার প্রধানতম লক্ষণ mass education কিন্তু minority culture। ফলে আমাদের মধ্যে স্তরবিভাগ বেড়ে উঠেছে, অনুভূতিসামান্যের অভাবে সকল স্তরে সংস্কৃতির একটি সাধারণ মাত্রা বজায় নেই। সহজ বুদ্ধি এবং সহজ সংস্কার নিয়ে সাহিত্যের রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায়, শুধু সমষ্টি ও ব্যষ্টি, বস্তু ও ব্যক্তির সুষ্ঠুতম সমন্বয় নয়, নানা লোকের মনে যে অভিজ্ঞতাপার্থক্য, রুচিবিভেদ ও স্তরবৈষম্য আছে তার শ্রেষ্ঠ সমাধান এই কাব্যনাট্যে। পশ্চিমী কাব্যনাট্যে বহু সময় দেখা যায় এই সমন্বয় হয়নি, ফলে ছন্দ ফাঁপানো, সহজ কথা সহজে বলা চলে না। অবশ্য এক্ষেত্রেও পশ্চিমে নতুন প্রতিভার উদয় হচ্ছে, কিন্তু এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি অদ্ভুত সৃষ্টি। আর রবীন্দ্রনাথ এগুলিতে উত্তরোত্তর উন্নতি করেছেন। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা তবু দীর্ঘ—তার মধ্যে কিছু ইতস্তত পরিভ্রমণ আছে। অর্জুনের প্রথম-দর্শনে চিত্রাঙ্গদার উচ্ছ্বাস, আত্ম-উদ্দীপনার গান, নূতন-রূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদার উক্তি—এগুলি পরবর্তী নৃত্যনাট্যগুলিতে নেই। নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য চণ্ডালিকা বা শ্যামায় সম্ভব নয়, সেখানে সুর আরও গভীর আরও ঋজু। শ্যামা এদিক হতে আরও সংহত আরও তীব্র, কিন্তু তবু তার মধ্যেও একটি দুর্বলতা আছে। নাট্যের সঙ্গে সুর নৃত্য ও কাব্যের এই রকম সংমিশ্রণের ফলে এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে এর মধ্যে 'রিয়লিস্টিক' নাট্যকলা অপরিহার্য নয়—এর ভঙ্গীটা স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে তরবারি হস্তে উত্তীয়ের ঘাতকের নৃত্য এবং উত্তীয়কে হত্যা আমাদের পীড়া দেয়। এখানে এ রস সমগ্র নাটকটির সঙ্গে মেলেনি। মনের কথা এখানে বস্তুর দ্বারাই সম্পূর্ণ ধ্বনিত নয়, হৃদয়ের রহস্য এখানে সুরের ও নৃত্যের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ব্যক্ত, সেখানে বস্তুর আবরণ নেই। কিন্তু তবুও 'রিয়লিস্টিক' পদ্ধতি অনুসারে এখানে হত্যা দেখাতেই হবে তাতে রসবোধ সম্ভবত ব্যাহত। চণ্ডালিকায় এরকম কোন স্খলনের সন্ধান নেই। ফলে যেটি সৃষ্টি হল তা নাটকীয় কবিতা নয়, কবিতায় নাটকও নয়—এ একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। রুচিবৈষম্য ও স্তরবিভেদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কবিতায়, নাটকে, গানে নানা বাঁধন ভাঙার চেষ্টা করছি, নানা উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি—কিন্তু এগুলিকে নতুন করে ভেঙে নতুন ঐতিহ্যে মিলিত করা রবীন্দ্রনাথেরই কীর্তি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার অনুকরণ হয়েছে, অন্যান্য রচনার অনুকরণ হয়েছে, কিন্তু এগুলির অনুকরণ হয়নি। আসলে এর অনুকরণ সম্ভব নয় কেননা যেটি রবীন্দ্রপ্রতিভায় সম্ভব হয়েছিল, আমাদের সে তুঙ্গশিখরে পৌছতে আরও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। সেই কারণে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের স্বরূপ বুঝবার জন্য, ভবিষ্যতের দিকে এগোবার জন্য, এই নৃত্যনাট্যগুলির গভীরতর সার্থকতা বোঝার প্রয়োজন ঘটেছে। তাতে হয়তো আমরা অন্য ধরনের সমন্বয়ে উপস্থিত হতে পারি, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও, অন্বয়মুখে বা ব্যতিরেকমুখে, এগুলির দিগ্‌নির্দেশ অবিস্মরণীয়।

চিঠিপত্র

শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

[চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

তোর চিঠি এইমাত্র পেলুম। পয়লা বৈশাখের উৎসবের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হচ্চে। বোধ হচ্চে অনেকে আসবেন। রামানন্দ বাবুর মেয়েরা এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়ে বোধ করি এসে পড়বেন। আমাদের আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের এই যোগটি আমার খুব ভাল লাগে। এতে মেয়েদেরও বেশ উপকার হচ্চে বলে বোধ হয়। তোদের ওখানে যেমন কাব্যগ্রন্থের ক্লাস বসে গেছে আমাদের এখানেও তেমনি বসেছে। রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা করে তাঁদের শোনাই—দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে—কোনোদিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে—আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্—ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। আমার ত এই মুস্কিল অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।

উমাচরণ অনেক চেষ্টায় নিজের যোগ্য একটি পাত্রী জুটিয়েছিল—কিন্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারেনি। পাত্রীর বয়স তিন বছর সুতরাং তিনশো টাকার কমে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়—আরো দুই এক বছর বয়স কম হলে বোধ করি সেই পরিমাণে দামও কম হতে পারত। কিন্তু উমাচরণ অনেকদিন ব্রাহ্ম বাড়িতে কাজ করচে বলে বাল্যবিবাহের প্রতি তার আন্তরিক বিদ্বেষ। এইজন্যে সে অতি কঠোর পণ করেছে যে তিন বছরের কম বয়সের মেয়েকে সে কোনো মতেই বিয়ে করবে না—মরে গেলেও না—তার এই সাধু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি—কত দুমাস তিন মাসের মেয়ে তাদের মার কোলে শুয়ে চীৎকার শব্দে কাঁদচে কিন্তু সে কান্নায় সে কিছুতেই কর্ণপাত করচে না—এমনি ওর হৃদয় পাষাণের মত অটল—কত সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী দুই চক্ষু মুদ্রিত করে অহোরাত্রি ধ্যান করচে কিন্তু তাদের সেই তপস্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে লেশমাত্র বিচলিত করতে পারচে না—ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার এই সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ তোরা যদি আপনাআপনির মধ্যে তিনশো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে তুলতে পারিস্ তাহলে এই একটি তিন বৎসরের বয়স্থা মেয়ের আইবড়দশা ঘুচে যায়—বৌমাকে বলিস তাঁদের উচিত গয়না বিক্রি করেও এই সৎকার্য্যটি করা।

পর্শু দিন রথীকে লিখেছিলুম কোনো লোক দিয়ে ওখান থেকে পয়লা বৈশাখের জন্য ওখানকার তরমুজ খরমুজ ইত্যাদি পাঠাতে—অত্যন্ত সহজে ও সস্তায় কাজ সারবার এই অসামান্য দৃষ্টান্তে এখানকার লোকের আমার বুদ্ধির প্রতি এমন একটু শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে যে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছি। আমার এই অনুরোধটা রথী যদি কাজে পরিণত করে তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষত দেখ্‌তে পাচ্চি আমার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে একটা আলোচনা চল্‌চে এই সময়ে যদি শিলাইদহ থেকে বোলপুরে তরমুজ ও ফুটি এসে পড়ে তাহলে সেই কীর্ত্তিটা হয়ত কারো অমর লেখনীর দ্বারা অবিনশ্বরভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব তোর দাদাকে লিখিস্‌ খবরদার যেন তরমুজ না পাঠায়।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে ২৬শে বৈশাখ। তখন তোদের ওখানে বোধ হয় রীতিমত গরম পড়বে। বড়দাদা হেমলতা ও কমল পুরীতে যাচ্চেন। কিন্তু ছুটির সময় দিনুকে আমার কাছে না রাখলে নিশ্চিন্ত হতে পারব না। তাই, যদি আমি সে সময় শিলাইদহে যাই তাহলে দিনুকেও সেখানে আমার সঙ্গে নেব। সেখানে তাকে স্থান দেবার কি বিশেষ অসুবিধা হবে? ইস্কুলের আর কোনো ছেলেকে আমি নিতে চাইনে। পটল পুরীতেও যেতে পারে। কিন্তু অরবিন্দ এবার হয়ত আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইবে না। দিনুকে নীচে পশ্চিমের দিকের দক্ষিণের ঘরটাতে এবং অরবিন্দকে মাঝের হলে বোধ হয় রাখা চলবে। আমি ত তেতালায় থাকব। সেখানে যদি একটা bathroom ছোটখাট রকম তৈরি হয় তাহলে দিনুকেও আমার তেতালার ঘরে আর একটা খাট দিয়ে অনায়াসে রাখা যেতে পারবে। রথীর সঙ্গে এই বেলা পরামর্শ করে সমস্ত ঠিক করিস্‌। তোরা কে কোথায় আছিস্‌ আমি ত কিছু জানি নে—কিন্তু তোরা নিজেদের কিছুমাত্র disturb করিস্‌নে যেন।

বাবা

বৌমাকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাস্‌ এবং তোরাও গ্রহণ করিস্‌।

২

[চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

গোলেমালে অনেকদিন তোর চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। কিছুদিন থেকে নানা ব্যাপারে নানা প্রকারে ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। এখনো চলচে। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে। আমার জন্মদিনে ছেলেরা উৎসব করবে বলে আর একটা হাঙ্গাম চলচে। সেদিন এরা "রাজা" আবার অভিনয় করবে। তাছাড়া আরো কি কি উৎপাত করবার মৎলব আছে—ওর পূর্ব্বে কোথাও পালাতে পারলে ভাল হত।

তোদের ওখানে লট্‌কানের গাছ আছে, রথীকে বলে এক প্যাকেট লট্‌কান পাঠিয়ে দিস্‌ তো। থিয়েটারের সময় ছেলেরা কাপড় রঙাতে চায়।

এখানে তো প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদল হয়ে এ পর্য্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা আছে। তোদের ওখানে কিরকম? তোরা কি বাগান করিস্‌? আমরা যেরকম দেখে এসেছিলুম তার থেকে কিছু বদল হয়েছে কি?

তোদের আলুর ক্ষেত থেকে আলু কত পেলি ? চৈতালি ফসলই বা কি রকম হল ? আমাদের আম বাগানে খুব আম ধরেছে। তোদের আমের অবস্থা কি রকম ? লিচু গাছে বিস্তর ছোট ছোট লিচু ধরেছিল কিন্তু আমাদের একটা হরিণ আছে সে এসে লিচুগুলো প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেল্লে—সফেটা গাছের নীচু ডালে যত সফেটা হয়েছে সেও আর রাখা যাচ্চে না। হরিণটা খুব পোষা বলে ওকে বাঁধতে ইচ্ছা করে না। আজকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। তাঁরা আশ্রমে এসেছিলেন—এখানকার সঙ্গে তাঁদের খুব একটা শ্রদ্ধার যোগ হয়ে গেছে। এবার কলকাতায় গিয়ে উপরি উপরি তিনদিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলেছিল। বোধ হয় পয়লা বৈশাখে তাঁরা এখানে আসবেন।

তোদের পড়াশুনা কি রকম চলচে ? তুই বুঝি Botany পড়তে আরম্ভ করেছিস্ ? কেমন লাগচে ? বৌমার পড়া এগোচ্চে ত ? তোর বন্ধু Miss Bourdette ত তোদের খুব নিন্দে করে দিব্যি তোদের টাকায় পেট ভরিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেছে। Yankeeদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব কেন ?

তোরা মাঝে মাঝে কখনো নদীতে বেড়াতে যাসনে ? উমাচরণ কলকাতায় ফিরেছে এই একটা সুসংবাদ—তার বিয়ে হয়নি এই আর একটা। আগামী সোমবারে শুনচি এখানে তার শুভাগমন হবে। কি রকম অভ্যর্থনা করা যাবে তাই ভাবছি।

বাবা

তোর মামা কিম্বা মামাশ্বশুরকে বলিস সেই বাউলদের গান আমাকে শীঘ্র সংগ্রহ করে পাঠাতে। দেরি না করে।

৩

S. S. City of Glasgow.
at আরব সমুদ্র।
৩১ মে, ১৯১২

মীরু

জাহাজ তো ভেসে চলেছে। ভয় করেছিলুম খুব sea-sickness হবে কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখচিনে। সমুদ্র তেমন উতলা নয়। অথচ ঢেউ একেবারে নেই তা নয়। ঠিক আমাদের মুখের সামনে দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া দিচ্চে তাই এক একদিন বেশ একটু দোলা লাগাচ্চে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নিচ্চে। আমার বিশ্বাস ওর মাথা ঘোরাটা একেবারেই ফাঁকি—কারণ, ঘুম খুব গভীর এবং আহারের পরিমাণও যথেষ্ট প্রচুর। একেবারে রাজকীয় চালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আহার চলচে—স্বয়ং ত্রিপুরার মহারাজকেও কোনো দিন এত আরাম করতে দেখিনি। বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসঙ্কোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্চেন বলে যে কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ আছে তা দেখচিনে। ইতিমধ্যে একদিন কেবল sea-sick হয়েছিলেন।

জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে আমাদের যে প্রাণের বন্ধুত্ব হয়েছে তা বলতে পারিনে। দূরে দূরে

চুপচাপ থাকি। কেবল ওদের মধ্যে দুজন আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার নামে একজন কবি আছেন শুনেছিলুম তিনি কে ? আমি বল্লুম তিনিই হচ্চেন আমি। লোকটি সৈনিকদলের অধ্যক্ষ—সুতরাং কবিতা পড়ে শোনাবার জন্যে আমাকে একদিনো অনুরোধ করেনি। বুঝতেই পারছিস্ এতে আমি মনে মনে বেদনা বোধ করেছি।

তোরা কোথায় আছিস্ তাও জানিনে। কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি দেব। কারণ শিলাইদহে থাকলেও চিঠি কলকাতা হয়েই যাবে সুতরাং তোদের পেতে দেরি হবে না।

নিতাইয়ের খবর কি ? তার বঙ্গভাষা শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হল ? আর তার Sandow Practice আশা করি উত্তরোত্তর প্রবলতর বেগে চল্‌চে। মুখের মধ্যে পায়ের গোড়ালি পূরে দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়াম সুরু হয়েছে কি ? তার শরীর কেমন আছে ? তাকে আমার হামি দিস্। বেয়ান এবার একলা তাঁর ক্ষুদ্র বন্ধুটির চিত্ত অধিকার করে নিচ্চেন—আমি যতদিনে ফিরব ততদিনে তাঁর দখল ভয়ঙ্কর পাকা হয়ে যাবে। বেয়ানকে বলিস্ শিলাইদহে একদিন আমাকে যে স্থান দিয়েছিলেন ফিরে গিয়ে যেন সেই আশ্রয়টি থেকে বঞ্চিত না হই।

শিলাইদহে তোদের কেমন চলচে লিখিস্। আশা করি বাদলা বৃষ্টি কেটে গিয়ে এখন সেখানটা স্বাস্থ্যকর হয়েছে। যদি ডাঙায় তোদের শরীর তেমন ভাল না থাকে তাহলে এক একবার কিছুদিনের মত বেশ নিরাপদ নিরালা জায়গা দেখে গোরাইয়ের নির্জ্জন চরে বোটে গিয়ে থাকিস্। বোট আজকাল অনেকগুলো হয়েছে সুতরাং তোদের থাকবার কোনো কষ্ট হবে না। বর্ষার সময় একটু অসুবিধা হতেও পারে কিন্তু পর্দ্দার বন্দোবস্ত ভাল করে রাখতে পারলে কোনো ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া তুই একটা গোরু কুঠিবাড়ি থেকে চরে নিয়ে গিয়ে রাখলে কিছুই ভাবতে হবে না। আর তোদের তো কুকারে দিব্যি রান্না হতে পারবে।

তোরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিস।

বাবা

৪

[১৯১২]

মীরু

তোকে দীর্ঘকাল চিঠি লিখিনি কেন, এই সম্বন্ধে তুই মনে মনে আলোচনা করচিস্। আমি নিশ্চয় জানি বৌমা তোকে প্রতি সপ্তাহেই প্রায় চিঠি লিখ্‌চেন এবং তাতে ছোট বড় কোনো খবর বাদ যাচ্চে না—আমার চিঠিতে তারই পুনরুক্তি হবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যে কর্ম্মের বিভাগ হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা—পুরুষরা দেশের কাজ করবে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে; পুরুষরা বই লিখ্‌বে, মেয়েরা চিঠি লিখ্‌বে। চিঠি লেখার নৈপুণ্য মেয়েদের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ—পুরুষদের ওটা নেই বল্লেই হয়। আমরা কাজের চিঠি লিখ্‌তে পারি—অকাজের চিঠিতে আমাদের কলম সরে না। এই ত চিঠি লেখা সম্বন্ধে তোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লিখলুম; ভাগ্যে এটা বৈজ্ঞানিক তাই এতখানি

লেখবার সুবিধা হল। আমি তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীর একজন সুবিখ্যাত লেখক তা বোধ হয় তুই পরম্পরায় শুনেছিস্ :—এখানকার লোক সমাজের লৌকিকতার দাবি মিটিয়ে যখনি সময় পাই প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগ দিতে হয় ; কিন্তু বৌমা এখনো সাময়িক পত্রের হাতে পড়েন নি এইজন্য অসাময়িক পত্র লেখা তাঁর পক্ষে নিতান্তই সহজ। এই সকল কারণে স্বভাবতই আমাদের মধ্যে একটা কর্ত্তব্য বিভাগ হয়ে গেছে। আর একটা কথা আমার বলবার আছে ; লোকে মনে করে যারা নূতন দেশে যায় বিস্তারিত খবর লেখা তাদের পক্ষেই সহজ। ঠিক তার উল্টো। যে খবর একেবারে নূতন সে ত অন্ধকার—পুরোণো খবরই খবর। একবার ভেবে দেখ্, আমরা গত সপ্তাহে ছিলুম South Kensingtonএ—এ সপ্তাহে এসেছি Worsely Road এর একটা বাসায়—এ খবরটা তোদের কাছে একেবারেই ব্যর্থ। কিন্তু তোরা যে আমাকে খবর দিয়েছিস্—কুঠিবাড়ী থেকে তোরা বোটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিস্ সেটা আমার পক্ষে একটা যথার্থ খবর। যদি বিস্তারিত করে তন্ন তন্ন করে লিখ্তিস্ তাহলে এই Worsely Rd. এর অন্ধকার বাসায় বসে তোদের সেই পদ্মা নিবাসের ছবি মনের মধ্যে অনেকক্ষণ উলট পালট করতে পারা যেত। তোদের ঘর দুয়োর বাবুর্চ্চি, মালী, বছির গোরুবাছুর সজারু ডোডো, পাটের ক্ষেত, অনঙ্গ, জমাদার, বৃষ্টিবাদল, রৌদ্র, আমগাছ, জামগাছ, পুকুর রাস্তা, মাছি, মশা, গাঁদা পোকা, ডাক্তার, ডাক্তারের স্ত্রী, ওলাউঠো, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যা কিছু তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে তার কথা তোলবামাত্র সেটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আমাদের এখানকার পনের আনা খবরই তোদের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক। এই দেখ্ চিঠি লেখার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হোল কিন্তু সত্যি তোরা কোথায় আছিস্, কি ভাবে আছিস্, বোটে থাকার কি রকম ব্যবস্থা করেছিস্, সেখানে খোকা কি ভাবে দিন যাপন করচে, সেখানে তার আহার বিহারের কি রকম আয়োজন, আজকাল তার অনুপানের কি রকম বন্দোবস্ত, লোকজনের প্রতি তার ব্যবহার কি রকমের এ সমস্ত জানবার জন্যে মন উৎসুক আছে অথচ নগেন্দ্রের চিঠিতে একটা লাইনমাত্র পাওয়া গেল যে তোরা শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য বোটে গিয়ে বাস করচিস্। হয়ত বৌমাকে তুই বিস্তারিত খবর দিয়েছিস্ কিন্তু বৌমা আমাকে কেবল একটিমাত্র কথা বল্লেন ছোট্ট ঠাকুরঝির চিঠি পেয়েছি, ছোট্ট ঠাকুরঝি জানতে চেয়েছে বাবা অনেকদিন চিঠি লেখেননি কেন ? এখানে গরমিকালেও এ বছর সূর্য্য ফাঁকি দিয়ে সেরেছেন—শরৎকালে দিন দুই চার একটু আশা দিয়ে আবার আজ এমনি অন্ধকার করে এসেছে এবং রীতিমত শীতের হাওয়া দিয়েছে যে সুবিধা বোধ হচ্ছে না। কালিদাসের একটা কাব্য আছে জানিস বোধ হয় তার নাম ঋতুসংহার। এখানে এবার সেই কাব্যটারই আধিপত্য দেখা যাচ্চে। গ্রীষ্ম ঋতুর সংহার ত হয়েইছে—আবার শরৎঋতুরও তথৈবচ। অথচ এদেশে গোটা তিনেক বই ঋতুই নেই। যদি সংহার করতে হয় তাহলে আমার মতে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মটাকে সংহার করতে পারলে ইলেকট্রিক পাখার খরচ বাঁচে।

তোরা কার্ত্তিক মাসে বোটে করে বরিশালে যাবার প্রস্তাব করেছিস। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সময়—আমি যত বড় বড় ঝড় পেয়েছি সব ঐ সময়ে। তার উপরে ম্যালেরিয়ারও সময় ঐ। যদি তোরা অঘ্রাণ মাসে যেতিস্ তাহলে চিন্তার কোনো কারণ থাকত না—কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিকে বোটে করে দীর্ঘ নদী পথ বেয়ে যাওয়া কোনোমতেই সুযুক্তি সঙ্গত নয়। নদীতে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি—নদীর ধাত আমি বুঝি।

বাবা

৫

New York

মীরু

এবার সমুদ্র পার হতে যে দুঃখ পেয়েছি সে তোকে লিখে আর কি জানাব! শরীরটাকে অহোরাত্র কসে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে মহাসমুদ্র প্রাণটাকে অনেকটা আলগা করে এনেছিল—এখনো ডাঙায় উঠেও মনে হচ্চে সেটা নড় নড় করচে। সী সিক্‌নেস্ অনেকবার হয়েছে কিন্তু এমন কখনো হয়নি। আবার এই সমুদ্র ফিরে পার হতে হবে মনে করলে আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তার উপরে আবার জাহাজের যাত্রীগুলোও বড় লক্ষ্মীছাড়া ছিল। কারো সঙ্গে যে ক্ষণকাল আলাপ করে সুখ পাব এমন সম্ভাবনামাত্র ছিল না। অনেকে ছিল যাদের ভাষা আমরা জানিনে—আর যাদের ভাষা আমরা জানতুম তাদের সঙ্গে জানাশুনো করবার প্রবৃত্তি হয়নি। যাই হোক্ আমরা দলে ভারি ছিলুম। সঙ্গে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন—গল্প জমাতে তিনি খুব মজবুৎ, আর একটি বাঙালী সহযাত্রী ছিলেন, গল্প না বল্‌তে তাঁর অসাধারণ শক্তি, তিনি প্যাণ্টলুনের দুই পকেটের মধ্যে দুই হাত গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ডেকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পদচারণ করে কাটিয়েছেন। আর একজন মারাঠি ছিলেন, তিনি আকারে আয়তনে নিতান্ত ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তিমি মাছের সঙ্গে কেবল একটা বিষয়ে তাঁর মিল দেখা যায়—অহোরাত্র কেবল তিনি ক্যাবিনের মধ্যেই থাকতেন কেবল ক্ষণে ক্ষণে মিনিট পাঁচেকের জন্যে ডেকে উঠে তিমিমাছের মত একবার হুস করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পরক্ষণেই ক্যাবিনের মধ্যে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। সমুদ্র যতই শান্ত থাক, দিন যতই সুন্দর হোক্ তিনি তাঁর বিবর ছাড়তেন না। যাক্ শেষকালে কাল কূলে এসে পৌঁছন গেছে। ইংলণ্ডে বিদেশীদের সুবিধা এই যে, জাহাজ থেকে নাববার সময় কোনো উৎপাত নেই। এখানে মাশুল যাচাইয়ের ঘরে দুটি ঘণ্টা বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি কষ্টে গিয়েছে। এখন ত হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আজ একবার এখানকার কোনো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের খোঁজ নিতে যেতে হবে। তারপরে ওষুধপত্রের জোগাড় করে ইলিনয়ে রথীদের কলেজের দরজায় গিয়ে গট হয়ে বসে পড়ব এই রকম মনে করচি। কিছুদিন নিরালায় চক্ষু বুজে বিশ্রাম করবার জন্যে মনটা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছে। আমেরিকায় বিশ্রাম জিনিষটা শস্তায় পাওয়া যায় কিনা আমার সন্দেহ হচ্চে—যা হোক্ চেষ্টা করে দেখা যাক। ইলিনয়ের ঠিকানাতেই তোদের সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্। ইতি ২৯ অক্টোবর ১৯১২

বাবা

৬

508. W. High Street
Urbana Illinoia
২৫শে পৌষ ১৩১৯

মীরু

আজ তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের আলো প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভোগ করে এসেছি। এতদিন পরে এই জানুয়ারীর আরম্ভে দেবতার ভাবগতিকের একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্চে। একদিন বরফ পড়ে বেশ সাদা হয়ে গেল—তারপরে রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি সকালে উঠে দেখি

সেই বৃষ্টি রাস্তার উপরে গাছের উপরে একেবারে কাঁচের মত জমে গিয়েছে। রাস্তা এমন ভয়ানক পিছল যে তার উপর দিয়ে চলা শক্ত। দুদিন ধরে তাই ঘরে বন্ধ হয়ে আছি। আজ রোদ্দুর উঠে ভারি চমৎকার দেখতে হয়েছিল। গাছপালা সমস্ত একেবারে হীরের মত ঝক ঝক করছিল। বিকেলের দিকে আর থাকতে পারলুম না ভাবলুম একবার একটুখানি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করে আসি। দু পা যেতেই বরফের উপর এমনি পড়া পড়ে গেলুম যে কবিত্ব সুদ্ধ কবি ভেঙে যাবার জো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসেছি। বরফ না গল্‌লে আমার এই রকম বন্দীদশা।

তোর বৌঠানকে এখন আর নিজের হাতে কাজ করতে হয় না। চাঁদ বলে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র আমাদের রেঁধে দেয়, বঙ্কিম বাসন মাজা এবং ঘর ঝাঁটের কাজে নিযুক্ত বৌমা কেবল বিছানা করেন। আর সোমেন্দ্র আহার করে থাকে। এখানে ঘরকন্নার ব্যাপারটা তেমন অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয়—এখানে সমস্ত কাজই প্রায় কল টিপে চলে। বাজার করা টেলিফোনেই হয়ে যায়। দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র পৌঁছে দেয়—এ দেশী রান্নায় বাটনা বাটা কোটনা কোটার জুলুম অতি যৎসামান্য—তারপরে গ্যাসে ইলেকট্রিসিটিতে মিলে রাঁধাবাড়া অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব এখানকার ঘরকন্নার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা মনে করিস নে। সেখানে আবার সেই বঁটি নিয়ে বসতে হবে—এবং মোচা ও থোড়ের মুণ্ডপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে। এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই। দেশে তোদের সেই এক বিষম সাজা।

আমি New York এর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। কিছুদিন ঠিক ওষুধটা বের করতে অনেক হাৎড়াতে হবে—এখনো সেই হাৎড়াবার পালাই চলচে—আশা করচি একটা কোনো ওষুধ খেটে যেতে পারবে।

আমি এবারকার চিঠিতে খবর পেলুম যে আজ পর্য্যন্ত বোলপুরে আমার বইয়ের বাক্স যায়নি। এতে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি সে বলে উঠতে পারিনে। আমি তাদের বইগুলি পাঠালুম এবং ইচ্ছা করলুম যে সেখানে সেগুলি কাজে লাগে—অথচ তারা পেলই না, এ ত নিদারুণ অন্যায়! এ যে কার দোষে হোলো, আমি আজ পর্য্যন্ত খবরই পেলুম না। এ যদি গোপালের শৈথিল্য হয় তাহলে সে অমার্জ্জনীয় কেননা জগদানন্দরা তাকে তাগিদ দিতে ত্রুটি করেনি। এ যদি আর কারো কাজ হয় তবে সেও গুরুতর অন্যায়। আমি ত এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করতেই পারিনে। যাকে আমি যে জিনিষটা দেব সে সেটা পাবেই না, অন্যে সেটা অবরুদ্ধ করে রাখবে এমন অদ্ভুত অধিকার ত আমি কাউকেই দিইনি। আমার কাছে এটা অপমানকর বলে মনে হয়। তোরা কলকাতায় আছিস এ সম্বন্ধে সন্ধান করে ঠিক খবরটা আমাকে জানাবি এবং যথোপযুক্ত প্রতিকার করতে একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করবিনে। আজ আমি দেড়মাস ধরে এইটে সম্বন্ধে প্রতি মেলেই নিরুপায় ভাবে বেদনা পাচ্চি—কিছু বুঝ্‌তেও পাচ্চিনে কিছু করতেও পারচিনে। খোকাকে হামি দিস্‌।

বাবা

পুঃ

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানাস্‌।

৭

মীরু

জাহাজ ত চলেইচে। কাল এডেনে পৌঁছব। তাই আজ দলে দলে সবাই চিঠি লিখ্‌তে বসে গেছে। সমুদ্র খুবই শান্ত—এমন কি মঞ্জুরও sea-sickness এর কোনো উপসর্গ হয়নি। কিন্তু জাহাজে যাত্রী একেবারে ঠাসা। ভিড়ের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই ডেকে অন্য সকলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে পারিনে—music saloon বলে একটা ঘর আছে সেই ঘরের এক কোণে চুপচাপ করে থাকি। এখানে বসে সমুদ্রের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা হয় না—তবে কিনা তার কলধ্বনি শোনা যায়। বেশিদিন যে য়ুরোপে থাকব না সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই কেননা ভাল লাগচে না। আমার সেই উত্তরায়ণের কাঁটাবনে আমার মন নিয়ত বিচরণ করে। পাশ্চাত্য দেশে বাস করবার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে সর্বদাই বেশভূষা করে জুতো মোজা পরে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই অপ্রস্তুত হয়ে থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে—সেইজন্যে বোতাম এঁটে থাকতে আমার বড় খারাপ লাগে। তোকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসবার প্রস্তাব মাঝে মাঝে আমার মনে জেগেছিল—কিন্তু আমি তোর স্বভাব যতটা বুঝি তাতে আমি নিশ্চয় বুঝি যে তোর পক্ষে এই ভিড় ঠেলাঠেলি, এই সর্ব্বদা সিধে খাড়া হয়ে কাটানো প্রতিমুহূর্ত্তে অসহ্য হত।

সাধু যখন বোম্বাই থেকে ফিরে গেল তার সঙ্গে তোকে দেবার জন্যে, এক ঝুড়ি বোম্বাই আম পাঠিয়েছিলুম—পেয়েছিলি কি? আমার সন্দেহ আছে সে আমগুলো হয়তো সাধু সেবাতেই লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত সাধুর ইচ্ছা ছিল এবং আশা ছিল যে তাকে আমাদের সঙ্গে বিলেতে নিয়ে আস্‌ব। আমরা জাহাজে চড়ে বসলেও সে প্রায় তিন চার ঘণ্টা dock এ বসে জাহাজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে বসে ছিল। যদি ওকে নিয়ে আসতুম তাহলে ওর যে কি দুর্গতি হত সে কথা বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই। আজ খুব গরম পড়েচে। কাল থেকে Red Sea র মধ্যে গরম আরো বেড়ে উঠ্‌বে। তারপরে Mediterranean এ পৌঁছে তবে একটু ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আর ১১ দিন পরে জাহাজ মার্শেল্‌স্‌ বন্দরে পৌঁছবে। কিন্তু আমরা সেখানে না নেবে একেবারে সমুদ্র পথে ইংলণ্ডে যাব। তাতে আরো ৭ দিন সময় লাগবে।

ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন। ইতি ১৯ মে ১৯২০

বাবা

৮

মীরু

আমার শরীর বেশ ভালোই আছে। পুপেরও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েচে।

কাল অর্দ্ধেক রাত্রে এডেনে পৌঁছব—সেখান থেকে এ চিঠি ডাকে রওনা হবে। সমুদ্র শান্ত আছে।

পশ্চিমদিকে আমার যে নতুন ঘর হয়েছে তাতে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে—বীরেনকে ডেকে বলে দিস্‌। ঘরে অকারণে দুটো সিঁড়ি করা হয়েচে। পশ্চিম দিকের সিঁড়ি রেখে অন্য সিঁড়িটা ভেঙে দিয়ে সেখানে একটা চ্যাপটা প্যারাপেট বানাতে হবে, যাতে তার উপরে বসা বা জিনিষপত্র রাখা যেতে পারে। বর্ষার সময়ে বাড়ির সামনে পূবদিকে যাতে বীথিকাটা সম্পূর্ণ হয় তা বলে দিস। অন্য গাছের সঙ্গে মহুয়া

ও ছাতিম লাগালে ভাল হয়। বর্ষা ঘন হলে কাসাহারাকে দিয়ে আশ্রম থেকে গোটা কয়েক বড় গাছ তুলিয়ে আনলে খুসি হব। কলকাতায় কাসাহারা জগদীশের বাগানে এমনি বড় গাছ লাগিয়েছিল। প্রণালীটা ছেলেদের পক্ষে একটা শিক্ষার বিষয় হবে। আসবার সময় বীরেন বলেছিল শীঘ্রই তোর বাড়ি তৈরিতে হাত দিতে হবে। হয় ত এতদিনে আরম্ভ হয়েচে—যদি শুনি হয়নি আশ্চর্য্য হব না।

পঞ্চবটীর কাছাকাছি বর্ষার সময় বড় বড় গাছের বীজ বেশি করে যেখানে সেখানে পুঁতে দিস্। তার কিছু হবে কিছু মরবে। ভবিষ্যতে একদিন ঐ উত্তর পশ্চিম কোণে একটা বন হয়ে ওঠে এই আমার ইচ্ছা। আমার কোণার্ক বাড়ির সেই নীলমণি লতার বিপরীত দিকে যে শ্বেতমণি লতাটা বেড়ে উঠে আশ্রয় খুঁজচে তার জন্যে জড়িয়ে ওঠবার একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিতে বলে দিস্—আর মধুমালতীর ঊর্দ্ধগতির জন্যে যে তিন তাল খাড়া হয়েছে তার তিনটে ঢালু চালের বাঁখারির জাফরি করে না দিলে তার উপর দিয়ে লতা উঠতে পারবে না। সুরেনকে ডেকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিস।

সন্তোষ কি আশ্রমে আছে না পালিয়েচে? তাকে একটা লম্বা চিঠি লিখে দিলুম।

বুড়ির বন্ধুবান্ধবেরা সব চলে গিয়ে বোধ হয় একলা ঠেকচে। ওখানে খুব কি গরম পড়েচে। আমার মনে হচ্চে এবার সমস্ত গর্ম্মি ভোর মাঝে মাঝে বৃষ্টি পাবি—তেমন বেশি গরম হবে না। সমুদ্রেও আমরা দুদিন বৃষ্টি পেয়েচি। রীতিমত গরম বটে কিন্তু দিনরাত হু হু করে হাওয়া দিচ্চে—বিশেষত আমার ক্যাবিনটা একেবারে জাহাজের সামনেই বলে কখনো হাওয়ার অভাব হয় না। মরিসের কি অবস্থা? এই অবকাশে সে যদি বাইসীকল্ চড়তে ভালো করে শিখে নেয় তাহলে অনেক কাজে লাগবে। সে আমার বাক্স বোঝাই করে একরাশ আমার সেই ফিলজফিকাল কনগ্রেসের বক্তৃতার চটি ঠেসে দিয়েচে—না দিয়েচে চিঠির কাগজ, না দিয়েচে একটা ব্লটিঙের কিছু। কলমগুলো থেকে হঠাৎ মোটা মোটা ফোঁটা কালী পড়ে যাচ্ছে, হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকচি—অথচ তার হাতে স্বয়ং একটা ব্লটিং বুক দিয়েছিলুম। যারা নিজের কাজ নিজে করে না তাদের এই দুর্গতি। ঐ বক্তৃতার প্যাম্ফ্লেট্গুলো দেখি আর সমুদ্রে টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইতি ১৯ মে ১৯২৬

বাবা

৯

পিনাঙ

[১৪ অগস্ট ১৯২৭]

মীরু

মালয় উপদ্বীপের শেষ বক্তৃতা আজ বিকেলে সমাধা হলে এখান থেকে ছুটি পাব—তার পরে কাল বিকেলে জাহাজে চড়ে চলব জাভায়। দেশটা বেজায় গরম—অথচ ইলেকট্রিক পাখা কেন যে চলে না আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না। গবর্নরের বাড়িতে যখন ছিলুম একটা টেবিল পাখা চালিয়ে প্রাণরক্ষা করা যেত। এখানে সামনে সমুদ্র অথচ বাতাস প্রায়ই পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা একটা হাত পাখা সঞ্চালন করা যাচ্চে। এদিকে একজন সামান্য লোকের বাড়িতেও অন্তত একটা মোটর গাড়ি আছে। বোধ হয় মোটর গাড়ি চালিয়ে এরা হাওয়া খায়—তার চেয়ে পাখা চালানো অনেক শস্তা। পাখা না থাকুক, এখানকার লোকেরা খুব উঠে পড়ে যত্ন করচে। গলায় মালা দিচ্চে, স্তুতিবাদ করচে, বক্তৃতা শুনচে, হাততালি চালাচ্চে, সঙ্গে

সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও দিচ্চে। মাঝে মাঝে এখানে তামিল কারি খেতে হয়েছে—স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে-দ্বীপে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল এরা তার খুব কাছেই থাকে। সৌভাগ্যক্রমে চীনেরা তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্যে ধরাধরি করেনি। তা না হলে হাঙরের পাখনা, দুশো বছরের পুরোনো ডিম, পাখীর বাসা প্রভৃতি খেয়ে তারপরে সেগুলোকে অন্তত তখনকার মত পেটের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হত। আজ ১৪ই অগষ্ট। বোধ হয় ভাদ্রমাসের সুরু, তোদের ওখানেও যথেষ্ট গুমোট পড়ে থাকবে। কিন্তু শিউলির গন্ধে বোধ হয় আকাশ ভরা—মালতীরও অভাব নেই। এখানে ফুল বড়ো একটা চোখে পড়ে না—গাছ অনেক, ফলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাখী কেন যে এত কম তা বোঝা যায় না। কদাচিৎ দোয়েল দেখা যায়। কাক নেই, কোকিল নেই। ডুরিয়ান বলে কাঁঠালের মত ফল আছে, তার দুর্গন্ধ জগদ্বিখ্যাত। সাহস করে খেয়ে দেখেচি। যারা এ ফল ভালোবাসে তারা বলে এই ফল ফলের রাজা। বিশ্বভুবনে আম থাকতে এমন কথা যারা বলে তাদের জেলে দেওয়া উচিত। এখানে একদল বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। তারা বেশ ব্যবসা জমিয়েচে। সবাই বলে এদেশে টাকা করা খুব সহজ।

তুই এখন কোথায় আছিস? তোর নতুন বাড়িতে কি গুছিয়ে নিয়েছিস? এখন বর্ষায় মাটিতে রস আছে, বাড়ির চারদিকে বাগান করতে চাস তো গাছ লাগাবার এই সময়। আমার কোণার্কের গাছ-গুলোর অবস্থা কি রকম? তাদের জন্যে মনটাতে টান পড়ে।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি।

বাবা

শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রসংগ্রহ 'চিঠিপত্র' চতুর্থ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। নির্বাচিত কয়েকখানি চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে মুদ্রিত হইল।

অজিত—অজিতকুমার চক্রবর্তী
উমাচরণ—ভৃত্য
হেমলতা—দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী
কমলা—দিনেন্দ্রনাথের পত্নী
দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পটল, অরবিন্দ—শান্তিনিকেতনের ছাত্র
Miss Bourdette—মার্কিন মহিলা
সোমেন্দ্র—শান্তিনিকেতনের ছাত্র সোমেন্দ্র দেববর্মা
নিতাই, খোকা—শ্রীমীরা দেবীর পুত্র নিত্যেন্দ্রনাথ
ডাক্তার মৈত্র—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র
বঙ্কিম—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়
মঞ্জু—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমঞ্জুশ্রী দেবী
সাধু—ভৃত্য
পুপে—কবির পৌত্রী শ্রীনন্দিনী দেবী
জগদানন্দ—জগদানন্দ রায়
বীরেন—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেন, এঞ্জিনিয়র
কাসাহারা—শ্রীনিকেতনের জাপানী উদ্যানকর্মী
জগদীশ—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
বুড়ি—শ্রীমীরা দেবীর কন্যা শ্রীনন্দিতা দেবী
মরিস—পরলোকগত এইচ. পি. মরিস

স্বরলিপি

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ   স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

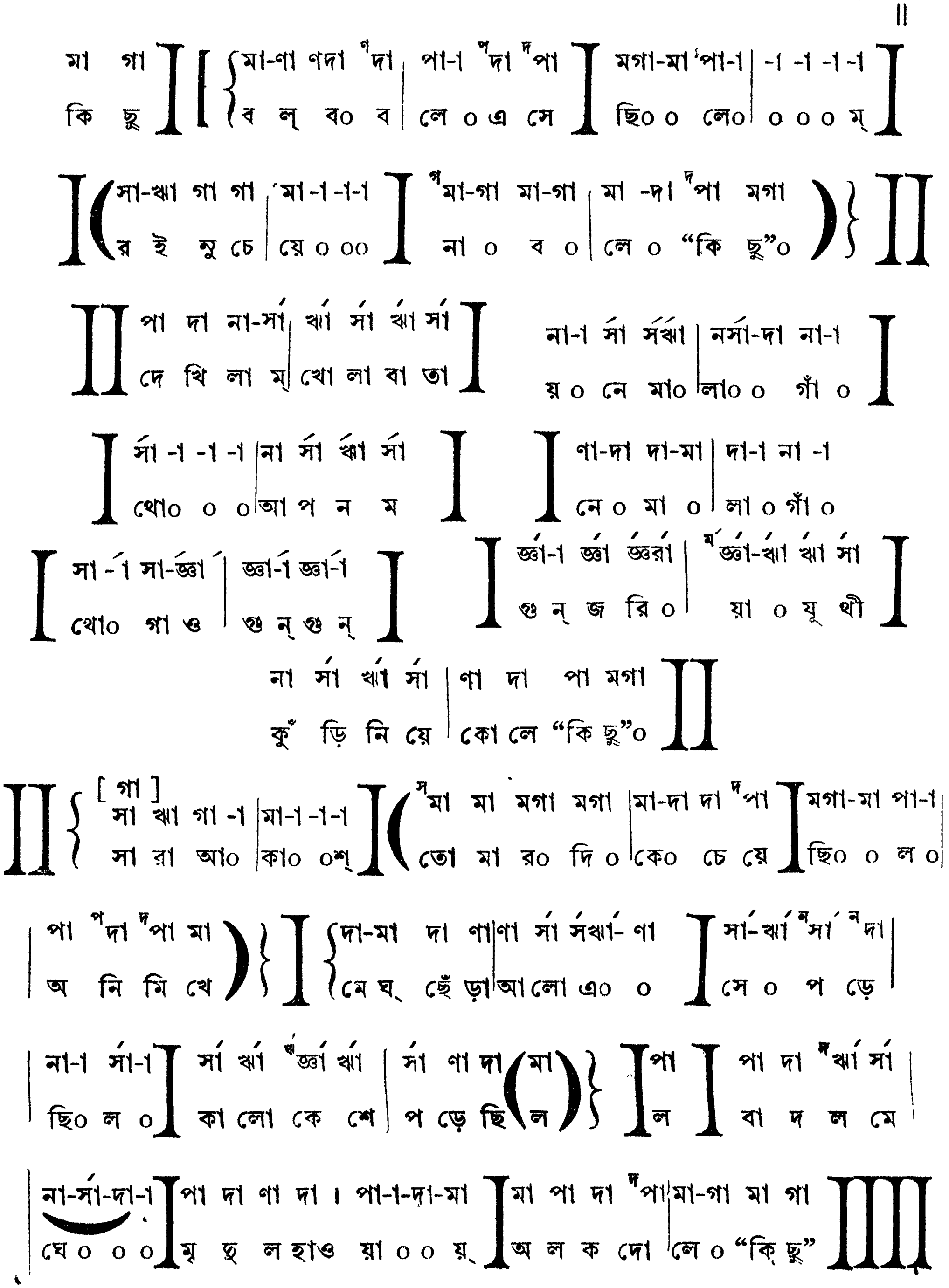

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

বিষয়সূচী

জীবনস্মৃতির খসড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৯
তৃতীয়দ্যূতসভা	শ্রীরাজশেখর বসু	১২৮
চাতক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৮
কবি-কথা	শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ	১৩৯
বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম অভিনয়ের তারিখ	শ্রীসুকুমার সেন	১৬৩
বৈশ্য সভ্যতা	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	১৬৪
অশোকের ধর্মনীতির পরিণাম	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	১৬৯
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী	শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী	১৮৭
রবীন্দ্রনাথ ও "সারস্বত সমাজ"	শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১৬
চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৫

চিত্রসূচী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্রাবলী

নিজের ছবি, স্বপ্নসৌধ

কাক, তুষারপুরী

আনন্দ কুমারস্বামী, প্রৌঢ়

জাতাসুর, "কনের মা কাঁদে···"

পুরীর মন্দির

কাঠ- ও লিনো- খোদাই

শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকানাই সামন্ত

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য — শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন — শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৪॥০, বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৩॥০

চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় :

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বিশ্বভারতী কার্যালয়

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা টেলিফোন : বড়বাজার ৩৯৯৫

মেঘদূত

মূল, শ্রীরাজশেখর বসু কৃত অনুবাদ, অন্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকা

কালিদাস ঠিক কি লিখেছেন জানতে হ'লে তাঁর নিজের রচনাই পড়তে হয়। যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না অথচ মূল রচনার রসগ্রহণের জন্য একটু পরিশ্রম স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন তাঁদের জন্যই এই পুস্তক লিখিত হ'ল। এতে প্রথমে মূল শ্লোক তারপর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেজন্য পুনর্বার অন্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ এবং প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হয়েছে। এই দুই প্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝতে পারবেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫০

জীবনস্মৃতির খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবার পূর্বে কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইহার একাধিক খসড়া করিয়াছিলেন দেখিতে পাই; প্রবাসীতে প্রেরিত পাণ্ডুলিপি শ্রীমতী সীতা দেবীর নিকট রক্ষিত আছে, ইহার পূর্ববর্তী আরো পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-ভবনে সংগৃহীত হইয়াছে।

জীবনস্মৃতি যে-আকারে এখন প্রচলিত বিষয়বস্তুতে প্রায় এক হইলেও তাহার সহিত এই পূর্বতন খসড়ার ভাষার অনেক স্থলেই প্রচুর পার্থক্য আছে এবং ইতস্তত এমন সব খুঁটিনাটি খবর আছে যে সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য কিছুতেই মিটিতে চায় না। রচনাকুশলতার দিক দিয়া মুদ্রিত গ্রন্থ অনেক সংহত; আলোচ্য খসড়াতে অনেক বিষয়ের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা আছে যাহা পরিবর্জন বা পরিমার্জন করিয়া সাহিত্যের দিক দিয়া লাভই হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিবেন। কিন্তু স্বীয় জীবন ও রচনার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা যাঁহারা পর্যাপ্ত মনে করেন না, সে-সম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতে আরো দু-চার কথা—এমন কি, পুরাতন কথা নূতন ভাষায় হইলেও—শুনিবার জন্য যাঁহারা লোলুপ, এবং আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যেখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলে চলিত সেখানে কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলে লেখককে যাঁহারা অতিকথনের অপবাদ দিবেন না, তাঁহারা আনন্দিত ও উপকৃত বোধ করিবেন মনে করিয়া এই পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ মুদ্রিত হইল। খসড়াটিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি আছে যাহা সম্ভবত কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, এবং মূল চিঠিগুলিও এতদিনে বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিকে "রেখাটানা ছবি"র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—এই খসড়াতে সে ছবির কয়েকটি রেখা যেন অধিকতর স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে—"ছবির ঘর"—হইতে প্রদর্শনীগৃহে প্রকাশ করিবার সময় কোনো রেখা মুছিয়া দিয়াছেন কোনো রেখা আভাসমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে,—হয়ত তাহাই শিল্পসম্মত হইয়াছে।

পূর্বে-অপ্রকাশিত অংশ যাহাতে বিচ্ছিন্ন খাপছাড়া বলিয়া মনে না হয় এইজন্য পূর্বে মুদ্রিত কোনো কোনো বাক্যও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে—সুপরিচিত কোনো অংশও মুদ্রিত হইয়া গিয়া থাকিলে 'জীবনস্মৃতি'র অনুরাগী পাঠক সহজেই তাহা মার্জনা করিতে পারিবেন, কেননা তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থের নবীনতা কখনো ম্লান হইবার নহে।

গ্রন্থসূচনাটিই পূর্বে অন্যরূপ ছিল:

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্ম্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয় কেননা তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান রচনা। কবির সর্ব্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা ত সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে আবার জীবনের কথা কেন?

এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধ সত্ত্বে নিজের জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে, দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।

ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্য রচনা ও জীবন রচনা ও দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।

কর্ম্মবীরদের জীবন কর্ম্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম্ম তাহাদের জীবনকে গঠিত করে। আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব। আজ এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে ১৮৯৪ সালে লিখিত এই ক'টি কথা হঠাৎ চোখে পড়িল :—

"আমি আমার সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্ত্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্ত্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে, সেই মুহূর্ত্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মত থাকত, ক্রমশঃ এমন দৃঢ় বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠচে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে—অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিষ কিছুতে পেতুম না।"

এই রকমে পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মত একত্রে রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু তেমন করিয়া লেখা নিতান্ত সহজ নহে। তেমন সময় এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ নাই, ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ করি।

এখন উপস্থিতমত আমার জীবন ও কাব্যকে জড়াইয়া একটা রেখাটানা ছবির আভাসপাত করিয়া যাইব। যে সকল পাঠক ভালবাসিয়া আমার লেখা পড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এটুকুও নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। আমার লেখা যাঁহারা অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন না তাঁহারাও সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন কল্পনা করিলে তাহাদের সন্দিগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কোচে কলম সরিতে চায় না—অতএব এই আত্মপ্রকাশের

সময় তাঁহাদিগকে অন্তত মনে মনেও এই সভাক্ষেত্রের অন্তরালে রাখিলাম বলিয়া তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আরম্ভেই একটা কথা বলা আবশ্যক, চিরকালই তারিখ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কাঁচা। জীবনের বড় বড় ঘটনারও সন তারিখ আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না আমার এই অসামান্য বিস্মরণশক্তি, নিকটের ঘটনা এবং দূরের ঘটনা—ছোট ঘটনা এবং বড় ঘটনা—সর্ব্বত্রই সমান অপক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আমার এই বর্ত্তমান রচনাটিতে সুরের ঠিকানা যদিবা থাকে তালের ঠিকানা না থাকিতেও পারে।

প্রথমে আমার রাশিচক্র ও জন্মকালটি ঠিকুজি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

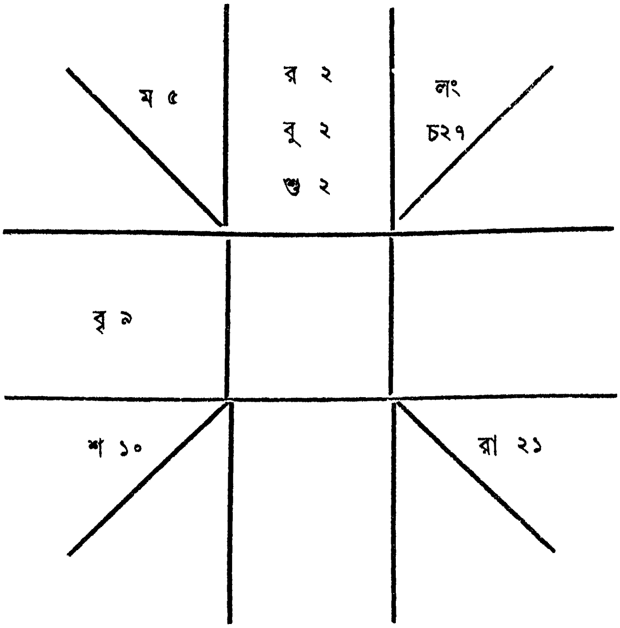

১৭৮৩।০।২৪।৫৩।১৭।৩০

কৃষ্ণাত্রয়োদশী

সোমবার।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে[শকে] অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে আমার জন্ম হয়। ইহার পর হইতে সন তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।

ঘর ও বাহির

"বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল।" এই বাগানে কি ভাবে তাহার সময় কাটিত, তাঁহার কল্পনা ছাড়া পাইত, জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত অংশে যে চিঠিখানি মুদ্রিত হইল তাহাতেও সেই কথাই আরো সহজভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বশেষে বালকের সন্ধ্যাযাপনের চিত্রটিও মনোরম :

…বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তের নারিকেল-পল্লবের ভিতর দিয়া কাঁচাসোনা-ঢালা শরতের প্রভাত আমার কাছে কি আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করিত তাহা স্মরণ করিয়া পরে কোনো কোনো কবিতায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিতে পারি নাই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমার চার বৎসর বয়সের শিশুপুত্রের কথা আলোচনা করিয়া একখানি চিঠি[১] লিখিয়াছিলাম, তাহাতে আছে—

"খোকা যখন নিমগ্নভাবে বসে থাকে তখন ওর মনের মধ্যে আমার প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে। দেখ্‌তে ইচ্ছা করে ওদের ঐ অল্পভাষার দেশে প্রদোষের আলোতে ভাবগুলো কি রকম অনির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে আনাগোনা করে। আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। …গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড় করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম—ভাব্‌তেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌লে সে কি একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হবে! পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন,—বাড়িভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়বাদলা—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী নানামূর্ত্তিতে আমার সঙ্গ দান করত। কুকুর বিড়াল ছাগল বাছুর প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে শিশুদের যেমন এক প্রকার আন্তরিক মিল আছে তেমনি এই বৃহৎ বিস্তৃত চঞ্চল মূক বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তার একটা হৃদয়ের যোগ আছে।"

সন্ধ্যার পরে বাড়ির মধ্যে আসিয়া দেখিতাম মা প্রদীপের আলোকে বসিয়া তাঁহার খুড়ির সঙ্গে বিন্তি খেলিতেছেন, তাঁহার বিছানার উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রথমে একচোট চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া লইতাম। বাহিরে সেজদাদা [হেমেন্দ্রনাথ] বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতেন তাহারি দুই একটা পদ আমি যাহা শুনিয়া শিখিতাম তাহাও কোনো কোনো দিন গলা ছাড়িয়া দিয়া মাকে আসিয়া শুনাইতাম। তাহার পর আহারান্তে তিন বালকে বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিলে আমাদের অতি সেকেলে কোনো একটি দাসী—শঙ্করী হোক, প্যারি হোক, তিনকড়ি হোক, কেহ একজন আসিয়া আমাদিগকে রূপকথা শুনাইত। ভাগ্যে, তখন সাহিত্যবিচারশক্তিটা এখনকার মত খরধার ছিল না—সুয়োরাণী দুয়োরাণী রাজকন্যা রাজপুত্রের কথা যতবার

---

১ চিঠিটির একাংশ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী-রচিত রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

যেমন করিয়াই পুনরুক্ত হইত, অন্তঃকরণটা নববর্ষার চাতকপাখীর মত উর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া শুনিত। আমি বিছানার যে প্রান্তটাতে শুইতাম তাহার সম্মুখেই ঘর বিভাগ করিবার একটা কাঠের বেড়া ছিল—সেই বেড়ার গায়ের চুনকাম মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া শাদায় কালোয় নানা প্রকারের রেখা রচনা করিয়াছিল—সেইগুলা মশারির ভিতর হইতে আমার কাছে নানা প্রকারের ছবিরূপে উদিত হইত এবং আসন্ননিদ্রায় অলস চক্ষে অর্দ্ধজাগরণের বিচিত্র স্বপ্নমালা রচনা করিত।

কবিতা রচনারম্ভ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা রচনা আরম্ভ-বিবরণ খসড়াটিতে কিছু বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে :

…[জ্যোতিঃপ্রকাশ] আমার হাতে একটা শ্লেট দিয়া বলিলেন পদ্মের উপর একটা কবিতা রচনা কর। তাহার পূর্ব্বে বারম্বার রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া ও শুনিয়া পদ্যচ্ছন্দ আমার কানে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়া ফেলিলাম। জ্যোতি খুব উৎসাহ দিলেন।…সেজদাদাকে বড় ভয় করিতাম। সত্য [সত্যপ্রসাদ] একদিন আমার খাতা লইয়া তাঁহার হাতে দিল। পদ্যলেখায় সময় যাপনকে পাছে তিনি অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন এই ভয়ে আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি এমন সময়ে আমার খাতা ফিরিয়া আসিল এবং যাহা রিপোর্ট পাওয়া গেল তাহাতে নিরাশ্বাস হইবার কোনো কারণ দেখিলাম না।

"এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে" যিনি "সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন"—"রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন না!"—সেই সোমেন্দ্রনাথের নাম জীবনস্মৃতিতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, খসড়াতে এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করা আছে। যে তিনজন বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম—"আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ এবং আমি।" 'বনফুল'ও ইঁহারই উৎসাহে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—খসড়াতে সে-কথা লিপিবদ্ধ আছে : "পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধ করি জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হইয়াছিল। এবং বছর তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াও ছিলেন।"

হিমালয়ে যাইবার পূর্বে বোলপুরে থাকিবার সময় নারিকেল গাছের তলায় কঙ্করশয্যায় বসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' রচনার কথা জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে—এই সময় "নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে।" কিশোর-কবিকে পরিহাস করিয়া প্রৌঢ় কবি স্নেহহাস্যে বলিতেছেন :

তখন শুধু কবিতা লিখিয়াই তৃপ্তি ছিল না তার সঙ্গে রীতিমত কবিত্ব করাও দরকার ছিল। তখন এটুকু বুঝিয়াছিলাম কবিত্ব করিবার কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। তাই ভোরে উঠিয়া বোলপুর বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় দক্ষিণ মাঠের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া পেন্সিল হাতে আমার খাতা ভরাইতে বসিতাম। ঘরের মধ্যে বসিয়া লিখিলে হয়ত ইহার চেয়ে অনেক বেশি মন স্থির করিয়া লেখা সম্ভব হইত কিন্তু তাহা হইলে নিজের কল্পনায় নিজেকে এমনতর ভয়ঙ্কর কবি বলিয়া ঠেকিত না। প্রভাতের আলোক উন্মুক্ত আকাশ, উদার প্রান্তর তরুর ছায়া—এ সমস্ত সেকালে ছাড়িবার জো ছিল

না! নবীন কবির ত একটা দায়িত্ব আছে! আমার কেহ দর্শক ছিল না জানি কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে ভুলাইবার প্রয়োজন ছিল। মধ্যাহ্নে খোয়াইয়ের মধ্যে বুনো খেজুরের ঝোপ হইতে ছোট ছোট অখাদ্য খেজুর খাইয়া নিজেকে জনহীন মরুরাজ্যে পথহারা তৃষ্ণার্ত্ত পথিক বলিয়া মনে হইত এবং সকাল বেলায় নারিকেলচ্ছায়ায় খাতা কোলে করিয়া বসিয়া নিজেকে কবি বলিয়া সন্দেহ থাকিত না।···

শ্রীকণ্ঠ সিংহ

···সঙ্গীতে একেবারে টস্ টস্ করিতেছে এমন ইঁহার মত দ্বিতীয় লোক আমি আর দেখি নাই ;—ইঁহার সমস্ত স্বভাবটির মধ্যে জোয়ারের জলের মত সঙ্গীত প্রবেশ করিয়াছিল। ছোট বড় সকলেরই প্রতি তাঁহার উচ্ছ্বসিত অজস্র প্রীতি এই সঙ্গীতেরই রূপান্তর। "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামক আমার একটি উপন্যাস লিখিবার বাল্য প্রয়াস যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে আমার এই বাল্যকালের বৃদ্ধ বন্ধুটির আদর্শেই বসন্তরায়কে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন

পিতার সহিত পার্বত্যাঞ্চলে ভ্রমণের সময় "বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া মার কাছে কি করিয়া সমস্ত বর্ণনা করিব সে কথাও ভাবিতাম।" এইরূপ তিনমাস প্রবাস ভ্রমণের পর "ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার অভ্যর্থনা তাহাব নবলব্ধ মর্যাদার উপযুক্ত হইয়াছিল। বিনাবিকারে এতটা সহ্য করা কঠিন" :

ভ্রমণের কাহিনী যাহা বিবৃত করিতে লাগিলাম তাহার মধ্যে কল্পনার অংশ যে মিশ্রিত হইয়া যায় নাই তাহা কি করিয়া বলিব! না মিশাইয়া উপায় ছিল না। প্রত্যক্ষ যে সকল দৃশ্য ও ঘটনার দ্বারা আমার মনে প্রচুর বিস্ময় ও প্রভূত আবেগ উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা বয়স্ক লোকের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া দেখি নিতান্তই ছোট হইয়া পড়ে। আমার কাছে সে সকল ব্যাপার যেমন প্রবলভাবে অদ্ভুতভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল শ্রোতার সম্মুখেও তাহাকে সেইভাবে দাঁড় করিতে গিয়া কথার পরিমাণটাকে যথাদৃষ্টের চেয়ে না বাড়াইয়া দিলে চলিল না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদিন নিদ্রাবেশের জোরে মধ্যাহ্নপাঠ হইতে সকাল সকাল নিষ্কৃতি পাইয়া একলা পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই না ফিরিলে পিতৃদেব উৎকণ্ঠিত হইবেন জানিয়া সহজ পথ ছাড়িয়া পাহাড়েদের পায়ে-চলা একটা দুর্গম সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। উঠিতে উঠিতে সেই পথের পাশে এক জায়গায় কতকগুলা ঝাঁটানো শুক্‌নো পাতা জড় ছিল ইচ্ছা করিয়া তাহার উপর পা দিলাম—দিবামাত্র আমার পা হড়্‌কিয়া গেল এবং যষ্টির সাহায্যে পতন হইতে রক্ষা পাইলাম। রক্ষা ত পাইলাম, কিন্তু আমার কল্পনা যাইবে কোথায়? আমি মনে মনে ভাবিলাম নিদারুণ একটা বিপদ হইতে কোনোক্রমে রক্ষা পাইলাম এবং এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একাকী দুরূহ পথে দুঃসাধ্য ভ্রমণের বিপদ গৌরব মনকে পুলকিত করিয়া তুলিল। কিন্তু ঘটিলে এবং সমস্ত অবস্থা প্রতিকূল হইলে জীবনের ইতিবৃত্তে যাহা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিতে পারিত অথচ ঘটে নাই বলিয়া সামান্য একটুখানি পা-হড়্‌কানির উপর দিয়াই গেল শ্রোতৃসমাজে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করি কি উপায়ে! প্রথমত যতদূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম প্রয়োজনের অনুরোধে তাহার দূরত্ব

বোধ করি কিছু বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহার পরে, ফিরিয়া আসিবার সময় পথের মধ্যে যদি সন্ধ্যা হইয়া পড়ে তবে সেই বিঘ্নের সঙ্গে বন্য জন্তু, বিশেষত ভালুকের আশঙ্কটা যোগ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার পরে পড়িলে যে কি ভয়ানক পড়া হইতে পারিত তাহার বর্ণনাও অপেক্ষাকৃত মিতভাষায় বলা উচিত ছিল কিন্তু বলা হয় নাই সে কথা স্বীকার করিব।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিবার পর "ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক কঠিন হইয়া উঠিল" জীবনস্মৃতিতে এইরূপ উল্লিখিত আছে। এই ইস্কুল পালানোর সঙ্গে মাতৃবিয়োগের যে সম্পর্ক আছে সে-কথা জীবনস্মৃতি হইতে খুব স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না।

[পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর]···এইরূপ কিছুদিন ধরিয়া ঘরে ঘরে আদর পাওয়ার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে স্বরু করিলাম। আমার পলায়নের উপায়গুলি কোনো ছাত্রের অনুকরণীয় নহে।···

বাড়ীতে আমার আদরের পরিমাণ অতিরিক্ত হইবার আর একটি কারণ ঘটিল। এই সময় মার মৃত্যু হইল।···এই ঘটনার পর শ্রাদ্ধশান্তিতে ও শোকের অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া গেল। তাহার পর মাতৃহীন বালক বলিয়া অন্তঃপুরে বিশেষ প্রশ্রয় পাওয়াতে ইস্কুলে যাওয়া প্রায় একপ্রকার ছাড়িয়াই দিলাম।···

আমি বুঝিতে পারিতাম আমি সকলেরই অবজ্ঞাভাজন হইয়াছি. এবং বিদ্যার অভাবে বড় হইলে আমার অবস্থা শোচনীয় হইবে—ইহাতে মনে মনে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত ও পীড়িত করিত কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশ বৎসরের পর বৎসর প্রায় প্রতিদিন হরিণবাড়ির পাথরভাঙা কয়েদীর মত ক্লাসে আবদ্ধ হইয়া নীরস পড়া লইয়া মাথা ঘোরানো ও তাহাই অভ্যাস করিবার জন্য বাড়ি ফিরিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত খাটুনি ও পরদিন সমস্ত সকালটা ইস্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া ও তাহারই কল্পনায় বিষাদভাবে বিমর্ষ হইয়া জীবনের সুদীর্ঘকাল যাপন করা মনে করিলে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত—আমি কোনোমতেই কোনো বিদ্রূপে কোনো লাঞ্ছনায় কোনো অনিষ্টের ভয়ে তাহা অতিক্রম করিতে পারিতাম না।

ঘরের পড়া

ছেলেবেলা হইতে বাংলা বই যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছি সমস্তই গিলিয়া পড়িয়াছি। তখন সাহিত্য এমন ফলাও ছিল না। মৎস্যনারীর গল্প, সুশীলার উপাখ্যান, রবিন্সন্ ক্রুশো আমাদের পড়িবার খোরাক ছিল। রবিন্সন্ ক্রুশো কতবার পড়িয়াছি বলিতে পারি না। ছেলেদের পড়িবার এমন বই কি আর জগতে আছে? আশ্চর্য্য এই যে, আজকাল ছেলেদের জন্য রংবেরঙের এত শত বই বাহির হইতেছে অথচ রবিন্সন্ ক্রুশোর তর্জ্জমা বাজারে পাওয়া যায় না। আমার ত মনে হয় ভাগ্যে এখন আমি বাংলা দেশে শিশু হইয়া জন্মাই নাই। এখন জন্মিলে রামায়ণ মহাভারত পড়া হইত না, রূপকথা বলিবার লোক পাইতাম না, সেই ছবিওয়ালা রবিন্সন্ ক্রুশো বইখানি পরম রত্নের মত হাতে আসিয়া পৌঁছিত না। তখনকার দিনের যে সমস্ত রঙীন ছবিওয়ালা ছেলেভুলানো বই পাইতাম, সে সকল বইয়ে শিশুপাঠকের প্রতি শ্রদ্ধার লেশমাত্র নাই। তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশুজ্ঞান করিয়া কেবলই ভুলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি শিশুরা কেবলমাত্র শিশু নহে, তাহাদিগকে যতটা অবোধ মনে করিয়া তাহাদের পাঠ্যগুলিকে

অপাঠ্য করিয়া তোলা হয় তাহারা ততটা অবোধ নয়। যেমন কোনো কোনো পিতামাতা ছেলের পানীয় দুধে অনাবশ্যক জল মিশাইতে থাকেন। তাঁহারা কেবলি আশঙ্কা করেন ছেলের পাকশক্তি দুর্ব্বল—এমনি করিয়া যথার্থই তাহার পাকযন্ত্রকে দুর্ব্বল ও শরীরকে পুষ্টিহীন করিয়া তোলেন, ছেলেদের পড়া সম্বন্ধেও অধিকাংশের ব্যবহার সেইরূপ। একথা মনে রাখা উচিত ছেলেদের পক্ষে সব কথাই সম্পূর্ণ বুঝিবার প্রয়োজন নাই ; মাঝে মাঝে ঝাপ্‌সা থাকিলে মাঝে মাঝে না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। তাহারা যে সংসারে আসিয়াছে তাহাও তাহাদের কাছে অনতিস্পষ্ট—তাহার মাঝে মাঝে অনেকখানিই অন্ধকার—কিন্তু তাহাতে ছেলেদের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না—এই সংসারটাকে বুঝিয়া না বুঝিয়াও তাহারা মোটের উপরে ইহাকে আপনার মনের মধ্যে এক রকম করিয়া খাড়া করিয়া লয়। আমরা ছেলেবেলায় যে সমস্ত বই পড়িতাম তাহার কি আগাগোড়াই বুঝিতাম? বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখনো আমরা ক্রিটিক্ হইয়া উঠি নাই—যাহা অবোধ্য তাহা অতি অনায়াসেই বর্জ্জন করিয়া যাহা আমাদের গ্রাহ্য তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতাম। ইহাতে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ভাবের ছেদ হইত কিন্তু তাহাতে রসের কিরূপ ব্যাঘাত হয় তাহা আমরা জানিতামই না। আমাদের মনটাও ত রচনাকার্য্য হইতে বিরত ছিল না—যেখানে যেটুকু অভাব ঠেকিত নিজেই তাহা পূরণ করিয়া লইত। এখন বড় সাবধানে বড়ই পাত্‌লা করিয়া জোলো করিয়া ছেলেদের পড়িতে দেওয়া হয় — বেচারাদিগকে অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় কিন্তু তাহারা জানে না এ সম্বন্ধে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কত বেশি সৌভাগ্যবান্ ছিলাম।...

...অথচ এই মাসিকপত্র [বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ] ছেলেদের জন্য লেখা নহে—তখনকার সাধু বাংলা ভাষা সহজ ছিল না, সমস্তই যে নিঃশেষে বুঝিতাম তাহা নয়, তবু তাহা আমার ক্ষুধার খাদ্য ছিল।...এখন যে সকল কাগজ বাহির হইতেছে তাহার মধ্যে নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ বাহির হইলেই পাঠকেরা অপমান বোধ করে—অথচ পনেরো আনা পাঠক নর্হাল তিমির বিবরণ কিছুই জানে না।...আমাদের সাহিত্যে ইহা ["মোটা ভাত মোটা কাপড়"-এর ব্যবস্থা] উপেক্ষিত হওয়াতে দেশের অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হইতেছে। আজকাল বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনই আমাদের দেশের মাসিক পত্রের একমাত্র আদর্শ হওয়াতে, সকলেই স্বাধীন "চিন্তাশীল" লেখক হইবার দুরাশা করাতেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এক একবার মনে হয় রামানন্দবাবুর সচিত্র পত্র "প্রবাসী" কিয়ৎপরিমাণে এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও সম্পূর্ণ পরিমাণে সঙ্কোচ দূর করিতে পারিতেছে না।

সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ বাল্যেই বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলেন এ-কথা জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :

একথা বলা বাহুল্য, তখন বিদ্যাপতি অথবা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদ অবাধে পড়িবার উপযুক্ত বয়স আমার হয় নাই, কিন্তু আমি সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ইহাতে আমার বাল্যকালের কল্পনাকে নিঃসন্দেহই কিছু আবিল করিয়াছিল কিন্তু সে আবিলতা এক সময়ে আপনিই কাটিয়া গেল কিন্তু পদগুলির গভীর সৌন্দর্য্য আমার অন্তঃকরণের সহিত জড়িত হইয়া গেছে। কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে কোনো বই বাহির হইতে আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। মনে আছে দীনবন্ধু মিত্রের "জামাইবারিক" বইখানি আমার কোনো সতর্ক আত্মীয়ার হাত হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে

আমাকে নানাপ্রকার কৌশল[১] করিতে হইয়াছিল। এই সকল বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্যভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি;—প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা "করুণা" নামক গল্প তাহার নমুনা। কিন্তু এই অকালোচিত জ্ঞানগুলি মস্তিষ্কের উপরিভাগেই ছিল তাহারা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ এখনকার কালের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাই যথার্থভাবে পরিণত হইয়া উঠিতে আমার সুদীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার বালকবুদ্ধি আমাকে অনেক দিন ত্যাগ করে নাই—আমি অধিক বয়সেও নানা বিষয়ে অদ্ভুতরকম কাঁচা ছিলাম। একটা কিছু জ্ঞানে জানা এবং তাহাকে আত্মসাৎ করার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে—আমার বালককালের সংসারজ্ঞান তাহার একটা দৃষ্টান্ত। এবং সেই দৃষ্টান্ত হইতেই আজ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি ইংরাজি হইতে আমরা যে সকল শিক্ষা খুব পাইয়াছি বলিয়া চারিদিকে ফলাইয়া বেড়াইতেছি যদি কালক্রমে সেই শিক্ষা যথার্থভাবে আমাদের প্রকৃতিগত হয় তখন বুঝিতে পারিব আমাদের পূর্ব্বের অবস্থা কিরূপ অদ্ভুত অসত্য এবং হাস্যকর এবং তখন আমাদের আস্ফালনও যথেষ্ট শান্ত হইয়া আসিবে।

এই উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া লইব। যখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প ছিল এবং দূষিত বুদ্ধি আমার জ্ঞানকেও স্পর্শ করে নাই এমন সময় একদিন বড়দাদা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া ইন্দ্রিয় সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ আমার মনে এমনি গাঁথিয়া গিয়াছিল, যে ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলন আমার কাছে বিভীষিকা স্বরূপ হইয়াছিল। বোধ করি, এইজন্য বাল্যবয়সে অনেক সময়ে আমার জ্ঞান ও কল্পনা যখন বিপদের পথ দিয়া গেছে তখন আমার সঙ্কোচপরায়ণ আচরণ নিজেকে ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

নানা বিদ্যার আয়োজন—ঘরের পড়া—বাড়ির আবহাওয়া

শৈশব ও কৈশোরে পঠিত বই প্রভৃতি সম্বন্ধে এই খসড়াটির স্থানে স্থানে একটু বিস্তৃত উল্লেখ আছে, সেগুলি উদ্ধৃত হইল :

…আমরা যখন মেঘনাদ বধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ করি নয় বছর হইবে।…

…[জ্যোতিষ সম্বন্ধে রচনা প্রসঙ্গে] বাংলা ভাষায় তখন আমার যতটা অধিকার ছিল ততটা তিনি [মহর্ষি] আশাও করেন নাই।…

…উপনয়নের পূর্ব্বে কয়েক মাস ধরিয়া উপনিষদের মন্ত্রগুলি আমরা যথাবিধি স্বরের সহিত অভ্যাস করিয়াছিলাম।…

…[কুমারসম্ভব] তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

…সেই [ম্যাকবেথ] অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেক দিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।

১। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে এই সকল কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ সকলেই পড়িয়াছেন।

…আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা [স্বপ্নপ্রয়াণ] শুনিবার চেষ্টা করিতাম।…স্বপ্নপ্রয়াণ বারম্বার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল…তথাপি আমার লেখায় তাঁহার নকল ওঠে নাই।…

…তখন আমার কাব্যলেখার আর একটি আদর্শ ছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী…ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্ব্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমাকে তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।…

…পৌল্-বর্জ্জিনী পড়ার পর হইতে সমুদ্র ও সমুদ্রতীর আমার অন্তরের সামগ্রী হইয়াছিল। আরো বড় হইয়া যখন কপালকুণ্ডলা পড়িলাম তখন সমুদ্রতীরের সৈকততটপ্রান্তবর্ত্তী অরণ্যচ্ছবি আমার মনে সেই জাদু করিয়াছিল।…

…তখন আমার বয়স বোধ করি এগারো হইবে।…আমার সেই কিশোরবয়সে মনের কুঁড়িটা যখন একটু একটু খুলিবে খুলিবে করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই তাহার উপরে নবোদিত বঙ্গদর্শনের কিরণপাত হইয়াছিল।

গীতচর্চ্চা

…কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায়, ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে" গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।

চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্ম্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কি নূতন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি—এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা, এইটেই সমস্তটা নয়। যখন এই বিপুল রহস্যময় প্রাসাদে সুর আর একটা মহলের একটা জালনা ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া দেয় তখন আমরা কি দেখিতে পাই! সেখানকার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নাই সেই জন্য ভাষায় বলিতে পারি না কি পাইলাম—কিন্তু বুঝিতে পারি সেদিকেও অপরিসীম সত্য পদার্থ আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানতঃ বস্তু ও আলোকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্য্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না—কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতি বিচিত্র সঙ্গীতরূপেই প্রকাশ পাইত—তবে অক্ষররূপে নহে বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুর যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে

চেষ্টা করে তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কতরকম ভাবে যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।

সেই সময় জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্রের উত্তেজনায়, কতক বা তাঁহার রচিত সুরে কতক বা হিন্দুস্থানী গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম। তখন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গল সঙ্গীত আর্য্যদর্শনে বাহির হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়াছিলাম: এই সারদামঙ্গলের আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।

তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া ষ্টেজ্ বাঁধিয়া এই বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। তাহাতে আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চে আমার প্রথম অবতরণ। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—তিনি এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে দশরথ কর্ত্তৃক মৃগভ্রমে মুনিবালকবধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহাও অভিনীত হইয়াছিল। আমি তাহাতে অন্ধমুনি সাজিয়াছিলাম।...

ভানুসিংহের কবিতা

কবির নিজের মন্তব্য সম্বল করিয়া ভানুসিংহের পদাবলী যাঁহারা অপাঠ্য বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে আরও কিছু পরিহাস নিম্নোদ্ধৃত অংশে সঞ্চিত আছে:

ভানুসিংহের কবিতা দেখিয়া তখনকার কোনো কোনো পাঠক ভুলিয়াছিলেন জানি—কিন্তু তখন যদি প্রাচীন বৈষ্ণব পদগুলি বাঙালী পাঠকসমাজে যথেষ্ট পরিচিত থাকিত তাহা হইলে ভুলিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ইহার ভাষা একটা যদৃচ্ছাকৃত ব্যাপার এবং ইহার ভাববিন্যাস নিতান্তই আধুনিক ও কৃত্রিম। ইটালিয়ান ঝিঁঝিট নামে খ্যাত একটা সুরে সরোজিনী নাটকের "প্রেমের কথা আর বোলো না" গান রচিত হইয়াছিল। বিলাতে গিয়া মনে করিয়াছিলাম ইটালিয়ান ঝিঁঝিট শোনাইলে শ্রোতারা খুসি হইবেন। অবশেষে গান শোনানো হইলে একটি মহিলা নিতান্তই ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"এ সুরটাকে তোমাদের যে কোনো খুসি নাম দিতে পার কিন্তু ভগবানের দোহাই, ইহাকে ইটালিয়ান বলিবার প্রয়োজন নাই।" তেমনি ভানুসিংহের ভাষার আর যে কোনো নামকরণ করা যাইতে পারে কিন্তু ইহাকে পদাবলীর ভাষা বলা চলে না।

স্বাদেশিকতা

শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পে সাহিত্যে স্বাদেশিকতায় বাংলাদেশের নব উদ্বোধন সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, এই কারণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইরূপ রচনায় ঠাকুর-পরিবারের কথাই অনেকটা লিখিতে হইবে, উহা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই সংকোচজনক। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত সেই সংকোচবশতই নিম্নোদ্ধৃত অংশের অনেকটা জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বর্জন করিয়াছিলেন, কতক সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন:

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পরিবারে বিদেশী প্রথার কতকগুলি বাহ্য অনুকরণ অনেকদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মতো বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। আমার পিতামহ ও ছোটকাকা মহাশয় [নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর] বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে। বড়দাদা বাল্যকাল হইতে আন্তরিক অনুরাগের সহিত মাতৃভাষাকে জ্ঞান ও ভাবসম্পদে ঐশ্বর্য্যবান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মেজদাদা বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাবপ্রকাশের ভাষা বাংলাই রহিয়া গেছে। সেজদাদার অকালে মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তিনিও নিজের চেষ্টায় ও মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞানের যে পরিমাণ চর্চ্চা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জ্যোতিদাদাও তরুণ বয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পরিবারে পিতৃদেবকে ইংরাজিপত্র লেখা একেবারে নিষিদ্ধ।···আমরা আপ্‌নাআপ্‌নির মধ্যে কেহ কাহাকে এবং পারৎপক্ষে কোনো বাঙালিকে ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখি না —আমাদের এই আচরণটিকে যে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম আশা করি একদা অদূর ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্ব্বদাই ভোজ দিতেন এ-কথা সকলেই জানেন—কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়!—তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাবলোলুপতার উপসর্গ আমাদের কোনোকালে দেখা দেয় নাই।

দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশে আমাদের বাড়ি হইতে "হিন্দু মেলা" নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল।···বড়দাদা এবং আমার খুড়তত ভাই গণেন্দ্রদাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।···

কবি-কাহিনী

···বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "বান্ধব" পত্রে এই কাব্য সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম। ইহার পর ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে আমার প্রভাত-সঙ্গীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি একথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না।

সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম।

ইঁহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি যথার্থ বল লাভ করিয়াছিলাম—ইঁহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার রচনার আরম্ভকালে সমালোচক সম্প্রদায় বা পাঠকসাধারণের নিকট এ সম্বন্ধে আমি অধিক ঋণী নহি।

আমেদাবাদ

বিলাতযাত্রার পূর্বে আমেদাবাদে শাহিবাগ প্রাসাদে কিভাবে তাঁহার দিনরাত্রি কাটিত, তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যায় :

সকলের উপরের তলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রম ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম—তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

"নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো !"

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম—কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতীনদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না। "বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটা এম্‌নি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগসুরে বসাইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। "শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি" "আঁধার শাখা উজল করি" প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।

ইংরাজিতে আমি যে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল। মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার তুরূহতা বিচারমাত্রে না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি, অ্যাংলো স্যাক্সন ও অ্যাংলো নর্ম্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি।

ভগ্ন হৃদয়

ভগ্নহৃদয় রচনা সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে যে চিঠিখানি মুদ্রিত আছে তাহা পাঠকের সুপরিচিত—"তখম আমার বয়স আঠারো।···একটা বস্তুহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখ:সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্বপদার্থ ছিল না কেবল নিজের মনটাই ছিল;—তাই আপনমনে তিল তাল হয়ে উঠত।" চিঠিখানির শেষাংশ জীবনস্মৃতিতে নাই, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

তিল তাল হয়ে না উঠলেও মনের সন্তোষ হত না—মনে হত ঠিক উপযুক্ত হচ্ছে না।··· যা হোক্ সেই আঠারো বৎসর বয়সের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে রাশি রাশি কুয়াশা দেখতে পাই, সেই অনির্দ্দিষ্ট কুয়াশায় আমার তখনকার জীবন একটা অশ্রুময় ভাবে আর্দ্র করে রেখেছিল। আমার যে একটা অস্থির বিষাদের ভাব ছিল তার নির্দ্দিষ্ট কোনো সত্য কারণ ছিল না—বরঞ্চ অনির্দ্দিষ্টতাই তার যথার্থ কারণ। মন কি চায় তা ঠিক ঠাওরাতে পারত না—কারণ, চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, উপন্যাস এবং কাব্য থেকে যা জান্‌তে পেত সেইটেকেই আপনার মনে করত। অনেক সময়ে রোগের একটা নাম দিতে পারলেও আরাম পাওয়া যায়—আমার সে সময়কার মানসিক ভাবটা নিজের একটা নামকরণ করবার চেষ্টা করত। তার নিজের মধ্যে অবশ্যই একটা সত্য ছিল কিন্তু সে সত্যটা যে কি তা সে কিছুতেই ঠাওরাতে পারত না বলে আপনাকে পুঁথিসম্মত অন্য পাঁচ নামে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা করে তুল্‌ত। কেবল যে মিথ্যা পরিচয় তা নয় তদনুসারে তাকে মিথ্যা অভিনয়ও কর্‌তে হত।

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবি নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ যে নিঃসংশয়তা অনুভব করিলেন সে-কথা তিনি জীবনস্মৃতিতে ও অন্যত্র আলোচনা করিয়াছেন; তবুও খসড়ার এই অংশটি উদ্ধারযোগ্য:

এক সময় তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল—জ্যোতিদাদারা বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি একা সেই বৃহৎ ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলি লিখিতে আরম্ভ করি। এই কবিতাগুলি লিখিবার সময় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বলিয়া উঠিয়াছিল—এইবার তুমি ধন্য হইলে! এতদিন পরে তুমি নিজের কথা নিজের ভাষায় লিখিতে পারিলে। এখন আর সঙ্গীতের জন্য তোমাকে অন্য কাহারো যন্ত্র ধার করিয়া বেড়াইতে হইবে না।···পক্ষীশাবক যেদিন হঠাৎ নিজের পাখা মেলিয়া বিনা পরের সাহায্যে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে সেদিন নিজের সম্বন্ধে তাহার যে একটা বিস্ময় ও আনন্দ ঘটে—এখন হইতে আমি স্বাধীন বলিয়া সে যে একটা উল্লাস অনুভব করে—আমিও সেইরূপ নিজের স্বাধীন অধিকার লাভের আনন্দে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি সর্ব্বপ্রথম নিজের সুরে নিজের কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার ছন্দ ভাষা ভাব সমস্তই কাঁচা হইতে পারে এবং কাঁচা হইবারই কথা কিন্তু দোষগুণ সমেত তাহা আমার।

এই কারণে এই সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলি নূতন গ্রন্থাবলীতে[১] স্থান পাইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রচিত

১। কাব্যগ্রন্থ, মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৩১০

"পথিক" নামক কেবল একটি কবিতা "যাত্রা" খণ্ডে বসিয়াছে এবং ভানুসিংহের পদ ও কতকগুলি গান ইহার পূর্ব্বের রচনা।

গঙ্গাতীর

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন চন্দননগরে গঙ্গার ধারের বাগানে আশ্রয় লইলেন তখনকার কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিতেছেন :

যেমন করিয়াই দেখি, এইখানেই আমার স্থান, এই আমার আপনার সামগ্রী! এরূপ পরিবেষ্টনের, এরূপ জীবনের যদি কোনো দোষ থাকে তাহা আছে কিন্তু যেটুকু লাভ করিতে পারি তাহা এইখান হইতেই পারি - যাহা কিছু আপনার করিয়াছি তাহা এই আমার অলস দেশের অবসরপূর্ণ শান্ত ছায়ার মধ্যেই করিয়াছি। আরো ত অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি ভাল জিনিষ প্রশংসার জিনিষ অনেক দেখিয়াছি—কিন্তু সেখানে ত আমার এই মার মত আমাকে কেহ অন্ন পরিবেষণ করে নাই। আমার কড়ি যে হাটে চলে না, সেখানে কেবল সকল জিনিষে চোখ বুলাইয়া ঘুরিয়া দিন যাপন করিয়া কি করিব! যে বিলাতে যাইতেছিলাম সেখানকার জীবনের উদ্দীপনাকে কোনোমতেই আমার হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে নাই।[১]...আমি বৈলাতিক কর্ম্মশীলতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছি না। আমি নিজের কথা বলিতেছি।...

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে আর একখানি পুরাতন চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

"যৌবনের আরম্ভ সময়ে বাংলা দেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণের বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত অজস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্ম্মহীন কল্পনা, আপনমনে সৌন্দর্য্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি। আজ আমার চারদিকে নবজীবনের প্রবলতা ও চঞ্চলতা দেখে মনে হচ্চে আমারও হয়ত এরকম হতে পারত। কিন্তু আমরা সেই বহুকাল পূর্ব্বে জন্মেছিলেম—তিনজন বালক — তখন পৃথিবী আর একরকম ছিল। এখনকার চেয়ে অনেক বেশি অশিক্ষিত সরল, অনেক বেশি কাঁচা ছিল। পৃথিবী আজকালকার ছেলের কাছে Kindergarten-এর কর্ত্রীর মত—কোনো ভুল খবর দেয় না—পদে পদে সত্যকার শিক্ষাই দেয়—কিন্তু আমাদের সময়ে সে ছেলে ভোলাবার গল্প বল্‌ত—নানা অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়ে দিত - এবং চারিদিকের গাছপালা প্রকৃতির মুখশ্রী কোনো এক প্রাচীন বিধাতৃমাতার বৃহৎ রূপকথা রচনারই মত বোধ হত, নীতিকথা বা বিজ্ঞানপাঠ বলে ভ্রম হত না।"

১। এই প্রসঙ্গে, প্রথমবার বিলাতবাস সম্বন্ধে, খসড়া হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

"একটা আশ্চর্য্য এই দেখিয়াছি, যতকাল বিলাতে ছিলাম আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ যেন একেবারে শুষ্ক হইয়াছিল। দেখা গেল আমার এই চিরপরিচিত আকাশের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও আমার গান গাহিবার কথা মনেও উদয় হয় না। কেবল ডেভনশিয়ারের পুষ্পবিকীর্ণ বসন্তবিরাজিত টর্কি নগরীর সমুদ্রতটে "মগ্নতরী" বলিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম সেও জোর করিয়া লেখা।"

এই উপলক্ষ্যে এখানে আর একটি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিব। এ চিঠি অনেকদিন পরে আমার ৩২ বছর বয়সে গোরাই নদী হইতে লেখা—কিন্তু দেখিতেছি সুর সেই একই রকমের আছে। এই চিঠিগুলিতে পত্রলেখকের অকৃত্রিম আত্মপরিচয়—অন্তত বিশেষ সময়ের বিশেষ মনের ভাব প্রকাশ পাইবে। ইহার মধ্যে যে ভাবটুকু আছে তাহা পাঠকের পক্ষে যদি অহিতকর হয় তবে তাঁহারা সাবধান হইবেন—এখানে আমি শিক্ষকতা করিতেছি না।

এইখানে ছিন্নপত্রে প্রকাশিত ১৬ মে ১৮৯৩ তারিখের চিঠিটি উদ্ধৃত আছে—"আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব ?·· আশ্চর্য্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।···"

এখনকার কোনো কোনো নূতন মনস্তত্ত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে, একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলা মানুষ জটলা করিয়া বাস করে, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার মধ্যেকার যে অকেজো অদ্ভুত মানুষটা সুদীর্ঘকাল আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে—যে মানুষটা শিশুকালে বর্ষার মেঘ ঘনাইতে দেখিলে পশ্চিমের ও দক্ষিণের বারান্দাটায় অসংযত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত, যে মানুষটা বরাবর ইস্কুল পালাইয়াছে, রাত্রি জাগিয়া ছাদে ঘুরিয়াছে, আজও বসন্তের হাওয়া বা শরতের রৌদ্র দেখা দিলে যাহার মনটা সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া পালাই পালাই করিতে থাকে, তাহারই জবানী কথা এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতের মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইবে। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখিব আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে—যথাসময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রভাত-সংগীত

সদর স্ট্রীটে বাসকালে অকস্মাৎ একদিন যে "একটা আশ্চর্য উলটপালট হইয়া গেল," সূর্যোদয় দেখিয়া "চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা উঠিয়া গেল," সে-কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি ও অন্যত্র বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই ঘটনার পরে রচিত প্রভাত-সংগীতের কবিতা সম্বন্ধেও অনেকবার আলোচনা করিয়াছেন—এই প্রসঙ্গে খসড়া হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলিও উল্লেখযোগ্য :

আমি সেইদিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিলাম।···

সেদিন আমাদের বাড়ির সম্মুখে একটা গাধার বাচ্ছা বাঁধা ছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একটি বাছুর আসিয়া তাহার ঘাড় চাটিয়া দিতে আরম্ভ করিল এই অপরিচিত মূঢ় পশু-শাবকটির ভাষাহীন স্নেহ-সম্ভাষণ দৃশ্যে একটা বিশ্বব্যাপী রহস্যবার্ত্তা আমার বুকের পাঁজরগুলার ভিতর দিয়া যেন বাজিয়া উঠিতে লাগিল।···

প্রভাত হল যেই কি জানি হল এ কি !
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি !
প্রভাত বায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরম মাঝে মোর কি জানি কি যে হয় !

এই উচ্ছ্বাস ও এই ভাষাকে বিদ্রূপ করা যাইতে পারে কিন্তু যে বালক ইহা রচনা করিয়াছিল তাহার পক্ষে ইহা কিছুই মিথ্যা ছিল না।···

···এই দার্জ্জিলিঙে প্রভাত সঙ্গীতের একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম প্রতিধ্বনি। সে

কবিতা অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ বলিয়া ঠেকে। আমি তাহার যে অর্থ অনুমান করিতেছি এই উপলক্ষ্যে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি।

জগৎকে সাক্ষাৎ বস্তুরূপে যে দেখিতেছি,—মাটিকে মাটি, জলকে জল, অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানিতেছি তাহাতে আমাদের আবশ্যকের কাজ চলে সন্দেহ নাই। অনেকের পক্ষে অন্তত অধিকাংশ সময়ে জগৎ কেবল আবশ্যকের জগৎ হইয়াই থাকে। কিন্তু এই জগৎই যখন আমাদিগকে সৌন্দর্য্যে বিহ্বল রহস্যে অভিভূত করে তখন ইহা কেবল আমাদের পেট ভরায় না। অন্তরঙ্গভাবে আমাদের অন্তঃকরণকে আলিঙ্গন করে—বস্তু যেন তখন তাহার বস্তুত্বের মুখস্ ফেলিয়া দিয়া চিদ্ভাবে আমাদের চিত্তকে প্রণয়সম্ভাষণ করে। বস্তুজগৎ ভাবের অন্তঃপুরে সেই যে একটা বহুদূরত্বের আভাস বহন করিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া প্রবেশ করে তাহাকেই আমি প্রতিধ্বনি বলিতেছি। জগতের এই মূর্ত্তি ফসলের কথা বলে না, বাণিজ্যের কথা বলে না ভূগোল বিবরণ ও ইতিবৃত্তের কথা বলে না—যেখানকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া দেয় সে কোথাকার কথা? সে কোন্ জায়গা, যেখানে বিশ্বজগতের সমস্ত ধ্বনি প্রয়াণ করিতেছে এবং সেখান হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভাবুকের অন্তঃকরণকে সেই রহস্যনিকেতনের দিকে আহ্বান করিতেছে!

অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,—
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,—
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,—
চেতনার, নিদ্রার মর্ম্মর,—
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,—
জীবনের, মরণের স্বর,—
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,—
পৃথিবীর, চন্দ্রমার গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,—
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানি রে হতেছে মিলিত!
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,—
সেই মহা আঁধার নিশায়
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।

বিশ্বের সমস্ত আলোকের অতীত যে অসীম অব্যক্ত সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকা. নৈমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নি—সেই বিশ্বলোকের অন্তরালের অন্তঃপুরে এই সমস্তই প্রয়াণ করিয়া সেখানকার কি আনন্দের আভাস সংগ্রহ পূর্ব্বক ভাবুকের অন্তঃকরণে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইতেছে। জগৎটা যখন সেই অনির্ব্বচনীয়ের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আসে তখন আমাদিগকে ব্যাকুল করে। তাহাকেই কবি বলিয়াছে :—

তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় মরণের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,—
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া
তোরে আমি ভালবাসিয়াছি,
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি!

পাখীর ডাক শুধু ধ্বনিমাত্র, বায়ুর তরঙ্গ, কিন্তু তাহা যে গান হইয়া উঠিয়া আমার অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করিতেছে এ ব্যাপারটা কোথা হইতে ঘটিল? পাখীর ডাক কোন্ আনন্দগুহার মধ্য হইতে প্রতিধ্বনিত

হইয়া জগতের পরপার হইতে আমার এই ভাললাগাটা বহন করিয়া আনিল ? এই সমস্ত ভাললাগার ভিতর হইতে যথার্থত কাহাকে আমার ভাল লাগিতেছে—তাহাকে বিশ্বময় খুঁজিয়া ফিরিতেছি কিন্তু তাহাতে পাই কই ! কোথায় সে ছলনা করিয়া আছে !

জ্যোৎস্নায় কুসুমবনে একাকী বসিয়া থাকি
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে—
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা
সে কি তোর তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নবায়
কোথা বহে যায় !
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হূহু করে,
সে কি তোর তরে ?
বাতাসে সুরভি ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,—
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়
সে কি তোরি কথা ?
ফুল হতে গন্ধ তার বারেক বাহিরে এলে
আর ফুলে ফিরিতে না পারে,
ঘুরে ঘুরে মরে চারিধারে ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায় ?

জগতের সৌন্দর্য্য আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে সে আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য কোন্ খানে ? সেইখানেই, যেথান হইতে এই সৌন্দর্য্য প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

সদর ষ্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্স্লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত।

…আমি দেখিতেছি প্রভাত সঙ্গীতের প্রথম কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" আমার কবিতার আমার হৃদয়ের এই যাত্রাপথটির একটি রূপক-মানচিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল। এক সময় ছিল যখন হৃদয় আপনার অন্ধকার গুহার মধ্যে আপনি বদ্ধ ছিল :—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনার মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে।

তাহার পর বাহিরের বিশ্ব কোন্ এক ছিদ্র বাহিয়া আলোকের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান !
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

তাহার পর জাগ্রতদৃষ্টিতে যখন বিশ্বকে সে দেখিল—তখন প্রথম দর্শনের আনন্দ আবেগ।

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়,
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায় !

তাহার পরে দুই শ্যামল কূলের মধ্য দিয়া, বিবিধ রূপ, বিবিধ সুখ, বিবিধ ভোগ, বিবিধ লেখার ভিতর দিয়া

যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে।

শেষকালে যাত্রার পরিণামক্ষণে মহাসাগরের গান শুনা যায়—

সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

একটি অপূর্ব্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্ত্তির দিনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যেব ভূমিকা লেখা হইতেছে!

[শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত]

শ্রীনন্দলাল বসু

তৃতীয়দ্যূতসভা

শ্রীরাজশেখর বসু

মহাভারতে আছে, প্রথম দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে সমস্ত পণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার খেলবার জন্য ডেকে আনেন। এই দ্বিতীয় দ্যূতসভাতেও যুধিষ্ঠির হেরে যান এবং তার ফলে পাণ্ডবদের নির্বাসন হয়।

শকুনি-যুধিষ্ঠির কি রকম পাশা খেলেছিলেন? তাঁদের খেলায় ছক আর ঘুঁটি ছিল না, উভয় পক্ষ পণ উচ্চারণ ক'রেই পক্ষপাত করতেন, যাঁর দান বেশী পড়ত তাঁরই জয়। মহাভারতে দ্যূতপর্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেকবার পণঘোষণার পর এই শ্লোকটি আছে—

এতচ্ ্শ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

অর্থাৎ পণঘোষণা শুনেই শকুনি নিকৃতি (শঠতা) আশ্রয় ক'রে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, জিতলাম। এতে বোঝা যায় যে পাশা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা বাজি শেষ হ'ত।

অনেকেই জানেন না যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে যুধিষ্ঠির আরও একবার শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছিলেন। ব্যাসদেব মহাভারত থেকে তৃতীয়দ্যূতপর্বাধ্যায়টি কেন বাদ দিয়েছেন তা বলা শক্ত। হয়তো কোনও রাজনীতিক কারণ ছিল, কিংবা তিনি ভেবেছিলেন যে আসন্ন কলিকালে কুটিল দ্যূতপদ্ধতির রহস্যপ্রকাশ জনসাধারণের পক্ষে অনর্থকর হবে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতারণার যেসব উপায় উদ্‌ভাবিত হয়েছে তার তুলনায় শকুনি-যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ছেলেখেলা মাত্র, সুতরাং সেই প্রাচীন রহস্য এখন প্রকাশ করলে বেশী কিছু অনিষ্ট হবে না।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা। যুধিষ্ঠির সকালবেলা তাঁর শিবিরে ব'সে আছেন, সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ প'ড়ে শোনাচ্ছেন। অর্জুন পঞ্চালশিবিরে মন্ত্রণাসভায় গেছেন, নকুল সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজে ব্যস্ত। ভীম যে একশ গদা ফরমাশ দিয়েছিলেন তা পৌঁছে গেছে, এখন তিনি প্রত্যেকটি আস্ফালন ক'রে এক-একজন ধার্তরাষ্ট্রের নামে উৎসর্গ করছেন। সব গদা শাল কাঠের, কেবল একটি কাপড়ের খোলে তুলো ভরা। এটি দুর্যোধনের ১৮নং ভ্রাতা বিকর্ণের জন্য। ছোকরার মতিগতি ভাল, দ্রৌপদীর ধর্ষণের সময় সে প্রবল প্রতিবাদ করেছিল।

সহদেব পড়ছিলেন, 'যবশক্তু দ্বাদশ লক্ষ মন, চণকচূর্ণ অষ্ট লক্ষ মন, অভগ্ন চণক পঞ্চাশৎ লক্ষ মন—'

ফর্দ শুনে শুনে যুধিষ্ঠিরের বিরক্তি ধরেছিল। কিছু আগ্রহপ্রকাশ না করলে ভাল দেখায় না, সেজন্য প্রশ্ন করলেন, 'ওতেই কুলিয়ে যাবে ?'

সহদেব বললেন, 'খুব। মোটে তো সাত অক্ষৌহিণী, আর যুদ্ধ শেষ হ'তে বড় জোর দিন-কুড়ি। তারপর শুনুন, ঘৃত লক্ষ কুম্ভ—'

'তুমি আমাকে পথে বসাবে দেখছি। অত অর্থ কোথায় পাব ?'

'অর্থের প্রয়োজন কি, সমস্তই ধারে কিনেছি, জয়লাভের পর মিষ্টবাক্যে শোধ করবেন। তৈল দ্বিলক্ষ কুম্ভ, লবণ অর্ধ লক্ষ মন—'

'থাক থাক। যা ব্যবস্থা করবার ক'রে ফেল বাপু, আমাকে ভোগাও কেন। আমি রাজধর্ম বুঝি, নীতিশাস্ত্র বুঝি। অঙ্ক কষা বৈশ্যের কাজ, আমার মাথায় ওসব ঢোকে না।'

এমন সময় প্রতিহার এসে জানালে, 'ধর্মরাজ, এক অভিজাতকল্প কুব্জপুরুষ আপনার দর্শনপ্রার্থী। পরিচয় দিলেন না, বললেন তাঁর বার্তা অতি গোপনীয়, সাক্ষাতে নিবেদন করবেন।'

সহদেব বললেন, 'মহারাজ এখন রাজকার্যে ব্যস্ত, ওবেলা আসতে বল।

সহদেবের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য যুধিষ্ঠির ব্যগ্র হয়েছিলেন। বললেন, 'না না, এখনই তাঁকে নিয়ে এস।'

আগন্তুক বক্রপৃষ্ঠ প্রৌঢ়, বলিকুঞ্চিত শীর্ণ মুণ্ডিত মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, গলায় নীলবর্ণ রত্নহার, পরনে ঢিলে ইজের, তার উপর লম্বা জামা। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি সৌম্য ?'

আগন্তুক উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সহদেব, তুমি এখন যেতে পার। ছোলার বস্তাগুলো খুলে খুলে দেখ গে, পোকা ধরা না হয়।' সহদেব বিরক্ত হয়ে সন্দিগ্ধমনে চ'লে গেলেন।

আগন্তুক অনুচ্চস্বরে বললেন, 'মহারাজ, আমি সুবলপুত্র মৎকুনি, শকুনির বৈমাত্র ভ্রাতা।'

'বলেন কি, আপনি আমাদের পূজনীয় মাতুল, প্রণাম প্রণাম—কি সৌভাগ্য—এই সিংহাসনে বসতে আজ্ঞা হ'ক।'

'না মহারাজ, এই নিম্ন আসনই আমার উপযুক্ত। আমি দাসীপুত্র, আপনার সংবর্ধনার অযোগ্য।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তবে ঐ শৃগালচর্মাবৃত বেদীতে উপবেশন করুন। এখন কৃপা ক'রে বলুন কি প্রয়োজনে আগমন হয়েছে। মাতুল, আগে তো কখনও আপনাকে দেখি নি।'

'দেখবেন কি ক'রে মহারাজ। আমি অন্তরালেই বাস করি, তা ছাড়া গত তের বৎসর বিদেশে ছিলাম। কুব্জতার জন্য ক্ষত্রিয়ধর্মপালন আমার সাধ্য নয়, সেকারণে যন্ত্রমন্ত্রবিদ্যার চর্চা ক'রে তাতেই সিদ্ধিলাভ করেছি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আমাকে বরদানে কৃতার্থ করেছেন। পাণ্ডবাগ্রজ, শুনেছি দ্যূতক্রীড়ায় আপনার পটুতা অসামান্য, অক্ষহৃদয় আপনার নখদর্পণে।'

'হুঁ, লোকে তাই বলে বটে।'

'তথাপি শকুনির হাতে আপনার পরাজয় ঘটেছে। কেন জানেন কি ?'

যুধিষ্ঠির ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'শকুনি ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূতে আমাকে হারিয়েছিলেন।'

মৎকুনি একটু হেসে বললেন, 'দ্যূতে কপট আর অকপট বলে কোনও ভেদ নেই। যে অক্ষক্রীড়ায় দৈবই উভয় পক্ষের অবলম্বন, অজ্ঞ লোকে তাকে অকপট বলে। যদি এক পক্ষ দৈবের উপর নির্ভর করে এবং অপর পক্ষ পুরুষকারদ্বারা জয়লাভ করে, তবে পরাজিত পক্ষ কপটতার অভিযোগ আনে। ধর্মরাজ, আপনার দৈবপাতিত অক্ষ শকুনির পুরুষকারপাতিত অক্ষের নিকট পরাস্ত হয়েছে। আপনি প্রবলতর পুরুষকার আশ্রয় করুন, রাবণবাণের বিরুদ্ধে রামবাণ প্রয়োগ করুন, দ্যূতলক্ষ্মী আপনাকেই বরণ করবেন।'

'মাতুল, আপনার বাক্য আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। লোকে বলে শকুনির অক্ষের অভ্যন্তরে এক পার্শ্বে স্বর্ণপট্ট নিবদ্ধ আছে, তারই ভারে সেই পার্শ্ব সর্বদা নিম্নবর্তী হয় এবং উপরে গরিষ্ঠ বিন্দুসংখ্যা প্রকাশ করে।'

'মহারাজ, লোকে কিছুই জানে না। স্বর্ণগর্ভ বা পারদগর্ভ পাশক নিয়ে অনেকে খেলে বটে, কিন্তু তার পতন সুনিশ্চিত নয়, বহুবারের মধ্যে কয়েকবার ভ্রংশ হ'তেই হবে। আপনারা তো অনেক বাজি খেলেছিলেন, একবারও কি আপনার জিত হয়েছিল ?'

যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'একবারও নয়।'

'তবে ? শকুনি কাঁচা খেলোয়াড় নন, তিনি অব্যর্থ পাশক না নিয়ে কখনই আপনার সঙ্গে খেলতেন না।'

'কিন্তু এখন এসব কথার প্রয়োজন কি। যুদ্ধ আসন্ন, পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ার সম্ভাবনা নেই, শকুনিকে হারাবার সামর্থ্যও আমার নেই।'

'ধর্মপুত্র, নিরাশ হবেন না, আমার গূঢ় কথা এইবারে শুনুন। শকুনির অক্ষ আমারই নির্মিত, তার গর্ভে আমি মন্ত্রসিদ্ধ যন্ত্র স্থাপন করেছি, সেজন্য তার ক্ষেপ অব্যর্থ। দুরাত্মা শকুনি যন্ত্রকৌশল শিখে নিয়ে আমাকে গজভুক্তকপিত্থবৎ পরিত্যাগ করেছে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে পাণ্ডবগণের নির্বাসনের পর দুর্যোধন আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদ দেবে। আপনারা বনে গেলে যখন দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতির কথা জানালাম তখন সে বললে— আমি কিছুই জানি না, মামাকে বল। শকুনি বললে— আমি কি জানি, দুর্যোধনের কাছে যাও। অবশেষে দুই নরাধম আমাকে ছলে বলে দুর্গম বাহ্লিক দেশে পাঠিয়ে সেখানে কারারুদ্ধ ক'রে রাখে। আমি তের বৎসর পরে কোনও গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'ও, এখন বুঝি আমাকেই অক্ষরূপে চালনা ক'রে রাজ্যলাভ করতে চান !'

'ধর্মরাজ, আমার পূর্বাপরাধ মার্জনা করুন, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আমাকে আপনার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে জানবেন। আমি বামন হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থরূপ চন্দ্রে হস্তপ্রসার করেছিলাম, তাই আমার এই দুর্দশা। আপনি বিজয়ী হয়ে শকুনিকে বিতাড়িত ক'রে আমাকে গান্ধাররাজ্য দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

'আপনার নির্মিত অক্ষে আমার সর্বনাশ হয়েছে—তারই পুরস্কারস্বরূপ ?'

মৎকুনি জিহ্বা দংশন ক'রে বললেন, 'ও কথা আর তুলবেন না মহারাজ। আমার বক্তব্য সবটা শুনুন। আমি গুপ্ত সংবাদ পেয়েছি—সঞ্জয় এখনই ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় আপনার কাছে আসছেন। দুর্যোধন আর শকুনির প্ররোচনায় অন্ধ রাজা আবার আপনাকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করছেন। মহারাজ, এই মহা সুযোগ ছাড়বেন না।'

এমন সময় রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা গেল। মৎকুনি ত্রস্ত হয়ে বললেন, 'ঐ সঞ্জয় এসে পড়লেন। দোহাই মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব সদ্য সদ্য প্রত্যাখ্যান করবেন না, বলবেন যে আপনি বিবেচনা ক'রে পরে উত্তর পাঠাবেন। সঞ্জয় চ'লে গেলে আমার সব কথা আপনাকে জানাব। আমি আপাতত ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকছি।'

যথাবিধি কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর সঞ্জয় বললেন, 'হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আপনার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদুর এই অপ্রিয় কার্যে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় রাজাজ্ঞায় আমাকেই আসতে হয়েছে। আমি দূতমাত্র, আমার অপরাধ নেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র এই বলেছেন।— বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা পঞ্চভ্রাতা আমার শতপুত্রের সমান স্নেহপাত্র। এই লোকক্ষয়কর জ্ঞাতিবিধ্বংসী আসন্ন যুদ্ধ যেকোনও উপায়ে নিবারণ করা কর্তব্য। আমি অশক্ত অন্ধ বৃদ্ধ, আমার পুত্রেরা অবাধ্য এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক। আমি বহু চিন্তা ক'রে স্থির করেছি যে হিংস্র অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে অহিংস দ্যূতযুদ্ধেই উভয় পক্ষের বৈরভাব চরিতার্থ হ'তে পারে। অতি কষ্টে আমার পুত্রগণ ও তাদের মিত্রগণকে এতে সম্মত করেছি। অতএব তুমি সবান্ধবে কৌরবশিবিরে এসে আর একবার সুহৃদদ্যূতে প্রবৃত্ত হও। পণ পূর্ববৎ সমগ্র কুরুপাণ্ডব রাজ্য। যদি দুর্যোধনের প্রতিনিধি শকুনির পরাজয় ঘটে তবে কুরুপক্ষ সদলে রাজ্যত্যাগ ক'রে চিরতরে বনবাসে যাবে। যদি তুমি পরাস্ত হও তবে তোমরাও রাজ্যের আশা ত্যাগ ক'রে চিরবনবাসী হবে। বৎস, তুমি কপটতার আশঙ্কা ক'রো না। আমি দুই প্রস্থ অক্ষ সজ্জিত রাখব, তুমি স্বহস্তে নিজের জন্য বেছে নিও, অবশিষ্ট অক্ষ শকুনি নেবেন। এর চেয়ে অসন্দিগ্ধ ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে? সঞ্জয়ের মুখে তোমার সম্মতি পাবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। হে তাত যুধিষ্ঠির, তোমার সুমতি হ'ক, তোমাদের পঞ্চভ্রাতার কল্যাণ হ'ক, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সহ কুরুপাণ্ডবের প্রাণরক্ষা হ'ক।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যেষ্ঠতাত কি স্বয়ং এই বাণী রচনা করেছেন? আমার মনে হয় তাঁর মন্ত্রদাতা দুর্যোধন আর শকুনি, বৃদ্ধ কুরুরাজ শুধু শুকপক্ষিবৎ আবৃত্তি করেছেন। মহামতি সঞ্জয়, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?'

'ধর্মপুত্র, আমি কুরুরাজের আজ্ঞাপিত বার্তাবহ মাত্র, নিজের মত জানাবার অধিকার আমার নেই। আপনি রাজবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধি আশ্রয় করুন, আপনার মঙ্গল হবে।'

'তবে আপনি কুরুরাজকে জানাবেন যে তিনি আমাকে অতি দুরূহ সমস্যায় ফেলেছেন, আমি সম্যক্ বিবেচনা ক'রে পরে তাঁকে উত্তর পাঠাব। এখন আপনি বিশ্রামান্তে আহারাদি করুন, কাল ফিরে যাবেন।'

'না মহারাজ, আমাকে এখনই ফিরতে হবে, বিশ্রামের অবসর নেই। ধর্মপুত্রের জয় হ'ক।' এই ব'লে সঞ্জয় বিদায় নিলেন।

মৎকুনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। এইবারে আমার মন্ত্রণা শুনুন। আজই অপরাহ্ণে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠান, কিন্তু আপনার ভ্রাতারা যেন জানতে না পারেন। আপনার দূত গিয়ে বলবে— হে পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, অতি অপ্রিয় হ'লেও তৃতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় আমি সম্মত আছি। আপনার আয়োজিত অক্ষে আমার প্রয়োজন নেই, আমি নিজের অক্ষেই নির্ভর করব। শকুনিও নিজের অক্ষে খেলবেন। আপনি যে পণ নির্ধারণ করেছেন তাতেও আমার সম্মতি আছে। শুধু এই নিয়মটি আপনাকে মেনে নিতে হবে, যে শকুনি আর আমি প্রত্যেকে একটি মাত্র অক্ষ নিয়ে খেলব এবং তিনবার মাত্র অক্ষক্ষেপণ করব, তাতে যার বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তারই জয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হে সুবলনন্দন মৎকুনি, আপনি সম্পর্কে আমার মাতুল হন, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে আপনি বাতুল। আমি কোন্ ভরসায় আবার শকুনির সঙ্গে স্পর্ধা করব? যদি আপনি আমাকে শকুনির অনুরূপ অক্ষ প্রদান করেন, তাতে সমানে সমানে প্রতিযোগ হবে, কিন্তু আমার জয়ের স্থিরতা কোথায়? ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষে আপত্তির কারণ কি? আমার ভ্রাতাদের মত না নিয়েই বা কেন এই দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দেব? তিনবার মাত্র অক্ষক্ষেপণের উদ্দেশ্য কি? বহুবার ক্ষেপণেই তো সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক। আর, আপনি যে দুর্যোধনের চর নন তারই বা প্রমাণ কি?'

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, স্থিরো ভব, আপনার সমস্ত সংশয় আমি ছেদন করছি। যদি আপনি ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষ নিয়ে খেলেন তবে আপনার পরাজয় অনিবার্য। ধূর্ত শকুনি সে অক্ষে খেলবে না, হাতে নিয়েই ইন্দ্রজালিকের ন্যায় বদলে ফেলে নিজের আগেকার অক্ষেই খেলবে। আমি এতকাল বাহ্লিকদুর্গে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, নিরন্তর গবেষণায় প্রচণ্ডতর মন্ত্রশক্তিযুক্ত অক্ষ উদ্‌ভাবন করেছি। আপনাকে এই নবযন্ত্রান্বিত আশ্চর্য অক্ষ দেব, তার কাছে এলেই শকুনির পুরাতন অক্ষ একেবারে বিকল হয়ে যাবে। মহারাজ, আপনার জয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। আপনার ভ্রাতারা যুদ্ধলোলুপ, আপনার তুল্য স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী নন। তাঁরা আপনাকে বাধা দেবেন, ফলে এই রক্তপাতহীন বিজয়ের মহাসুযোগ আপনি হারাবেন। আপনি আগে ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ পাঠান, তারপর আপনার ভ্রাতাদের জানাবেন। তাঁরা ভর্ৎসনা করলে আপনি হিমালয়বৎ নিশ্চল থাকবেন।'

'কিন্তু দ্রৌপদী? মাতুল, আপনি তাঁর কটুবাক্য শোনেন নি।'

'মহারাজ, স্ত্রীজাতির ক্রোধ তৃণাগ্নিতুল্য, তাতে পর্বত বিদীর্ণ হয় না। কদিনেরই বা ব্যাপার, আপনার জয়লাভ হ'লে সকল নিন্দকের মুখ বন্ধ হবে। তারপর শুনুন— আমার যন্ত্র অতি সূক্ষ্ম, সেজন্য একদিনে অধিকবার ক্ষেপণ অবিধেয়। শকুনির অক্ষও দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকে না, সেজন্য সে সানন্দে আপনার

প্রস্তাবে সম্মত হবে। আপনার জয়ের পক্ষে তিনবার ক্ষেপণই যথেষ্ট। অক্ষ আমার সঙ্গেই আছে, পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

মৎকুনি তাঁর কটিলগ্ন থলি থেকে একটি গজদন্তনির্মিত অক্ষ বার করলেন। যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন, অক্ষটি শকুনির অক্ষেরই অনুরূপ, তেমনই সুগঠিত সুমসৃণ, ধার এবং পৃষ্ঠগুলি ঈষৎ গোলাকার, প্রতি বিন্দুর কেন্দ্রে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র।

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, তিনবার ক্ষেপণ ক'রে দেখুন।'

যুধিষ্ঠির তাই করলেন, তিনবারই ছয় বিন্দু উঠল। তিনি আশ্চর্য হয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু মৎকুনি ঝটিতি কেড়ে নিয়ে থলির ভিতর রেখে বললেন, 'এই মন্ত্রপূত অক্ষ অনর্থক নাড়াচাড়া নিষিদ্ধ, তাতে গুণহানি হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনার অক্ষটি নির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু এর পর আপনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না তার জন্য দায়ী থাকবে কে?'

'দায়ী আমার মুণ্ড। আপনি এখন থেকে আমাকে বন্দী ক'রে রাখুন, দুজন খড়্গপাণি প্রহরী নিরন্তর আমার সঙ্গে থাকুক। তাদের আদেশ দিন— যদি আপনার পরাজয়ের সংবাদ আসে তবে তখনই আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবে। মহারাজ, এখন আপনার বিশ্বাস হয়েছে?'

'হয়েছে। কিন্তু শকুনির কূট পাশক যদি আমার কূটতর পাশকের দ্বারা পরাভূত হয় তবে তা ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূত হবে।'

'হায় হায় মহারাজ, এখনও আপনার কপটতার আতঙ্ক গেল না! আপনারা দুজনেই তো যন্ত্রগর্ভ কূট পাশক নিয়ে খেলবেন, এতে কপটতা কোথায়? মল্লযুদ্ধে যদি আপনার বাহুবল বিপক্ষের চেয়ে বেশী হয় তবে সেকি কপটতা? যদি আপনার কৌশল বেশী থাকে সে কি কপটতা? শকুনির পাশকে যে কূট কৌশল নিহিত আছে তা আমারই, আপনার পাশকে যে কূটতর কৌশল আছে তাও আমার। ধর্মরাজ, এই তৃতীয় দ্যূতসভায় বস্তুত আমিই উভয় পক্ষ, আপনি আর শকুনি নিমিত্তমাত্র।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার বক্তৃতা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছি। এক দিকে লোকক্ষয়কর নৃশংস যুদ্ধ, অন্যদিকে কূট দ্যূতক্রীড়া। দুইই আমার অবাঞ্ছিত, কিন্তু যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা যেমন রাজধর্মবিরুদ্ধ, সেইরূপ জ্যেষ্ঠতাতের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করাও আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আপনার মন্ত্রণা আমি অগত্যা মেনে নিচ্ছি, আজই কুরুরাজের কাছে দূত পাঠাব। আপনি এখন থেকে সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হয়ে গুপ্তগৃহে বাস করবেন, কুরুপাণ্ডব কেউ আপনার খবর জানবে না। যদি জয়ী হই, আপনি গান্ধার রাজ্য পাবেন। যদি পরাজিত হই তবে আপনার মৃত্যু। এখন আপনার পাশকটি আমাকে দিন।'

'মহারাজ, আপনার কাছে পাশক থাকলে পরিচর্যার অভাবে তার গুণ নষ্ট হবে। আমার কাছেই এখন থাকুক, আমি তাতে নিয়ত মন্ত্রাধান করব এবং দ্যূতযাত্রার পূর্বে আপনাকে দেব। ইচ্ছা করেন তো আপনি প্রত্যহ একবার আমার কাছে এসে খেলে দেখতে পারেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার তুচ্ছ জীবন আমার হাতে, কিন্তু আমার বুদ্ধি রাজ্য ধর্ম সমস্তই আপনার হাতে। আপনার বশবর্তী হওয়া ভিন্ন আমার অন্য গতি নেই।'

পরদিন যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দকে আসন্ন দ্যূতের কথা জানালেন। ধর্মরাজের এই বুদ্ধিভ্রংশের সংবাদে সকলেই কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর তাঁকে যেসব কথা বললেন তার বিবরণ অনাবশ্যক। যুধিষ্ঠির নিশ্চল হয়ে সমস্ত গঞ্জনা নীরবে শুনলেন, অবশেষে বললেন, 'হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ, আমাকে তোমরা রাজা ব'লে থাক। অপরের বুদ্ধি না নিয়েও রাজা নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারেন। যুদ্ধে অসংখ্য নরহত্যার চেয়ে দ্যূতসভায় ভাগ্যনির্ণয় আমি শ্রেয় মনে করি। জয় সম্বন্ধে আমি কেন নিঃসন্দেহ তার কারণ আমি এখন প্রকাশ করতে পারব না। যদি তোমরা আমার উপর নির্ভর করতে না পার তো স্পষ্ট বল, আমি কুরুরাজকে সংবাদ পাঠাব— হে জ্যেষ্ঠতাত, আমি ভ্রাতৃগণকর্তৃক পরিত্যক্ত, তারা আমাকে পাণ্ডবপতি ব'লে মানে না, দ্যূতসভায় রাজ্যপণনের অধিকার আমার আর নেই, আমি অঙ্গীকারভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি, আপনি যথাকর্তব্য করবেন।'

তখন অর্জুন অগ্রজের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, 'পাণ্ডবপতি, আপনি প্রসন্ন হ'ন, আমাদের কটূক্তি মার্জনা করুন, আমাকে সর্ববিষয়ে আপনার অনুগত ব'লে জানবেন।'

তারপর ভীম নকুল সহদেবও যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাভিক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে আশীর্বাদ ক'রে তাঁর গৃহে চ'লে গেলেন।

দ্রৌপদী এপর্যন্ত কোনও কথা বলেন নি। যে মানুষ এমন নির্লজ্জ যে দু-দুবার হেরে গিয়ে চূড়ান্ত দুঃখভোগের পরেও আবার জুয়ো খেলতে চায় তাকে ভৎর্সনা করা বৃথা। যুধিষ্ঠির চ'লে গেলে দ্রৌপদী সহদেবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, 'ছোট আর্যপুত্র, হাঁ ক'রে দেখছ কি? ওঠ, এখনই চতুরশ্বযোজিত রথে মথুরায় যাত্রা কর, বাসুদেবকে সব কথা ব'লে এখনই তাঁকে নিয়ে এস। তিনিই একমাত্র ভরসা, তোমরা পাঁচ ভাই তো পাঁচটি অপদার্থ জড়পিণ্ড।'

দশ দিনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে সহদেব পাণ্ডবশিবিরে ফিরে এলেন। রথ থেকে নেমে কৃষ্ণ বললেন, 'দাদাও আসছেন।' যুধিষ্ঠির সহর্ষে বললেন, 'কি আনন্দ, কি আনন্দ! দ্রৌপদী অতি ভাগ্যবতী, তাঁর আহ্বানে কৃষ্ণ-বলরাম কেউ স্থির থাকতে পারেন না।'

ক্ষণকাল পরে দারুকের রথে বলরাম এসে পৌঁছলেন। রথ থেকেই অভিবাদন ক'রে বললেন, 'ধর্মরাজ, শুনলাম আপনারা উত্তম কৌতুকের আয়োজন করেছেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আমি দেখতে চাই না, কিন্তু আপনাদের খেলা দেখবার আমার প্রবল আগ্রহ। এখানে নামব না, আমরা দুই ভাই পাণ্ডবদের কাছে

থাকলে পক্ষপাতের অপযশ হবে। কৃষ্ণ এখানে থাকুন, আমি দুর্যোধনের আতিথ্য নেব। দ্যূতসভায় আবার দেখা হবে। চালাও দারুক।' এই ব'লে বলরাম কৌরবশিবিরে চ'লে গেলেন।

মহা সমারোহে দ্যূতসভা বসেছে। ধৃতরাষ্ট্র স্থির থাকতে পারেন নি, হস্তিনাপুর থেকে দুদিনের জন্য কৌরবশিবিরে এসেছেন, খেলার ফলাফল দেখে ফিরে যাবেন। শকুনির দক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কুরুপক্ষের জয় সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সভায় কৃষ্ণবলরাম, পঞ্চপাণ্ডব, দুর্যোধনাদি সহ ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হ'লে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, 'আমি এই দ্যূতসভার সম্যক্ নিন্দা করি। কিন্তু আমি কুরুরাজ্যের ভৃত্য, সেজন্য অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই গর্হিত ব্যাপার দেখতে হবে।'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

ভীষ্ম বললেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই সভায় দ্যূতনীতিবিরুদ্ধ কোনও কর্ম যাতে না হয় তার বিধান তোমার কর্তব্য। আমি প্রস্তাব করছি শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নিযুক্ত করা হ'ক।

দুর্যোধন আপত্তি তুললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষপাতী।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কথাটা মিথ্যা নয়। আর, আমার অগ্রজ উপস্থিত থাকতে আমি সভাপতি হতে পারি না।

তখন ধৃতরাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে বলরামকে সভাপতির পদে বরণ করলেন।

বলরাম বললেন, 'বিলম্বে প্রয়োজন কি, খেলা আরম্ভ হ'ক। হে সমবেত সুধীবর্গ, এই দ্যূতে কুরুপক্ষে শকুনি এবং পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির নিজ নিজ একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলবেন। প্রত্যেকে তিনবার মাত্র অক্ষপাত করবেন। যাঁর বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তাঁরই জয়। এই দ্যূতের পণ সমগ্র কুরুপাণ্ডবরাজ্য। পরাজিত পক্ষ বিজয়ীকে রাজ্য সমর্পণ ক'রে এবং যুদ্ধের বাসনা পরিহার ক'রে সদলে চিরবনবাসী হবেন। সুবলনন্দন শকুনি, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনিই প্রথম অক্ষপাত করুন।'

শকুনি সহাস্যে অক্ষনিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'এই জিতলাম।' তাঁর পাশাটি পতনমাত্র একটু গড়িয়ে গিয়ে স্থির হ'লে তাতে ছয় বিন্দু দেখা গেল। কর্ণ এবং দুর্যোধনাদি সোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'আমাদের জয়।'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠির, এইবার আপনি ফেলুন।'

যুধিষ্ঠিরের পাশা একবার ওলটাবার পর স্থির হ'লে তাতেও ছয় বিন্দু উঠল। পাণ্ডবরা বললেন, 'ধর্মরাজের জয়।'

বলরাম বললেন, 'তোমরা অনর্থক চিৎকার করছ। কারও জয় হয় নি, দুই পক্ষই এখন পর্যন্ত সমান।'

শকুনি গম্ভীরবদনে বললেন, 'এখনও দুই ক্ষেপ বাকী, তাতেই জিতব।'

দ্বিতীয় বারে শকুনির পাশা আর গড়াল না, প'ড়েই স্থির হ'ল। পৃষ্ঠে পাঁচ বিন্দু। যুধিষ্ঠিরের পাশায় পূর্ববৎ ছয় বিন্দু উঠল। শকুনি লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশাটি কাঁপছে।

পাণ্ডবপক্ষ আনন্দে গর্জন ক'রে উঠলেন। বলরাম ধমক দিয়ে বললেন, 'খবরদার, ফের চিৎকার করলেই সভা থেকে বার ক'রে দেব।'

সভা স্তব্ধ। শেষ অক্ষপাত দেখবার জন্য সকলেই শ্বাসরোধ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

শকুনি পাংশুমুখে তৃতীয়বার পাশা ফেললেন। পাশাটি কর্দমপিণ্ডবৎ ধপ ক'রে পড়ল। এক বিন্দু।

যুধিষ্ঠিরের পাশায় আবার ছয় বিন্দু উঠল। বলরাম মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করলেন, 'যুধিষ্ঠিরের জয়।'

তখন সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের পতিত পাশা ধীরে ধীরে লাফিয়ে লাফিয়ে শকুনির পাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল—'মায়া, মায়া, কুহক, ইন্দ্রজাল!'

দুর্যোধন হাত পা ছুড়ে বললেন, 'যুধিষ্ঠির নিকৃতি আশ্রয় করেছেন, তাঁর জয় আমরা মানি না। সাধু ব্যক্তির পাশা কখনও চ'লে বেড়ায়?'

বলরাম বললেন, 'আমি দুই অক্ষই পরীক্ষা করব।'

যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর পাশা তুলে নিয়ে বলরামকে দিলেন।

শকুনি তাঁর পাশাটি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'আমার অক্ষ কাকেও স্পর্শ করতে দেব না।'

বলরাম বললেন, 'আমি এই সভার অধ্যক্ষ, আমার আজ্ঞা অবশ্যপাল্য।'

শকুনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাবহ নই।'

বলরাম তখন শকুনির গালে একটি চড় মেরে পাশা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'হে সভ্যমণ্ডলী, আমি এই দুই অক্ষই ভেঙে দেখব ভিতরে কি আছে।' এই ব'লে তিনি শিলাবেদীর উপর একে একে দুটি পাশা আছড়ে ফেললেন।

শকুনির পাশা থেকে একটি ঘুরঘুরে পোকা বার হয়ে নির্জীববৎ ধীরে ধীরে দাড়া নাড়তে লাগল। যুধিষ্ঠিরের পাশা থেকে একটি ছোট টিকটিকি বেরিয়ে তখনই পোকাটিকে আক্রমণ করলে।

বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সভা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে?'

বলরাম উত্তর দিলেন, 'বিশেস কিছু হয় নি, একটি ঘুর্ঘুর-কীট শকুনির অক্ষে ছিল—'

ধৃতরাষ্ট্র সভয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কামড়ে দিয়েছে? কি ভয়ানক!'

'কামড়ায় নি মহারাজ, শকুনির অক্ষের মধ্যে ছিল। এই কীট অতি অবাধ্য, কিছুতেই কাত বা চিত হ'তে চায় না, অক্ষের ভিতর পুরে রাখলে অক্ষ সমেত উবুড় হয়। যুধিষ্ঠিরের অক্ষ থেকে একটি গোধিকা বেরিয়েছে। এই প্রাণী আরও দুর্বিনীত, স্বয়ং ব্রহ্মা একে কাত করতে পারেন না। গোধিকার গন্ধ পেয়ে ঘুর্ঘুর ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল, তাই শকুনি অভীষ্ট ফল পান নি।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জয় হ'ল?'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের। দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না।'

যুধিষ্ঠির তখন জনান্তিকে বলরামকে মৎকুনির বৃত্তান্ত জানালেন। বলরাম তাঁকে বললেন, 'আপনার কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই, কূট পাশকের ব্যবহার দ্যূতবিধিসম্মত।'

যুধিষ্ঠির পরম অবজ্ঞাভরে বললেন, 'হলধর, তুমি মহাবীর, কিন্তু শাস্ত্র কিছুই জান না। ভগবান্ মনু বলেছেন—

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥

অর্থাৎ অপ্রাণী নিয়ে যে খেলা তাকেই লোকে দ্যূত বলে, আর প্রাণী নিয়ে খেলার নাম সমাহ্বয়। কুরুরাজ আমাকে অপ্রাণিক দ্যূতেই আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু দুর্দৈববশে আমাদের অক্ষ থেকে প্রাণী বেরিয়েছে। অতএব এই দ্যূত অসিদ্ধ।'

কর্ণ করতালি দিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ, তুমি সার্থকনামা।'

বলরাম বললেন, 'ধর্মরাজের শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ, যদিও কাণ্ডজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। মেনে নিচ্ছি এই দ্যূত অসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে পূর্বের দ্যূতও অসিদ্ধ, শকুনি তাতেও ঘুর্ঘুরগর্ভ অক্ষ নিয়ে খেলেছিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার শ্যালকের অশাস্ত্রীয় আচরণের জন্য পাণ্ডবগণ বৃথা ত্রয়োদশ বর্ষ নির্বাসন ভোগ করেছেন। এখন তাঁদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিন, নতুবা পরকালে আপনার নরকভোগ সুনিশ্চিত।'

যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার ঘৃণা ধ'রে গেছে। আমরা যুদ্ধ ক'রেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করব। জ্যেষ্ঠতাত, প্রণাম, আমরা চললাম।'

তখন পাণ্ডবগণ মহা উৎসাহে বারংবার সিংহনাদ করতে করতে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণবলরামও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

ফিরে এসেই যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার প্রথম কর্তব্য মৎকুনিকে মুক্তি দেওয়া। এই হতভাগ্য মূর্খের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। চল, তাকে আমরা প্রবোধ দিয়ে আসি।'

একটু আগেই পাণ্ডবশিবিরে সংবাদ এসে গেছে যে দ্যূতসভায় কি একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়েছে। যুধিষ্ঠিরাদি যখন কারাগৃহে এলেন তখন দুই প্রহরী তর্ক করছিল— মৎকুনির মুণ্ডচ্ছেদ করা উচিত, না শুধু নাসাচ্ছেদেই আপাতত কর্তব্যপালন হবে।

যুধিষ্ঠিরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মৎকুনি মাথা চাপড়ে বললেন, 'হা, দৈবই দেখছি সর্বত্র প্রবল। আমি গোধিকাকে বেশী খাইয়ে তার দেহে অত্যধিক বলাধান করেছি, তাই সেই কৃতঘ্ন জীব লম্ফঝম্প ক'রে আমার সর্বনাশ করেছে। বলদেব তবু সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মরাজ শেষটায় শাস্ত্র আউড়ে সব মাটি ক'রে দিলেন। মুক্তি পেয়ে আমার লাভ কি, দুর্যোধন আমাকে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

বলরাম বললেন, 'মৎকুনি, তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার সঙ্গে দ্বারকায় চল। সেখানে অহিংসক সাধুগণের একটি আশ্রম আছে, তাতে অসংখ্য উৎকুণ-মৎকুণ-মশক-মূষিকাদির নিত্যসেবা হয়। তোমাকে তার অধ্যক্ষ ক'রে দেব, তুমি নব নব গবেষণায় সুখে কালযাপন করতে পারবে।'

চাতক

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন চা-সভায় আহূত অতিথিগণের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ কবিতাটি গুরুদেব যে প্রসঙ্গে লেখেন তাহা আমার মনে আছে। অধ্যাপকেরা বিদ্যাভবনের বারাণ্ডায় চা পান করিতেন। গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন, এবং বলাই বাহুল্য তাহাতে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া উঠিত। আমি বিদ্যাভবনে আমার কাজ নিয়া থাকিতাম, অত কাছে থাকিলেও আমি খুব কমই ঐ 'চা-চক্রে' বসিতাম, চা পান তো করিতামই না। একদিন অধ্যাপকেরা 'চা-চক্রের' জন্য আমার নিকট হইতে ১৫৲ আদায় করেন। ইহাতে আমার ঐ বন্ধু 'চা-চাতকগণ' (এ নাম গুরুদেবেরই দেওয়া) 'চা-চক্রে'র এক বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আর গুরুদেব সেদিন 'চক্রেশ্বর' হইয়া এই আলোচ্য কবিতাটি পাঠ করেন।

—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

কী রস সুধাবরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীর শাস্ত্রগিরিশিরে!
তিয়াষী দল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজ ঘিরে!
পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,
অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে।
নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখী,
গৌড়পাদ-পাদপে নাহি রহে।
অনুস্বরে ধনুঃশর-টঙ্কারের সাড়া
শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে।
শঙ্কর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসাছাড়া,
পালিভাষায় শাসায় ভীরুদেরে।
চা-রস ঘনশ্রাবণধারাপ্লাবন-লোভাতুর
কলাসদনে চাতক ছিল এরা—
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর,
চকোরবেশে বিধুরে কেন ঘেরা।

কবি-কথা

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

তিরিশ বছরেরও বেশী খুব কাছ থেকে কবিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। যা দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলবার দায়িত্ব আমার রয়েছে। যা দেখেছি তার স্মৃতি আমার নিজের প্রগল্‌ভতা থেকে আমাকে রক্ষা করুক, আমার বাক্যকে গৌরবমণ্ডিত করুক।

অনেক বড়ো বড়ো আদর্শের কথা কবির লেখায় পাওয়া যায় তা সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁদের সৌভাগ্য ঘটেছে কবিকে কাছে থেকে দেখবার তাঁরাই শুধু জানেন যে এই সব কথা কবির নিজের জীবনে কতখানি সত্য ছিল। আজ তিনি দূরে চলে গিয়েছেন, এখন আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে তাঁর কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, জীবনযাত্রার ছোটখাটো খুঁটিনাটি জিনিসগুলির সঙ্গেও তাঁর লেখার গভীর মিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপটিকে আমরা দেখেছি তাঁর নিজের জীবনের মধ্যে, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। রবীন্দ্রসাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বস্তু। আজ সে আলোচনা নয়। যে পরম বিস্ময়কর জীবনটিকে দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আজ আমার এখানে আসা।

বিশ্ববোধ

উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় খুব ছেলেবেলায়। এই মন্ত্রগুলি ছিল তাঁর জীবনের আশ্রয়। তাই তাঁর সাধনার মধ্যে দেখি উপনিষদের শান্ত সমাহিত গম্ভীর ভাব। কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কবির কাছে শুনেছি, আগে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যবহার করতেন। পরে তাঁর ধ্যানের মন্ত্র ছিল "শান্তং শিবং অদ্বৈতম্"।

নিজের জীবনেও তাঁর পথ ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। একখানি চিঠিতে লিখেছেন;

"আমার কাছে ধর্ম ভারী concrete যদিচ এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকমে উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে, গাছপালা পশুপাখি ধুলোমাটি সব জিনিস থেকেই পেয়েছি।......আকাশে বাতাসে জলে সর্বত্র আমি তার স্পর্শ অনুভব করি। এক-একসময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।

গানে কবিতায় বারে বারে বলেছেন:

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে।
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো-অন্ধকার

মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন,
আর আমার ভুবন।

কতবার বলেছেন, "সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে।" হয়তো গাছের পাতায় আলো পড়েছে, গেয়ে উঠেছেন, "এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।"

বোলপুর বা কলকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্য গরম, দুপুরবেলা চারদিক রোদে পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না। বর্ষার সময়েও দেখেছি হয়তো জানালা খুলে রেখেছেন যাতে অবাধে আসতে পারে "বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।" যখন বয়স কম ছিল, কালবৈশাখীর মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বোলপুরের খোলা মাঠে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। সারাবছর বিকাল থেকে খোলা ছাতে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। বিলাতে শীতের জন্য দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে রাখতে হ'ত তাতে ওঁর মন খারাপ হয়ে যেত। বলতেন, "ভালো লাগে না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

বাইরের জগৎটা ওঁকে সত্যিই যেন পাগল ক'রে দিত। তাই লেখবার সময় জানালার কাছ থেকে দূরে সরে বসতেন। আমাদের আলিপুরের বাড়িতে যে ঘরে থাকতেন তার জানালা ছিল পুবদিকে— ঠিক সামনে অনেকগুলি পাম গাছ, তার পরে খোলা মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অন্য সব বড়ো বড়ো গাছ। লেখবার সময় টেবিলটাকে ঘুরিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসতেন। বরানগরের বাড়িতে থাকতেন খুব ছোটো একটা কোণের ঘরে। সামনে একটা বড়ো জানালা দিয়ে পুব-দক্ষিণ কোণে দেখা যেত পুকুরঘাট, আম সুপুরির বাগান—তাই ঘরটার নাম দিয়েছিলেন "নেত্রকোনা"। এই ঘরেও লেখবার টেবিলটা রাখতেন জানালার কাছ থেকে সরিয়ে এক কোণে, যেখানে দুপাশে দেয়াল, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। বলতেন, "খোলা জানলার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। আমার মন ঘুরে বেড়াবে ঐ বাইরে দূরে।" যখন কাজকর্ম শেষ হয়ে যেত তখন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের আগে আমি প্রায় দু-মাস শান্তিনিকেতনে ছিলাম। কবি তখন থাকতেন অতিথিশালার দোতালায় পুবদিকের ঘরে। সব চেয়ে ছোটো এই ঘর। সামনে খোলা ছাদ। আমি থাকি পশ্চিমদিকের ঘরে। সে আমলে বাইরের লোকের আসাযাওয়া কম। কবির জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সরল নিরাড়ম্বর। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসতেন। আশ্রমের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ দেখা করতে আসতেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। অধ্যাপকেরা একে একে চলে যেতেন। রাত হয়তো এগারোটা বারোটা বেজে গিয়েছে, তখনো কবি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। আমি ঘুমোতে চলে যেতুম। আবার সূর্য ওঠার আগেই উঠে দেখি কবি পুবদিকে মুখ করে ধ্যানে মগ্ন।

কোনো কোনো দিন হয়তো অন্ধকার থাকতে মন্দিরে পুবদিকের চাতালে গিয়ে বসেছেন।

পিছনে দু-চারজন লোক। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হয়তো কিছু বললেন। "শান্তিনিকেতন" নামক বইয়ের অনেক ব্যাখান এইভাবে মুখে মুখে বলা।

তিরিশ বছরের বেশি এই রকমই দেখেছি। শেষ বয়সে যখন রোগশয্যায় অজ্ঞান তাছাড়া কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অসুস্থতার মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকতেন কখন ভোর হবে। বার বার বলতেন, ভোর হোলো, আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও।" যখন যে বাড়িতে থাকতেন পছন্দ করতেন পুবদিকের ঘর। যাতে প্রথম সূর্যের আলো এসে মুখে পড়ে। জানালা কখনো বন্ধ করতেন না। সূর্য ওঠার অনেক আগেই উঠে বসতেন। বলতেন, "শেষরাত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোটো-আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড়ো-আমির মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে। পারিনে তা নয়, কিন্তু একটু সময় লাগে।" আমরা বলেছি, "ক্লান্ত শরীরে আরেকটু শুয়ে থাকলে ভালো হয়।" বলেছেন, "দেখেছি যে শেষ রাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ তখন সহজে এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা ব্যর্থ করতে ইচ্ছা হয় না। ছেলেবেলায় বাবামশায় রাত চারটের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন তখন ভাবতুম কেন আরেকটু শুয়ে থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে যে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে পারি না।"

এই ভোরে ওঠা নিয়ে বিদেশে মজার মজার ব্যাপার ঘটত। নরওয়েতে ওঁর শোবার ঘরের পাশে আমাদের শোবার ঘর। মাঝে একটা ছোটো দরজা। প্রথম দিন সভাসমিতি অভ্যর্থনা সেরে শুতে যেতে দেরি হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি দরজায় টক্‌টক্ করে আওয়াজ। কবি বলছেন, "আর কত ঘুমোবে? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।" ঘরে চারদিকে কালো পর্দা টাঙানো। আলো জ্বেলে ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। তখন গ্রীষ্মকাল, নরওয়েতে সূর্য ওঠে রাতদুপুরে। কবির ঘরেও কালো পর্দা টাঙানো ছিল, কিন্তু শোবার আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। মাঝরাত্রে ঘর আলোয় ভরে গিয়েছে আর উনিও উঠে বসেছেন। আমাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আর থাকতে না পেরে আমাদের ডেকে তুলেছেন। যাহোক ওঁকে তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললুম, যে, তখন রাত তিনটা। নরওয়েতে ভোরের আলো দেখে ওঠা চলবে না। সকালে চায়ের টেবিলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হ'ল।

কত কবিতার মধ্যে বলেছেন, "প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান।" বলেছেন :

হে প্রভাতসূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল;
প্রভাত-ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত···

ভোরবেলা যেমন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেও সেই রকম চুপ করে বসে থাকতেন। বলতেন, "সারাদিনের ছোটখাটো কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি একেবারে ধুয়ে মুছে স্নান করে শুতে যেতে চাই।" এর মধ্যে কোনো আড়ম্বর ছিল না। এমন কি এই যে প্রতিদিনের ধ্যানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা

জানাতেও যেন একটু সংকোচ ছিল। ওঁর নিজের কাছে এর এমন গভীর মূল্য পাছে অন্য লোকের কাছে হালকা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসংকোচে আলোচনা করতেন।

মন যখন বেশি ক্লিষ্ট তখন কোনো কোনো সময়ে নিজের মনে গান করতেন। কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হ'ল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে—পরে এ বাড়ির নাম হয় 'প্রান্তিক'। শুধু দুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পরে আমাকে বললেন, "তুমি এখানেই থাকবে।" লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হ'ল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পর্দা টাঙানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ"। বার বার ফিরে ফিরে গান চলল, সারারাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা, "অন্ধজনে দেহ আলো"। বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হ'ল। সকালে মন্দিরের পরে বললুম, "কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোননি।" একটু হেসে বললেন, "মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।"

জীবন-দেবতা

কবি বার বার বলেছেন যে তাঁর জীবনে ছোটো বড়ো নানা ঘটনার মধ্যে তাঁর জীবন-দেবতার ইঙ্গিত তিনি দেখতে পেয়েছেন। অনেক কবিতায় আর গানে এই কথা পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি অনেকবার অনেক ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি অনেক সময়ে কবির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। প্রথমে মনে হয়েছে ভুল হ'ল, ক্ষতি হল কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে ভালোই হয়েছে।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের অল্পদিন পরেই কবির আগ্রহ হয় বিলাত যাওয়ার। ব্যবস্থা সমস্ত স্থির হয়ে গেল, কলকাতা থেকে সিটি-লাইনের জাহাজে যাবেন। খুব ভোরে রওনা হওয়ার কথা। আগের দিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেক লোক কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন। রাত দশটা বেজে গিয়েছে; চলে আসবার সময় কবিকে প্রণাম করে বললুম, "ভোরবেলায় তাহলে একেবারে জাহাজঘাটেই যাব।" কবি বললেন, "হাঁ তাই তো ব্যবস্থা।" হঠাৎ মনে খটকা লাগল। পথে আসতে আসতে ভাবলুম যে, এ-কথা কেন বললেন যে "তাই তো ব্যবস্থা"। তবে কি যাওয়া নাও হতে পারে? রাত্রেই ঠিক করলুম পরের দিন জাহাজঘাটে না গিয়ে একটু আগে বাড়িতেই যাব।

খুব ভোরে, রাস্তায় তখনো গ্যাসের আলো নেবেনি, জোড়াসাঁকোর তিনতলায় শোবার ঘরে গিয়ে দেখি যে কবির শরীর ভালো নেই। বিলাত যাওয়া স্থগিত। বিশেষ কিছু শক্ত অসুখ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্তি আর অবসাদ। স্থির হল কিছুদিন কলকাতার বাইরে বিশ্রাম করবেন। এই সময় দীর্ঘ অবসর কাটাবার জন্য কতকগুলি বাংলা গান ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এইরকম করেই ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হয়। এর কিছুদিন পরে কবি বিলাতে গেলেন। তার পরের কথা সকলেই জানেন। এই ইংরেজি গীতাঞ্জলির মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের বাইরে কবির বড়ো রকম পরিচয় শুরু হয়েছিল। আর এর

জন্যই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ঠিক ঐ সময় বিলাত যাওয়া স্থগিত না হলে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হ'ত কি না জানি না। কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখার সুযোগ ঘটবে বলেই সেদিন বিলাত যাওয়া বন্ধ হয়েছিল।

আবার অন্যরকমও হয়েছে। ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬ই ভাদ্র কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কবি আচার্যের কাজ করবেন কথা হয়। কবির শরীর কিন্তু তখন অত্যন্ত অসুস্থ। তার কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে কলম্বো পর্যন্ত গিয়ে বিলাত যাওয়া বন্ধ হ'ল—ওঁকে আমরা কলকাতায় ফিরিয়ে আনলুম। কলকাতায় আসবার পরে শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ল—ডাক্তাররা লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলেন। ভাদ্রোৎসবের আগের দিনেও এই রকম অবস্থা। ধরে নেওয়া হ'ল যে, আচার্যের কাজ করতে পারবেন না। তবু উৎসবের দিন খুব ভোরে আমি ওঁর কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, "আমাকে নিয়ে চলো, আমি মন্দিরে যাব।" অনেক হাঙ্গামা করে নিয়ে এলুম। মন্দিরে সেদিন যে শুধু উপাসনার কাজ করলেন তা নয়, নিজে থেকেই গান ধরলেন "তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।" আর ব্যাখ্যানের সময় গভীর বেদনার সঙ্গে, রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁর যা বলবার ছিল, বললেন :

> আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সেই আহ্বান ফুরোয়নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে-সত্যকে বহন ক'রে এনেছেন দেশ এখনও সে-সত্যকে গ্রহণ করেনি। যতদিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিনমজুরি দিয়ে জনতার স্তুতি-বাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না। ক্ষুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ।[১]

সেদিন খুব আবেগের সঙ্গেই সব কথা বলেছিলেন কিন্তু তার জন্য শরীর একটুও খারাপ হয়নি। বরং দুপুরবেলা বললেন, "আজ সকালে মন্দিরে গিয়ে খুব ভালো হয়েছে। আমার শরীরও ভালো আছে।"

রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে শুধু তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তা নয় একটা আশ্চর্য রকম দরদও ছিল। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার কথা বলি। অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় কবি তখন বিলাতে। দেশ থেকে তাঁর কাছে সকলে চিঠি লিখছেন। দেশের লোকের ইচ্ছা কবি দেশে ফিরে এসে আন্দোলনে যোগ দেন। কবি দেশে রওনা হলেন। আমরা খবর পেলুম যে, বম্বেতে একদিনও থাকবেন না। জাহাজঘাট থেকে সোজা ওভারল্যাণ্ড মেলে সকালবেলা বর্ধমান হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন। কলকাতাতে আসবেন না। আগের দিন রাত্রে বর্ধমান চলে গেলুম, স্টেশনে রাত কাটল। ভোরবেলা, তখনো ভালো করে ফরশা হয়নি, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছল। গাড়িতে উঠে প্রণাম করার সময় দেখি কবির মুখ গম্ভীর। প্রথম কথা আমাকে বললেন "প্রশান্ত, রামমোহনকে যেখানে pygmy মনে করে

১ প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৫

সেই দেশে আমি ফিরে এলুম!" এতদিন পরে দেখা, এই হ'ল প্রথম সম্ভাষণ। তার পরে বললেন "আমি বিলেতে এণ্ড্রুজ সাহেব, সুরেন, সকলের চিঠি পাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি যে, দেশে ফিরে আমার যদি কিছু কর্তব্য থাকে তো তা করব। জাহাজেও সারাপথ নিজেকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছি। বম্বেতে যখন জাহাজ পৌঁছল, দেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগেই একখানা খবরের কাগজ হাতে পড়ল। তাতে দেখি, রামমোহন রায় pygmy কেননা তিনি ইংরাজি শিখেছিলেন—এই হ'ল দেশের প্রথম খবর। তখন থেকে সে-কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছিনে।" সেদিন কবির মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলুম অসহযোগ আন্দোলনে ওঁর যোগ দেওয়া হবে না।

তার কারণ এর অল্পদিন পরেই 'শিক্ষার মিলন' আর 'সত্যের আহ্বান' নামে কলকাতায় যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্পষ্ট করে কবি নিজেই বলেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের সত্যিকারের মিলন। ভারতবর্ষ চিরদিন তার হৃদয়ের ক্ষেত্রে সর্বমানবকে আহ্বান করেছে, তার আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয়নি। রামমোহনও এই বাণীকেই বহন করে এনেছিলুম, আর ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে নিখিলমানবের যোগসেতুটিকে নূতন করে রচনা করেছিলেন। কবি নিজেও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার কথায় তাঁর মন সায় দিতে পারেনি।

আরেক দিনের ঘটনা বলি। বিশ্বভারতী যখন প্রতিষ্ঠা হয় সেই সময়কার কথা। বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন তখন পুরোমাত্রায় চলেছে। দেশের লোকের সকলের ইচ্ছা যে সে-সম্বন্ধে, বিশেষত কলকাতায় পুলিশের ধরপাকড় লাঠি-চালানো সম্পর্কে কবি কিছু লেখেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো নেতারা নিজে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিকে অনুরোধ করলেন আর কবিও কিছু লিখতে রাজী হলেন।

সেইদিনই বিকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে পৌঁচেছি। তখন শীতকাল, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। শুনলুম কবি 'দেহলী'র দোতালায় ছোটো ঘরে বসে ঐ লেখাটিই লিখছেন। উপরে উঠে দেখি ঘর অন্ধকার, কবি স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, "আজ কী কাণ্ড জানো? ওঁরা সব এসেছিলেন, অনেক কথা হ'ল, আমাকে রাজী করিয়ে গেলেন কিছু লিখতে হবে। কী লিখব মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলুম কিন্তু সমস্ত বিকালবেলাটা কুঁড়েমি করে কিছুতেই লিখতে বসা হ'ল না। তার পরে সন্ধ্যেবেলা ভাবলুম যে, না, আর দেরি করা নয় এখনি লিখে ফেলি। লিখতে বসেও মনে মনে সবটা আবার ভেবে নিলুম, ঠিক কোন্ কথাটা কোথায় কেমন করে গুছিয়ে বলব। কিন্তু কাগজ নিয়ে যেই কলম হাতে তুললুম হাত অবশ হয়ে এল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু হাত থেকে আবার কলম খসে পড়ল। আমার জীবনে কখনো এমন ঘটেনি। কলম কখনো আমার হাত থেকে খসে পড়েনি। তার পরে চুপ করে বসে আছি। বুঝলুম এ লেখা আমার দ্বারা হবে না।"

এই নিয়ে সকলে বিরক্ত হয়েছেন। অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন। কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে তাঁর বিধাতাপুরুষ সেদিন তাঁকে রক্ষা করেছিলেন এমন কিছু করা থেকে যা তাঁর অভিপ্রায় নয়।

বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটখাটো ঘটনাতেও এই একই জিনিস দেখেছি। কবে

কোথায় যাবেন, কবে কী করবেন তা অন্য লোক তো দূরের কথা তিনি নিজেও কিছু বলতে পারতেন না। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে অথচ বারে বারে দেখেছি সব কিছু বদলিয়ে গেল। বিলাত যাওয়াই শেষ মুহূর্তে বন্ধ হয়েছে চার-পাঁচবার। এ তো তবু বড়ো ব্যাপার। একবার মাদ্রাজ মেলে রওনা হয়ে খড়গ্‌পুর থেকে ফিরে এলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাও ঘটেছে। একদিনের কথা মনে আছে। লোকজন জিনিসপত্র হাওড়া স্টেশনে চলে গিয়েছে। হাওড়া-ব্রিজের সামনে রাস্তার পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বললেন, "গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।" আমরা ফিরে এলাম।

মনে আছে ১৯২৬ সালে বুডাপেস্ট শহর থেকে যেদিন রওনা হব। প্রথমে কথা হ'ল, যে, কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল যাওয়া হবে—আমি পশ্চিমমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে জায়গা রিজার্ভ করলুম। একটু পরে বললেন, ওদিকে না গিয়ে, প্যারিসে ফিরে যাবেন। অবশ্য দুদিক থেকেই তাগিদ ছিল। আমি তখনি গাড়ি বদলিয়ে পুবমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ব্যবস্থা করলুম। তারপরে আবার কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল। আমরা যে হোটেলে ছিলুম তার একতলায় বুকিং আপিস। আমি তাদের বুঝিয়ে বললুম, কবির ইচ্ছা, পুব আর পশ্চিম দুদিকেই গাড়ি ঠিক করলাম। কবি যতবার মত বদলান, আমি অল্প একটু ঘুরে এসে বলি যে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য টেলিগ্রাম আর টেলিফোন প্যারিসে করতে হ'ল অনেকবার। বুডাপেস্ট শহরে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস দুদিক থেকেই রাত দশটা আন্দাজ পৌঁছায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাত্রে খেতে বসলুম। এমন সময়ে একজন দেখা করতে এসে খুব ধরে পড়লেন যে, তাঁদের দেশে ক্রোয়াটিয়ার (Croatia) রাজধানী জাগ্রেব (Zagreb) শহরে যেতে হবে। পুব বা পশ্চিম কোনোদিকেই যাওয়া হোলো না। শেষ মুহূর্তে দক্ষিণদিকে জাগ্রেব-এর গাড়ি ধরলুম। খুব ভিড়। কবির খাতিরে অনেক কষ্টে সেদিন জায়গার ব্যবস্থা হ'ল। যাহোক্, এইভাবে ঐদিকে যাওয়ার ফলে সেবার সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক এই সব দেশের লোকের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

এইরকম শেষমুহূর্তে বারেবারে ব্যবস্থা বদলিয়েছে। নিজেই বলতেন "তা কী করব। একটা ব্যবস্থা হয়েছে বলেই যে সেটা মানতে হবে এমন কি কথা আছে। ব্যবস্থা যেমন হতে পারে আবার তেমনি বদলাতেও তো পারে।" দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে তাঁর এক সঙ্গী একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন যে দ্বারকানাথ অনেক সময় হঠাৎ সমস্ত ব্যবস্থা বদলিয়ে দিতেন। তাই তাঁর সঙ্গী বলেছিলেন, "Baboo changes his mind"। শেষ বয়সে কবি এই চিঠিখানা পড়েন, আর তার পর থেকে কবি অনেক সময় হাসতে হাসতে বলতেন "পিতামহ যা করেছেন পৌত্রও তো তা করতে পারেন। অতএব Baboo changes his mind !"

খানিকটা হয়তো কবির খেয়াল। কিন্তু তিনি নিজে মনে করতেন যে তাঁর বিধাতা-পুরুষ বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটোখাটো ঘটনাতেও তেমনি করে কবির জীবনকে একটা কোনো বিশেষ দিকে নিয়ে গিয়েছেন। ১৩১১ সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কবি একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নিজে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি সম্প্রতি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

কবির এরকম ধারণাও ছিল যে অনেক সময় বড়ো বড়ো বিপদের আগে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ইঙ্গিত পেয়েছেন। যাকে ভবিষ্যৎ জানা বলে তা নয়। অনিশ্চিত কোনো বিপদ বা মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া

ঠিক কী বিপদ তা না জেনেই। আমাকে একদিন বলেছিলেন যে-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কবির সহধর্মিণীর মৃত্যু হয়, তার কয়েক মাস আগে নববর্ষের সময় কবির মনে হ'ল সামনে খুব বড়ো রকম একটা দুঃখ বা বিচ্ছেদ আসছে। কথাটা এমন স্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল যে, কবি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন নিজেদের প্রস্তুত করবার জন্য।

নিজের সম্বন্ধেও অসুখ বা বিপদের কথা ওঁর আগে মনে হয়েছে দেখেছি। ১৯৪০ সালে বর্ষাকালে কালিম্পং রওনা হওয়ার আগের দিন রাত্রে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি লালবাড়ির পশ্চিমদিকের কোণের ঘরে মুখ বিমর্ষ করে বসে রয়েছেন। বৌঠান (প্রতিমা দেবী) আগেই কালিম্পং চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য কবির যথেষ্ট আগ্রহ। অথচ মনে মনে একটা বাধাও অনুভব করছিলেন। আমাকে বললেন, "পাহাড়ে যেতে ভালো লাগছে না। এবার পাহাড়ে গেলে ভালো হবে না। কিন্তু এখন সব স্থির হয়ে গিয়েছে। বৌমা চলে গিয়েছেন। এখন আর বদলাতে চাইনে। কিন্তু ভিতর থেকে একটা অনিচ্ছা।" পরের দিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে রওনা হওয়ার সময়েও দেখেছিলুম ওঁর মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ। হয়তো ওঁর অবচেতন-মন অজ্ঞাত কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিল। কয়েকদিন পরেই কালিম্পঙে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই ওঁকে আমরা কলকাতায় নামিয়ে আনতে বাধ্য হলুম। এই তাঁর শেষ অসুখ।

১৯৪১ সালে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন অপারেশন করার কথা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কবির একটুও মত ছিল না। পরে রাজী হয়েছিলেন। আমার নিজের বরাবরই অপারেশন করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। অপারেশন যেদিন করা হয় সেদিন সকালেও আমি দু-তিনজন ডাক্তারকে বলেছিলুম, যে, এখনো বন্ধ করা হোক। কিন্তু তার পরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে রকম কাণ্ড চলেছে, আর ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, নানা দিক দিয়ে যে রকম দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে এখন মনে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবি শেষ পর্যন্ত যে অপারেশনে মত দিলেন তাতে হয়তো ভালোই হয়েছে।

দুঃখবোধ

তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড়ো কথা ছিল, "ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।" বলতেন, "ভালোমন্দ সব ছাড়িয়ে আরো বড় কথা হচ্ছে সত্য। তাই তো আমাদের প্রার্থনা অসতো মা সদ্গময়। এতবড়ো প্রার্থনা আর নেই। প্রতিদিন নিজেকে বলি সত্য হও। যখন আত্মবিস্মৃত হই তাতে লজ্জা পাই, কারণ আমার সত্য-আমিটিকে তাতে ক'রে আবৃত করে দেয়। আমার প্রতিদিনের সাধনা তাকে আমি নির্মল ক'রে তুলব, সত্য ক'রে তুলব। নইলে আমার মধ্যে তাঁর প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হবে।"

গভীর শোকের সময়েও যে শান্ত থাকতে দেখেছি তার কারণ তাঁর এই সত্যদৃষ্টি। বলতেন, "জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। কষ্ট হয় মানি। কিন্তু মৃত্যু না থাকলে জীবনেরও কোনো মূল্য থাকে না। যেমন বিরহ না থাকলে মিলনের কোনো মানে নেই। তাই শোককে বাড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। অনেক সময় আমরা শোকটাকে ঘটা করে জাগিয়ে রাখি পাছে যাকে হারিয়েছি তার প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু এটাই অপরাধ, কারণ এটা মিথ্যে। মৃত্যুচেয়ে জীবনের দাবি বড়ো।"

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়িয়ে ধরে থাকা কবি পছন্দ করতেন না। লিপিকা বইয়ের 'কৃতঘ্ন শোক', 'সতেরো বছর', 'প্রথম শোক', 'মুক্তি' এই সব যখন লিখছেন সেই সময়ের কথা মনে আছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা জোড়াসাঁকোর তিনতলায় শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় কবির কাছে বসে আছি। পশ্চিমদিকের আকাশ তখনো লাল, নিচে চিৎপুরের রাস্তায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সামনের গলিতে দু-একটা আলো জ্বলে উঠছে। দোতলায় যে-ঘরে কবি মারা যান ঠিক তার উপরে তিনতলায় ঐ শোবার ঘর ছিল মহর্ষিদেবের, তিনি ঐ ঘরেই মারা গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় ঐ ঘরে তাঁকে দেখতে আসতুম। দক্ষিণদিকের দেয়ালে টাঙানো থাকতো একটা গির্জার ছবি—তার ঘড়িটা ছিল আসল। কম বয়সে সেইদিকে অনেক সময়ে চোখ পড়ত। সে-আমলের শুধু ঐ একটা জিনিসই বাকি ছিল—মহর্ষির সময়কার আর কোনো জিনিস ঐ ঘরে ছিল না। কবিকে এই সব কথা বলছিলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কবি বললেন :

"সদর স্ট্রীটের বাড়িতে বাবামশায়ের তখন খুব অসুখ। কেউ ভাবেনি যে তিনি সেবার সেরে উঠবেন। এই সময় আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে যেতেই বললেন—আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোনো ছবি বা মূর্তি বা ঐরকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্যথা না হয়।"

কবি বললেন, "বুঝলুম মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনোরকম বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। বাবামশায় জানতেন এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে না ডেকে আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমার এক-একসময় কী মনে হয় জানো? রামমোহন রায় খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলেন বিলাতে মারা গিয়ে। আমাদের দেশকে কিছু বিশ্বাস নেই। তাঁকে নিয়েও হয়তো একটা কাণ্ড আরম্ভ হ'ত। তিনি আগে থেকে তার পথ বন্ধ করে গিয়েছেন। আমার নিজের অনেক সময় মনে হয়েছে আমিও যদি বিদেশে মারা যাই তো ভালো হয়।"

সদর স্ট্রীটের বাড়িতে মহর্ষি যা বলেছিলেন তা এই একবার নয়, এর পরে কবি আরো দু-তিনবার আমাকে বলেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহর্ষির কোনো ছবি বা মূর্তি কখনো রাখা হয়নি, রাখা নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়। জোড়াসাঁকো বাড়ির তিনতলায় যে-ঘরে মহর্ষি মারা গিয়াছিলেন অনেকের ইচ্ছা ছিল যে এই ঘর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। মীরা আর রথীবাবুর কাছে শুনেছি এ নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু কবি কিছুতেই রাজী হননি। কবি এই ঘর অন্য সব ঘরের মতোই ব্যবহার করেছেন। সে ঘরে মহর্ষিদেবের ছবি পর্যন্ত রাখেন নি।

কবির নিজের কাছেও কখনো কারো ছবি বা ফটো রাখতে দেখিনি। ছবি সম্বন্ধে যে কবির কোনো আপত্তি ছিল তা নয়। যে যখন চেয়েছে নিজের অসংখ্য ছবিতে নাম সই করে দিয়েছেন। আসলে ছবি কাছে রাখবার তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন এলাহাবাদে তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির বাড়িতে বাস করেছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন-বৌঠানের একখানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার 'ছবি'-নামে কবিতাটি লেখেন। তাতে আছে :

সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

'ছবি' কবিতাটি লেখবার কয়েকদিনের মধ্যে এলাহাবাদে বসেই লেখেন 'শাজাহান' কবিতা যার মধ্যে আছে :

সমাধি-মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

এ-সব কথা বারেবারে বলেছেন তাঁর লেখায় গানে কবিতায়। কিন্তু শুধু গান বা কবিতায় নয়, জীবনে তিনি কীভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন তাও দেখেছি বারেবারে।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। বড়ো মেয়ে বেলা রোগশয্যায়। জোড়াগির্জার কাছে স্বামী শরৎ-চন্দ্রের বাড়িতে। কবি জোড়াসাঁকোয়। মেয়েকে দেখবার জন্য রোজ সকালে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাই। কবি দোতলায় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা করি। রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। রোজ যেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম। সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, "আমি পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।"

গাড়িতে আর কিছু বললেন না। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অন্যদিনের মতো আমাকে বললেন, "উপরে চলো।" তিনতলায় শোবার ঘরে গিয়ে বসলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে। তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম। ছেলেবেলায় অনেক সময় বলত, বাবা গল্প বলো। অসুখের মধ্যেও মাঝে মাঝে ছেলেবেলার মত বলত, বাবা গল্প বলো। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হ'ল।" এই বলে চুপ করে বসে রইলেন। শান্ত সমাহিত।

সেদিন বিকালে ওঁর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে।" বললেন, "না, বদলাবে কেন? তার কোনো দরকার নেই।" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বুঝতে পারলেন আমি একটু আশ্চর্য হয়েছি। বললেন, "এরকম তো আগে আরো হয়েছে।" তার পরে তাঁর মেজোমেয়ে মারা যাওয়ার সময়কার কথা নিজেই বললেন।

সে সময় স্বদেশী আন্দোলন চলছে। জাতীয়শিক্ষাপরিষদের ব্যবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অসুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।

আর একটি শোনা কথাও এখানে বলি। কবির ছোটো ছেলে শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় মারা যায়। কবি শেষমুহূর্তে গিয়ে পৌঁছলেন। মৃত্যুশয্যার পাশে গৃহকর্তা এমন অস্থির হয়ে পড়েন যে, সেদিন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কবি স্বয়ং। তারপরে কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন সে-কথা শুনেছিলুম জগদানন্দবাবুর কাছে। তার এল যে, কবি ফিরে আসছেন। আর কোনো খবর নেই। জগদানন্দবাবুরা ভাবলেন যে শমীকেও সঙ্গে নিয়ে আসছেন। সে আমলের বাহন গোরুর গাড়ি নিয়ে সকলে স্টেশনে গেলেন। কবি একা ট্রেন থেকে নেমে এলেন। ওঁর মুখ দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারেননি। পরে জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন শমী মারা গিয়েছে। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পরে সেদিনও কোনো কাজে কোথাও ফাঁক পড়েনি।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প দিন পরে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কবি বলেছিলেন:

হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা। হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি। হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি। সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া রাখিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।···

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি।···হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো।···তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি আবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।[১]

শমী মারা যাওয়ার সময় কবিকে কেউ বিচলিত হতে দেখেনি। অথচ তার অনেক বছর পরে শমীর কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে এল, তাও একদিন দেখেছি। কুড়ি-একুশ বছর আগেকার কথা। কবির তখন জ্বর, জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে। ছুটির সময়ে রথীবাবুরা কলকাতার বাইরে। বাড়িতে কেউ নেই। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি বেশ রীতিমতো চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন। আমাকে দেখে বললেন, "একটু জ্বর হয়েছে কিনা, তাই বোধ হয় মাথাটা উত্তেজিত আছে, কিছু চেঁচিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।" এই বলে লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মনে পড়লো শমীন্দ্রের কথা। বললেন, "শমীর ঠিক এইরকম হ'ত। ওর

১ 'ধর্ম', "দুঃখ" মাঘোৎসব, ১৩১৪

মা যখন মারা যায় তখন ও খুব ছোটো। তখন থেকে ওকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলেম। ওর স্বভাব ছিল ঠিক আমার মতো। আমার মতোই গান করতে পারত আর কবিতা ভালোবাসত। এক-একসময়ে দেখতুম চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছে। এই রকম দেখলেই বুঝতুম যে ওর জ্বর এসেছে। ওকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিতুম। আমার এই বুড়োবয়সেও কখনো কখনো সেই রকম হয়।"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শমীর ছেলেবেলার কথা বলতে লাগলেন। "ওর জন্য অনেক কবিতা লিখেছি। শমী বলত, বাবা গল্প বলো। আমি এক-একটা কবিতা লিখতুম আর ও মুখস্থ করে ফেলত। সমস্ত শরীর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবৃত্তি করত। ঠিক আমার নিজের ছেলেবেলার মতো। ছাতের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াত। নিজের মনে কত রকম ছিল ওর খেলা। দেখতেও ছিল ঠিক আমার মতো।" সেদিন দেখেছি শমীর কথা বলতে বলতে ওঁর চোখ জলে ভরে এসেছে।

আরো দেখেছি। কুড়ি বছর আগে, আলিপুরে হাওয়া-আপিসে তখন কাজ করি। কবি আমার ওখানে আছেন। কবির মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন বালিগঞ্জের বাড়িতে অত্যন্ত অসুস্থ। একদিন খবর এল যে অবস্থা খারাপ। কবি চলে গেলেন। কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি সঙ্গে যাইনি। খানিকক্ষণ পরে কবি ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর কিন্তু আর কিছু বোঝা যায় না। বললেন, শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পর ঘরে গিয়ে, অন্যদিনের মতোই নিজের কাজে মন দিলেন।

তখন আমার বাড়িতে আরেকজন অতিথি ছিলেন—একজন ইংরেজ, সার্ গিলবার্ট ওয়াকার। আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসতুম। সেদিন রাত্রে কবি নিজের ঘরে যদি আলাদা খেতে চান এই ভেবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম। বললেন, "না, তা কেন। একজন বিদেশী লোক রয়েছেন। আমি খাবার ঘরেই আসব।" সেদিনও খাওয়ার টেবিলে কথাবার্তায় কোথাও ফাঁক পড়েনি। মনে আছে, খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ ধ'রে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। আমার বিদেশী অতিথি সেদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, "এঁর কথা অনেকদিন থেকে শুনেছি। লেখাও পড়েছি। আজ ওঁর একটা বড়ো পরিচয় পেলাম।"

আরেকদিনের কথা বলি। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাস। কবি আমাদের বরানগরের বাগান বাড়িতে। কবির একমাত্র নাতি নীতু তখন বিলাতে। খুব সাংঘাতিক অসুখে ভুগছে। অল্পদিন আগে মীরা (নীতুর মা) এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে তার কাছে গিয়েছেন যতো শীঘ্র সম্ভব তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য। একদিন এণ্ড্রুজ সাহেবের চিঠি এল নীতুর অবস্থা একটু ভালো। তার পরের দিন ভোরবেলা কবি রানীকে বললেন, "যদিও সাহেব লিখেছেন যে নীতু একটু ভালো, তবু মন ভারাক্রান্ত রয়েছে।" তারপরে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। আর শেষে বললেন, "ভোরবেলা উঠে এই জানালা দিয়ে তোমার গাছপালা বাগান দেখছি আর নিজেকে ওদের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছি। বর্ষায় ওদের চেহারা কেমন খুশি হয়ে উঠেছে। ওদের মনে কোথাও ভয় নেই। ওরা বেঁচে আছে এই ওদের আনন্দ। নিজেকে যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তখন সে কী আরাম। আর কোনো ভয়ভাবনা মনকে পীড়া দেয় না। এই গাছপালার মতোই মন আনন্দে ভরে ওঠে।"

আমি এদিকে সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি, রয়টারের তার, নীতু মারা গিয়েছে। রথীবাবু তখন খড়দার বাড়িতে। তাঁকে ফোন করলুম। স্থির হ'ল, তিনি এসে কবিকে খবর দেবেন। খানিকক্ষণ পরে রথীবাবু এলেন। দোতলায় কবির কাছে গিয়ে বললেন, "নীতুর খবর এসেছে।" প্রথমে কবি বুঝতে পারেননি। বললেন, "কি, একটু ভালো?' রথীন্দ্রনাথ বললেন "না, ভালো নয়।" রথীন্দ্রনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন। তারপরে একেবারে স্তব্ধ। চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আর কিছু নয়। একটু পরে রথীন্দ্রনাথকে বললেন, "বুড়ি (নীতুর বোন) একা রয়েছে, বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান। আমি কাল ফিরব তোর সঙ্গে।"

সকালে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ নয়। সেইদিনই বসে বসে "পুকুরধারে" নামে কবিতাটি লিখলেন। 'পুনশ্চ' নামে যে বইটি নীতুকে উৎসর্গ করা তাতে ছাপা হয়েছে। পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেখানে তখন বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন চলছে। অনেকে নীতু মারা গিয়েছে বলে উৎসব বন্ধ রাখবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কবি বর্ষামঙ্গল বন্ধ রাখলেন না। নিজেও পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময়ে মীরাকে একখানা চিঠি লেখেন :

সমস্ত ভুলচুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে আমরা ভালোবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতর দিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তাহলে সে অভাব হ'ত গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েছে। এমন বারবার হ'ল, বারবার হবে। এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলছে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে।…নীতুকে খুব ভালোবাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।…অনেকে বললে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্ আমার শোকের খাতিরে। আমি বললুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব।…আমার সকল কাজকর্মই আমি সহজভাবে করে গেছি।……

যেরাত্রে শমী গিয়েছিল সেরাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতু চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধ'রে বারবার ক'রে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক।…শমী যেরাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনোসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে। ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩২

এই ভাবেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। তাই কবিতাতেও তিনি জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন :

দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।

আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।

তাই মৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন :

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাবো আমি চ'লে॥

দয়া ও করুণা

মানুষকে শুধু শুধু নিজের কাজে ব্যবহার করা এ জিনিসটা তাঁর কাছে ছিল বর্বরতা। বারবার বলেছেন, সভ্যতার ভিতরের কথা প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে আরো বড়ো কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা। যারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, দীনমজুর, বা চাকরের কাজ করে তাদেরও সুখসুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। দুপুরবেলা চাকরদের কখনো ডাকতেন না। জানতেন ঐ সময়ে হয়তো তারা একটু বিশ্রাম করে। অপেক্ষা করে থাকতেন তারা নিজেরা যতক্ষণ না আসে। বেশি কিছু দরকার হলে নিজেই যা পারেন করে নিতেন।

সব সময়েই চেষ্টা ছিল যারা কাছে আছে তাদের সকলের সঙ্গে একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা। শেষবয়সে তাঁর পরিচারক ছিল বনমালী। তাকে নিয়ে কতরকম হাসিঠাট্টা করেছেন, গান গেয়েছেন। একদিন রাত্রে খাওয়ার পরে দু-তিনজনকে গান শেখাচ্ছেন। বনমালী ওঁর জন্য আইসক্রীমের প্লেট নিয়ে একবার এগিয়ে আসছে, আবার কাজের ব্যাঘাত করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেদিকে কবির চোখ পড়ল, আর হাত ঘুরিয়ে গান ধরলেন, "হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি, দ্বিধা কেন ?" সকলে হেসে অস্থির। বনমালী একেবারে দৌড়। এই রকম কত ব্যাপার ঘটত। আবার বনমালীর বাড়ি থেকে কোনো বিপদের খবর এলে অস্থির হয়ে উঠতেন যতক্ষণ না ভালো খবর আসে।

নিতান্ত সামান্য লোককেও কখনো অবজ্ঞা করেননি। তাঁর কাছে যে কেউ চিঠি লিখেছে, যতদিন সক্ষম ছিলেন, নিজের হাতে উত্তর দিয়েছেন। দেখা করতে এলে কাউকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। শরীর যতই অসুস্থ থাকুক, কাজের যতই ব্যাঘাত হোক তাতে আসে যায় না। একটা কিছু লিখছেন বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, আমরা কাউকে হয়তো ঠেকিয়েছি, খবর পেলে মনে মনে বিরক্ত হতেন। বারবার বলতেন, "আহা, আর তো কিছু নয়। আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবে। না হয় দুটো কথা বলবে। তার জন্যে এত হাঙ্গামা কেন ? এতেই যদি খুশি হয়, এটুকু কি আমি দিতে পারিনে।"

শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু সম্বন্ধেও তাঁর ছিল অসীম করুণা। বিশেষ ক'রে যাদের কেউ দেখবার নেই, যাদের কথা কেউ ভাবে না। শখ করে কখনো পাখি বা জানোয়ার পুষতে দেখিনি। কিন্তু নিরাশ্রয় জন্তু এসে ওঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে তা অনেকবার দেখেছি। শান্তিনিকেতনে কবির ঘরের সামনে পাখিদের জন্য জলের পাত্র ভরা থাকত। কবি রোজ নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। শালিখ পায়রা চড়াই কতরকম পাখি ওঁর আশেপাশে ঘুরে খুঁটিয়ে খাবার খেয়ে যেত। কাকের দলও মাঝে মাঝে আসত। সে কথা স্মরণ করে 'আকাশপ্রদীপ' বইয়ের 'পাখির ভোজ' নামে কবিতায় লিখেছেন :

এমন সময় আসে কাকের দল,
　　খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
　　…প্রথম হোলো মনে
তাড়িয়ে দেব, লজ্জা হোলো তারি পরক্ষণে
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার।
আমার মতোই সমান অধিকার।
　　তখন দেখি লাগছে না আর মন্দ,
　　সকালবেলার ভোজের সভায়
　　　　কাকের নাচের ছন্দ।

শান্তিনিকেতনে একটা ময়ূর ছিল। কেউ তাকে খাঁচায় পুরে রাখবার মতলব করলেই কবির চেয়ারের পিছনে এসে বসত। চাকরবাকরেরা চারিদিকে ঘুরছে, সে আর নড়ে না। কখনো কখনো কবি চাকরদের সরিয়ে দিতেন, বলতেন, "পাখিটাকে একটু নিস্তার দে।" তখন সে স্বচ্ছন্দমনে ঘুরে বেড়াত। এই ময়ূরটির কথাও আকাশপ্রদীপ বইএর আর একটি কবিতায় লিখেছেন।

শেষের দিকে একটা লাল রঙের কুকুর আসত, তার নাম দিয়েছিলেন লালু। এটা রাস্তার কুকুর। উঁচুজাতের তো নয়ই। কিন্তু রথীবাবুর দামী পোষা কুকুরের চেয়ে এর সম্বন্ধেই কবির দরদ ছিল বেশি। রোজ নিজের পাত থেকে একে খাওয়াতেন। কুকুরটাও ছিল মজার। কবির কাছে তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সংযত। যতক্ষণ কবির খাওয়া শেষ না হয় চুপ করে পিছন ফিরে বসে থাকত। খাওয়া হয়ে গেলে ওকে ডাকলে তখন খেতে আসত। কিন্তু কেউ যদি ওকে বলত হ্যাংলা কুকুর, লজ্জা নেই, খাওয়ার জন্য লোভ করছে, অমনি চলে যেত। কবি অনেক সময় আমাদের ডেকে বলেছেন, "রাস্তার কুকুর কিন্তু এর আছে আসল আভিজাত্য।" 'আরোগ্য' নামে বইতে এই কুকুরটির কথা লিখেছেন :

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে। • • •
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয়—সৃষ্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

কবির শেষ অসুখের সময়ে যখন উত্তরায়ণের দোতলায় থাকতেন বলে দিয়েছিলেন যে লালু দোতলায় এসে তাঁকে একবার করে রোজ যেন দেখে যেতে পায়, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়।

আমাদের বাড়িতে যখন থাকতেন, দেখেছি যে আমাদের পোষা কুকুর কোনো দুষ্টুমি করেই ওঁর পায়ের কাছে বা চেয়ারের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। জানে যে সেখান থেকে আমরা টেনে এনে শাস্তি দিতে পারব না। তিনি অনেকবার লক্ষ্য করেছেন যে আমরা বাইরে চলে গেলে কুকুরটি অস্থির হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের বলতেন, "আমার ভারি খারাপ লাগে। তোমরা হঠাৎ কেন চলে যাও,

কখন ফিরে এসো কিছু বোঝে না, মন খারাপ করে বসে থাকে। ওদের কিছু বোঝানো যায় না, অথচ ওরা কষ্ট পায় দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়।"

যেসব গাছপালার কেউ যত্ন করে না তাদের প্রতি ছিল কবির বিশেষ টান। একসময়ে যখন শান্তিনিকেতনে 'কোণার্ক' নামে বাড়িতে থাকতেন পিছনের একটা উঁচু জায়গা ঘিরে নিয়ে কাঁটাগাছের বাগান তৈরি করলেন। সেখানে নানা জায়গা থেকে নানারকম বুনো কাঁটাফুলের গাছ সংগ্রহ করে রাখতেন। নিজের হাতে এই গাছগুলিতে জল দিতেন, আর আমাদের ডেকে বলতেন, "কী সুন্দর সব কাঁটাফুল একবার চোখ তুলে দেখো।" বেশির ভাগ ফুলের নাম জানা নেই। কত নতুন নাম তিনি নিজে রচনা করেছেন—সোনাঝুরি, বনপুলক, হিমঝুরি, বাসন্তী। কবির লেখার মধ্যে এইরকম অনেক ফুল আর গাছের কথা আছে যাদের দিয়ে আর কোনো কবি কখনো গান রচনা করেননি। এইসব দেখে সহজেই বোঝা যায় যে মহাকবিরা যাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, যারা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তাদের কথাও রবীন্দ্রনাথ কেন স্মরণ করেছেন।

আসল কথা যারা সকলের কাছে ছোটো, যাদের সকলে অবজ্ঞা করে, কবির করুণা বিশেষভাবে তাদের দিকেই ধাবিত হয়েছে। সংসারে যারা অভাগা, যারা অত্যাচরিত তাদের জন্য কবির মন চিরদিন পীড়িত। যৌবনের প্রারম্ভেই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লিখেছিলেন :

…স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।…
…এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।…

গরিবদুঃখীদের কথা তিনি শুধু কবিতায় বলেননি। নানারকমে তাদের সাহায্য করেছেন। তাদের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করেছেন। জমিদারির কাজের মধ্যেও বারবার তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এখানে একটা সামান্য ঘটনার কথা বলি। জমিদারির একটা অংশ ছিল শিলাইদার কাছে কুষ্টিয়ার পাশে। পাঁচ-ছয় বছর আগে আমরা একদিন কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে নৌকা করে হিজলাবট গ্রামে যাচ্ছি। মাঝির বেশ বয়স হয়েছে। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় বললে যে, ঠাকুরবাবুদের জমিদারিতে। কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেছে কিনা। যেই কবির নাম করা মাঝির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে, "হাঁ, দেখেছি বইকি। কতবার আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি। আর কাছারি-বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি। আহা! কী চেহারা। মানুষ তো নয়, দেবতা। সেরকম আর কখনো দেখব না। আর কী দয়া! যখনি ইচ্ছা সরাসরি তাঁর কাছে চলে যেতুম। কেউ আমাদের ঠেকাতে পারত না। তাঁর হুকুম ছিল, সকলেই কাছে যেতে পারবে। আমাদের দুঃখের কথা যখনি যা বলেছি তখনি ব্যবস্থা করেছেন।"

এই সময়ে কবির একবার হিজলাবটে বেড়াতে যাওয়ার কথা হয়েছিল। এই খবর শুনে মাঝি

বললে, "আহা, আর একটিবার যদি তাঁকে দেখতে পেতুম। কবে তিনি আসবেন? আমাদের যেন নিশ্চয় খবর দেওয়া হয়। আমরা সকলে এসে আরেকবার তাঁকে দেখে যাব।" আশ্চর্য ব্যাপার! এই বুড়ো মুসলমান মাঝি চল্লিশ বছর আগে তাঁকে দেখেছিল, কখনো ভুলতে পারেনি। ওঁর কথা শুনে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বারবার বললে, "অমন মানুষ দেখিনি। অমন মানুষ আর হয় না।"

কবিকে পরে এই মাঝির গল্প করায় খুব খুশি হলেন। বললেন, "ওরা সত্যিই আমাকে ভালোবাসত। কম বয়সে যখন প্রথম জমিদারির কাজের ভার নিলুম তখনকার একজন খুব বুড়ো মুসলমান প্রজার কথা মনে আছে। এক বছর ভাল ফসল হয়নি। প্রজারা খাজনা রেহাই পাওয়ার জন্য এসেছে। আমি বুঝলুম সত্যিই দুরবস্থা। যতটা সম্ভব খাজনা মাপ করতে বলে দিলুম। প্রজারা খুব খুশি হ'ল। কিন্তু এই বুড়ো মুসলমান প্রজা আমাকে এসে বললে, 'এত টাকা মাপ করছ, কর্তামশায় তো তোমাকে বকবে না? তুমি ছেলেমানুষ। ভেবে দেখো, বুঝেসুঝে কাজ করো।' সে আমাকে এত ভালোবাসত, যে, আমার জন্য তার ভয় হ'ল পাছে আমার দাদারা আমাকে তিরস্কার করেন।"

কবি যে পল্লীসংস্কারের কথা বারে বারে বলেছেন তার ভিতরের কথা হচ্ছে যে যারা গরিব দুঃখী চাষী তাদের জীবনকে কী করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা যায়। বিশ্বভারতীর মধ্যে শ্রীনিকেতনের কেন এতবড়ো জায়গা, কবিকে যাঁরা জানতেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। বড়ো বড়ো আদর্শের কথা শুধু বইতে লেখেননি, কী করে সে-সব আদর্শ গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা যায় সারাজীবন সেই চেষ্টা করেছেন। যখন জমিদারি দেখতেন তখনো যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও তেমনি সেই একই চেষ্টা। যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন সমস্ত টাকা চাষীদের সাহায্য করার জন্য কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজে লাগালেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর মন পড়ে ছিল কিসে দেশের সাধারণ লোক ভালো করে দুটি খেতে পায়, কিসে তারা ভালো করে থাকতে পারে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে একথা যেমন বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন তার প্রথম ধাপ হচ্ছে আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের কল্যাণকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করা। বড়ো বড়ো আদর্শ সম্বন্ধে কথার চাতুরীতে নিজেকে বা পরকে ভোলাননি। বরং তাঁর মনে একটা ভয় ছিল পাছে বড়ো বড়ো কথার ফাঁকে আসল কাজের জিনিসে ফাঁকি পড়ে। শেষ বয়সে তাই অনেক দুঃখে লিখেছিলেন :

কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

ধৈর্য ও উদারতা

মানুষের সম্বন্ধে ছিল আশ্চর্য ধৈর্য ও ক্ষমা। কারুর মতামত বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। উপর থেকে কখনো কোনো চাপ দেননি। সব সময়েই চেষ্টা ছিল বুঝিয়ে বলে কিংবা নিজের উদাহরণ দেখিয়ে কাজ করানো।

তিরিশ বছর আগেকার কথা। আশ্রমের নিয়ম ছিল যে ছাত্র অধ্যাপক সকলেই ঘর আসবাব-পত্র সমস্ত পরিষ্কার রাখবে। কিন্তু শিথিলতা ঘটত। একসময়ে কবি এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেন কিন্তু আশানুরূপ ফল হয়নি। এই রকম একটা সময়ে সকালবেলার গাড়িতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। বিদ্যালয়ের ছোটো আপিসঘরটি তখন ছিল শালবীথিকায়। গিয়ে দেখি কবি নিজে একটা ঝাঁটা নিয়ে সমস্ত ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছেন। সকলে অপ্রস্তুত। অনেকে ওঁর হাত থেকে ঝাঁটা নিতে এল। উনি তাদের বাধা দিয়ে বললেন, "আহা, তোমরা তো রোজই করবে। আজ আমাকে করতে দাও।" এই বলে আর কাউকে সেদিন ঝাঁটা ছুঁতে দিলেন না। নিজের হাতে খুব পরিপাটি করে সমস্ত পরিষ্কার করলেন। এই ছিল তাঁর ঠিক নিজের মনের মতো পন্থা। জোর করে নয়, কিন্তু ইঙ্গিত দিয়ে কাজ করাতেই তিনি ভালোবাসতেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের যা মূল আদর্শ, কোনো জায়গায় তার কিছুমাত্র স্খলন না হয় সে সম্বন্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এইটুকু বাঁচিয়ে চললেই যার যে রকম মত হোক না কেন তাতে বাধা দেননি। শান্তিনিকেতনের মধ্যে কবির নিজের আদর্শের বিরুদ্ধে আলোচনা, এমন কি আন্দোলনও, অনেকবার হয়েছে। কবি যা ভালোবাসেন না তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে এমন কাজ বা আচরণ করা হয়েছে। আমরা অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি ; বলেছি, "আপনার জোর করে বারণ করা উচিত।" কিন্তু রাজী করাতে পারিনি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত সহ্য করেছেন। বলেছেন, "বাইরে থেকে জোর করে কিছু হয় না। জোর করে নিয়ম মানানো যায় এই পর্যন্ত। কিন্তু সে·কতটুকু জিনিস ? আসল কথা মানুষকে তার নিজের ভিতরের দিক থেকে বড়ো হতে দেওয়া।" বিশ্বভারতীর কর্মব্যবস্থার সঙ্গে দশ বছর আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলুম। দশ বছর কর্মসচিবের কাজ করেছি। অনেকবার মতভেদ ঘটেছে, বিরক্ত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কর্ম-পরিচালনা সম্বন্ধে একদিনও আমার উপরে জোর করে কোনো হুকুম জারি করেননি।

যারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে, ক্ষতি করেছে, তাদের সম্বন্ধেও ছিল অদ্ভুত উদারতা। বাইশ-তেইশ বছর আগে একদিন বিকালে জোড়াসাঁকোয় লালবাড়ির দোতলায় বসে আছি। সে আমলের একজন নামজাদা সাহিত্যিক দেখা করতে এলেন। ইনি প্রকাশ্যভাবে কবির বিরুদ্ধে মাসের পর মাস অন্যায় অপমানজনক বিদ্রূপ ও সমালোচনা ক'রে এসেছেন। কলকাতায় কবির পঞ্চাশ বৎসরের জন্মোৎসবের সময়ে ইনি বিধিমতে বাধা দিয়েছেন। অনেক বছর কবির সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই এঁকে সেদিন আসতে দেখে আশ্চর্য হলুম। যা হোক, ইনি অল্প দু-চার কথা বলবার পরেই কবিকে জানালেন যে, তিনি একটা বার্ষিকী বের করছেন তার জন্য কবির একটা নতুন লেখা চাই। কবির হাতে তখন একটা ভালো লেখা ছিল। যেই এ-কথা শোনা তখনি সেই লেখাটা দিয়ে দিলেন।

এই ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পরে আমি কবিকে বললুম, "আপনি এঁকেও লেখা দিলেন ?" কবি একটু হেসে বললেন, "উনি বলেই তো আরো সহজে দিলুম। আমাকে সমালোচনা করেন, সে ওঁর ইচ্ছা। ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা'ও করেন। হয়তো তাতে ওঁর খ্যাতি বাড়ে। হয়তো অন্যদিকেও ওঁর সুবিধা হয়। কিন্তু এখন ওঁর নিজের দরকার পড়েছে তাই আমার কাছে এসেছেন। আমার একটা লেখা চাই। তা থেকে ওঁকে বঞ্চিত করি কেন ? আমার তাতে কি এসে যায় ?"

এরকম এক-আধবার নয়, অনেকবার ঘটেছে। একজন লেখকের কথা জানি যিনি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মুখে আনা যায় না এমন মিথ্যা কুৎসা ছাপার অক্ষরে রটনা করেছেন। কবি তা নিয়ে মর্মাহত হয়েছেন। বিচলিত হয়েছেন পাছে এরকম ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ বিনা প্রতিবাদে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নজীর হয়। এই নিয়ে মানহানির মোকদ্দমা আনাতেও কবির অপমান, এই ভেবে নিরস্ত হতে হয়েছে। অথচ পরে এই সাহিত্যিকটিই যখন আবার কবির কাছে এসেছেন তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আরেকজনের কথা কবির নিজের কাছে শুনেছি। একসময়ে সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি নানারকমে কবির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এই লোকটিকে কবি অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য করেছেন। বলতেন, "সাহায্য যখন করি তখন সব চেয়ে ভয় হয় পাছে তার জন্য কোনো দাম ফিরে চাই।" তাই এই লোকটির শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মাসিক দান বন্ধ করেননি।

সকলের ভালো দিকটাই দেখতে চাইতেন তাই সহজেই সকলকে বিশ্বাস করতেন। কবির নিজের কাছে শুনেছি, বাংলাদেশে যেবার খুব বড়ো ভূমিকম্প হয় তারপরে রাজশাহী থেকে একখানা চিঠি পেলেন। একজন লিখেছে সে বিধবা, ভূমিকম্পে তার ঘরবাড়ি সব পড়ে গিয়েছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে পথে দাঁড়িয়েছে। কবি তাঁকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে লাগলেন। পরে কী এক উপলক্ষ্যে রাজশাহী যাওয়ায় এই পরিবারের খোঁজ করেন। তখন জানা গেল যে ঐ ঠিকানায় আদৌ কোনো বিধবা মেয়ে থাকে না। এক নিষ্কর্মা যুবক ফাঁকি দিয়ে কবির টাকায় বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছে। এর পরেও কিন্তু হঠাৎ টাকা বন্ধ করলেন না। ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

কবি বলতেন, মানুষ দোষ করে, অপরাধ করে। কিন্তু তাই বলে কাউকে চিরকালের মতো দাগী করে দেওয়া চলে না। মানুষকে কখনো অবিশ্বাস করতে চাইতেন না। তাই অনেকবার তাঁকে ঠকতে হয়েছে। তাঁর নিজের কাছে শুনেছি, স্টীমারে পার হওয়ার সময়ে একবার একটি ছেলে কবি-গৃহিণীকে এসে বলে, যে তিনি তার আগের জন্মের মা। তার বড়ো সাধ যে সে রোজ সকালে মায়ের পাদোদক খায়। পূর্বজন্মের ইতিহাস হেসে উড়িয়ে দিলেও ছেলেটি জোড়াসাঁকোর সংসারে টিঁকে গেল। সে বললে, কলেজে ভর্তি হয়েছে। খায় দায়, কলেজের মাইনে বই কেনার জন্য টাকা নেয়। কবি তাকে তাঁর লাইব্রেরি দেখবার ভার দিলেন। কিছুদিন পরে অনেকগুলি বই আর খুঁজে পান না। মনে মনে একটু সন্দেহ হ'ল, কিন্তু নিজেই তাতে লজ্জিত হলেন। যা হোক ছেলেটিকে ডেকে বললেন, অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে না ভালো করে যেন খুঁজে দেখে। সে বললে, খুব ভালো করে তদারক করবে। কয়েকদিন পরে এসে বললে যে, সে বুঝতে পেরেছে কেন বই হারাচ্ছে। কী ব্যাপার ? সে তখন খুব গম্ভীরভাবে

কবিকে জানাল যে, সুরেনবাবু সুধীবাবু বলুবাবু এঁরা সব অবাধে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করেন। কবি প্রথমে বুঝতেই পারেননি যে তাঁর ভাইপোদের লাইব্রেরিতে যাওয়ার সঙ্গে বই হারানোর কী সম্পর্ক থাকতে পারে। পরে ইঙ্গিতটা বুঝলেন, আর এমন কথা কেউ মুখে আনতে পারে দেখে নিজেই অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু কথাটা সুরেনবাবুদের জানালেন। তাঁরা ক্ষেপে অস্থির। খোঁজ করে দেখেন যে, ছেলেটি কলেজে ভর্তি হওয়া তো দূরের কথা এণ্ট্রান্স পরীক্ষাই পাশ করে নি। আরো খোঁজ পাওয়া গেল পুরানো বইয়ের দোকানে কবির বই বিক্রি করছে—কতকগুলি বই উদ্ধারও হ'ল। কিন্তু এর পরেও ছেলেটি যখন কবির কাছে "পিতা, অপরাধী" ব'লে দাঁড়াল তখন তাকে পরিত্যাগ করতে পারলেন না। এই ছেলেটিরও একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

এইরকম করে কত লোক যে ওঁকে ঠকিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ-সব ছিল একরকম ইচ্ছা করেই ঠকা। বলতেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চাইনে। নিজে ঠকেও যদি মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বাস অটুট থাকে তবে সেই তো ভালো। নইলে যদি ভুল করেও কাউকে অবিশ্বাস করি তো সে কতবড়ো অন্যায়। নিজের সামান্য ক্ষতি হ'ল কিনা এ-কথা তার কাছে কত তুচ্ছ।" আমাদের অনেকবার বলেছেন, "তোমরা বোঝো না। আমার সন্দিগ্ধ মন। জানো তো আমাদের বংশে পাগলামির ছিট আছে, আর পাগলামির একটা লক্ষণ হচ্ছে সন্দেহবাতিক, তাই তো আমাকে আরো বেশি সাবধান হতে হয় পাছে কারোর সম্বন্ধে অন্যায় সন্দেহ করি। সন্দেহ আমার হয়। অন্য লোকের চেয়ে হয়তো বেশিই হয়, তাই বারে বারে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি।"

অনেক সময় লোকের উপর রাগ করতেন, বিরক্ত হতেন। কিন্তু কারোর সম্বন্ধে রাগ বা বিরক্তি বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারতেন না। বলতেন, "যখন কারো উপরে রাগ করি তখন বুঝি যে আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি। তাতেই আমার লজ্জা। তাই চেষ্টা করি যত শীঘ্র পারি মন থেকে রাগ বিরক্তি ঝেড়ে ফেলতে।" ওঁর নিজের কাছেই একটা গল্প শুনেছি। মেজো মেয়ে যখন মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত তাকে আলমোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে শরীর আরো খারাপ হওয়ায় তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরিয়ে আনা স্থির হ'লা। যানবাহনের অভাব। মেয়েকে ডাণ্ডিতে চড়িয়ে অনেক দূরের পাহাড়ে পথ নিজে পায়ে হেঁটে রেল স্টেসনে এসে পৌঁছলেন। ট্রেনে ফেরবার পথে, মাঝে কোন্ একটা স্টেসনে দেখলেন বেঞ্চির উপর থেকে দুশো টাকার ব্যাগ চুরি গিয়েছে। হাতে পয়সা নেই, খুবই বিপদ। কবি বলেছিলেন, "প্রথমে ভারি রাগ হ'ল লোকটার উপরে যে, এরকম ভাবে টাকা চুরি করল। তার পরে চুপ করে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, যে-লোকটা নিয়েছে তার হয়তো খুব টাকার দরকার। আমার চেয়েও হয়তো তার ঘরে আরো বড়ো বিপদ। তখন ভাবতে চেষ্টা করলুম যে, টাকাটা আমি তাকে দান করেছি। সে চুরি করেনি, আমি তাকে দিয়েছি যেই এ-কথা মনে করা, বাস্, আমার রাগ কোথায় মিলিয়ে গেল। মন শান্ত হ'ল।"

কবি বলতেন, "কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না এ হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের বিধি। ঈশ্বর কোনো বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তাঁর শুধু একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন—প্রকাশিত হও। সূর্যকে বলেছেন, পৃথিবীকে বলেছেন, মানুষকেও বলেছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাঁর শুধু এই আদেশ

প্রকাশিত হও।" তাই কোনো বিধিনিষেধের দিক দিয়ে কবি কখনো কোনো মানুষকে বিচার করেননি। মানুষকে দেখতেন ঠিক মানুষ হিসাবে। কোনো শুচিবাই তাঁর ছিল না। কবির লেখায় এই কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়।

তাই দেখেছি নিঃসংকোচে তাঁর কাছে এসেছে এমন সব লোক যাদের নীতিবাগীশেরা দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কোনোরকম মিথ্যা, কোনোরকম ক্ষুদ্রতা নীচতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করলেই কাউকে বর্জন করবে তা কখনো মনে করেননি। পিতামাতার সামাজিক অপরাধের জন্য তিনি ছেলেমেয়েদের কখনো অপরাধী করেননি। বলতেন, "মানুষ ভুল করে এ-কথা সত্য। কিন্তু এইটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। কে কী ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে তার চেয়ে বড়ো কথা কে কী রকম লোক।"

সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। বিশ্বভারতী থেকে কলকাতায় একটি অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। একটি মেয়ে খুব ভালো অভিনয় করতে পারে। কবি তাকে ডেকে পাঠালেন। নিজের নাটকে অভিনয় করবার জন্য বললেন, আর কয়েকদিন ধরে তাকে গান আর অভিনয় শেখালেন। মেয়েটির কিন্তু সমাজে অত্যন্ত নিন্দা, সে অপাংক্তেয়। তার সঙ্গে অভিনয় করায় অনেকের ঘোর আপত্তি। বাধ্য হয়ে তাকে বাদ দিতে হ'ল। কবি কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। আমাকে বললেন, "দেখো, মানুষের যেখানে সত্যিকারের ক্ষমতা আছে সেখানে সে বড়ো। মানুষের বড়ো দিকটাও যদি আমরা না নিতে পারি সে আমাদের দুর্ভাগ্য। আমার তো একে নিয়ে অভিনয় করতে কিছু বাধে না। কিন্তু কী করব, উপায় নেই। সকলের যখন আপত্তি, আমি একা কী করব?" মেয়েটিকে ডেকে এনে যে বাদ দিতে বাধ্য হলেন এ দুঃখ তাঁর কোনোদিন ঘোচেনি।

'ল্যাবরেটরি' নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়, কবি তখন অসুস্থ, অল্পদিন আগে তাঁকে কালিম্পঙ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিকালবেলা গিয়ে শুনি, যে, দুপুর থেকে আমাকে খুঁজছেন। আমি যেতেই গল্পটা দেখিয়ে বললেন, "পড়েছ?" আমি বললুম, "খুব ভালো লেগেছে। এ রকম জোরালো গল্প কম আছে।" বললেন, "হাঁ, তোমার তো ভালো লাগবেই। কিন্তু আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে এটা লেখা ওঁর উচিত হয়নি?" একটু হেসে বললেন, "আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কী রকম, তার মনের জোর, তার লয়ালটি, এই হ'ল আসলে বড়ো কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাত—সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।"

মানুষের মন, এই ছিল তাঁর কাছে আসল জিনিস। বাইরের রীতিনীতি সব সময়েই গৌণ। লেখা হয়নি এমন একটা নাটকের কথা বলি। কবির কাছে শুনেছি, যে সময় 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি মহাভারতের গল্প নিয়ে লিখছেন, তখন আরেকটা গল্পের কথাও মাথায় এসেছিল। যদুবংশের মেয়েদের দস্যুরা হরণ করে নিয়ে গেল, অর্জুনও তাদের রক্ষা করতে

পারলেন না। প্রথমে ভেবেছিলেন চৌদ্দ অক্ষরের পদ্যে লিখবেন, কিন্তু সেই সময় অনেকগুলি লেখা ঐ ভাবে হওয়ায় এটাতে আর হাত দেননি। অনেকদিন পরে 'রাজা' আর 'অচলায়তন' যখন লেখা হয়, তখন ভেবেছিলেন এই নিয়ে একটা গদ্য নাটক লিখবেন। সেই সময় আমাকে বলেন কী ভাবে লেখবার ইচ্ছা। কৃষ্ণ, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর যদুবংশের সব বীরেরা বড়ো বড়ো যুদ্ধ, বড়ো বড়ো কথা আর বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় নেই। মেয়েরা আছে শুধু ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ওদিকে অনার্য দস্যুরা হ'ল পৃথিবীর মানুষ, তারা এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, গান শোনায়। মেয়েদের মন তাদের দিকেই আকৃষ্ট হ'ল। মেয়েরাই তখন লুকিয়ে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত নষ্ট করল—যাতে দস্যুরা তাদের সহজে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে। দস্যুদের ঠেকাতে গিয়ে অর্জুন দেখেন তাঁর গাণ্ডীবের ছিলা কাটা। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর কিছু করবার সময় নেই। যে কারণেই হোক এ নাটকটা লেখা হয়নি। পরেও মাঝে মাঝে এই নাটকের কথা বলেছেন আর সঙ্গে হাসতে হাসতে বলেছেন, "এই নাটক লিখলে সকলে চটে যাবে, কেউ আমার রক্ষা রাখবে না।"

বিশ্ব-মানব

বিশ্ব-মানবের আদর্শ কবি তাঁর লেখায় বক্তৃতায় দেশে দেশে প্রচার করেছেন। কিন্তু শুধু মুখের কথায় তা আবদ্ধ ছিল না। নিজের ঘরে কোনো বিদেশী অতিথি এলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠত। তাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। প্রত্যেকের জন্য একটা দেশী নাম তৈরি করতেন। নরওয়ে থেকে এলেন অধ্যাপক কোনো (Konow), তাঁর নাম হোলো কণ্ব। ডেনমার্ক থেকে একটি মেয়ে এল তার নাম দিলেন হৈমন্তী। কেউ বা বাসন্তী, এই রকম কত কী। বিদেশেও দেখেছি বারে বারে বলেছেন, "অন্য দেশের লোকেরা যখন আমার কাছে আসে, আমাকে ভালোবেসে কিছু দেয়, হয়তো আমার একটু সেবা করে তখনি সব চেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে আমি মানুষ—সার্থক আমার মানবজন্ম।" তাই লিখেছেন :

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ-কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব'লে।…
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম পরিনু চিনের বেশবাস।
এ-কথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। —জন্মদিনে

শুধু কি বিদেশী মানুষ? দক্ষিণ-আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে লিখেছিলেন:

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
কী তোমার নাম,
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়; হাসিতে তোমার পরিচয়॥···
হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি?
হাসিয়া দুলাও মাথা; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুইদিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা;—
মোরে ভুলিবে না। —পূরবী

গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন, "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" এ-কথা তাঁর নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কবির সঙ্গে সার্বিয়া থেকে বুলগেরিয়া যাচ্ছি। গভীর রাত্রে সীমানার কাছে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে—বেশি ঠাণ্ডা নয়, আমাদের দেশের শীতকালের রাতের মতো। হঠাৎ শুনি কবির গাড়ির পাশে কে এসে বাঁশি বাজাচ্ছে তাঁকে শোনাবার জন্য। অজানা সুর, কিন্তু তার মধ্যে দেশী সুরের রেশ। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করল বাঁশি তখনো থামেনি। কে বাজাল, কী তার পরিচয় জানি না। কবির সঙ্গে তার দেখাও হ'ল না। কবি তার বাঁশি শুনলেন এই শুধু তার পুরস্কার।

বিদেশের ভালো দিকটা সর্বদা দেখেছেন কিন্তু গায়ের জোরে কেউ বিশ্ব-মানবের পথ রোধ করে দাঁড়াবে তা কখনো সহ্য করেননি। ১৯২৬ সালে মুসোলিনির নিমন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে ফ্যাসিস্ত-তন্ত্রের ভালো দিকটাই শুধু তাঁকে দেখানো হ'ল। দিনরাত ঘিরে রইল শুধু গোঁড়া ফ্যাসিস্ত-পন্থীরা। নিজের লেখায় কবি মুসোলিনির প্রশংসা করলেন। ইটালি থেকে বাইরে যাওয়ার পরে অন্য দিকের কথা শুনতে পেলেন। প্রথমে ভিলনিউভ-এ দেখা হ'ল রোমাঁ রোলাঁ আর দুহামেলের সঙ্গে। পরে দেখা হোলো মাদাম সাল্‌ভাডোরি (Madam Salvadori), মাদাম সালভামিনি (Madam Salvamini), আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ্ (Angelica Balbanoff), এই রকম সব লোকের সঙ্গে যাঁরা ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কবি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কী করা যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বার বার করে লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। আহারনিদ্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা ওঁকে ভিলনিউভ থেকে জ্যুরিক্ সেখান

থেকে ইন্‌স্‌ব্রুক তার পরে ভিয়েনা আর সেখান থেকে প্যারিসে নিয়ে গেলাম। য়ুরোপের সব চেয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তাররা দেখলেন। কিছুতেই কিছু হয় না। কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তার পরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন তখন শান্ত হলেন। শরীর মন দুই ভালো হয়ে গেল।

শেষ বয়স পর্যন্ত ঠিক এই রকম। জার্মানি যখন নরওয়ে আক্রমণ করে, সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতনে রেডিয়োতে খবর পৌছল। শুনে ওঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, বললেন, "অসুররা আবার নরওয়ের ঘাড়ে পড়ল—ওরা কাউকে বাদ দেবে না।" তার পরে কয়েকদিন ধরে বারে বারে আমাদের বলেছেন, "নরওয়ের লোকজনের কথা মনে পড়ছে আর আমার অসহ্য লাগছে। তাদের যে কী হচ্ছে জানিনে।"

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কালিম্পঙ থেকে ওঁকে অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে আনলুম। তার কয়েকদিন পরের কথা। শরীর তখনো এমন দুর্বল যে, ভালো করে কথা বলতে পারেন না, কথা জড়িয়ে যায়। একদিন খবর পেলুম আমাকে বার বার ডেকেছেন। কিন্তু পৌছতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। আমাকে দেখেই বললেন, "অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি, চীনদেশের লোকেরা যে যুদ্ধ করছে"—বলতে বলতে কথা জড়িয়ে এল। থেমে গেলেন। বললেন, "এত দেরি করলে কেন? যা বলতে চাচ্ছি বলতে পারছিনে। একটু আগে কথাটা খুব স্পষ্ট ছিল, এখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।" বুঝলুম, কিছু বলবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। রুগ্ন শরীরে এতটা উত্তেজনা সহ্য হয়নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পাশে বসে অপেক্ষা করলুম। তখন থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা কথায় বলে গেলেন :

"চীনদেশের লোকেরা চিরদিন যুদ্ধ করাকে বর্বরতা মনে করেছে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছে লড়াই করতে দানবরা ওকে আক্রমণ করেছে বলে। এতেই ওদের গৌরব। ওরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে এই হ'ল বড় কথা। ওরা যুদ্ধে হেরে গেলেও ওদের লজ্জা নেই। ওরা যে অত্যাচার সহ্য করেনি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এতেই ওরা অমর হয়ে থাকবে।"

বুঝলুম কী বলতে চান। 'নৈবেদ্য'র কবিতায় অনেকদিন আগে লিখেছিলেন :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে।

আশি বছর বয়সে, জীর্ণ শরীরে, কঠিন রোগের সময়েও ভুলতে পারেননি চীনদেশে কী কাণ্ড চলেছে। বিছানায় উঠে বসবার ক্ষমতা নেই, তখনো ভুলতে পারেননি যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। শেষবয়সেও লিখেছেন :

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।...

মৃত্যুর তিন মাস আগেও 'সভ্যতার সংকটে' লিখেছেন :

আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রবো। আশা ক'রবো মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।

শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল তাঁর এই বিশ্বাস। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও বারেবারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, সব চেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : "রাশিয়ার খবর বলো।" বললুম, "একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।" মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।"

তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য, যে, সেদিন তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।

১৯৪২, ৯ই আগষ্ট, রবিবার কবির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মুখে বলা হয়। পরে পরিবর্ধিত আকারে লেখা।

বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম অভিনয়ের তারিখ

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যেদিন বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম অভিনয় হয় সেদিন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ও ছিলেন। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইনি একটি কবিতা লিখেন 'বালিকা-প্রতিভা' নামে। ইহা রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'অবসর-সরোজিনী'তে সঙ্কলিত আছে। কবিতাটিতে যে পাদটীকা আছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার দিবসে বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

শ্রীসুকুমার সেন

বৈশ্য সভ্যতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমি কবি মনোমোহন বোসের একটি লম্বা কবিতা পড়ি। সে কবিতার প্রথম লাইন হচ্ছে :

দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।

আমি মনোমোহন বোসকে কবি বলছি এই কারণে যে, আমাদের ছেলেবেলায় যে-সমস্ত কবিতাপুস্তক পড়তে হত, তার মধ্যে মনোমোহন বোসের পদ্যমালা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। যদুগোপাল চাটুজ্যের পদ্যপাঠ ছিল নানা কবির নানা কবিতার একপ্রকার সংগ্রহপুস্তক, কিন্তু মনোমোহন বোসের পদ্যমালা আদ্যোপান্ত তাঁর নিজের লেখা। ছেলেদের সে কবিতাগুলি খুব ভাল লাগত; এবং বড়রাও তার তারিফ করতেন। যে দীর্ঘ কবিতাটির উল্লেখ করেছি, তাতে এক জায়গায় ছিল :

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার।

ইংরেজ আমলে যে নানারূপ আর্টিজান ক্লাসের দুর্দশা ঘটেছে, তা সকলেই জানেন। এর কারণ, হাত কলের সঙ্গে সমান বেগে চলতে পারে না। এর ফলে কারিগরের দল সব কর্মহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ ঘটনা সব দেশেই হয়েছে। জর্মান কবি হাউপ্টম্যান এই ব্যাপার নিয়ে "Weavers" নামক একখানি নাটক লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এই আর্টিজান সম্প্রদায় আমাদের দেশের গৌরববৃদ্ধি করেছিল। কামার কুমোর ছুতোর প্রভৃতি আমাদের দেশে নবশাখ বলে পরিচিত। এই নবশাখ সম্প্রদায় সমাজের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। কারণ এদের হাতে-গড়া সামগ্রী ব্যতীত আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব ছিল। এই নবশাখদের প্রতি আমাদের কোনোরূপ অবজ্ঞা ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে যখন জাহাজে-আনা কলে-তৈরি নানা দ্রব্যে দেশ ছেয়ে ফেলেছে, এবং এই কারিগর সম্প্রদায় আমাদের মত শিক্ষিত নয়, অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত নয়, —তখন ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তারা নগণ্য শূদ্রের সামিল হয়ে পড়েছে।

এই নবশাখ সম্প্রদায় কারা?—আমার বিশ্বাস তারা আদিতে বৈশ্য ছিল। মনু এ-সব সম্প্রদায়ের একটি লম্বা ফর্দ দিয়েছেন। তাঁর মতে তারা সকলেই বর্ণসঙ্কর। এবং কি করে তারা বর্ণসঙ্কর হল, তারও হদিস তিনি বাতলেছেন। কিন্তু মনুর সে-সব কথা অগ্রাহ্য। একটা কথা নিশ্চিত যে, সেকালে বৈশ্যেরা দ্বিজ ছিল, এবং তাদের উপনয়ন হত। তারা সাবিত্রীভ্রষ্ট নয়; অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রে তাদের অধিকার ছিল। সংস্কৃত বইয়ে বৈশ্যদের বিষয় বেশি কিছু লেখা হয়নি; লেখা হয়েছে শুধু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের বিষয়। সেদিন পঞ্চতন্ত্রে একটি গল্প পড়লুম। তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ছুতোর ও তাঁতিরা সব বৈশ্য ছিল।

সে গল্পটি হচ্ছে এই : গৌড়দেশে এক ছোকরা রথকার (ছুতোর) আর একটি কৌলিক (তাঁতি) ছিল, যারা নিজের নিজের বিদ্যায় পারগামী হয়েছিল। উভয়ে পরস্পরের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তারা

দিনের বেলায় নিজের নিজের কাজ করত, তারপর সন্ধ্যাবেলায় মৃদু বিচিত্র বসন পরিধান করে, সুগন্ধদ্রব্য অঙ্গে লেপন করে ভ্রমণ করতে বেরত ; এবং মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করত। একদিন তাঁতি ছোকরা হঠাৎ রাজপ্রাসাদের বাতায়নে রাজকন্যাকে দেখতে পেলে, এবং দেখামাত্র তার প্রতি ভয়ংকর প্রণয়াসক্ত হল। তার পরদিন থেকে সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করলে। তার এইরকম অবস্থা দেখে রথকার বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে? তাতে সে বললে যে, সে রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, অথচ তাকে পাবার কোনো উপায় নেই, তাই তার এই দশা। তার উত্তরে রথকার বললে—তোমার কোনো ভাবনা নেই ; আমি একটি গরুড়যন্ত্র তৈরি করে দেব, যাতে চড়ে তুমি আকাশপথে উড়ে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করতে পারবে—স্বয়ং নারায়ণ সেজে। এই গরুড়যন্ত্র হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে এরোপ্লেন, তারই সংস্কৃত নাম। এই গল্পটি অতি চমৎকার, কিন্তু এস্থলে সব গল্পটি আমি বলব না।

রথকার আরও বললে,

ক্ষত্রিয়ো হসৌ রাজা। ত্বং চ বৈশ্যঃ সন্ন্ অধর্মাদ্ অগ্নি ন বিভেষি। ততো হসৌ প্রাহ। ক্ষত্রিয়স্য তিস্রো ভার্যা ধমতো ভবন্ত্য এব। তদ্ এষা কদাচিদ্ বৈশ্যাসুতা ভবিষ্যতি। তদ্ অনুরাগো মমাস্যাম। উক্তং চ।

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
যদ্ আর্যম্ অস্যাম্ অভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণম্ অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

উপরে যে সংস্কৃত কথাগুলি তুল্লুম, তার ভাবার্থ এই ঃ—রাজকন্যাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে অধর্ম হবে না। কেন না, রাজা হচ্ছেন ক্ষত্রিয় ; আর শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন বর্ণের তিনটি বিবাহ করা বৈধ। প্রথম স্ত্রী হবেন ক্ষত্রিয়কন্যা, দ্বিতীয়টি বৈশ্যকন্যা, এবং তৃতীয়টি শূদ্রকন্যা। এ অবস্থায়, যে রাজ-কন্যাকে তুমি দেখেছ, সে বৈশ্যসুতাও হতে পারে। তা ছাড়া এরূপ সন্দেহের স্থলে সৎলোকের মনোমত কাজ করাই সংগত।—এ কথোপকথন থেকে প্রমাণ হয় যে, আমরা যাকে নবশাখ বলি, তারা সকলে বৈশ্য ছিল ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিল না। তারাও দ্বিজ। প্রভেদ যা ছিল, তা কেবল গুণকর্মে। এই বৈশ্য সম্প্রদায় ইংরেজ আমলে শুধু নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে হেয় হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে না হোক, বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈশ্যদের অনেক কথা আছে। ভগবান বুদ্ধ যখন কোনো নতুন নগরে যেতেন, তখন এই সব কামার কুমোর তাঁতি প্রভৃতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিশান উড়িয়ে মহা ধুমধাম করে দলে দলে তাঁর অভ্যর্থনা করতে আসত। আর আমার বিশ্বাস, এরা সকলেই ছিল বৈশ্য। এবং ভগবান বুদ্ধের নবপ্রচারিত ধর্ম প্রধানত বৈশ্য সম্প্রদায়ই গ্রহণ করেছিল। এ-বিষয় যদি বিস্তারিত জানতে চান তো মহাবস্তু পড়ে দেখবেন।

স্বয়ং বুদ্ধের প্রধান শিষ্যের ভিতর উপালি ছিল নাপিত, এবং ঘটিকার (কুমোর) প্রভৃতি ছিল তাঁর আদিশিষ্য। জাতকে অনেক লোকের বর্ণনা পাওয়া যায়, যারা সকলেই ছিল বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁর উপাসক হয়ে ওঠে। এরা সকলেই ছিল সমাজে গণ্যমান্য। এমন

কি, পৈশাচী ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এই বৈশ্য বণিক এবং কারুজীবীদের বর্ণনায় পূর্ণ। এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, সেকালে বৈশ্যরা হেয় সম্প্রদায় ছিল না, এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা তারাই একরকম গড়ে তুলেছিল।

বাংলায় যাঁরা সর্বপ্রথম ইংরেজিশিক্ষিত হন, তাঁরা বাঙালীদের অনেক বিষয়ে আত্মোন্নতির পথপ্রদর্শক। তাঁদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা এই আর্টিজান ধ্বংস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। আমি খালি একজনের উল্লেখ করব। 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখক টেকচাঁদ ঠাকুরের ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে, তিনি দেশের শিল্পরক্ষা ও শিল্পের উন্নতির জন্য কত নানাবিধ চেষ্টা করেছিলেন। তারপরে অপর অনেকেও করেছেন। কিন্তু সে-সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষিত বুর্জোয়া সম্প্রদায় এর কোনো প্রতিকার করতে পারেনি।

তার বহুকাল পরে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশী শিল্পরক্ষার জন্য অনেকে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এবং বাংলার প্রধান শিল্প বস্ত্রবয়নের দিকে তাঁদের নজর পড়ে। চন্দননগরের খট্‌খটি তাঁত দেশময় প্রচার করবার জন্য বহু লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীতে এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য বহু অর্থব্যয় করেছেন। অবশ্য আমাদের এ-সব চেষ্টায় ম্যাঞ্চেস্টরকে কাবু করতে পারা যায়নি। কারণ তাঁতিরা ম্যাঞ্চেস্টর থেকেই সুতো কিনত।

তারপর মহাত্মা গান্ধী চরকার আশ্রয় নিলেন। এবং চরকায়-কাটা মোটা সুতোয় খদ্দর প্রস্তুত করতে ব্রতী হলেন। খদ্দরের পোলিটিকাল প্রভাব যাই হোক, আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির তাতে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়েছে বলে ত মনে হয় না।

আমি বহুকাল পূর্বে রংপুরে এক রায়ত-সভায় সভাপতি হিসেবে একটি অভিভাষণ পাঠ করি। সেক্ষেত্রে আর পাঁচ কথার ভিতর আমি বলি :

"ইংরেজের আমলে আমাদের হাত যে শুকিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ, যে-সম্প্রদায়ের কাজই হচ্ছে হাতের কাজ, সে সম্প্রদায় একরকম উচ্ছন্নে গেছে। কামার কুমোর তাঁতি ছুতোর যুগী জোলা প্রভৃতি সব কলের তলে চাপা পড়ে পিষে গিয়েছে। শিল্পীর দল এখন আর এদেশে নেই, আছে ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায়। তাদের হাতের তৈরি মাল আমাদের জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু যে দেশে শিল্প আছে, সে দেশে একালে শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের, মাথার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এর একটির শক্তির সঙ্গে অপরটির শক্তি বাড়ে কিংবা কমে, সুতরাং সে-সব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ-দেহেরই উচ্চাঙ্গ। এদেশে সে উচ্চাঙ্গ ছিন্ন অঙ্গ। আমি যখন একটু দূর থেকে স্ব-সম্প্রদায়কে দেখি, তখন আমি মনে মনে এ-কথা না বলে থাকতে পারিনে যে, কাটা মুণ্ড কথা কয়। শুধু কথা কয় না, বড় বড় কথা বলে, তাও আবার ইংরেজিতে। এ দেখে যাঁর আনন্দ হয় তিনি ছেলেমানুষ; আমার শুধু হাসি পায়, কিন্তু সে হাসি কান্নারই সামিল।"

আমাদের বর্তমান দুর্দশার প্রধান কারণই হচ্ছে, সমাজ-অঙ্গের হস্ত পঙ্গু হয়ে যাওয়া। এই ভীষণ অবস্থা থেকে কি করে উদ্ধার পাব, আমি তা জানিনে; অপর কেউ জানেন বলেও আমার বিশ্বাস নেই। সুতরাং রংপুরের বক্তৃতাতে আমি এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় বাতলাইনি। ধরুন যদি

বর্তমান যুদ্ধের পরে আমরা স্বরাজ লাভ করি, তাহলেও এ ঘোর সমস্যা সমানই থেকে যাবে। কারণ আমরা পোলিটিকাল স্বরাজ পেলেও, বিদেশের কাছে ইকনমিক অধীনতা দূর হবে না। তবে স্বরাজ লাভ করলে এই সমস্যার দিকে সকলেরই নজর পড়বে, এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ আমাদের দেশের বৈশ্য সভ্যতা পুনরুদ্ধার করতে ব্রতী হবেন। আজকের দিনে পলিটিক্স ইকনমিক্স-এর অধীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুদ্ধের মূলে যতটা ইকনমিক্স আছে, সম্ভবত ততটা পলিটিক্স নেই। আবার এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সব জাতিই অত্যন্ত ইকনমিক দুর্দশায় পড়েছে ; যদিও আমাদের মত ঘোর দুর্ভিক্ষ আর কারো হয়নি।

আমাদের দেশ কৃষিকর্মের দেশ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে একটি গানে বলেছিলেন :

"দেশে বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

আজও হয়ত আমরা দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করছি ; কিন্তু দেশের লোকে অন্নাভাবে উপবাসী।

শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা যে বিদেশীদের কতদূর অধীন, আজকের সে-বিষয় সকলেরই চোখ ফুটেছে। নিত্যব্যবহার্য বস্তু যে শুধু ভয়ানক দুর্মূল্য তা নয়—দুষ্প্রাপ্য। কোন্ কোন্ জিনিস দুষ্প্রাপ্য তার কোনো ফর্দ দেব না। কারণ তার অভাব সকলেই অনুভব করছেন। আমি পূর্বে বলেছি যে, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে কলের সঙ্গে হাত পাল্লা দিতে পারে না। অপর পক্ষে, এক হিসেবে কল হাতের সঙ্গে লড়তে পারে না। সূক্ষ্ম ও সুন্দর জিনিস হাত যেমন তৈরি করতে পারে, কল তা পারে না। সে কারণ, আমাদের কোনো কোনো শিল্প আজও টিঁকে আছে। বয়নশিল্পে তাঁতিদের কাছে বিলাতের কল সব হেরে গিয়েছে। শান্তিপুর ও ঢাকার তাঁতিদের বোনা ধুতিশাড়ির সঙ্গে কলে-বোনা ধুতি-শাড়ির কোনো তুলনা হয় না। সুতরাং আজও দেশে তাঁতে-বোনা কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

কুমোরের ব্যবসা আজও সমান চলছে। তার কারণ, আমরা চীনেমাটির বাসন ব্যবহার করিনে, করি দেশী মাটির বাসন। সে-সব জিনিস, যথা হাঁড়িকলসী প্রভৃতি, দেশে প্রচুর পরিমাণে বানানো হয়। সেগুলি যেমন নিত্যব্যবহার্য, তেমনি সুলভ। কি ইংলণ্ড, কি জর্মানি, এবিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে কখনো চেষ্টাও করেনি। মাটির ঠাকুরও বিদেশীরা গড়তে পারে না। আমি আমার 'আত্মকথা'য় বলেছি যে, কৃষ্ণনগরের তুল্য কুমোর বাংলায় আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের ভালো ভালো কারিগর এখন আর্টিস্ট হবার চেষ্টায় আছে। যে মূর্তি পাথর কেটে গড়লে অতি সুদৃশ্য হয়, সেইজাতীয় মূর্তি সব মাটিতে গড়বার চেষ্টা করছে। উপরন্তু তারা জর্মানির চীনেমাটির পুতুলেরও নকলে পুতুল গড়ছে।

এই শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব কি করে পূরণ করা যেতে পারে, সে-বিষয় এখন কোনো কোনো সাহিত্যিকও পথপ্রদর্শক হয়েছেন। 'গড্ডলিকা'র লেখক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর সদ্যপ্রকাশিত 'কুটিরশিল্প' নামক পুস্তিকা তার প্রমাণ। ইউরোপে যাকে বলে কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি, রাজশেখরবাবুর কুটিরশিল্প ঠিক তা নয়। এই কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি বড় বড় কলকারখানার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি না, সে বিষয়ে ইকনমিস্টরা বহু আলোচনা করেছেন। শেষটা তাঁরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তা কিছুতেই হতে পারে না। কলের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের নানারূপ পরীক্ষা করতে হবে। সে-সব পরীক্ষার ফল যে কি হবে, তা আজকের দিনে বলা কঠিন। কল যখন মানুষের সুবিধার্থ নির্মিত

হয়েছে, তখন কলের উচ্ছেদ করা অসম্ভব। আমি সেদিন ইংরেজ লেখক প্রীস্টলির একখানা বই পড়ছিলুম। তাতে দেখলুম তিনি বলেছেন, বড় বড় কলকারখানাই মানবজাতির বর্তমান দুর্দশার কারণ। কিন্তু বড় বড় কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেই যে মানবজাতি স্বর্গলাভ করবে, তা তো মনে হয় না। আমার বিশ্বাস কলের কাজও থাকবে, হাতের কাজও থাকবে। হাতের পিছনে মানুষের মন আছে, কলের পিছনে নেই। আর মানুষের মন বাদ দিয়ে মানুষের সভ্যতা কি করে গড়া যায়, তা আমি জানিনে। ভবিষ্যতে কলের কাজের সঙ্গে হাতের কাজেরও একটা ভাগবাঁটোয়ারা হবে বলে আমার বিশ্বাস। অনেকে বলেন যে, বিলাতি সভ্যতা বৈশ্য সভ্যতা। হতে পারে তাই। কিন্তু বৈশ্য সভ্যতার প্রধান সহায় হচ্ছে ক্ষাত্রশক্তি। আর এই ক্ষাত্রশক্তির ধ্বংসলীলা ত আমরা আজ দেখতেই পাচ্ছি। এমন দিন যদি কখনো আসে যেদিন পৃথিবীতে ক্ষাত্রশক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ সভ্যতা ও বৈশ্য সভ্যতা দুইয়ে মিলে একটি নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারবে, তাহলে সেই শান্ত সভ্যতার কাছে মানবজাতি সুখস্বাচ্ছন্দ্য আশা করতে পারে।

(শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অশোকের ধর্মনীতির পরিণাম

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

১

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্যসাম্রাজ্যের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। বাহুবলে ও শাসননৈপুণ্যে, ধর্মবিস্তারে ও প্রজারঞ্জনে, ঐশ্বর্যে ও শিল্পে, এবং সর্বোপরি বহির্জগতের সঙ্গে যোগস্থাপনে ও বৈদেশিক শক্তির শ্রদ্ধা-অর্জনে মৌর্যসাম্রাজ্যের গৌরব ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতুলনীয়। বৈদিক যুগ থেকে যে আর্যসভ্যতা ক্রমবিস্তার লাভ করতে করতে ভারতীয় সভ্যতার রূপ ধারণ করছিল, তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে মৌর্যযুগে। এবং এদেশের ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রগঠনপ্রচেষ্টাও এই যুগেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত সংস্কৃতির বিস্তার ও রাষ্ট্রগৌরব, এই উভয় দিক্ দিয়েই এই যুগ হচ্ছে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভ্যুদয়ের সর্বোচ্চ সীমা। এই অভ্যুদয়ের চরম পরিণতি ঘটেছিল প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-৩২)। আর, অশোক যে শুধু ভারতবর্ষের নয় পরন্তু সমগ্র পৃথিবীরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্, একথা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। অথচ এই অশোকের রাজত্বের অত্যল্পকাল পরেই মৌর্যসাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা হয়। মৌর্যযুগের পর ভারতবর্ষের ইতিহাস আর কখনও অনুরূপ সর্বাঙ্গীণ গৌরবের অধিকারী হয়নি। সুতরাং অশোকের রাজত্বকালের পর এত শীঘ্র মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটল কেন, এইটে স্বভাবতই ঐতিহাসিকগণের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় এবং আমাদের পক্ষেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

২

মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কতকগুলি কারণ অতি সুস্পষ্ট। এস্থলে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলেই নিরস্ত হবো।

প্রথমত, উক্ত সাম্রাজ্যের অতিবিশালতাই তার পতনের অন্যতম কারণ। তখনকার দিনে অত বড়ো প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যকে এক কেন্দ্রের আয়ত্তে রাখা ও তার সমস্ত প্রান্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ছিল না। সে যুগে রাজপথের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল বটে; কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক রাজপথের রজ্জুবন্ধনে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রান্ত রাজধানী পাটলিপুত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়েছিল কিনা সন্দেহ। 'All roads lead to Rome'-এর অনুরূপ উক্তি পাটলিপুত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। আর, বহুসংখ্যক রাজপথ থাকলেও আধুনিক কালের ন্যায় দ্রুতগতি যানবাহনের অভাবে তৎকালে অত বড়ো সাম্রাজ্যকে যথোচিতরূপে কেন্দ্রানুগত করে রাখা সম্ভব ছিল না। রাজধানী পাটলিপুত্রের ভৌগোলিক অবস্থিতিও সাম্রাজ্যের সর্বাংশের আনুগত্য বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল ছিল বলে বোধ হয় না। রাজধানী যদি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে কিংবা আশংকিত বিপৎস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত হতো, তাহলে হয়তো উক্ত সাম্রাজ্যের বিনাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হতো।

দ্বিতীয়ত, রাজকুমারগণের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য- ও রাজত্ব-লিপ্সা। অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই জলৌক নামক তাঁর এক পুত্র কাশ্মীরে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসেন নামক অপর এক পুত্রও

সম্ভবত গন্ধারে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। একথা নিশ্চিত যে খ্রীঃ পূঃ ২০৬ অব্দের পূর্বেই সুভাগসেন নামক এক শক্তিশালী রাজা (সম্ভবত উক্ত বীরসেনের বংশধর) ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। রাজকুমারগণের এরকম স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে অশোকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আত্মকলহের কথাও অনুমান করা যায়। অশোক নিজেও ভ্রাতৃকলহে জয়লাভ করে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন, বৌদ্ধ সাহিত্যেই একথার উল্লেখ আছে।

তৃতীয়ত, অশোকের পরবর্তী মৌর্য রাজাদের অনেকেই যে দুর্বল, রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে তাঁদের গৌরবকাহিনী প্রায় নেই বললেই হয়, যা আছে তাও অতি নগণ্য। তাঁদের রাজত্বকালের কোনো শিল্পনিদর্শন বা শিলালিপি পাওয়া যায়নি। নাগার্জুনি পর্বতে অশোকের পৌত্র দশরথের যে তিনখানি লিপি পাওয়া গিয়েছে তার অসৌষ্ঠব লক্ষ্য করার বিষয়। এসব কারণে মনে হয় এঁদের রাজত্বকালে অশোকের আমলের ঐশ্বর্য ও শিল্পগৌরব অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। অশোকের অন্যতম বংশধর (সম্ভবত প্রপৌত্র) শালিশুক সম্বন্ধে গার্গীসংহিতায় বলা হয়েছে 'স্বরাষ্ট্রং মর্দতে ঘোরং ধর্মবাদী অধার্মিকঃ'। শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথও নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন এবং সৈন্য-পরিচালনার ভার সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সুযোগে সেনাপতি পুষ্যমিত্র সৈন্যদলের সম্মুখেই তাঁকে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেন।

চতুর্থত, প্রান্তবর্তী অচিরবিজিত প্রদেশগুলির পুনঃস্বাতন্ত্র্যলাভের স্বাভাবিক ইচ্ছাও সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরার অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। কাশ্মীর, গন্ধার, বিদর্ভ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ অশোকের অত্যল্প কাল পরেই স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই রাজপুরুষগণের উৎপীড়ন ও তজ্জনিত বিদ্রোহের ফলেই এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একথা মনে করার হেতু আছে। দিব্যাবদান গ্রন্থে দেখা যায়, একবার বিন্দুসারের আমলে এবং আরেকবার অশোকের আমলেই তক্ষশিলা নগরে দুষ্টামাত্যগণের উৎপীড়ন ('পরিভব') ও অপমানের ফলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল। অশোকের শিলালিপিতেও তোসলী (কলিঙ্গে), উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলায় মহামাত্রগণের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। অশোক অবশ্য এই অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং হয়তো অনেকটা সাফল্য লাভও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীরা অত্যাচারী অমাত্যগণকে দমন করতে সমর্থ হননি বলেই মনে হয়।

যখন এই সমস্ত অকর্মণ্য রাজাদের শিথিল মুষ্টি থেকে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের পরিচালিত রাজদণ্ড স্খলিতপ্রায় হয়ে এসেছিল, তখন একদিকে রাজ্যলিপ্সু সেনাপতি পুষ্যমিত্র এবং অপরদিকে বিজয়কামী 'দুষ্টবিক্রান্ত' ও 'যুদ্ধদুর্মদ' যবনগণের আক্রমণে মৌর্যসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র-স্বরূপ রাজধানী যদি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রবেশপথের নিকটে অবস্থিত হতো তাহলে হয়তো ভারতবর্ষে যবনবিজয় এত সহজসাধ্য হতো না।

৩

অশোকের অবলম্বিত শাসননীতিও মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতির কতকটা সহায়তা করেছে বলে অনুমিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল, এর থেকে স্বভাবতই মনে হয়

এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্বও সম্ভবত কম নয়। 'রাজূক'-নামক একশ্রেণীর প্রচুর ক্ষমতাশালী রাজপুরুষকে অনেকখানি স্বাতন্ত্র্য ও বহুশতসহস্র প্রজার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। একশ্রেণীর বিশিষ্ট কর্মচারীকে এতখানি ক্ষমতা, স্বাতন্ত্র্য এবং এত বেশি লোকের উপর আধিপত্য করার সুযোগ দান রাজ্যের সংহতি রক্ষার পক্ষে খুব সম্ভব অনুকূল হয়নি এবং অশোকের পরবর্তী দুর্বল রাজাদের পক্ষে ওই রাজূকগণকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অশোক ছিলেন দানে মুক্তহস্ত। তাঁর শিলালিপিতেও পুনঃপুন দানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। দরিদ্রকে ভিক্ষাদান, ব্রাহ্মণশ্রমণকে অর্থদান, স্থবিরদিগকে হিরণ্যদান, সর্বধর্মসম্প্রদায়কে সাহায্যদান, আজীবিকদের উদ্দেশ্যে গুহাদান, বুদ্ধের জন্মভূমির সম্মানার্থে লুম্বিনী গ্রামকে রাজস্ব ('বলি' ও 'ভাগ') থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি কার্যে অশোক নিশ্চয়ই বিস্তর অর্থব্যয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হর্ষবর্ধনের অতিদানপরায়ণতার কথাও স্মরণীয়। তাছাড়া, দেশে ও বিদেশে মানুষ ও পশুর চিকিৎসাব্যবস্থা এবং ভেষজ সংগ্রহ ও রোপণ, রাজপথে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য, সর্বধর্মের সারবর্ধনার্থ ধর্মমহামাত্রাদি নিয়োগ, নানা দেশে দূতপ্রেরণ, রাজ্যের সর্বত্র পর্বতে স্তম্ভে ও ফলকে ধর্মলিপি উৎকিরণ এবং নানাবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের সঞ্চিত অর্থ নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং তাতে সাম্রাজ্যের আর্থিক শক্তির অনেকখানি ক্ষতি হয়েছিল, এমন অনুমান করা অসংগত নয়। কিন্তু অশোকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এই যে, কলিঙ্গবিজয়ের পরে তিনি যে সংগ্রামবিমুখতার নীতি অবলম্বন করলেন তার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিল। তাতে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণ, দুটোই সহজসাধ্য হয়েছিল। পূর্বে এক প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩৪৯) আমি দেখিয়েছি যে, অশোক সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না ; তিনি রাজ্যবিস্তারমূলক (offensive ও aggressive) যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজ্যরক্ষামূলক (defensive) যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। তিনি তাঁর সেনাদলকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিলেন, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই ; শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাদলের কথা সুবিদিত। কিন্তু একথা সত্য যে, কলিঙ্গযুদ্ধের পরে তাঁর মন যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি একান্তরূপেই বিমুখ হয়ে উঠেছিল এবং নিজে দিগ্‌বিজয়নীতি পরিহার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি ; তাঁর পুত্র-প্রপৌত্রেরাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্যবিজয়ের আকাংক্ষা মনে স্থান না দেন, সে ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। সুতরাং যে সামরিক শক্তির সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অশোক সেই সামরিক শক্তিকে অবহেলা করে সাম্রাজ্যের বিনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

৪

কিন্তু এগুলি হচ্ছে বাহ্য কারণ। এর চেয়ে গভীরতর কোনো কারণ আছে কিনা এবং মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে অশোকের অনুসৃত ধর্মনীতির কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা, তাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বহুকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের ফলেই মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তিনি এই পতনকে

একটি বিরাট্ রাষ্ট্রবিপ্লব (great revolution)-এর ফল বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে ওই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ব্রাহ্মণ-সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই অভিমতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন—

The theory which ascribes the decline and dismemberment of the Maurya Empire to a Brahmanical revolution led by Pushyamitra does not bear scrutiny. (*Political History of Ancient India,* ৪র্থ সং, পৃঃ ৩০১)

অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ব্রাহ্মণগণ এক বিপ্লব বাধিয়েছিলেন এবং তারই ফলে মৌর্যসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই বটে ; কিন্তু একথাও বোধকরি অস্বীকার করা যায় না যে, তৎকালীন বেদমার্গী ব্রাহ্মণগণ মৌর্যসম্রাট্গণের (বিশেষত অশোকের) প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং তাঁদের ওই অপ্রসন্নতা উক্ত সাম্রাজ্যের পতনের পক্ষে আনুকূল্য করেছিল। কথাটা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

আধুনিক কালের দেশী এবং বিদেশী সমস্ত ঐতিহাসিকই অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে থাকেন। তাঁদের মতে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই অশোকের মতো আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত বিরল। সুবিখ্যাত '*Outline of History*'-রচয়িতা এইচ. জি. ওয়েল্স্-এর মতে অশোক ছিলেন 'one of the greatest monarchs of history'. অশোকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ওয়েল্স্ বলেছেন—

He is the only military monarch on record who abandoned warfare after victory. . . . He made—he was the first monarch to make—an attempt to educate his people into a common view of the ends and way of life. . . . Asoka worked sanely for the real needs of men.

অতঃপর পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থাননির্ণয় উপলক্ষে তিনি বলেছেন—

Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history. . . . the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured. China (and) Tibet . . . . . preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or Charlemagne.

ওয়েল্স্ সাহেবের এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

যেসব রাজারা সমকালীন জনসাধারণের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরবর্তী কালেও যুগে যুগে বহুসংখ্যক নরনারীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকেন, তাঁদেরই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে থাকি। এঁদের ঐতিহাসিক স্বরূপ কালে কালে বিকৃত হলেও দেশের সাহিত্যে, কাহিনীতে ও কিংবদন্তীতে এঁদের মহত্ত্ব চিরজীবী হয়ে থাকে। ইউরোপের শার্লেমঁা, আরবের হারুন-অল-রসিদ এবং ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্যের কালজয়ী মহত্ত্ব উক্তপ্রকার জনপ্রসিদ্ধির ভিতর দিয়েই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। রাজোচিত মহত্ত্বের বিচারে সম্রাট্ অশোকের গৌরব এঁদের কারও চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর রাজমহিমা সত্যই অতুলনীয়। সুতরাং জনপ্রসিদ্ধিতে অশোকের স্থান বিক্রমাদিত্যের চেয়ে কম হবে না, এটাই স্বভাবত মনে হয়। কিন্তু একথা সুবিদিত যে, অশোকের স্মৃতি ভারতবর্ষের জনশ্রুতি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

অথচ জনমেজয়, পরীক্ষিৎ বা জনকের খ্যাতি আজও এদেশের জনস্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে। এই উক্তিটিকে একটু সংশোধন করে বলা উচিত যে, বৌদ্ধ জগতে অর্থাৎ চীনে তিব্বতে ব্রহ্মে সিংহলে অশোকের স্মৃতি জনচিত্তে এখনও জীবন্ত রয়েছে এবং সে স্মৃতি নিছক স্মৃতিমাত্র নয়, পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতি; কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকে সে স্মৃতি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় উক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ সম্ভবত কোনো কালেই অশোক সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেনি।

৫

এবিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যে কি পাওয়া যায় বিচার করে দেখা যাক। প্রথমেই দেখি দীপবংস, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত বা অতিরঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অশোক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নীরব। পুরাণের বংশতালিকায় অবশ্য অশোকের নাম আছে, কিন্তু সে উল্লেখ শুধু নামমাত্রই। পুরাণে তার চেয়ে বেশি আশাও করা যায় না। অন্যত্র মৌর্যবংশ তথা অশোক সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে গভীর অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। মহাপরিনিব্বান সুত্ত, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পুরাণসাহিত্যে মৌর্যদিগকে কোনো কোনো স্থলে 'শূদ্রযোনি' এবং অন্যত্র 'শূদ্রপ্রায় অধার্মিক' বলে কলঙ্কিত করা হয়েছে। 'শূদ্রপ্রায়' কথার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় মৌর্যরা বস্তুতই শূদ্র ছিলেন না; ব্রাহ্মণদের বিচারে 'অধার্মিক' বলেই তাঁদের শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে 'বৃষল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মনুসংহিতার (১০।৪৩) মতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন'- বশত ধর্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়কে বৃষল বলে অভিহিত করা যায়। মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ৯০, ১৪-১৫) স্পষ্টই বলা হয়েছে—

যস্মিন্ ধর্মো বিরাজেত তং রাজানং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ বিলীয়তে ধর্মস্তং দেবা বৃষলং বিদুঃ॥
বৃষোহি ভগবান্ ধর্মো যস্তস্য কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুঃ ··· ··· ··· ··· ॥

অর্থাৎ যে রাজাতে ধর্ম বিরাজমান থাকে তাঁকেই যথার্থ রাজা বলা হয়, আর যাঁর থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হয় তিনি বৃষল নামে বিদিত। ভগবান্ ধর্মই বৃষ, যিনি সেই ধর্মকে ত্যাগ বা ব্যর্থ (অলম্) করেন তাঁকে বৃষল বলা হয়। এই উক্তির শেষাংশটি মনুসংহিতাতেও (৮।১৬) ধৃত হয়েছে। অতএব এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রাহ্মণস্বীকৃত ধর্মকে যাঁরা মানতেন না, ব্রাহ্মণদের মতে তাঁরাই বৃষল। বৌদ্ধসাহিত্যে (সংযুত্তনিকায়, ১।১৬২) দেখা যায়, সমসাময়িক ব্রাহ্মণরা বুদ্ধকেও 'বৃষল' বলে নিন্দা করতেন। চন্দ্রগুপ্তের বৃষল অভিধা থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণোপদিষ্ট ধর্মকে স্বীকার করেন নি। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রায়চৌধুরী বলেছেন—

The Mauryas by their Greek connection and Jain and Buddhist learnings certainly deviated from the *Dharma* as understood by the great Brahmana law-givers. (ঐ, পৃঃ ২৯৫)

জৈনসাহিত্যে চন্দ্রগুপ্তকে নিষ্ঠাবান্ জৈন বলে বর্ণনা করা হয়; তাছাড়া, যবনরাজ সেলুকাসের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও সুবিদিত। আর, অশোকের বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের কথা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্রাহ্মণরা যে তাঁদের 'বৃষল' এবং 'শূদ্রপ্রায় অধার্মিক' বলে নিন্দা করবেন, এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

একটু পূর্বেই বলেছি যে, গৌতম বুদ্ধকেও তৎকালীন ব্রাহ্মণরা বৃষল বলে অপভাষণ করতেন। কিন্তু বৈদিক ধর্মত্যাগী বুদ্ধকে শুধু বৃষল বলেই ব্রাহ্মণদের আক্রোশ মেটেনি। তাঁকে 'চোর' বলে গালাগালি করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। রামায়ণে (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯, ৩৪) বলা হয়েছে—

যথা হি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাম্
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ॥

ভাগবত পুরাণেও (১।৩।২৪) এই বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্
বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণদের মতে সুরদ্বেষীদের মোহ ঘটাবার জন্যেই বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুরদ্বিষ্ মানে দেবতাদের শত্রু অর্থাৎ অসুর। উদ্ধৃত শ্লোকটিতে বৌদ্ধরা সুরদ্বিষ্ বা অসুর বলে নিন্দিত হয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই যে বিদ্বেষ, তা বুদ্ধের আবির্ভাবকাল থেকে শুরু ~~করে~~ এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত কখনও নিরস্ত হয়নি। এই বিদ্বেষের সংস্কার আমাদের সামাজিক মন থেকে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। আধুনিক কালে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে যে কঠোর মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তৎকালে বৌদ্ধদেরও অনুরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিদ্বেষময় কঠোর মনোভাবের অবিশ্রান্ত আঘাতে পরাভূত হয়েই বৌদ্ধধর্ম অবশেষে এদেশ থেকে তিরস্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশে ইউরোপের ন্যায় রক্তপাতময় ধর্মসংগ্রাম হয়নি এবং রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তি সাধারণত কোনো প্রকার ধর্মদ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করতেন না, একথা সত্য। কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণুতা আমাদের সামাজিক চিত্তে বা সাহিত্যে কখনও সম্পূর্ণ প্রাধান্য পায়নি। ধর্মত্যাগীদের সংশ্রব বর্জন ও তাদের একঘরে করার মনোবৃত্তিই আমাদের সমাজকে পরিচালিত করেছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল, পক্ষান্তরে বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবের দৃষ্টান্ত ও-সাহিত্যে প্রচুরপরিমাণেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে উক্ত ধর্মগুলির পারস্পরিক কলহের কথা ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নয়। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব ধর্মের কলহও সর্বজনবিদিত, আজও তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। তাই বলছিলাম পরধর্মসহিষ্ণুতা আমাদের সামাজিক মনের বিশিষ্ট লক্ষণ নয় এবং ব্রাহ্মণ্য অসহিষ্ণুতাই বৌদ্ধধর্মকে অবশেষে দেশছাড়া করে ছেড়েছে।

ভিক্ষুব্রতী বুদ্ধ যখন ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হলেন, তখন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ তাঁকে ভিক্ষা তো দিলেনই না, অধিকন্তু গালাগালি করে বিদায় করলেন, এমন ঘটনা সেই প্রাচীনকালেও বিরল ছিল না

(Mookerji, *Hindu Civilization*, পৃঃ ২৬৪)। বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত বুদ্ধকে নিহত করার ষড়যন্ত্র করে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাজাও তাতে সম্মত হয়েছিলেন, এ ইতিহাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে (ঐ, পৃঃ ১৯৩-৯৪)। মহাবস্তু-অবদান প্রভৃতি পরবর্তী কালের বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধনির্যাতনের কাহিনী আছে। তথ্য হিসাবে এসব কাহিনী সত্য না হলেও এগুলির মূলে কিছু সত্য আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না (রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, পৃঃ ১২১ দ্রষ্টব্য)। বহু পরবর্তীকালেও যে এ মনোভাবের অবসান ঘটেনি তার প্রমাণ আছে। রাজা হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখিয়েছিলেন বলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শুধু তাই নয়, পাঁচশো ব্রাহ্মণ ষড়যন্ত্র করে হর্ষবর্ধনের নির্মিত একটি সংঘারামে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং রাজাকে হত্যা করতেও চেষ্টা করে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্থ-সাঙ্ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তাঁর গ্রন্থে এর যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় (Beal, *Si-yu-ki*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯-২১) তার সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্যের বৌদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যের ইতিহাসও সর্বজনবিদিত। যাহোক, অজাতশত্রুর আমল থেকে শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত এই যে ধারাবাহিক বৌদ্ধবিরোধী মনোভাব, অশোকের রাজত্বকালে তা অবিদ্যমান বা নিষ্ক্রিয় ছিল একথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

৬

আমরা দেখেছি ভাগবত পুরাণে বৌদ্ধদের সুরদ্বিষ্ বা অসুর বলে নিন্দা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৮৮।৫) মৌর্যবংশকেই 'অসুর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে (৬৭।১৩-১৪) অশোককে এক মহাসুরের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধদের এই যে সুরদ্বিষ্ বা অসুর বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণানুমোদিত দেবপূজার সমর্থক ছিলেন না। অশোক কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বনের পরেও স্বীয় 'দেবানং পিয়' উপাধি পরিত্যাগ করেননি। অশোকের শিলালিপিতে কোথাও দেবগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের উপদেশ না থাকলেও এবং বিশেষভাবে অব্রাহ্মণ্যদের জন্য রচিত কয়েকটি লিপিতে (যেমন বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশ্যে রচিত ভাব্রু ফলকলিপিতে এবং আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্যে রচিত তিনটি গুহালিপিতে) ওই উপাধি ব্যবহার না করলেও অধিকাংশ স্থলেই ওই উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। সিংহলের বৌদ্ধরাজা তিস্স এবং অশোকের পৌত্র দশরথও ওই উপাধি ব্যবহার করতেন। কিন্তু দেবপূজাবিরোধী বৌদ্ধরাজার 'দেবানাং প্রিয়ঃ' উপাধি ব্রাহ্মণদের নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি। সেজন্যে তাঁরা 'আক্রোশ'-বশত বিদ্রূপ করে 'দেবানাং প্রিয়ঃ' কথার অর্থ করলেন 'মূর্খ'। "ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" অর্থাৎ আক্রোশ বোঝাতে হলে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হবে না, পাণিনি-ব্যাকরণের অলুক্‌সমাস-প্রকরণের এই সূত্রের (৬।৩।২১) কাত্যায়নকৃত—'দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে'—এই বার্তিক থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। হতে পারে এই বৈয়াকরণিক অর্থান্তরসাধন পরবর্তী কালের অর্থাৎ অশোকের সমকালীন নয়। কিন্তু আক্রোশটা যদি 'দেবানাং প্রিয়'দের আমল থেকেই চলে না আসত, তাহলে পরবর্তী কালেও ওরকম অর্থবিকৃতি হতে পারত না। কাত্যায়ন সম্ভবত অশোকের সমকালীন কিংবা তাঁর অল্প পরবর্তী ছিলেন (Keith, *Sanskrit Literature*, পৃঃ ৪২৬ দ্রষ্টব্য)।

অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হচ্ছে 'পাষণ্ড'। সাধারণভাবে যে-কোনো ধর্ম সম্প্রদায় অর্থেই তিনি ওই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পালি-সাহিত্যেও পাষণ্ড শব্দের ওই অর্থই দেখা যায়। অশোকের দ্বাদশ গিরিলিপির গোড়াতেই আছে 'দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সব পাসংডানি··· পূজয়তি', অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) সব সম্প্রদায় ('পাষণ্ড')-কেই (সমভাবে) সম্মান ('পূজা') করেন। কিন্তু মনুসংহিতায় (৪।৩০) বলা হয়েছে "পাষণ্ডিনো···শঠান্ হৈতুকান্··· বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ', অর্থাৎ পাষণ্ডী, শঠ এবং হৈতুকদের বাঙ্‌মাত্রের দ্বারাও সংবর্ধনা ('অর্চনা', কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যায় 'পূজা') করবে না। মনুসংহিতার অন্যত্র (৯।২২৫) আছে, "ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্···ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ', অর্থাৎ ক্রূর এবং পাষণ্ডস্থ লোকদের ত্বরায় পুর থেকে নির্বাসিত করবে। কুল্লুকভট্টের টীকা অনুসারে পাষণ্ডিনঃ = বেদবাহ্যব্রতলিঙ্গধারিণঃ শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদয়ঃ, শঠাঃ = বেদেষশ্রদ্দধানাঃ, হৈতুকাঃ = বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ, ক্রূরাঃ = বেদবিদ্বিষঃ, পাষণ্ডস্থাঃ = শ্রুতিস্মৃতিবাহ্য-ব্রতধারিণঃ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মনু ও কুল্লুকভট্ট-চালিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে কিরূপ কঠোর অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা হতো। এই তীব্র ঘৃণার মনোভাব থেকেই পাষণ্ড শব্দের এরকম অর্থাবনতি ঘটেছে সন্দেহ নেই। যাদের কাছে পাষণ্ড শব্দের এরকম হীনার্থ তাদের কাছে, যে-'দেবানং পিয়' সব 'পাষণ্ড'কেই পূজা করেন, তিনি যে 'মূর্খ'-রূপেই প্রতিভাত হবেন, এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

যে মনোবৃত্তির ফলে বুদ্ধকে বৃষল ও চোর বলে গালাগালি করা হয়েছে, বৌদ্ধদের অসুর ক্রূর শঠ প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের বাঙ্‌মাত্রের দ্বারাও সংবর্ধনা করা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং তাদের গ্রাম বা নগর (পুর) থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সে মনোবৃত্তি নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ রাজা অশোকের ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, একথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আমরা জানি অশোক নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তিনি জনসাধারণের কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, একথা বলা যায় না। সর্বধর্মের 'সার' বস্তুকেই তিনি 'ধর্ম' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এবং এই সারধর্মের দ্বারা স্বদেশের ও বিদেশের জনচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করাকেই তিনি 'ধর্মবিজয়' নামে অভিহিত করেছিলেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০, শ্রাবণ, 'অশোকের ধর্মনীতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই ধর্মবিজয়ের আদর্শটিও ব্রাহ্মণগণের মনঃপূত হয়নি। গার্গীসংহিতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে, "স্থাপয়িষ্যতি মোহাত্মা বিজয়ং নাম ধার্মিকম্"। অশোকের প্রতি প্রযুক্ত 'মোহাত্মা' বিশেষণটি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্বোদ্ধৃত ভাগবত পুরাণের 'সম্মোহ' শব্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া, এই 'মোহাত্মা' বিশেষণ এবং 'দেবানাং প্রিয়ঃ' কথার মূর্খবাচক অর্থস্বীকার মূলত একই মনোভাবের পরিচায়ক।

অশোক কথিত 'ধর্ম'কে ব্রাহ্মণরা কখনও স্বীকার করতে পারেননি, কেননা সে ধর্ম বেদমূলক ছিল না (মনুর 'বেদোঽখিলাধর্মমূলম্' উক্তিটি স্মরণীয়)। বস্তুত তাঁদের মতে অশোক ছিলেন 'অধার্মিক' (পূর্বোদ্ধৃত 'শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্মিকাঃ' এই পুরাণোক্তি এবং মনু ও মহাভারতে স্বীকৃত বৃষল শব্দের অর্থ স্মরণীয়)। অথচ তিনি তাঁর অনুশাসনগুলিতে পুনঃপুন ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অশোকের প্রপৌত্র শালিশুকের সম্বন্ধে উক্ত 'ধর্মবাদী অধার্মিকঃ' বিশেষণটি ব্রাহ্মণদের অভিমতে অশোকের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। শালিশুক ছিলেন খুব সম্ভবত অশোকের পৌত্র 'সম্প্রতি'র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। আর,

সম্প্রতি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ জৈন। তৎপুত্র শালিশুক অশোকের ন্যায় 'ধর্ম' প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন কিনা এবং তজ্জন্যই তাঁকে 'ধর্মবাদী অধার্মিক' বলা হয়েছে কিনা, নিঃসন্দেহে বলার উপায় নেই।

৭

যাহোক, শুধু যে বেদমার্গী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ই অশোক ও তাঁর ধর্মনীতির উপর অপ্রসন্ন ছিলেন তা নয়। বেদ- ও ব্রাহ্মণ- বিরোধী ভাগবতসম্প্রদায়ও এসময়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অশোকপ্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিকরা এরকম অনুমান করেন। *Early History of the Vaishnava Sect* নামক গ্রন্থে (২য় সং, পৃঃ ৬-৭) ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন—

The earlier Brahmanical attitude towards the faith (Bhagavatism) was one of hostility, but later on there was a combination between Brahmanism and Bhagavatism probably owing to to the Buddhist propaganda of the Mauryas

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মতের সমর্থক। তিনি তাঁর *Ancient Indian History and Civilization* গ্রন্থে (পৃঃ ২২৮-২৯) ব্রাহ্মণ্য ও ভাগবত সম্প্রদায়ের এই সহযোগিতা সম্বন্ধে লিখেছেন—

The advance might have been made by the Brahmanas themselves, as a protection against Buddhism, which grew predominant under the patronage of Asoka. . . . The reconciliation with orthodox Brahmanism . . . . gave a new turn to the latter. Hence for the Bhagavatism, or as it may now be called by its more popular name, Vaishnavism, formed, with Saivism, the main plank of the orthodox religion in its contest with Buddhism.

ভাগবত ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ ভগবদ্গীতাও এই সময়েই অর্থাৎ অশোকের রাজত্বের কাছাকাছি সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় (ডক্টর রায়চৌধুরীপ্রণীত *Early History of the Vaishnava Sect*, ২য় সং, পৃঃ ৮৭)। কাজেই গীতাতেও বৌদ্ধ-ভাগবত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু আভাস থাকা বিচিত্র নয়। এই দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান করলে গীতা থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধবিরোধী উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫

গীতার এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন প্রবল অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই শ্লোকের প্রথমাংশটি অন্যত্র (১৮।৪৭) হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে। এই পুনরুক্তি থেকে মনে হয় এই মনোভাবই তৎকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং জনসমাজে মুখে মুখে সুপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। গীতাসংকলনকালে তাই এটি একাধিক স্থলে গৃহীত হয়েছে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬), এই উক্তিটিকে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি" এই দুটি বৌদ্ধ মন্ত্রের প্রত্যুত্তর বলে ধরা যেতে পারে। 'শরণং ব্রজ' এই কথা-দুটিই যেন ইঙ্গিতে সমস্ত বাক্যটির গূঢ়ার্থকে সুস্পষ্ট করে তুলছে। সে অর্থটি এই যে, বুদ্ধপ্রচারিত 'ধর্ম' অবশ্যপরিত্যাজ্য

এবং 'বুদ্ধে'র পরিবর্তে বাসুদেবের 'শরণ' গ্রহণই মোক্ষার্থীর পক্ষে অধিকতর ও আশু ফলপ্রদ। এই ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' (২।৪৯) এই উক্তিটিতেও হয়তো 'বুদ্ধশরণ' মন্ত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। গীতাতে কর্মের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আছে, তাতেই সংঘশরণের তথা ভিক্ষুব্রতের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তা ছাড়া, অর্জুনের বিষাদ ও যুদ্ধবিমুখতাকে উপলক্ষ্য করে কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোকের যুদ্ধত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কিনা বলা শক্ত। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ', 'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি' (২।৩৭, ৩৮) ইত্যাদি গীতোক্তিতে বৌদ্ধ সমরবিমুখতার বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমমূলক ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিবাদই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি শ্লোকের 'ধর্ম' শব্দটিকে যদি তার প্রচলিত অর্থাৎ টীকাকারস্বীকৃত অর্থে গ্রহণ করা যায়, তাহলে যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয় রাজা অশোক যে বর্ণাশ্রম ধর্মের দৃষ্টিতে স্বধর্মত্যাগী রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, যুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্মও বটে, রাজধর্মও বটে। তাছাড়া, তৎকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা অকালেই ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করত তারাও যে স্বধর্মত্যাগী ও বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী বলে গণ্য হতো তাতে সন্দেহ নেই। এই ভিক্ষুব্রতগ্রহণোন্মুখদের উদ্দেশ্যেই 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। নতুবা ঐ শ্লোকটির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি হতে পারে? অর্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করে গীতা জনসাধারণের জন্যই রচিত হয়েছিল, এ বিষয়ে তো কোনো সংশয় করা চলে না। বহু লোক দলে দলে বৌদ্ধসংঘে যোগ দিতে শুরু করাতে বর্ণাশ্রমমূলক সমাজে যে ক্ষয় দেখা দিল, সে ক্ষয় রোধ করার প্রয়োজনবোধেই উক্তপ্রকার বহু শ্লোক রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এসব অনুমানের মূল্য যাই হোক না কেন, অর্থাৎ গীতায় বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনো উক্তি থাকুক বা না থাকুক, একথা সত্য যে গীতায় ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক বহু মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস থাকলেও ও-গ্রন্থে বৌদ্ধ (তথা জৈন, আজীবিক প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ও অবৈদিক) ধর্মমতকে উপেক্ষাই করা হয়েছে। টীকাকাররাও গীতোক্ত সাধনমার্গগুলির মধ্যে বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মার্গের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। পরবর্তীকালে মৎস্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু গীতায় বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কোনো প্রকার অনুকূল মনোভাব প্রকাশ পায়নি।

৮

পূর্বপ্রকাশিত এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, অশোক নিজে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ হলেও স্বদেশে কিংবা বিদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার করেছিলেন, একথা মনে করার পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। সর্বধর্মের সারবস্তুস্বরূপ কতকগুলি চারিত্রনীতিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছিলেন, এবং সর্বসাধারণের পক্ষে এই মৌলিক ধর্ম পালনের উপযোগিতার উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি অপক্ষপাতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতেন, একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

বস্তুত পারস্পরিক সমবায়ের দ্বারা তিনি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ডক্টর রায়চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়—

He preached the virtues of concord and toleration in an age when *religious feeling ran high.* (*Political History*, পৃ, ২৮৭)

শুধু তাই নয়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি নিজে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে উপদেশ দিতেন; নানা উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করতেন এবং প্রজাগণকেও এভাবে দান করতে উৎসাহিত করতেন; কেননা, তাঁর মতে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করা এবং দান করা ধর্মেরই অঙ্গ। এসব কথা তাঁর শিলালিপিগুলি থেকেই নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। কিন্তু তথাপি তিনি ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারেন নি, বরং তাঁদের কাছে তিনি শূদ্রপ্রায়, অধার্মিক, বৃষল, অসুর, পাষণ্ডী, মূর্খ, মোহাত্মা বলেই গণ্য হয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি।

আধুনিক কালে অশোককে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তাঁকে সে দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। সেজন্যই ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য তাঁর সম্বন্ধে এত নীরব বা প্রতিকূল এবং সেজন্যই ভারতীয় জনস্মৃতিতেও তাঁর কোনো স্থান হয়নি। বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে সকলেই স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন বুদ্ধদেব। কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রতি কতখানি বিরূপ ছিলেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তার ফলে ভারতবর্ষের জনচিত্ত থেকে বুদ্ধদেবের স্মৃতিও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৯

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অশোক সম্বন্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মণদের এই যে অপ্রসন্নতা ও বিরুদ্ধতা, তার কারণ কি। প্রথমেই বলা উচিত যে, এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ কোনো স্পষ্ট উক্তি প্রাচীন সাহিত্যে বা অন্য কোথাও নেই। এর থেকে মনে হয় ব্রাহ্মণদের এই বিরুদ্ধতা সম্ভবত স্পষ্ট প্রতিবাদের আকার ধারণ করেনি, নতুবা সংস্কৃত সাহিত্য অশোকের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠত। উক্ত ব্রাহ্মণ্য বিরুদ্ধতা প্রধানত নীরব অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়। সেজন্যই ওই বিরুদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট বিবৃতি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তথাপি ওই কারণ অতি সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন—

প্রথমত, অশোক ছিলেন স্বধর্মত্যাগী; বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগও ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বাভাবিক। অশোকের বৌদ্ধত্ব যদি বংশানুগত হতো তাহলেও সেটা তত গুরুতর হতো না। কিন্তু কিছুকাল রাজত্ব করার পর তিনি নিজে পূর্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণের চোখে এ অপরাধ সত্যই গুরুতর। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ অনুসারে যে নৃপতি বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্মের আশ্রয়স্থল তিনিই যথার্থ রাজা এবং যিনি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন তিনি 'বৃষল'। এই হিসাবে অশোকও ছিলেন বৃষল। ব্রাহ্মণদের মতে বেদই সমস্ত ধর্মের মূল এবং যারা শ্রুতিস্মৃতিবাহ্য ব্রতধারী তারা পাষণ্ডী। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিচারে অশোক ছিলেন অধার্মিক পাষণ্ডী। বৌদ্ধরা দেবপূজার সমর্থক ছিলেন না এবং অশোক যদিও তাঁর

পূর্বগৃহীত 'দেবানং পিয়' উপাধি ত্যাগ করেন নি, তথাপি তাঁর শিলালিপিতে কোথাও দেবপূজার সার্থকতা (তথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব) স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং দেবহীন ধর্মের সমর্থক হিসাবে তাদের চোখে তিনি ছিলেন সুরদ্বিষ্ বা অসুর এবং নাস্তিক (বুদ্ধ সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত রামায়ণের শ্লোকটি স্মরণীয়)।

দ্বিতীয়ত, অশোক পুনঃপুন যে ধর্মের মহিমা কীর্তন করেছেন সে ধর্ম হচ্ছে আসলে কতকগুলি চারিত্রনীতিমূলক, ব্রাহ্মণানুমোদিত আচার- বা অনুষ্ঠান- মূলক নয়। অশোকের শিলালিপিতেও অনুষ্ঠানাদি উপেক্ষিতই হয়েছে। বরং কতকগুলি 'মংগল' অর্থাৎ অনুষ্ঠানকে তিনি 'নিরর্থক' বোধে স্পষ্টভাবেই নিন্দা করেছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন তা আন্তরিক হলেও আনুষ্ঠানিক ছিল না। কেননা, বৌদ্ধ বলেই কোনো প্রকার ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক ছিল (মনুসংহিতার 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন'- বশত ক্ষত্রিয়ের বৃষলত্বপ্রাপ্তির কথা স্মরণীয়)। বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। বৌদ্ধ হিসাবে অশোক স্বভাবতই যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। তবে সে বিরোধিতা তিনি কোথাও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন নি, কিংবা প্রজাগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত হতেও বলেন নি। কিন্তু যজ্ঞোপলক্ষে পশুহত্যা সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধ অভিমত তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, এবং প্রজাগণকে এ বিষয়ে নিরস্ত হতে বাধ্য না করলেও যজ্ঞে প্রাণীহত্যা না-করা যে ভালো এ সম্বন্ধে তিনি তাদের পুনঃপুন উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশ যে প্রত্যক্ষত ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পশুবধ না করলে যজ্ঞই অসিদ্ধ হয়, অথচ যজ্ঞই বৈদিক ধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ এবং ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রধান কৃত্য। সুতরাং অশোকের উক্তপ্রকার উপদেশের ফলে বৈদিক ধর্মলোপ তথা নিজের অধিকার, প্রভাব ও স্বার্থ লোপের আশংকায় ব্রাহ্মণদের আতঙ্কিত হবার যথার্থ কারণ ছিল। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। সে বাক্যটি হচ্ছে এই—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।

এই উক্তিটি অশোক সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এর দ্বারা অশোক-চরিত্রের মহত্ত্ব ('সর্বভূতের নিকট আনৃণ্য'-লাভ ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য) যতই প্রমাণিত হোক, এই পশুঘাতমূলক শ্রৌত যজ্ঞবিধির নিন্দা দ্বারা তিনি যে ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

একথা বলা যেতে পারে যে—অশোকের বহু পূর্বেই মুণ্ডক উপনিষদে অতি কঠোর ভাষায় যজ্ঞনিন্দা করা হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও অহিংসার মহিমাপ্রচার এবং বৈদিক বিধিযজ্ঞ বর্জন করে তৎস্থলে চারিত্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়, এমন কি গীতাতেও দ্রব্যযজ্ঞের পরিবর্তে জ্ঞানযজ্ঞের বিধান এবং বেদের নিন্দা দেখা যায়, তাতে ব্রাহ্মণরা বিচলিত হন নি, সুতরাং অশোকের যজ্ঞার্থ প্রাণীবধ-বিরোধী উক্তিতেও তাঁদের উত্তেজিত হবার কোনো কারণ দেখা যায় না। এর উত্তর এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বই লিখে (বা মৌখিক ভাবে) বেদ- বা যজ্ঞ- বিরোধী মত প্রচার করা এবং অশোকের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বরের পক্ষে (বিশেষত তিনি যদি বেদধর্মবিরোধী বৌদ্ধ হন) রাজাসন থেকে যজ্ঞে প্রাণীহত্যার অনৌচিত্য প্রচার করা এক কথা নয়।

অশোকের প্রথম গিরিলিপির একেবারে গোড়াতেই স্পষ্ট বলা হয়েছে 'ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতব্যং'—এখানে (অর্থাৎ এই রাজ্যে) কোনো জীবকে হত্যা করে (যজ্ঞে) আহুতি দেবে না। এই উক্তিতে ক্ষমতাশালী সম্রাটের কণ্ঠে তাঁর আদেশবাক্যই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এরকম দৃঢ় রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণদের মনে যদি আতঙ্ক দেখা দিয়ে থাকে সেটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। এই উক্তির সঙ্গে উপনিষদ্ বা গীতার যজ্ঞনিন্দার তুলনাই হয় না।

বলা প্রয়োজন যে, পূর্বোক্ত ইধ (এখানে) শব্দটিকে আমি 'এই রাজ্যে' অর্থে গ্রহণ করেছি ; কেউ কেউ 'পাটলিপুত্রে' বা 'রাজপ্রাসাদে' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থ মেনে নিলেও এই অনুশাসনের গুরুত্ব কমে না। অশোক প্রজাদের অবগতি ও অনুসরণের জন্য এই অনুশাসনটিকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সর্বত্রই প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া, অন্যান্য অনুশাসনেও তিনি যজ্ঞে প্রাণীহত্যার অসাধুত্বের কথা (প্রাণানং সাধু অনারংভো) পুনঃপুন প্রচার করেছেন। সুতরাং রাজার আদর্শ কি এবং তাঁর অভিপ্রায়ই বা কি, সে বিষয়ে প্রজাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আর, এই অনুশাসন যে রাজার সাধু ইচ্ছা বা মুখের কথামাত্রই থেকে যায় নি, পরন্তু প্রজাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে অনুসৃতও হতো, তার প্রমাণ আছে অশোকের লিপিতেই। চতুর্থ গিরিলিপিতে অশোক পরম সন্তোষ-সহকারে জানাচ্ছেন যে, বহুকাল যা হয়নি তাঁর ধর্মানুশাসনের ফলে তাই হয়েছে, (প্রজাদের মধ্যে) যজ্ঞে প্রাণীবধ থেকে বিরত থাকা (অনারংভো প্রাণানং) প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মাচরণ খুবই বেড়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও বেড়ে যায় তা তিনি করবেন।

সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অশোক যে ভাবে যজ্ঞে প্রাণীবধের অপ্রশংসা ও অনৌচিত্যপ্রচার করেছেন প্রজাগণের পক্ষে তা কার্যত নিষেধমূলক রাজাজ্ঞার তুল্যই হয়েছিল। সুতরাং এরকম অনুশাসনকে ব্রাহ্মণরা স্বভাবতই বৈদিক যজ্ঞমূলক ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ এবং ব্রাহ্মণের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য করেছিলেন, একথা মনে করা অসংগত নয়। ব্রাহ্মণদের বিচারে আদর্শ রাজা হবেন যজ্ঞাদি বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের তথা বর্ণাশ্রমধর্মের প্রধান ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু অশোকের কাছে তাঁরা তার বিপরীত আচরণই লাভ করেছিলেন।

তাছাড়া, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুসারে দেশের ধর্মরক্ষা ও ধর্মানুশাসনের ভার থাকবে ব্রাহ্মণেরই উপর, রাজা ওই অনুশাসন-অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন মাত্র। কিন্তু অশোক দেশের ধর্মানুশাসন ও তার ব্যবস্থাপন, এই উভয় দায়িত্বই নিজে গ্রহণ করলেন এবং নিজের সহায়করূপে ধর্মমহামাত্র, রাজূক প্রভৃতি রাজপুরুষ নিযুক্ত করলেন অর্থাৎ তিনি নিজে রাজ্যের সর্বত্র ধর্মানুশাসন প্রচার করলেন এবং সেগুলিকে কার্যে পরিণত করার ভার দিলেন ধর্মমহামাত্রাদির উপর। ইউরোপীয় ইতিহাসের পরিভাষায় বলা যায়, তিনি এম্পারার ও পোপের অধিকারকে নিজের মধ্যে সংহত করলেন। এটাও খুব সম্ভবত পোপের স্থলবর্তী ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য হয়েছিল। হয়তো এজন্যই ধর্মবিজয়ের স্থাপয়িতা হিসাবে তাঁকে 'মোহাত্মা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

একদিকে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা হরণ এবং অপরদিকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এটা অবশ্যই তাঁদের কাছে প্রীতিকর হয়নি। এই ক্ষমতা হরণের আরও কয়েকটি দিক্ আছে। আমরা দেখেছি অশোক

সর্বসম্প্রদায়কে সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নি। কিন্তু তৎকালে দেশে ব্রাহ্মণ্যসমাজের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়গুলির প্রভাব খুব কমই ছিল। কিন্তু অশোকের অপক্ষপাত নীতির ফলে ওই সম্প্রদায়গুলি এক হিসাবে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের সমকক্ষতা লাভ করল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তাঁদের চিরাগত প্রাধান্য থেকে বঞ্চিত হলো। অশোকের লিপিগুলিতে সর্বত্রই ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন, জনসাধারণকেও তিনি তাদের প্রতি সমভাবে দানাদির দ্বারা শ্রদ্ধা দেখাতে উপদেশ দিয়েছেন। অশোকের এই সমদৃষ্টিও ব্রাহ্মণদের পক্ষে সম্ভবত প্রীতিজনক হয়নি। কেননা, তাঁরা কখনও শ্রমণদের সমকক্ষতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তাছাড়া, অশোক সকলকেই পুনঃপুন স্ব-সম্প্রদায়ের পূজা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা থেকে বিরত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশের দ্বারা বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক ধর্মসম্প্রদায়ের সুবিধা এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজের অসুবিধাই হয়েছিল মনে হয়। কেননা, অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি যখন ব্রাহ্মণ্যসমাজের ক্ষয়সাধন করছিল, তখন ওগুলির তীব্র নিন্দার দ্বারাই ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মরক্ষা করছিল। এই নিন্দার অধিকার তাঁদের কাছে ছিল আত্মরক্ষারই অধিকার। কেননা, এই নিন্দার দ্বারা তাঁরা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকে অভিভূত করে রাখছিলেন। অশোকের এই অনুশাসনের দ্বারা অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাধিক ব্রাহ্মণ্যসমাজের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেল এবং ব্রাহ্মণসমাজ তীব্র আক্রমণের দ্বারা তাদের পরাভূত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

অশোক পুনঃপুনঃ ধর্মসমবায় (অর্থাৎ ধর্মসম্মেলন) ও পরধর্মশুশ্রূষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ও তাঁর ধর্মমহামাত্ররা বহু ধর্মসমবায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয়। এই সমবায়গুলিতে সকলেই পরস্পরের ধর্মমত শ্রবণ করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে, এই ছিল অশোকের অভিপ্রায়। কিন্তু এখানেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বধর্মপ্রচারের সুযোগই হয়েছিল মনে করা যায়। পক্ষান্তরে যে পাষণ্ডীদের বাঙ্‌মাত্রের দ্বারা সংবর্ধনা করাও ব্রাহ্মণরা সংগত মনে করতেন না, তাঁদের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরই ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিশ্চয়ই একান্ত অপমানজনক বলে গণ্য হয়েছিল। সনাতনীদের পক্ষে hereticদের ধর্মমত শোনা সব দেশে এবং সব কালেই অপ্রীতিকর।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় প্রাকৃত ভাষাকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ ও প্রচারের বাহন বলে গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণরা কিন্তু কোনোকালেই প্রাকৃত ভাষাকে ধর্মসাহিত্যের ভাষা বলে স্বীকার করেননি, রসসাহিত্যেরও যোগ্য বাহন মনে করতেন না (অনেক পরবর্তীকালে অবশ্য প্রাকৃতকে রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে সামান্য একটু স্থান দেওয়া হয়েছিল)। অশোক কিন্তু বৌদ্ধপ্রথা অনুসারে তাঁর 'ধর্ম'-লিপিগুলিতে প্রাকৃতই ব্যবহার করেছেন। রাজকার্যও ওই প্রাকৃত ভাষার যোগেই সম্পাদিত হতো। সংস্কৃতকে পরিহার করে প্রাকৃতকে ওরকম প্রাধান্য দান ব্রাহ্মণদের অনুমোদন লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কেননা, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের পুনরভ্যুত্থানের যুগে সংস্কৃতই ধর্মসাহিত্য তথা রাজানুশাসনের বাহন বলে স্বীকৃত হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এস্থলে আমাদের পক্ষে তা অপ্রাসংগিক।

১০

আমরা দেখলাম অশোক ও তাঁর ধর্মনীতির উপর ব্রাহ্মণরা প্রসন্ন ছিলেন না এবং সে অপ্রসন্নতার যথেষ্ট উপলক্ষ্যও ছিল। কিন্তু তাঁদের এই অপ্রসন্নতা ও বিরুদ্ধতা খুব সম্ভব অল্পবিস্তর নীরব অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আকারেই ধূমায়িত হচ্ছিল, কখনও তীব্র প্রতিবাদে মুখর কিংবা প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু মৌর্যসাম্রাজ্যের স্থিতির পক্ষে ওই নীরব অসন্তোষই যথেষ্ট অকল্যাণকর ছিল। অশোকের লিপি থেকেই বোঝা যায়, তৎকালে দেশে ব্রাহ্মণের মর্যাদা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিও খুব বেশি ছিল। সে সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সংখ্যাশক্তিতে এই সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারপন্থীরা ছিল নগণ্য। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও স্থায়িত্বের পক্ষে উপেক্ষণীয় ছিল না। এইজন্যই দেখি অশোক তাদের সন্তোষ অর্জনের জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের প্রসন্নতার অধিকারী হতে পারেননি। কেননা, ধর্মে ও সমাজে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার না করে তাঁদের সন্তোষলাভ করা সম্ভব ছিল না। তাই সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধতার ফল মৌর্যসাম্রাজ্যের পক্ষে অশুভই হয়েছিল।

একথা বলা বাহুল্য যে, যে-সাম্রাজ্য প্রজাসাধারণের অধিকাংশের সদিচ্ছা ও আনুগত্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে সাম্রাজ্য যতই সুশাসিত এবং শক্তি ঐশ্বর্য ও অন্যান্য বিষয়ে যতই গৌরব ও প্রশংসার বিষয় হোক না কেন, তার পক্ষে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়, অচিরকালের মধ্যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে কোনো সাম্রাজ্য যদি জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি ও সন্তোষলাভে সমর্থ হয়, তাহলে সে সাম্রাজ্য সাময়িক কুশাসন বা রাজাবিশেষের উৎপীড়ন প্রভৃতি নানারকম অগভীর বা সামান্য প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও বহুদিন স্থায়ী হয়ে থাকে। অশোকের প্রজাবাৎসল্য, সুশাসন, রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের অক্লান্ত প্রয়াস, এসমস্তই সুবিদিত। তৎসত্ত্বেও যে মৌর্যসাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং বৈদেশিক আক্রমণের পূর্বেই ভেঙে গেল, তার অন্যতম প্রধান কারণ ব্রাহ্মণচালিত সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের অসন্তোষ, এবিষয়ে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না।

অশোকের ব্যক্তিগত আদর্শ ও তাঁর অনুসৃত ধর্মনীতির ফলে বৌদ্ধধর্ম মর্যাদায় ও প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমকক্ষতা লাভ করে এবং মৌর্যসাম্রাজ্যের বাইরে একদিকে চোল, চের, পাণ্ড্য, তাম্রপর্ণী (সিংহল), অপরদিকে পারস্য, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে এবং পরবর্তীকালে প্রায় সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় প্রসার লাভ করে। সম্ভবত অশোকের আদর্শ ও অনুপ্রাণনার ফলেই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে নিরামিষ খাদ্যের প্রচলন হয়। এ সমস্তই অশোকের ধর্মনীতির পরোক্ষ ও ব্যবহিত ফল। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ফল খুবই অশুভ হয়েছিল। অশোকের যুদ্ধবিমুখতার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি হ্রাস এবং তাঁর ধর্মনীতির প্রতি ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধতা, প্রধানত এই দুই কারণেই মৌর্যসাম্রাজ্যের ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে যায়। এইজন্যই অশোকের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই পুষ্যমিত্র শুঙ্গ যখন মগধের সিংহাসন অধিকার করেন, তখন তাঁকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার

করতে হয়েছিল বলে মনে হয় না। মৌর্যসাম্রাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করে পুষ্যমিত্রকে বাধা দেবার ইচ্ছা বা সাহসও কারও ছিল বলে মনে হয় না। বৌদ্ধদের মনোভাব যাই হোক, মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের হৃদয় থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাসও উত্থিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে পুষ্যমিত্রের রাজ্যাধিকারে ব্রাহ্মণদের আন্তরিক সমর্থন ছিল বলেই মনে হয়। অশ্বমেধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা বলে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে পুষ্যমিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়। কেননা, অশ্বমেধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মানেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। হরিবংশে বলা হইয়াছে, "সেনানী ঃ কাশ্যপো দ্বিজঃ অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি"। এখানে 'দ্বিজ' শব্দের উল্লেখ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। যাহোক, পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে একটি-মাত্র নয়, দুটি অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অশোক বলেছিলেন "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতব্যং"। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রনগরে এবং সম্ভবত তাঁর প্রাসাদসীমার মধ্যেই মহাসমারোহে দুটি অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হলো—এটা যুগপৎ অশোকের যজ্ঞবিমুখ ধর্মনীতি এবং যুদ্ধবিমুখ রাজনীতির ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়ারই প্রত্যক্ষ ফল। অশ্বমেধ শত্রুবিজয়েরই প্রতীক এবং সম্ভবত যবনবিজয়ের নিদর্শন হিসাবেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছিল। যবনবিরোধী সংগ্রাম ও অশ্বমেধযজ্ঞের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই যে সংযোগ দেখা যাচ্ছে, এটা নেহাত আকস্মিক ব্যাপার বলেই মনে হয় না।

ভারতবর্ষের বাইরেও অশোকের ধর্মনীতি প্রত্যক্ষত ব্যর্থ ও অশুভফলপ্রসূই হয়েছিল। যবনমণ্ডলে (অর্থাৎ সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি গ্রীকরাজ্যে) তিনি ধর্মবিজয় ও মৈত্রীর বাণী এবং যুদ্ধবিগ্রহের ব্যর্থতার কথা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রেম ও মৈত্রীর বাণী যবন বিজিগীষুদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। তার ফল এই হলো যে, মৌর্যসাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ ঠিক সেই সময়ে মধ্যএশিয়ার দুষ্টবিক্রান্ত, যুদ্ধদুর্মদ ও যুগদোষদুরাচার যবনগণ অশোকের মৈত্রী- ও ধর্মবিজয়- বাণীর প্রতিদানস্বরূপ বৈরিতা ও অস্ত্র-বিজয়ের উন্মাদনায় দুর্নিবার বেগে ভারতবর্ষের উপর আপতিত হলো এবং মধ্যমিকা (চিতোরের নিকটে), মথুরা, পঞ্চাল (রোহিলখণ্ড), সাকেত (অযোধ্যা), এমন কি রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত আক্রমণ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করে তুলল।

সুতরাং দেখা গেল রাজনীতির দিক্ থেকে অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ দেশে ও বিদেশে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিল। বিদেশে তিনি রাজ্যলিপ্সু যবনদের চিত্ত মৈত্রীর বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেন নি, ফলে তাদের আক্রমণে রাজধানীসহ সমস্ত সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হলো। দেশে তাঁর ধর্মবিজয়ের নীতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত স্পর্শ করা দূরে থাক, তাদের বিরুদ্ধতাকেই উদ্দীপ্ত করে তুলল ; ফলে তিনি তাঁদের কাছে 'মোহাত্মা' ও 'ধর্মবাদী অধার্মিক' বলেই গণ্য হলেন এবং অবশেষে তাঁর ধর্মবিজয়ের মহৎ আদর্শ রাজধানী পাটলিপুত্রেই দুটি অশ্বমেধের যজ্ঞভস্মের মধ্যে পর্যবসিত হলো।

মৌর্যসাম্রাজ্যের এই পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের শোচনীয়তম ঘটনা, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল, কেবল দক্ষিণতম প্রান্তে কয়েকটি মাত্র ছোটো ছোটো জনপদ সমগ্র ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্রের গণ্ডির বাইরে ছিল। অশোকের ধর্মনীতিপ্রসূত যুদ্ধবিমুখতার ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পূর্ণ হবার সুযোগ আর হলো না। তথাপি তিনি এক ধর্মের

আদর্শ, এক ভাষা ও এক শাসননীতির দ্বারা সমগ্র দেশকে যে ঐক্য দান করেছিলেন, তা অতুলনীয়। অশোকের পূর্বে বা পরে আর কখনও ভারতবর্ষ এতখানি ঐক্য লাভ করেনি। তা ছাড়া, শান্তি শৃঙ্খলা শিল্প ঐশ্বর্য ও বৈদেশিকগণের শ্রদ্ধা-অর্জনে অশোকের সাম্রাজ্য যে উত্তুঙ্গ সীমায় পৌঁছেছিল, তাঁর পরবর্তী প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসেও ভারতবর্ষ আর কখনও সে সীমায় পৌঁছতে পারেনি। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ও তৎকালীন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ক্রম-অভিব্যক্তির অব্যাহত ধারা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে গিয়ে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অশান্তি দেখা দিল তার জন্যে ভারতবাসীকে যে বহুকাল অশেষ দুঃখভোগ করতে হয়েছিল, শুধু তা নয়। গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, তার পরোক্ষ অশুভ ফল আজও আমাদের ভাগ্যকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করছে।

১১

পরিশেষে পরবর্তী কালের দুয়েকটি ঐতিহাসিক বিষয়ের সঙ্গে অশোকের আশ্রিত ধর্মনীতি ও তার ফলাফলের তুলনা করেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব।

রাজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতার কথা অশোকের পরবর্তী ইতিহাসেও অজ্ঞাত নয়। হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মারাঠাশক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকেও ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্যর যদুনাথ সরকার প্রণীত *Shivaji* গ্রন্থের নবম ও ষোড়শ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শিবাজী ক্ষত্রিয় ছিলেন না বলে ব্রাহ্মণরা তাঁর রাজ্যাভিষেককালে যে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করেছিলেন, তা এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্যর যদুনাথ লিখেছেন—

> There was a mutiny among the assembled Brahmans who asserted that there was no true Kshatriya in the modern age and that the Brahmans were the only twice-born living.

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

> Shivaji keenly felt his humiliation at the hands of the Brahmans to whose deftnce and prosperity he had devoted his life.

এই উক্তি অশোকের প্রতিও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। শিবাজী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের "insistence on treating him as a Sudra" পুরাণে মৌর্যবংশকে শূদ্র বা শূদ্রপ্রায় বলে বর্ণনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৌর্যসাম্রাজ্যে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের আধিপত্যস্থাপনের প্রসঙ্গে ভোঁসলারাজ্যে ব্রাহ্মণ পেশোয়াদের প্রাধান্যলাভের কথাও স্মরণীয়।

পূর্বে এক প্রবন্ধে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে আকবরের ধর্মনীতির আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে ওবিষয়ে আরও দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আকবরের সর্বধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের নীতি যতই উদারতা বিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক হোক না কেন, ওই নীতির দ্বারা তিনি সকলের সন্তোষভাজন হতে পারেন নি। গোঁড়া মুসলমানগণের প্রসন্নতা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁরা তাঁর উপর কিরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় বদাউনীর ইতিহাসগ্রন্থে। আকবর একমাত্র কোরানকেই প্রামাণ্য বলে গণ্য না করে অন্য ধর্মের প্রতিও যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, সেটা তাঁদের পছন্দ

হয়নি। সেজন্যে আকবরকে বিশেষভাবেই গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। মুসলমানেরা তৎকালে সংখ্যাশক্তিতে হীন হলেও বিজেতৃসম্প্রদায় বলে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় তাঁদের প্রভাব কম ছিল না। কাজেই উক্ত ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁদের বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করা আকবরের পক্ষেও সহজ হয়নি। ফলে আকবরের 'দীন ইলাহি' ধর্ম তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর সুল্‌হ্‌-ই-কুল্‌ নীতিও দীর্ঘকাল ফলপ্রসূ হয়নি; শাহ্‌জাহানের সময় থেকেই ওই নীতিতে শৈথিল্য দেখা দেয় এবং ঔরঙ্গ্‌জীবের সময়ে তা সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যক্ত হয়।

অশোক বেদানুমত ধর্মের অনুসরণ করেন নি বলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। আকবরও কোরান-সম্মত ধর্মের সীমা লংঘন করেছিলেন বলে মুসলমানরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অশোকের ধর্মনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ এবং আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে মুসলমানদের অসন্তোষ, উভয়ের পরিণাম হয়েছিল একই রূপ। এই বিরুদ্ধতার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই রাজানুসৃত উদার ধর্মনীতি কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং দেশে দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

অশোক ও আকবরের ধর্মনীতিতে একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টির নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে অশোক সংখ্যাগুরু ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন; কিন্তু আকবর প্রভাবশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ সত্ত্বেও সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে মৌর্যসাম্রাজ্য অশোকের তিরোধানের পর অত্যল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গেল। আর, মুঘলসাম্রাজ্য আকবরের পরেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গ্‌জীব যখন আকবরের নীতি ত্যাগ করে সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের সদিচ্ছাজাত আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হলেন তখনই সুচিরপ্রতিষ্ঠিত মুঘলসাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা হলো।

শ্রীকানাই সামন্ত

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

১

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের গোত্রবিচার

তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে চিত্র বা চিত্রকরের পরিচয় অনাবশ্যক। ছবি চোখে দেখিবার জিনিস; চোখে ভাল লাগিলে দেখিব, ভাল না লাগিলে দেখিব না; ব্যাপারটা সংক্ষেপে চুকিয়া গেল। কিন্তু কার্যত তাহা ঘটে না। প্রথমত, চোখকেও দেখিতে শিখাইতে হয়, অশিক্ষিতপটুত্বই যথেষ্ট নয়। ইহার উপর চোখের দুর্বলতা ছাড়া চরিত্রের দুর্বলতাও আছে। ছবির বা যে কোন আর্টের নিদর্শনের মূল্যবিচার আমরা শুধু উহার নিজস্ব গুণাগুণ দিয়া করি না, জাতিকুলশীলের সংবাদ লই, বিদগ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠার খোঁজ করি, এমন কি সামাজিক এবং আর্থিক মর্যাদারও হিসাব লইয়া থাকি। বৈষয়িক দিক হইতে আমাদের অপেক্ষা সব দিকে গণ্যমান্য ব্যক্তি একটা জিনিস দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন, উহাকে অনাদর করিবার সাহস কোন্ ইতরজনের হয়? অমুকের ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, এই হৈম-লগুড়াঘাত কয়জন কাটাইয়া উঠিতে পারে? তাই পরিচয়ের চাহিদা। আর্ট-ক্রিটিকের মত বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে ইহা লাভেরই কথা। তাহার অস্তিত্বের, তাহার পেশার উচ্চতর সাফাই না থাকিলেও শুধু ইহারই জোরে সে কলিকা পাইয়া থাকে।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্র আমাদের কাছে দুইটি পরিচয় লইয়া উপস্থিত হইত, এবং এখনও সম্ভবত হয়। উহার একটি নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার তরফ হইতে, অপরটি নব্য পাশ্চাত্ত্য 'কিউবিজম্' হইতে। দুটিই সমীহ উদ্রেক করিবার মত পরিচয়পত্র। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা, যাহাকে ঘরোয়া কথায় 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর আসল মনের ভাব যাহাই হউক মুখের কথা আর অশ্রদ্ধাসূচক নয়। গেল বছর চল্লিশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি কায়েমী হইয়া বসিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষ উহাকে গ্রহণ করিয়াছে, চিত্রসমালোচকমাত্রেই উহার অবিশ্রাম প্রশংসা করিতেছেন। এমন কি সাহেবরা পর্যন্ত উহার বাহবা দিতেছেন। প্রতিষ্ঠার এতগুলি লক্ষণ ও প্রমাণ যাহার পিছনে রহিয়াছে তাহাকে কে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে? কিউবিজম্-এর সম্ভ্রম আরও বেশী। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার একেবারে হালের খবর রাখেন না, তাঁহাদের ধারণা কিউবিজম্ একটা অত্যন্ত অভিনব ও ফ্যাশন-দোরস্ত জিনিস। একে ফ্যাশন, তার ওপর প্যারিসের ফ্যাশন, তাই কিউবিজম্-ও নমস্য।

এই দুই সুপারিশের জোরে গগনেন্দ্রনাথের চিত্র সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। এই জিনিসটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যকর, কারণ নব্যবঙ্গীয় চিত্র ও 'কিউবিষ্ট' চিত্র, এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য এত বেশী, শুধু পার্থক্য বলি কেন, দুটি এত বিপরীতধর্মী যে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের পক্ষে একসঙ্গে দুইএরই সুপারিশ পাওয়া ততটুকুই

সম্ভব কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে সমবেতভাবে মুসলীম লীগ ও হিন্দু-মহাসভার অনুমোদন পাওয়া যতটুকু সম্ভব। যাহা আমাদের কাছে লাল ও বৃত্তাকার বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা একই সঙ্গে নীল ও চতুষ্কোণ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। তেমনই গগনেন্দ্রনাথের চিত্র নব্যবঙ্গীয় হইলে উহা 'কিউবিষ্ট'-ধর্মী হইতে পারে না। কিউবিষ্ট-ধর্মী হইলে নব্যবঙ্গীয় হইতে পারে না। আসল কথা এই, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের আর যে গুণ বা লক্ষণই থাকুক না কেন, তাঁহার তরফ হইতে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা ও কিউবিজমের অযাচিত সুপারিশের কোন মূল্য নাই। দুটিই অবান্তর। এ দুটির কোনটির সহিতই তাঁহার নাড়ীর যোগ নাই।

গগনেন্দ্রনাথ ও নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা

গগনেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের ভাই না হইলে, ঠাকুর-বংশীয় না হইলে, তাঁহার চিত্রগুলি বরাবরই নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে বিন্যস্ত না হইলে, এক কথায় নব্যবঙ্গীয় চিত্রের সহিত তাঁহার কয়েকটা কাকতালীয় সংযোগ না থাকিলে, কেহ তাঁহার চিত্রকে নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র অন্তর্ভুক্ত করিবার কল্পনাও করিত কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ এটাই আশ্চর্যের কথা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার এত কাছে থাকিয়াও, নব্যবঙ্গীয় চিত্রের অনুপ্রেরণা যিনি জোগাইয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথের ও এই অনুপ্রেরণাকে যিনি চিত্ররূপ দিয়াছেন সেই অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সারাজীবন কাটাইয়াও, কি করিয়া গগনেন্দ্রনাথ নিজেকে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সম্পর্ক হইতে এতটা মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সহিত তাঁহার পার্থক্য বিবেচনা করিলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, তাঁহার সব ছবি এক ধরণের নয়। অঙ্কনরীতি, বিষয়বস্তু, চিত্রধর্ম, যেদিক হইতেই দেখা যাক না কেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে স্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। এই শ্রেণীগুলি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, তাঁহার একার চিত্রে যতটা বৈচিত্র্য সমগ্র নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র মধ্যেও ততটা বৈচিত্র্য নাই। অবনীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র হালের নবীন চিত্রকর পর্যন্ত সকলের কাজের মধ্যে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও বেশ একটা আদল পাওয়া যায়। গগনেন্দ্রনাথের একশ্রেণীর চিত্র ও অন্য শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে ততটুকুও আদল নাই।

আরও আশ্চর্যের কথা, এই বহুমুখীনতা তিনি একই সঙ্গে বজায় রাখিয়াছেন। আধুনিক চিত্রকর এক ধরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা ধরণে অতিসহজেই যে আসিয়া পৌছিতে পারেন তাহার সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত, পাব্লো পিকাসো। কিন্তু চিত্রধর্মের এই পরিবর্তন সাধারণত চিত্রকরের বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। উহা ধর্মান্তর গ্রহণের মত, এক ধর্ম গ্রহণের পর কেহ আর পুরাতন ধর্মে ফিরিয়া যায় না। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার ধরণগুলি একসঙ্গে চালাইয়াছেন, তথাকথিত রূপক চিত্রের সঙ্গে একই প্রদর্শনীতে একেবারে অন্যধরণের পূর্ববঙ্গের দৃশ্য দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই যে বৈচিত্র্য ও বহুদেশদর্শিতা উহা নব্যবঙ্গীয় চিত্রে একেবারে বিরল।

দ্বিতীয়ত, কি বিষয়বস্তুতে কি অঙ্কনপদ্ধতিতে গগনেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় স্কুল হইতে একেবারে বিভিন্ন। পৌরাণিক কাহিনী তিনি সাধারণত বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণবিন্যাস এবং রেখাপাতও সম্পূর্ণ

নিজস্ব। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরেরা যে 'প্যালেট' ব্যবহার করিয়াছেন, গগনেন্দ্রনাথ সেই 'প্যালেট' ব্যবহার করেন নাই। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরেরা নির্ভর করিয়াছেন প্রধানত রেখার উপর, গগনেন্দ্রনাথ নির্ভর করিয়াছেন 'ছোপে'র উপর। তাহা ছাড়া আলো-ছায়ার সংঘাত তাঁহার চিত্রে খুবই বেশী, যাহা সাধারণত নব্যবঙ্গীয় চিত্রে নাই-ই বলা চলে। জায়গায় জায়গায় আলো-ছায়ার সংঘাতের তীব্রতায় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর ইটালিয়ান চিত্রকর কারাভাদ্জোকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার এই তীব্রতাকে অত্যন্ত 'সেন্সেশ্যনাল', এমন কি কৃত্রিম বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, আলো-ছায়ার খেলা সম্বন্ধে গগনেন্দ্রনাথের এই যে অতিজাগ্রত অনুভূতি, উহাও নব্যবঙ্গীয় স্কুলে অবর্তমান।

সবচেয়ে বড় কথা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের যে কোন শ্রেণীর কথাই ধরি না কেন, প্রত্যেকটিরই একটা বিশিষ্ট চিত্রধর্ম আছে। নব্যবঙ্গীয় স্কুল সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা অনেকটা নব্যবঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তির মত, ধর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বর্জিত। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরদের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা গোঁড়া গুরুবাদী। তাঁহারা ধর্ম কি জানিতে চাহেন না, কিন্তু মন্ত্র লইয়াছেন; গন্তব্যস্থানের পরোয়া রাখেন না, পথের বাহ্যিক নির্দেশ লইয়াছেন। গুরু বলিয়া দিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিতে হইবে যাহা শহরের বহুদূর গিয়া বুড়ো শিবতলা, পদ্মদীঘি, দ্বাদশ দেউল, ভাঙা ঘাট ইত্যাদির পাশ ধরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার বাস্তব সম্পর্ক বর্জন করিয়া, রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি স্মরণ করিতে করিতে মোগল বা রাজপুত 'কলমে'র অনুকরণ করিতে হইবে, পুরাতন পট আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিলে আরও ভাল।

আর একদল আছেন, যাঁহারা এত গোঁড়া নন, বরঞ্চ একটু বেশী উদার বা 'এক্লেক্টিক'ই বটেন। কিন্তু তাঁহারাও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন। তাঁহাদের ধরণ দেখিয়া অনেক সময়ে অ্যালিসের সহিত চেশায়ার পুসের কথাকাটাকাটির কথা মনে পড়ে।

> অ্যালিস জিজ্ঞাসা করিল—কোন রাস্তা ধরে যাওয়া উচিত আমায় অনুগ্রহ করে বলে দিন না?
>
> চেঃ পুঃ—তা নির্ভর করছে তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ তার ওপর।
>
> অ্যাঃ—যেখানেই হোক না, বিশেষ কিছু এসে যায় না আমার।
>
> চেঃ পুঃ—তা হলে যে কোনো রাস্তা ধর না কেন তাতেও কিছু এসে যাবে না।
>
> অ্যাঃ—না, আমি বলছি কি কোন একটা জায়গায় পৌছলেই হল।
>
> চেঃ পুঃ—তা নিশ্চয়ই পৌছবে, শুধু যদি খানিকটা পথ হাঁটতে পার।

এইভাবে বহু নব্যবঙ্গীয় চিত্রকর ভারতীয়, চীনা, জাপানী, পারসীক, নানা বা যে কোন একটা পথ ধরিয়া, বিশেষ কোন জায়গায় পৌছিবার সংকল্প না রাখিয়াও একটা-না-একটা জায়গায় পৌছিবার আনন্দ পাইতেছেন।

গগনেন্দ্রনাথের পথচলা অন্য রকম। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিষ্কার একটা লক্ষ্য লইয়া বাহির হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্ততপক্ষে তাঁহার চিত্রের ধর্মনির্ণয় খুব কঠিন কাজ নয়।

গগনেন্দ্রনাথ ও কিউবিজম্

'কিউবিষ্ট' চিত্রকলার সহিত গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের পার্থক্য আরও বেশী। প্রকৃতপ্রস্তাবে দুটি জিনিস বিপরীতধর্মী। গগনেন্দ্রনাথ 'কিউবিষ্ট' চিত্রকর, এরকম একটা ভুয়ো কথা শিক্ষিতসমাজে প্রশ্রয় কি

করিয়া পাইল তাহা একটা হেঁয়ালি। গগনেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে মতামত কি ছিল তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু আসল 'কিউবিষ্ট'রা এই কথা শুনিলে যে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিউবিজম্ চিত্রজগতের একরোখা পাগলামি, উহাকে লইয়া অকারণ রহস্য করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। গগনেন্দ্রনাথ চতুষ্কোণ 'মোটিফ' ব্যবহার করিবার ইঙ্গিত কিউবিজম্ হইতে পাইয়াছেন, তাহা মানা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি 'কিউবিষ্ট' চিত্রকর, একথা যুক্তিসংগত নয়। তন্তু তাঁতিতেও বোনে মাকড়সাতেও বোনে, সেজন্য দুজনেই 'তন্তুবায়' নয়।

প্রথম আপত্তি, গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রে চতুষ্কোণ 'মোটিফ' যতটা ব্যবহার করিয়াছেন বৃত্তাংশ তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ব্যবহার করেন নাই। 'কিউবিষ্টে'র কাছে কিউবই এক ও অদ্বিতীয়, কিউব ভিন্ন রূপ নাই। দৃশ্যজগতের যাবতীয় বস্তুকে চতুষ্কোণে অনুবাদ করিতে হইবে, এই সংকল্প লইয়াই কিউবিষ্টরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দৃশ্যজগতে—অন্তত প্রাকৃতিক দৃশ্যের জগতে—বিশুদ্ধ সরলরেখা বা বিশুদ্ধ চতুষ্কোণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, পক্ষান্তরে সব জিনিসই অল্পবিস্তর বৃত্তাংশ। এই অসমন্বয়ের সমন্বয় করিবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় 'কিউবিষ্ট'রা দৃশ্যজগতের স্বাভাবিক রূপকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণের আসল তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য গণিত হইতে একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরুন, কোন গণিতজ্ঞের খেয়াল জন্মিল সব অখণ্ড সংখ্যাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে ফল অখণ্ড সংখ্যাই হইবে, অর্থাৎ ছয় বা নয়ের মধ্যে তিন যেমন যায় আট ও দশের মধ্যেও তিন তেমনই যায়, যদি কার্যত না যায়, তাহা হইলে যেখানে যত অবশিষ্ট থাকিবে, সব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে কারণ অঙ্কশাস্ত্রে তিনের 'মাল্টিপ্ল্' ভিন্ন সংখ্যা নাই। এই রকমের গোঁড়ামি গগনেন্দ্রনাথ কখনও দেখান নাই। তিনি জ্যামিতিক ডিজাইন অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুধু কিউবও অবলম্বন করেন নাই, সকল দৃশ্যরূপকে চতুষ্কোণ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টাও করেন নাই। এটা মনে রাখা উচিত।

ইহার উপরও আর একটা গুরুতর আপত্তি আছে। কিউবিজমের লক্ষ্য ও গগনেন্দ্রনাথের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিউবিজম্ ষোল আনা 'ফর্ম-বাদী' অর্থাৎ 'কিউবিষ্ট' চিত্রকরেরা চিত্রে মানস আবেগের সামান্য একটু স্থান আছে বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন একেবারে নির্ভাজ দৃষ্টিগ্রাহ্য ডিজাইন তৈরি করিতে। ভাবে মনে হয়, তাঁহাদের মত এই যে চিত্রের ডিজাইন যত জ্যামিতি ও জড়ঘেঁষা হইবে ততই ভাল, কারণ তাহা হইলে বাস্তবজগতের প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের আশ্লেষ হইতে মানুষের মন যে আবেগ সঞ্চয় করে দ্রষ্টা চিত্রে তাহা খুঁজিবে না, শুধু জ্যামিতিক (আসলে জ্যামিতির একটিমাত্র রূপ অর্থাৎ চতুষ্কোণ রূপের প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট) সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য দেখিয়াই তৃপ্ত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'কিউবিষ্ট' চিত্র দেখা দাবার ছক্‌কে চিত্র হিসাবে দেখার মত সৌন্দর্যানুভূতি। কিন্তু মনে রাখিবেন এই নূতন রকম দাবার ছকে চালবেচালের উত্তেজনা নাই, উহা রাজা-মন্ত্রী গজ-নৌকাহীন হিমশীতল ডিজাইন মাত্র।[১]

---

১ বাস্তবানুকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জ্যামিতিক ডিজাইনের প্রতি ঝোঁক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। গ্রীকোরোমান সভ্যতার শেষ পর্বে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে উহা দেখা গিয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দী হইতে এই আন্দোলন হেলেনিষ্টিক আর্টের ন্যাচরালিজ্‌মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। যাহা কিছু স্বভাবানুকারী,

পক্ষান্তরে গগনেন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন, মানস আবেগ সৃষ্টি করিতে। সুন্দর ও নিখুঁত ডিজাইন সৃষ্টি করিতে তিনি সুপটু, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি ডিজাইনেই পর্যবসিত নয়। ডিজাইন জ্যামিতিকই হউক কিংবা অন্য ধরণেরই হউক, চতুষ্কোণই হউক কিংবা বৃত্তাংশই হউক, গগনেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য স্বভাব-সম্পর্কবর্জিত নির্ভাঁজ 'কর্ম' সৃষ্টি নয়। তিনি ডিজাইনের দ্বারা নানা শ্রেণীর চিত্রে নানা ধরণের মানস অনুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, মানস আবেগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ডিজাইনকে বিশুদ্ধ ডিজাইন হিসাবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। ফলে তাঁহার চিত্র দেখিয়া দ্রষ্টার মন কোন ক্ষেত্রে কৌতূহলী হয়, কোন ক্ষেত্রে বিচার ও বিতর্ক মুখীন হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু পর্যাকুল হইয়া উঠে, যে পর্যাকুলতার কথা কালিদাস রাজার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।"

২

চিত্রকলা ও বাস্তব

আমার বিশ্বাস এই ভাবপ্রবণতাই গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহার চিত্রাবলীর লক্ষণবিশ্লেষণ, স্টাইল ও পদ্ধতির আলোচনা, দোষগুণবিচার, ভাবকে মুখ্য প্রসঙ্গ করিয়া ও ভাবকে কেন্দ্র ধরিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু এই কথা বলিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে একেবারে গোড়াকার সূত্রই অস্ফুট থাকিয়া যাইবে। ভাবপ্রবণ চিত্র কি, অন্য ধরণের চিত্র হইতে উহার প্রভেদ কোথায়, ভাব বলিতে চিত্রকলায় ঠিক কোন জিনিসটা বোঝায়, চিত্রে ভাবের স্থান কি, ভাবেতর অন্য জিনিসেরই বা স্থান কি, চিত্রকলায় ভাব নানারকমের হইতে পারে কিনা, তাহা হইলে ভাবের শ্রেণীবিভাগই বা কি, চিত্রসমালোচনা করিতে নামিয়া এই সকল প্রশ্ন এড়াইবার উপায় নাই, অথচ উত্তর দেওয়া সহজ কাজ নয়। সকল কথা পরিষ্কার করিবার স্পর্ধা রাখি না, কিন্তু মোটের উপর যে প্রস্তাবের উপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রবিচার খাড়া করিতে যাইতেছি, উহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

একটি ফ্যাশনেবল্ থিওরী

চিত্রকলায় ভাবের অবলম্বন যাহা চিত্রকলার মুখ্য অবলম্বনও তাহাই—অর্থাৎ বাস্তববস্তুর প্রতিচ্ছবি। স্বভাবানুকৃতিকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের রূপকে বর্ণে রেখায় অনুকরণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে পটের উপর বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া চিত্রকলা

মনুষ্য বা জীবদেহের অবিকল প্রতিচ্ছবি তাহাও তখন নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহার ফলে পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার শিল্পে সুগঠিত মনুষ্য বা জীব মূর্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কে জানে, অতিআধুনিক ইউরোপীয় আর্টের বাস্তববিরোধিতা রোমান সাম্রাজ্যের শেষযুগের বাস্তববিরোধিতার মত একটা সংস্কৃতির (অর্থাৎ ক্লাসিকাল ইউরোপীয় সভ্যতার) সায়ংকালের ছায়া কিনা?

সম্ভব, এই কথাটা হালে পাশ্চাত্ত্যে, সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের দেখাদেখি আমাদের দেশেও, চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ভদ্রতার খেলাপ করিয়াও বলিতে হইবে—এই ফ্যাশনেবল্ থিওরীটি নির্জলা ধাপ্পাবাজী। এই ফ্যাশনেবল্ থিওরীটি মানিয়া লইলে আর দুইটি প্রস্তাবও বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইতে হইবে। সে দুটি এই—(১) নকশা বা অলংকারই চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; (২) পুরাতন প্রস্তরযুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহা চিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে তাহা মোটেই চিত্র নয়।

স্বভাবানুকারিতা বা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি যদি চিত্রে নিষ্প্রয়োজন বা দূষনীয় হয় তাহা হইলে শাল কিংখাব বিদ্রির কাজ, মন্দির মসজিদে ও মকবরার দেয়ালের কারুকার্য, চীনামাটির উপর রং ও রেখার অদ্ভুত খেলা, এই সকলকে চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে বাধা কি? মোগল ছবির ছবিটুকু বাদ দিয়া হাঁসিয়াটুকু লইয়া মাতামাতি করিবার বিপক্ষেই বা কি যুক্তি আছে? বাস্তব বস্তুর বিকৃত বা অবিকৃত প্রতিচ্ছবির সহায়তায় চিত্রকর যত সুন্দর 'কম্পোজিশ্যন'ই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা কি কখনও বিশুদ্ধ অলংকার বা কারুকার্য হিসাবে পূর্বোক্ত জিনিসগুলির সমান হইয়াছে, না হইতে পারে? অথচ কোন যুগে কেহই কারুকার্যকে চিত্র বলিয়া স্বীকার করে নাই, কারুকার্য শত মনোরম হইলেও উহাকে চিত্রের সম্মান দেয় নাই। বিশুদ্ধ অলংকার সর্বদাই অন্য বড় কোন সৃষ্টির মণ্ডন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, উহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে আসল চিত্র ও ভাস্কর্যের নিচে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মামুলি চিত্রকলাতেও 'কম্পোজিশ্যন' বলিতে যাহা বুঝায় তাহারও নামগন্ধ অজন্তার বড় চিত্রগুলিতে নাই। এগুলি ফঁ দ্য গোম বা আলতামিরার গুহাগাত্রে প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানবের দ্বারা চিত্রিত বাইসন, অতিকায় হস্তী প্রভৃতির ছবির মতই যথাতথা বিন্যস্ত। তাই বলিয়া কি অজন্তার ছবি চিত্রকলার নিদর্শন নয়?

অবশ্য একথা ঠিক যে, আধুনিক আর্ট-ক্রিটিকরা পুরাতন চিত্রকলার নূতন তাৎপর্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা পুরাতন চিত্রকে বিশুদ্ধ ডিজাইন হিসাবে, 'সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট ফর্ম' বা 'অর্থপূর্ণ রূপ' হিসাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইঁহাদের মতে চিত্রে বিষয়বস্তুর স্থান নাই, উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় স্থানগত সম্পর্ক (স্প্যাশিয়াল রিলেশ্যন্‌স্)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"এক ধরণের চিত্র থাকা সম্ভব যাহার উদ্দেশ্য নিছক 'অর্থপূর্ণ রূপ,' যাহাকে বিশ্লেষণ করিলে স্থানগত সম্পর্ক ও রং ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু 'অর্থপূর্ণ রূপ' কোন না কোন জিনিসের অর্থ প্রকাশ নিশ্চয়ই করে। এমন কি সংগীত যে সকল আর্টের তুলনায় সব চেয়ে বেশী বস্তুগন্ধহীন, যে সংগীতের সহিত এই নবীনপন্থীরা চিত্রকলাকে লীন করিতে চান, হান্‌স্‌লীকের সুবিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী সেই সংগীতেরও বিষয় গতির ধারণা। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'কিসের রূপ', 'কিসের অর্থ' এই দুইটি প্রশ্ন চিত্রকলা কি করিয়া এড়াইতে পারে তাহা বোঝা কঠিন।" (স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার—"আর্ট অ্যাণ্ড ইন্‌স্টিন্‌ক্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ, "ফিলসফিক্যাল অ্যাণ্ড আদার পীসেজ," ২৫৫ পৃ.)

পাশ্চাত্ত্য চিত্রকরদের সাক্ষ্য

কিন্তু আধুনিক দার্শনিকের কথা বাদ দিলেও চিত্রকলার বিষয়বস্তু বর্জিত ব্যাখ্যার জড় বড় বড় চিত্রসমালোচক ও চিত্রকরেরাই মারিয়া রাখিয়াছেন। চিত্রকলা বাস্তব বা স্বভাবের অনুকরণের উপরই যে

প্রতিষ্ঠিত এই কথাটা লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁহার সুবিখ্যাত নোটবুকের বহু স্থলে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এখানে তাঁহার দুই একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। কবি ও চিত্রকরের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,

"আকৃতি, কর্ম ও দৃশ্যকে কাব্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা করে, চিত্রকর এই সকল দৃশ্যবস্তুকে পুনরাবির্ভূত করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে অবিকল প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত করে। মানুষের পক্ষে কোন্ জিনিসটা বেশী আবশ্যক—মনুষ্যনাম না মনুষ্যমূর্তি, তাহা বিবেচনা কর। দেশ পরিবর্তনের সঙ্গে নাম পরিবর্তন হয়; কিন্তু এক মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায়ে রূপ পরিবর্তিত হয় না।" (ম্যাক্‌কার্ডি সম্পাদিত ইংরেজী সংস্করণ, ২য় খণ্ড ২২৭ পৃ.)

একটু পরেই তিনি আবার বলিতেছেন,

"চিত্রকলা প্রকৃতির চক্ষুগোচর সকল সৃষ্টির একমাত্র অনুকরণকারী।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২২৯ পৃ.)

ইহার অপেক্ষাও সাংঘাতিক একটা কথা লেওনার্দো বলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মতে "দর্পণই চিত্রকরদের গুরু!" (উপরোক্ত পুস্তক, ২৫৪ পৃ.)

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"যুগে যুগে চিত্রকলার পতন ও অধোগতি হইয়াছে তখনই যখন চিত্রকরেরা পূর্ববর্তী চিত্রকরদের চিত্র ভিন্ন অন্য আদর্শ পায় নাই। অন্যের সৃষ্টিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিত্রকর যে চিত্র সৃষ্টি করিবে উহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর হইবে কিন্তু সে যদি স্বাভাবিক বস্তু হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা করে তাহা হইলে সুফল লাভ করিবে।"

ইহার পর রোমান আর্ট ও জোত্তোর দৃষ্টান্ত দিয়া লেওনার্দো আবার বলিতেছেন,

"তাঁহার [অর্থাৎ জোত্তোর] পরও চিত্রকলার আবার অবনতি হয়, এবং ফ্লোরেন্সবাসী তম্মাসো, যাঁহার জনপ্রচলিত নাম মাসাচ্চো, তাঁহার কাল পর্যন্ত শত শত বৎসর ধরিয়া এই অবনতি চলিতে থাকে। মাসাচ্চো তাঁহার চিত্রের উৎকর্ষের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, সকল চিত্রগুরুর শ্রেষ্ঠ গুরু প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন আদর্শ যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা বৃথা শ্রম করিতেছেন।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২৭৬ পৃ.)

এই উক্তির মধ্যে নব্যভারতীয় চিত্রকলার জন্য কি কোন নির্দেশ নাই? লেওনার্দো চিত্রকর হিসাবে যাহা বলিয়াছেন জর্জো ভাজারি চিত্রকর ও চিত্রকলার ইতিহাস লেখক হিসাবে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লেওনার্দোর সুবিখ্যাত 'মোনা লিজা' সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"চিত্রকলা কত অবিকলভাবে স্বভাবকে অনুকরণ করিতে পারে তাহা যদি কেহ দেখিতে চায় তাহা হইলে এই মাথাটি হইতে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে, কারণ অঙ্কন-কৌশলের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সেই সবটুকু সূক্ষ্মতাই ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে। দেখ, জীবন্ত মানুষে যাহা দেখা যায় এই চোখেও সেই জ্যোতি ও তারল্য, আর চক্ষুর চারিদিকে সেই গোলাপ ও মুক্তার বর্ণ, আরও দেখ অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত আঁকা পক্ষযুগ্ম।"

তারপর ভ্রূ, নাসা, মুখ ও ওষ্ঠাধরের স্বাভাবিকতার প্রশংসা করিয়া ভাজারি বলিতেছেন,

"গলদেশের নিম্নাংশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে মনে হইবে যেন ধমনীর স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি।" (ডি. ভিয়ার কর্তৃক অনূদিত ও লী-ওয়ার্নার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১০০-১০১ পৃ.)

প্রাচ্য ধারণা

কেহ এ-কথা বলিতে পারিবেন না যে, চিত্রে বাস্তবানুকারিতা ও স্বাভাবিকতার এই প্রশংসা শুধু পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা ও চিত্রসমালোচনারই লক্ষণ, প্রাচ্যে উহা নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাচ্যে এই ব্যাপারটা আরও

বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য, ইতিহাস ও কলাসমালোচনা হইতে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, চিত্রকলায় প্রাচ্য দেশেও সকলেই স্বভাবানুকারিতা এবং বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়াছে। 'আদর্শ' বা 'ভাব' বলিয়া যে ধোঁয়াটে জিনিসটা আধুনিক লেখকরা প্রাচ্য আর্টের উপর চাপাইতে চাহিতেছেন উহার আসল অস্তিত্বই নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় চিত্রের কথাই প্রথমে ধরা যাক।

ভাজারি 'মোনা লিজা' চিত্রের যে ধরণের প্রশংসা করিয়াছেন, শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বিদূষককে দিয়া কালিদাস কি শকুন্তলাচিত্রের বা চিত্রগতা শকুন্তলার (দুইএর মধ্যে কোন পার্থক্য কবি করেন নাই) ঠিক সেই ধরণের প্রশংসা করান নাই ? বিদূষক বলিতেছে,

"সাধু বয়স্য, মধুরাবস্থানদর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি এব মে দৃষ্টিনিম্নোন্নত প্রদেশেষু।[২] কিং বহুনা সত্ত্বানুপ্রবেশশঙ্কয়া আলপন কৌতূহলং মে জনয়তি।" (বুঝিবার সুবিধার জন্য মূল প্রাকৃত না দিয়া বিদূষকের উক্তির সংস্কৃত ভাষান্তর উদ্ধৃত করিলাম।)

ইহার কিছু পরে বিদূষক আবার বলিতেছে,

"ভোঃ কিং নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়শোভিনা অগ্রহস্তেন মুখমাবার্য চকিতচকিতা ইব স্থিতা। (সাবধানং নিরূপ্য) আঃ এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চরস্তত্রভবত্যা বদনকমলমভিলঙ্ঘতে মধুকরঃ।"

রাজাও উত্তর দিয়া বসিলেন,

"ননু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ।"

শুধু একটি নয়, চিত্র বাস্তবেরই ভ্রম—এই ধারণা সূচনা করে এরূপ বহু প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করা যায়। নাটকের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মালতীমাধব, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, কর্পূরমঞ্জরী ও অন্যত্র চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বত্রই চিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ও মনোভাব এক—চিত্র বাস্তবজগতের প্রতিচ্ছবি। চিত্রসংক্রান্ত বিধিনির্দেশেও এই একই কথা। বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণের চিত্রসূত্রে বলা হইয়াছে, চিত্রের আটটি গুণের মধ্যে একটি গুণ—"সাদৃশ্য"। আরও সবিস্তারে বলা হইতেছে—

"শূন্যদৃষ্টিং চেতনারহিতং বা স্যাত্তদশস্তং প্রকীর্ত্তিতম," "হসতীব চ মাধুর্য্যং সজীব ইব দৃশ্যতে।"

আরও পরিষ্কার কথা—

"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ১৯-২২ শ্লোক)

ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যের ব্যাপার স্বভাবানুকৃতি সম্বন্ধে চীনা চিত্রকরদের মনোভাব। প্রাচ্য চিত্রকলার মধ্যে চীনা চিত্রকলাই বেশী 'ভাব'-ঘেঁষা। এমন কি একজন চীনা চিত্রকর (নি-জান, চতুর্দশ শতাব্দী-য়ুয়ান যুগ) বলিয়াছেন,

---

২ 'নিম্নোন্নত প্রদেশে'র উল্লেখ শকুন্তলার অঙ্গলাবণ্যের প্রতি বিদূষকসুলভ শ্লেষ নয়, রাজার চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা বলিয়া মনে হয়। 'নিম্নোন্নত' কথাটি সম্ভবত পারিভাষিক। বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণের চিত্রসূত্রেও উহা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে "নিম্নোন্নত বিভাগং চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।" ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক) এই কথার অর্থ কি 'প্ল্যাষ্টিসিটি' বা 'রিলীফ' হইতে পারে না ? উচ্চতানীচতা বা বস্তুর তিন ডাইমেনশ্যন দেখানই চিত্রকলার সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। বিদূষক সম্ভবত বলিতে চাহিতেছে রাজা উহাতে খুব কৃতকার্য হইয়াছেন।

"আমি যাহাকে চিত্র বলি তাহা তুলির অযত্নকৃত খেয়াল ছাড়া কিছু নয়, সাদৃশ্য উহার লক্ষ্য নয়, উহার উদ্দেশ্য চিত্রকরের চিত্তবিনোদন।" (আর্থার ওয়েলী, "আন্ ইন্ট্রোডাকশন টু দি ষ্টাডি অফ চাইনিজ পেন্টিং", ২৪৩ পৃ.)

এই চীনারাও বাস্তবানুকরণকে চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শিয়ে হো (পঞ্চম শতাব্দী, "ছয়-বংশ" যুগ)—যিনি চিত্রকলার ষড়ধর্মের প্রণেতা হিসাবে বিখ্যাত—তাঁহার ষড়ধর্মের বেশীর ভাগই স্বভাবের অনুকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে ওয়েলী বলিতেছেন,

"প্রথম ধর্মটি না থাকিলে আমরা সিদ্ধান্ত করিতাম শিয়ে হো'র আদর্শ সবর্ণ ফটোগ্রাফীর আদর্শ।" উপরোক্ত পুস্তক, ৭৩ পৃ.)

শুধু একটি ধর্মে তিনি 'ভাব-সামঞ্জস্য' ও 'জীবন্ত গতি'র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতরা সুনিশ্চিত নন।

আর একজন 'ভাব'-প্রধান চীনা চিত্রকরের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া চীনা নজীর সমাপ্ত করিব। ইনি ওয়াং-লি (চতুর্দশ শতাব্দী)। ওয়াং-লি বলিতেছেন,

"যদিও চিত্রকলা আকৃতির প্রতিচ্ছবি. তবু 'ভাব'ই (অর্থাৎ চিত্রিত বস্তুর 'ভাব') উহাতে প্রাধান্য পায়। ভাবকে অবহেলা করিলে, শুধু প্রতিচ্ছবি-সৃষ্টির সার্থকতা নাই। কিন্তু এই 'ভাব' আকৃতির ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়. এবং আকৃতি ভিন্ন প্রকাশ্য নয়। আকৃতির প্রতিচ্ছবি-সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ যে করিয়াছে সে দেখিবে ভাব আসিয়া এই আকৃতিকে পূর্ণ করিবে। কিন্তু আকৃতির প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করিতে যে অক্ষম সে দেখিবে শুধু ভাবই নয়, সবই গিয়াছে।"

ইনিও লেওনার্দোর মত চিত্রকরকে প্রাকৃতিক বস্তু দেখিতে ও প্রকৃতি হইতে আঁকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সহিত লেওনার্দোর উপদেশের সাদৃশ্য কতটুকু দেখুন। তিনি বলিতেছেন,—

"কেহ যখন কোন জিনিস আঁকিতে আরম্ভ করে তখন সে চায় বস্তুটার সহিত তাহার চিত্রের সাদৃশ্য থাকিবে। কিন্তু জিনিসটার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ও যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে কি করিয়া উহা সম্ভব হইতে পারে? পুরাতন চিত্রগুরুরা কি অন্ধকারে হাতড়াইয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন? এই যে লোকগুলি নকল করিয়া সময় কাটায়, নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাহাদের অনেকেরই পরিচয় শুধু অন্যের ছবির ভিতর দিয়া, উহারা ইহার অপেক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় না। প্রত্যেকটি নকলেই সত্য আরও দূরে সরিয়া পড়ে। ক্রমশ আকৃতি নষ্ট হয়, আকৃতির বিলোপের পর ভাবের অস্তিত্বও সম্ভব নয়।

"এক কথায় বলিব, হুয়া পর্বতের আকৃতি না জানা পর্যন্ত আমি কি করিয়া উহার ছবি আঁকিতাম? উহাকে দেখিবার এবং বাস্তব হইতে উহাকে আঁকিবার পরও উহার 'ভাব' অপরিণত ছিল। পরে আমার গৃহে নির্জনে বসিয়া উহার ধ্যান করিতে লাগিলাম; বাহিরে বেড়াইবার সময়েও তাহাই করিতাম; শয়নে, ভোজনে, সংগীত শুনিবার সময়ে, কথাবার্তা ও রচনার অবকাশেও তাহাই করিতাম। একদিন বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম বাঁশী ও মৃদঙ্গ বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। পাগলের মত লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'পাইয়াছি'। তারপর পুরাতন খসড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার আঁকিলাম। এবারে একমাত্র হুয়া পর্বতই আমার পথনির্দেশক। 'স্কুল' ও 'ষ্টাইলে'র যে ভাবনা সাধারণত চিত্রকরের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে আমি তাহার কথা চিন্তাও করিলাম না।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২৪৫ পৃ.)

ওয়াং-লি'র এই উক্তি পড়িবার সময়ে প্রণিধান করিতে হইবে তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন, চিত্রের আকৃতি ও 'ভাব' দুইএরই প্রেরণা মূল প্রাকৃতিক বস্তু হইতে আসে।

চীনাদের পর মুসলমান চিত্রকরদের বহু নজীর দিতে পারিতাম। স্থানাভাবে ও বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পারস্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বিহ্জাদের যশের একটি কারণ ইহাই যে, তাঁর তুলিকাস্পর্শে জড় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রের প্রধান অবলম্বন

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে কোথাও চিত্রকর, চিত্রসমালোচক, ও চিত্রের সমঝদারদের মধ্যে এই ধারণা কখনও ছিল না যে, স্বভাবানুকৃতি বা দৃশ্যমান জগতের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি বাদ দিয়া ছবি আঁকা যাইতে পারে—বা, এমন কি, দেখা পর্যন্ত যাইতে পারে। সুতরাং বাস্তবের অনুকরণই যে চিত্রের প্রধান অবলম্বন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিচ্ছবি-বর্জিত চিত্র শুধু যে ডেনমার্কের যুবরাজবর্জিত হ্যামলেট নাটক তাহাই নয়, সকল পাত্রপাত্রী বর্জিত নাটক। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে উহা চিত্রই নয়—কারুকার্য হইতে পারে, কিন্তু কারুকার্য হিসাবেও আসল কারুকার্য যাহাকে বলে তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়া থাকেন, চিত্রকলা ফোটোগ্রাফী নয়। কথাটা অনাবশ্যক, অবান্তর, এমন কি অর্থহীন। কাব্য উপন্যাস সমালোচনা করিতে গিয়া কি আমরা কখনও বলি, কাব্য ইতিহাস নয়, উপন্যাস খবরের কাগজ নয়? সাহিত্যবোধযুক্ত ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্ন উঠেই না। বাস্তব জীবনের উপাদান ও কাব্য উপন্যাসের উপাদান যে একই জিনিস এ-কথা সে সহজভাবে মানিয়া লয়, নিরর্থক তর্ক করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এক স্থাপত্য ও সংগীত ছাড়া[৩] সব আর্টই বাস্তব জীবনের এক বা অন্য উপাদানের অনুকরণ। চিত্রকলাও তাহাই, বরঞ্চ সাহিত্য অপেক্ষাও চিত্রের ক্ষেত্রে কথাটা বেশী সত্য। বাস্তব জীবনের দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদানই চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র উপজীব্য।

৩

আর্টে সৃষ্টি

বাস্তবানুকারিতা চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন হইলেও চিত্রকলা শুধু বাস্তবানুকারিতাতেই পর্যবসিত নয়।[৪] বাস্তবের প্রতিচ্ছবি উহার আশ্রয় বটে, কিন্তু চিত্রকলাতে প্রতিচ্ছবি বা অনুকৃতির উপর আরও কিছু আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই নূতন উপাদান জোগায় চিত্রকরের মন। এদিক হইতে কবিতা বা উপন্যাসের সহিত চিত্রকলার কোন প্রভেদ নাই। তিনটি আর্টই বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনটিই বাস্তবাতিরিক্ত কিছু, বাস্তবের রূপান্তর—সুতরাং সৃষ্টি।

---

৩ সংগীতেও বাস্তব জীবনের অনুকরণ যে নাই তাহা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেতোফেনের ষষ্ঠ সিম্‌ফনীতে নদীর কলকল মেঘের গর্জন ও পাখীর ডাকের অনুকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সিম্‌ফনীটির দ্বিতীয় মুভমেণ্টে ফ্লুটে বুলবুলের, ওবয়ে তিতিরের ও ক্ল্যারিনেটে কোকিলের ডাকের অনুকরণ রহিয়াছে। কিন্তু সংগীত এবং স্থাপত্য মূলত একেবারে বাস্তব গন্ধহীন বা 'অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট' আর্ট। বেতোফেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, ষষ্ঠ সিম্‌ফনীতে পাখীর ডাকের অনুকরণ তামাশামাত্র।

৪ এই সূত্রে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল মনে করি। চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন বাস্তবের অনুকরণ বলিলাম বটে, কিন্তু অনুকরণ ব্যাপারটা সাধারণ লোকে যত সহজ বলিয়া মনে করে চিত্রকরের কাছে তত সহজ নয়, সাধারণে যত সহজবোধ্য মনে করে দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিকের কাছে তত সহজবোধ্যও নয়। প্রথমত, বাস্তবের অনুভূতি বা জ্ঞান নানা জনের নানাপ্রকার। দ্বিতীয়ত, বাস্তবকে নানা উপায়ে অনুকরণ করা যাইতে পারে; তৃতীয়ত, সমগ্র বা অখণ্ড বাস্তবকে চিত্রে অর্পণ করা সম্ভব নয়,

নূতন ইমার্জেণ্ট

চিত্রকলা যে সৃষ্টি, তাহা দুইটি চিত্রবিরোধী মত হইতে যেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য কোথাও এত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আমি দেখি নাই। দুটি মতই উদ্ধৃত করিব। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ধর্মসাধক-লেখক পাস্কাল চিত্রকলার প্রতি বিমুখ ছিলেন, অন্ততপক্ষে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি লিখিবার সময়ে তাঁহার বিরাগ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন,

"কি অসার মোহ চিত্রকলা! যে জিনিসকে মূলে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই না, সেই জিনিসের সহিত সাদৃশ্যের বলে সে আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে!" ('লে গ্রাঁজেক্রিভেঁ দ্য লা ফ্রাঁন্স' গ্রন্থমালা সংস্করণে পাস্কালের গ্রন্থাবলী, ১৩শ খণ্ড, ৫০পৃ.)

মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে চিত্রকলা নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ, তাহার সংবাদ লইলে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকারদের দ্বারা নরকবাস দণ্ডে দণ্ডিত চিত্রকরও সান্ত্বনা পাইবে। পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেয় বলিয়া নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টির স্পর্ধিত অনুকরণ করিতে যায় বলিয়াই মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশে চিত্রকর মহাপাপী। চিত্রকর ঈশ্বরের শত্রু। বুখারীকৃত সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক হদিস সংগ্রহে আছে—

"আল্লাহ্ বলেন, আমার সৃষ্টির মত সৃজন করিতে যায় যে ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে হইতে পারে?" (অল-বুখারী সংকলিত শাহী বুখারীর যুইনবল কৃত সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১০৪ পৃ. ৯০নং)

তারপর আরও কথা আছে। বুখারী ধৃত আর একটি হদিস এইরূপ,

"ছবি অঙ্কন করে যাহারা, কেয়ামতের দিনে তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে জীবন দান কর'।" (উপরোক্ত পুস্তক, ১০৬ পৃ, ৯৭ নং)

কিন্তু চিত্রকর তাহা পারিবে না ও উদ্ধত স্পর্ধার জন্য দণ্ডিত হইবে।

চিত্রকরকে মুসলমান সমাজ সৃষ্টিকর হইবার স্পর্ধায় স্পর্ধিত বলিয়া যে মনে করে তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে। আরবী ভাষায় চিত্রকরের প্রতিশব্দ "মুস্বব্বির"—অর্থাৎ "যে গঠন করে বা আকৃতি দেয়।" এই শব্দটি কোরাণে স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তিনি ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণকর্তা, গঠনকারী।" (কোরাণ, ৫৯ সুরা ২৪ আয়ৎ)

পাস্কাল ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকার চিত্রকলার যে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, উহার অপেক্ষা উচ্চ সার্টিফিকেট পাইবার ভরসা কোন্ চিত্রকর রাখে?

আর্ট যে সৃষ্টি মোটের উপর দার্শনিকরা তাহা মানিয়াই লইয়াছেন। যদিও আর্টকে বিশ্বসৃষ্টির অবিকল প্রতিরূপ মনে করা ভুল হইবে, আর আর্টিস্ট কর্তৃক আর্ট সৃষ্টিকে ভগবান বা ঐ প্রকার কোন অনৈসর্গিক শক্তি কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির সমর্থক যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা আরও ভুল হইবে, তবু মোটা কথায় বলা যাইতে পারে, বিশ্বসৃষ্টি যে "প্রোসেস্" আর্টকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় অথবা সেই 'প্রোসেস্'

নানাদেশে নানা জনে বাস্তবের নানা অংশ বাছিয়া লইয়া থাকে; চতুর্থত, চিত্রে বাস্তবকে অনুকরণ করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সকল কারণে চিত্র বাস্তবানুকারী হইয়াও নানা রকমের হইতে পারে, এমন কি সাধারণের চক্ষে অবাস্তব বলিয়াই মনে হইতে পারে। এই বড় প্রশ্নের আলোচনা গগনেন্দ্রনাথের সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু জিনিসটার জটিলতা ও সূক্ষ্মতার কিছু ধারণা যাঁহারা করিতে চান তাঁহারা হাইনরিশ ভোয়েল্ফলিন প্রণীত "প্রিন্সিপল্স্ অফ্ আর্ট হিষ্টরী" পুস্তকটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

হইতে উদ্ভূত বলিয়া মানা যায়। এই প্রসঙ্গে আলেকজাণ্ডারের একটি কথা আমার নিকট অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি বলেন,

দেশ-কালের ('স্পেস-টাইমে'র) সৃষ্টিপ্রেরণা ('নিসাস্') বিশ্বের নানাস্তরের ও নানাধরণের যে সব অস্তিত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, আর্ট সেই সৃষ্টিরই একটা ফল, জীবনের উচ্চতম রূপ বলিয়া যাহা আমাদের নিকট জ্ঞাত আর্ট উহারই একটা 'ঘটনা'। ("আর্টিষ্টিক ক্রিয়েশ্যন অ্যাণ্ড কস্‌মিক ক্রিয়েশ্যন" শীর্ষক প্রবন্ধ, আলেকজাণ্ডার প্রণীত ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত পুস্তক, ২৭৮ পৃ.)

অধ্যাপক ল্যয়ড মরগ্যানের কথায় বলা যাইতে পারে আর্ট একটা নূতন "ইমার্জেণ্ট"—বা আবির্ভাব।

আর্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু কি সৃষ্টি? এটাই সব চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন। সাধারণ লোকে যখন ছবি দেখে এই জিনিসটাই তাহার কাছে সব চেয়ে ঝাপসা ঠেকে। ছবি দেখিয়া উহারা যে সকল মন্তব্য করে তাহা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, একটা ভাষা তাহাদের কানে যাইতেছে বটে, কিন্তু সে ভাষা তাহাদের অজানা। স্বভাবতই উহারা জানা ভাষার সাহায্যে অজানা ভাষার অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আর্টের ভাষায় ও তাহাদের জানা ভাষায় গুরুতর প্রভেদ থাকায় উহাদের কৃত অর্থ অনেক সময়ে চিত্রের আসল অর্থের বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। কি সাধারণভাবে চিত্রের অর্থ বুঝিবার জন্য, কি গগনেন্দ্রনাথের চিত্র বুঝিবার জন্য, এই প্রশ্নটার একটা পরিষ্কার উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

চিত্র ডিজাইন নয়

চিত্রকরের সৃষ্টি ডিজাইন মাত্র নয় তাহা একরকম জোর করিয়াই বলা চলে। শুধু ছন্দ যেমন কবিতা নয়, শুধু তাল যেমন সংগীত নয়, শুধু স্টাইল যেমন উপন্যাস নয়, তেমনই শুধু ডিজাইনও চিত্র নয়, তা সে ডিজাইন যাহারই আঁকা হউক না কেন। ডিজাইন বা অলংকারজাতীয় বস্তু যত মনোরমই হউক না কেন, তাহা কখনও আমাদের মনকে চিত্রের মত জোরে ঘা দেয় না, আমাদের সমস্ত সত্তাকে সে রকম উদ্বেলিত এবং আলোড়িত করিয়াও তুলে না। এই ধরণের মানসিক উত্তেজনার জন্য বাস্তবের প্রতিচ্ছবির আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহা সত্য, দুই ডাইমেন্‌শ্যনে আবদ্ধ ডিজাইনের তুলনায় মনকে আকৃষ্ট ও বিচলিত করিবার শক্তি তিন ডাইমেনশ্যন্ যুক্ত ডিজাইনের বেশী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা বলিবার উপায় নাই যে, তিন ডাইমেনশ্যন্ যুক্ত ডিজাইনও মানুষের মনকে চিত্রের মত আলোড়িত করিতে পারে। তাহার জন্য ডিজাইনের সহিত বাস্তবের প্রতিচ্ছবি যোগের আবশ্যক। দুইএর সংযোগ, কাব্যে ধ্বনি, অর্থ, ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সংযোগের মত মানুষের মনের মধ্যে একটা বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। এই রসায়নের সূত্র এখন বাহির হয় নাই, কিন্তু চিত্র যে বিষয়সাপেক্ষ, শুধু ডিজাইন নয় তাহা সুনিশ্চিত।

প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্রের ডিজাইনের বিচার সমগ্র চিত্রের বিচার নয়। অবশ্য ডিজাইনের বিচার করিতে বাধা নাই, যেমন বাধা নাই কবিতার ছন্দের বিচার করিতে। আমরা ত কবিতার ব্যাকরণ লইয়াও আলোচনা করি। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক চিত্রের ডিজাইনের বিচার শুধু উহার অংশবিশেষের বিচার।

এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে, 'ডিজাইন' সৃষ্টি চিত্রাঙ্কনের লক্ষ্য নয়, উহা উপায় মাত্র। কবিতায় কবির 'বক্তব্য' ছন্দের সাহায্যে তীব্রতর হইয়া উঠে। ছন্দের জন্য কবিতা মানুষের মনকে অপেক্ষাকৃত সহজে অভিভূত করিতে পারে। ছন্দ না থাকিলে শ্রোতার চিত্তে প্রবেশলাভ কবির পক্ষে

আরও দুরূহ হইত। তেমনি চিত্রকরের 'বক্তব্য'—অর্থাৎ উপপাদ্য ডিজাইনের সহায়তায় আমাদের মনে আরও সহজে প্রবেশ করে, এবং আমাদিগকে আরও বেশী অভিভূত করে। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, ডিজাইন চিত্রের বহির্ভূত বস্তু, নিঃসম্পর্কিত সহায়কমাত্র। যেমন স্বামীস্ত্রীর মিলন ভিন্ন দাম্পত্যজীবন নাই, ছাদ ভিত্তি দেয়ালের যোগাযোগ ভিন্ন গৃহ নাই, তেমনই ডিজাইন ও বিষয়বস্তুর সংযোগ ভিন্ন চিত্র নাই। দুই-ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবু দুইটিকে বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, এবং ইহাও অনুভব করা যায় যে, চিত্রের চিত্রসত্তা আর ডিজাইনের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা নাই।

চিত্রকলা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ

তাহা হইলে চিত্রকলায় সৃষ্টি কোন্ জিনিসটা, কাহাকেই বা চিত্রের 'বক্তব্য', 'উপপাদ্য', বা 'বিষয়' বলিব? সংগীতের কারবার যেমন ধ্বনি লইয়া চিত্রকলার কারবার তেমনিই দৃষ্টিগ্রাহ্যবস্তু লইয়া,—চিত্রকলা দ্রষ্টব্য আর্ট, এই কথা বলিয়া অনেকে চিত্রকলাকে বিশিষ্ট ও অন্য আর্ট হইতে পৃথক করিতে যান। অবশ্য ইহা সত্য যে, চিত্রকলার একমাত্র অবলম্বন দৃষ্টিগ্রাহ্যবস্তু, কিন্তু এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়, কেন না চিত্রকলা ভিন্ন সাহিত্যেরও আংশিক উপাদান দৃশ্যবস্তু; তাহা ছাড়া দৃশ্য বস্তু প্রথমত নানাপ্রকারের, দ্বিতীয়ত আমাদের মনকে নানাদিক হইতে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। ইহার জন্য শুধু দৃশ্যবস্তুর আর্ট বলিলে চিত্রকলার ধর্মকে বিশিষ্ট করা হয় না।

সাহিত্যের উপাদান দৃশ্যবস্তু এই যুক্তি অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু বর্ণনামূলক রচনা ও চিত্রের মধ্যে তফাত কোথায়? "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"—এই ভাষাচিত্র এবং রঙে ও রেখায় সম্বদ্ধ দৃশ্যচিত্রের মধ্যে মূলত প্রভেদ কোথায়? আর একটা দৃষ্টান্ত ধরুন।

—ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,—

এই ছবি ও টার্নারের আঁকা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য কি অনেকটা একধর্মী নয়? একটা বড় পার্থক্য অবশ্য আছে। চিত্রকলা দৃশ্যবস্তুকে একেবারে সাক্ষাৎভাবে না পারিলেও অন্য পর্যায়ের দৃশ্যবস্তু হিসাবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, ভাষাচিত্র তাহা পারে না, ভাষাচিত্রকে দৃশ্যে পরিণত করে আমাদের মন—কল্পনা ও ভাবসংশ্লেষের সহায়তায়। এই কথা ভাষার দ্বারা সৃষ্ট সকল আর্ট সম্বন্ধেই খাটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল অভিজ্ঞতাকে কমবেশী পুনরাবির্ভূত করিবার ক্ষমতা ভাষার আছে। সেজন্য ভাষার দ্বারা সৃষ্ট আর্ট ও বর্ণরেখার দ্বারা সৃষ্ট আর্ট খানিকটা সমানাধিকারযুক্ত অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'ওভারল্যাপিং'। বর্ণনার সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সৃষ্টি ভাষা যতটুকু করিতে পারে সেই অনুপাতে ভাষা চিত্রধর্মী। দৃশ্যবস্তুকে সাক্ষাৎভাবে ও গৌণভাবে উপলব্ধির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা চিত্রগত বর্ণনা ও ভাষাগত বর্ণনার

মধ্যে অবশ্য বাহৃত না থাকিয়া পারে না, কিন্তু আমাদের মনে রসসৃষ্টির দিক হইতে ভাষাচিত্র ও আসল চিত্রের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নাই। দুই-ই আমাদের মনে একই পর্যায়ের ভাব সৃষ্টি করে।

তেমনি চিত্র আবার ভাষার নিজস্ব এলাকায় আসিয়া প্রভেদও করিতে পারে। ঘটনাবর্ণন বা আখ্যান ভাষার বিশিষ্ট ক্ষমতা। চিত্র তাহা অহরহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধরুন, বাইবেলে যীশুর শেষ ভোজনের কাহিনী। "আসবাব যুক্ত একটি বড় খাইবার ঘর……যীশু বারো জন শিষ্য লইয়া ভোজনে বসিলেন……" ইত্যাদি। এই আখ্যান ও লেওনার্দোর 'লাস্ট সাপারে'র মধ্যে তফাত কি? নিছক বর্ণনা হিসাবেই বা কি, আমাদের মনে ভাবাবেশের দিক হইতেই বা কি? অবশ্য দৃশ্য সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে ভাষার যেমন খানিকটা অসুবিধা আছে তেমনই আখ্যানের ব্যাপারে চিত্রেরও একটা অক্ষমতা আছে। চিত্র ঘটনাপরম্পরা দেখাইতে পারে না, কালক্ষেপকে প্রকাশ করিতে পারে না, চিত্রের বর্ণনা কালমুহূর্তের মধ্যে আবদ্ধ স্থাণু অবস্থার বর্ণনামাত্র। কিন্তু শুধু এইটুকুই একটা আখ্যান হইতে পারে, এবং একটি মুহূর্তব্যাপী আখ্যানাংশ আখ্যানের বাকী অংশটুকুকে ভাবসংশ্লেষের সাহায্যে আমাদের মনে আনিয়া দিতে পারে। এইখানেও ভাষাগত আর্ট ও বর্ণরেখাগত আর্টের মধ্যে সমানাধিকার রহিয়াছে।

দৃশ্যবস্তুর বৈচিত্র্য

চিত্রকলায় দৃশ্যের লক্ষণ ও প্রকার ভেদের কথা ধরিলে, এবং এই দৃশ্যবৈচিত্র্যের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে যে ভাববৈচিত্র্য হয় উহার বিশ্লেষণ করিলে, ব্যাপারটা আরও অনেক জটিল হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমত চিত্র মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত ও মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত হইতে পারে। আমাদের মনকে মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত ছবি যে-ভাবে প্রভাবান্বিত করে মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত ছবি ঠিক সে-ভাবে করে না। মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত চিত্র দেখিবার সময়ে আমরা মানুষের জীবনের আনুষঙ্গিক আবেগ, উচ্ছ্বাস, নৈতিক ধারণাকে, সংক্ষেপে বলা চলে আমাদের মনের সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারি, ছবিটিকে প্রধানত দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিস হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত ছবিকে আমরা সাধারণত এইভাবে দেখিতে পারি না। উহা দেখিবার সময়ে চিত্রগত বিষয়বস্তু আমাদের মনে এমন সব ভাব আনিয়া দেয় যাহা বাস্তবজীবনে অনুরূপ দৃশ্য দেখিলেও আমাদের মনের মধ্যে উদয় হয়।

তারপর মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত চিত্রও নানাধরণের হইতে পারে। উহা ঐতিহাসিক পৌরাণিক ধর্মবিষয়ক বা সাহিত্যিক কোন উপাখ্যানের ছবি হইতে পারে, লৌকিক জীবনের কোন ঘটনা হইতে পারে অর্থাৎ মিলন, বিরহ, শোক, বীরত্ব, ইত্যাদি সূচক কোন দৃশ্য হইতে পারে, কিংবা ঐতিহাসিক বা অখ্যাত ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিকৃতি হইতে পারে। এই প্রত্যেকটি ধরণের চিত্র দেখিবার সময়ে আমাদের মনের ভাব বিভিন্ন ধরণের হয়। উপাখ্যানের ছবিতে আমরা মূল উপাখ্যানের রস পাই বা খুঁজি। এক্ষেত্রে আমাদের মন ছবি দেখা আর গল্প পড়ার মধ্যে কোন তারতম্য করে না; তারতম্য হয় শুধু উপলব্ধির উপায়ের মধ্যে; একটির উপলব্ধি হয় ভাষার সহায়তায়, আর একটির হয় বাস্তবের প্রতিচ্ছবির সহায়তায়। লৌকিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিলে আমাদের মনে যে আবেগ হয় তাহাও প্রায় অবিকল লৌকিক জীবনের বাস্তব ঘটনার দ্বারা

উদ্রিক্ত আবেগেরই মত। আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি দেখিলে সেই ব্যক্তির চরিত্র, মানসিক ধর্ম, এই ধরণের ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মন কৌতূহলী হইয়া উঠে।

চিত্রপ্রসূত এই সকল মনোভাব এবং বাস্তবজীবনের ঘটনা ও দৃশ্যের দ্বারা প্রসূত মনোভাবের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বড় জোর সূক্ষ্মতা, তীব্রতা ও বিশুদ্ধতার কম বেশী হইতে পারে। কিন্তু চিত্রগত দৃশ্যকে আমরা অন্য চোখেও দেখিতে পারি, উহাদের দ্বারা অন্য বৃত্তিকেও তৃপ্ত করিতে পারি। চিত্রকলার যে সব বিষয়বস্তুর কথা এইমাত্র বলা হইল উহাদের প্রায় সবগুলিকেই আমরা উপাখ্যান হিসাবে দেখা ছাড়া শুধু চোখে দেখিবার সুসমঞ্জস এবং সুসম্বদ্ধ দৃশ্য হিসাবেও নিতে পারি। তখন উহার দ্বারা আমাদের মানসিক বৃত্তি—অর্থাৎ আবেগ ইত্যাদির—উত্তেজনা না হইয়া শুধু সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত হইলেও একই ছবিকে আমরা একাধিক উপায়ে উপভোগ করিতে পারি।

আবার এমন সব ছবিও আছে যাহা হইতে লৌকিক জীবনের আবেগ সংগ্রহ করা কঠিন, যদিও অসম্ভব না হইতে পারে। ফলের ছবি দেখিয়া অত্যন্ত নির্বোধ না হইলে আমাদের রসনা সরস হইয়া উঠে না, আমরা চিত্রকরের নিপুণতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু নৈসর্গিক দৃশ্যের চিত্র দেখিলে উহার লক্ষণ অনুযায়ী আমাদের মনে একদিকে যেমন শুদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতি হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই ভয়, আনন্দ বা বিস্ময়ের উদ্রেক হইতে পারে। এক্ষেত্রে মন মনুষ্যসম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, চিত্র হইতে গৃহীত রস বা মনোভাব চিত্রগত বিষয়ের মতই বহুবিচিত্র, বহুমুখীন, এমন কি সময়ে সময়ে বিপরীতধর্মী। এর কোন্‌টা চিত্রকরের আসল লক্ষ্য? সে কি আঁকিবে? বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাহার স্বাধীনতা কতটুকু? কি ধরণের মনোভাব উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে সংগত, আর কোন্‌টা অসংগত? তাহার সৃষ্টি বিচিত্রতায় বাস্তবের মতই ব্যাপক ও বিভ্রান্তিকর হইতে পারে কি, না উহার একটা গণ্ডী ও নিয়ম আছে?

৪

চিত্রের বিচিত্র ধর্ম

চিত্রসমালোচকের পক্ষে এইগুলি গুরুতর প্রশ্ন, কিন্তু তর্ক এবং গণ্ডগোলও পাকাইয়া উঠিয়াছে এই সব প্রশ্ন লইয়াই। বিতর্কটা সাধারণ চিত্রদ্রষ্টা এবং আর্ট-ক্রিটিকের মধ্যে নয়, আর্ট-ক্রিটিকে আর্ট-ক্রিটিকে। সাধারণ চিত্রদ্রষ্টা, চিত্রকরের বা চিত্রসমালোচকের বক্তব্য বা উদ্দেশ্যের কোন তোয়াক্কা রাখে না, তাহার মন যাহা চায় চিত্র হইতে সে উহাই বাছিয়া লয়, প্রেমের দৃশ্য দেখিলে কল্পনায় প্রেমাভিভূত হয়, বাৎসল্যের দৃশ্য দেখিলে বাৎসল্য অনুভব করে, গল্প পাইলে তাহাকেই ধরিয়া বসে। অপরপক্ষে বর্তমান যুগে চিত্রকর এবং সমালোচকও ধরিয়া লইয়াছেন, সাধারণের দ্বারা বোধ্য ও সমাদৃত হইবার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই, প্রচলিত জনমত ও আদর্শের মধ্যে তাঁহাদের কাজের অবলম্বন পাইবার উপায় নাই, সুতরাং তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য সমব্যবসায়ী-চিত্রকর বা চিত্রসমালোচক, বড়জোর চিত্রানুরাগী সমঝদার ব্যক্তি।

এই সকল "বিশেষজ্ঞ"দের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের একটা দিক পুরাতন ও নূতন থিওরীর সংঘাত, আর একটা দিক নব্য থিওরিস্টদের মধ্যে মতানৈক্য।

বিশেষজ্ঞদের গৃহযুদ্ধ

বহু প্রাচীনকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কাহারও মনে এই ধারণাটা জাগে নাই যে, চিত্রসৃষ্ট রসের ধর্ম এবং সাহিত্যসৃষ্ট রসের ধর্ম একই পর্যায়ের বস্তু নয়,—এ দুটি জিনিসের প্রকাশোপায় যতই বিভিন্ন হউক না কেন। সুতরাং চিত্রার্পিত উপাখ্যান বা ঘটনা, বা বস্তুর মধ্যেই সকল চিত্রের রস খুঁজিয়াছে। ইহাও কাহারও মনে জাগে নাই যে, চিত্র বা সাহিত্যের দ্বারা সৃষ্ট রস বাস্তবজীবনে অনুভূত মানসিক আবেগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা জিনিস। অবশ্য একটা ব্যাপার রসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই অনুভব করিয়াছে যে, আর্ট সৃষ্ট জগতের রস এবং বাস্তবজীবনের রস হুবহু এক ধরণের নয়—প্রথমটা দ্বিতীয়টার অপেক্ষা অনেক বেশী সংস্কৃত, ঘনীভূত, একত্রীকৃত ও স্পষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দুইটি জিনিসকে মনের দুইটি স্বতন্ত্র এলাকায় ফেলিয়া দিবার কল্পনা কাহারও মনে উঠে নাই; এই দুইটি জিনিসের উপভোগ যে বিভিন্ন ধরণের মানসিক বৃত্তির দ্বারা হয় একথাও কেহ বলে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রাচীন আর্ট-ক্রিটিকদের কথাই ধরা যাক্। এ বিষয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণকার একেবারে স্পষ্ট কথা বলিয়া খালাস, "শৃঙ্গারহাসকরুণবীররৌদ্র ভয়ানকাঃ বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব চিত্ররসাঃ স্মৃতা।" এখানে চিত্র ও সাহিত্যের রসের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। চিত্ররস সম্বন্ধে এই পুরাণের দুই একটা ব্যাখ্যা উক্ত পুরাণ হইতেই দিতেছি। "যৎ কান্তিলাবণ্যলেখামাধুর্যসুন্দরম্ বিদগ্ধবেশাভরণং শৃঙ্গারে তু রসে ভবেৎ" (দৃষ্টান্ত—অজন্তার প্রসাধনচিত্র, ১৭নং গুহা—গ্রিফিথ, প্রথম খণ্ড, ৫৫নং চিত্র)। "যৎ কুব্জবামণপ্রায়মীষদ্‌বিকটদর্শনম বৃথা চ হস্তং সংকোচ্য তৎ স্যাদ্‌ধাস্যকরং রসে।" (এই ধরণের ছবিও অজন্তায় আছে।) "যদ্‌যৎ সৌম্যাকৃতি ধ্যান ধারণাসন বন্ধনম্ তপস্বিজনভূয়িষ্ঠং তত্তু শান্তে রসে ভবেৎ।" (অজন্তায় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির চিত্র, ১নং ও ১৯নং গুহা, গ্রিফিথ, ২য় খণ্ড, ১৫১নং চিত্র ও ইয়াজদানি ১ম খণ্ড ২৪নং চিত্র)। ইহার পর বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে কোথায় কোন্ রসের চিত্র আঁকা সংগত বা অসংগত তাহাও বলা হইয়াছে—যেমন, "শৃঙ্গারহাস্যশান্তাখ্যা লেখনীয়া গৃহেষু তে।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ১-১৭ শ্লোক)।

সংস্কৃত সাহিত্যেও যেখানে যেখানে চিত্রের উল্লেখ আছে সেখানেও কোথাও ইঙ্গিতমাত্রও নাই যে, চিত্রের অনুভূতি বাস্তবের অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে চিত্রদর্শন উপলক্ষ্যে রাম সীতার কথাবার্তা উহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

সমসাময়িক কয়েকজন সমালোচক এতদূর না গেলেও মোটের উপর এই ধরণের মতেরই পক্ষপাতী। ইঁহাদের মধ্যে আই. এ. রিচার্ডস্ ও হাওয়ার্ড হ্যানের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাইতে পারে, একথা ইঁহারা জানেন না, একটা বিশিষ্ট 'এস্‌থেটিক' বোধের অস্তিত্বও ইঁহারা স্বীকার করিতে চান না। মোটের উপর ইঁহাদের মতামত অনেকটা প্রাচীনপন্থী।

ইঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন ক্লাইভ বেল, রজার ফ্রাই প্রমুখ। ইঁহারা চিত্রকলার সুলতান মহম্মদ গজনভী—পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইঁহাদের মূলকথা দুইটি—(১) চিত্ররস

চিত্রাঙ্কিত বিষয়বস্তু সাপেক্ষ নয়, (২) চিত্ররসের উপলব্ধি আমাদের হয় বিশিষ্ট একটা বোধশক্তির দ্বারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ 'এস্থেটিক' বোধ বা আবেগের সহায়তায়।[৫] দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্লাইভ বেলের হালের রচনা হইতে একটা জায়গা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন,—"চিত্রকলা (পেণ্টিং) মনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবান্বিত করে। চিত্রাখ্যান (ইলাস্ট্রেশন) চায় বাস্তবের প্রতিচ্ছবির দ্বারা উদ্রিক্ত ভাবসংশ্লেষ ও ধারণার সহায়তায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতে, তৃপ্ত করিতে, মার্জিত করিতে, আমোদ দিতে, ভয় দেখাইতে বা কষ্ট দিতে: আমার মতে এই কাজ ভাষার সাহায্যে আরও সুসম্পন্ন হইতে পারে। ("নিউ স্টেটস্ম্যান অ্যাণ্ড নেশ্যন" পত্র, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪২ সন, ২৩৭ পৃ.)

এই যুক্তির তাৎপর্য বড়ই গুরুতর। সুতরাং উহাকে ভাল করিয়া যাচাই করা দরকার।

নূতন মত অগ্রাহ্য

প্রথমত, ছবিকে ক্লাইভ বেল দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেছেন—একটি আসল চিত্রকলা (পেণ্টিং) যাহার উদ্দেশ্য শুধু "দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য" (ভিজিব্‌ল্ হার্মনি) সৃষ্টি করা, অপরটি "চিত্রাখ্যান" (ইলাস্ট্রেশ্যন)। দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য এবং আখ্যান বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা ক্লাইভ বেল পূর্বোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার করিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সহিত একমত অন্য সমালোচকদের রচনা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, চিত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য অর্থরেখা ও বর্ণের সাহায্যে দৃষ্ট 'ডিজাইন' বা 'কম্পোজিশ্যন' আর আখ্যানের অর্থ ছবিতে গল্প ঘটনা, প্রতিকৃতি বা বাস্তবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু আছে সবই। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিকেল এঞ্জেলোর 'পুরুষ ও নারী সৃষ্টি'কে কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? রাফায়েলের 'সিস্টাইন ম্যাডোনা'কে, রেমব্রাণ্টের 'চিত্রকর ও তাহার পত্নী'কে, ভেল্যাস্কুয়েথের 'ব্রেডার আত্মসমর্পণ'কে কোন পর্যায়ে ফেলিব? অজন্তার জাতকের চিত্র, ওস্তাদ মন্সুরের অঙ্কিত জাহাঙ্গীর ও কৃষ্ণসারের চিত্র, ফুকাইচির অঙ্কিত "উপদেশ ও শিক্ষা" চিত্রকেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? এমনকি ইম্প্রেশ্যনিস্ট স্কুলের 'ল্য দেজোনের স্যুর লর্ব', 'ল্য বঁ বক', 'বাকে নর্তকী' প্রভৃতি চিত্রকেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? এই কয়টি বিখ্যাত ছবির উল্লেখ শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে করিলাম। চিত্রকলার নিদর্শন অল্পই আছে যাহার সম্বন্ধে এই প্রশ্নটা উঠিবে না। ক্লাইভ বেলও পূর্বোল্লিখিত চিত্রগুলিকে 'চিত্রাখ্যানে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসল চিত্রকলার পর্যায় হইতে বাহির করিয়া দিতে সাহস পাইবেন না, অথচ তাঁহার সংজ্ঞানুযায়ী এগুলির কোনটাই চিত্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্রকলার ক্লাইভ বেল-কৃত শ্রেণি-বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নয়। চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্রকলার মধ্যে অবান্তর ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করাও কখনও সম্ভব নয়।

ক্লাইভ বেলের দ্বিতীয় কথা—প্রকৃতচিত্র আমাদের মনে সৌন্দর্যানুভূতির উদ্রেক করে, 'ইলাস্ট্রেশ্যন' শিক্ষা দেয়, আমোদিত করে, ভয় বা কষ্টের উদ্রেক করে, চিত্তসংস্কার করে। চিত্রের ধর্মনির্ধারণে এই

---

৫ রিচার্ডস, হ্যানে, বেল, ফ্রাই প্রমুখ সমালোচকদের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। রিচার্ডস-এর "প্রিন্সিপল্স্ অফ্ লিটারারী ক্রিটিসিজম্", হ্যানের "রজার ফ্রাই অ্যাণ্ড আদার এসেজ", ক্লাইভ বেলের "আর্ট" ও রজার ফ্রাইএর "ভিশ্যন অ্যাণ্ড ডিজাইন" এবং "ট্রান্স্ফর্মেশ্যন" এই কয়েকটি বই পড়িলেই এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া যাইতে পারে।

যুক্তিও ভিত্তিহীন। প্রথম আপত্তি, সৌন্দর্যানুভূতি আমাদের শুধু চিত্র হইতেই হয় না, সাহিত্য হইতে হয়, ভাস্কর্য হইতে হয়, স্থাপত্য হইতে হয়, সংগীত হইতে হয়, তাহার উপর বাস্তব জগত হইতেও হয়। সৌন্দর্যানুভূতি একমাত্র কলাজগতেই আবদ্ধ নয়। এখানে হয়ত বলা হইবে, ক্লাইভ বেল শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য সুন্দর বস্তু চিত্রকলায় যেমন আছে তেমনই ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যেও আছে, বাস্তবজীবনে ত আছেই। বাস্তব নারীদেহ আমরা যেমন লৌকিক চক্ষে দেখিতে পারি, তেমনই নিছক্ সুন্দর বস্তু হিসাবেও দেখিতে পারি। সুতরাং সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে চিত্রকলার একটা বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি, একই চিত্র আমাদের মনে সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক করিতে পারে, সেই সঙ্গে লৌকিক আবেগের উদ্রেক করিতে পারে, আবার নীতিমূলক চিন্তাও জাগাইতে পারে। ধরুন মিকেল এঞ্জেলোর "শেষবিচার"। উহাতে সৌন্দর্যসৃষ্টি যতটুকু আছে, ভয়বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ উহার অপেক্ষা কম নাই, মানুষের শেষগতি স্মরণ করাইয়া তাহাকে ধর্মানুবর্তী করিবার উদ্দেশ্যও নয়। কিংবা ধরুন ফুকাইচি অঙ্কিত পূর্বোল্লিখিত চিত্রমালার তৃতীয় চিত্র। ইহাতে হানবংশীয় সম্রাট ইয়ুয়ানের উপপত্নী ফেং-এর বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি ভালুক তাঁহার (প্রকৃত) স্বামীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, ফেং নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া স্বামীকে কি করিয়া বাঁচাইলেন তাহাই দেখান হইয়াছে। এই চিত্রটির মূল উদ্দেশ্যই ত নীতিমূলক। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

আবার এমন কোন ছবি নাই যাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যবর্জিত। ব্যঙ্গচিত্র একান্তভাবে উপদেশ-মূলক, কিন্তু এমন কোন ব্যঙ্গচিত্র আছে কি যাহাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য নাই? যে ব্যঙ্গচিত্র ডিজাইন হিসাবে সুন্দর নয়, তাহাকে কেহ সার্থক ব্যঙ্গচিত্র বলেই না। সুতরাং একদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যকে ও অন্যদিকে আবেগ ও উপদেশকে কষ্টিপাথর হিসাবে ধরিয়া চিত্রকলার ধর্ম নির্ণয় সম্ভব নয়।

ক্লাইভ্ বেলের তৃতীয় কথা—যাহা ভাষায় প্রকাশ্য তাহা চিত্রকলার ন্যায্য ও নিজস্ব অবলম্বন হইতে পারে না। এই কথাও মানা যায় না। ভাষাশ্রয়ী আর্ট ও চিত্রকলা কোন কোন ক্ষেত্রে যে সমানাধিকার যুক্ত তাহা আগেই বলা হইয়াছে। লেওনার্দোর মন এবিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় ছিল। তিনি বলিতেছেন,

"কবি! তুমি আখ্যান বর্ণন কর লেখনীর সহায়তায়, চিত্রকর করে তাহার তুলিকার সাহায্যে এবং এমনইভাবে সে তাহা করে যে উহা আরও সহজে আনন্দদান করে এবং বুঝিতে কম শ্রম হয়। তুমি যদি চিত্রকে 'মূক কাব্য' বল, চিত্রকর বলিতে পারে কবির কাব্যকলা 'অন্ধচিত্র'। বিবেচনা কর কোনটা অধিকতর দুর্ভাগ্য—দৃষ্টিহীনতা অথবা বাক্যহীনতা। কবির এবং চিত্রকরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা সমবিস্তীর্ণ, কিন্তু কবির সৃষ্টি মানবজাতিকে চিত্রের সমতুল্য তৃপ্তি দিতে অক্ষম।" (লেওনার্দোর নোটবুক, পূর্বোল্লিখিত সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃ.)।

আর একটি নজীর দেওয়া যাক। একজন চীনা চিত্রকর তাঁহার চিত্রের জন্য নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছেন—

"নিসর্গে এমন কিছু নাই যাহা উন্নতস্থান হইতে অধঃপতিত না হয়…সূর্য মধ্যাহ্নের পর নিম্নগামী হয়; চন্দ্র পূর্ণ হইবার পর ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে। গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠা ধূলিকণা দিয়া পর্বত গড়ার মতই কঠিন; কিন্তু দুর্দৈবগ্রস্ত হওয়া সংকুচিত ধনুর পুনঃপ্রসারণের মতই সহজ।" (ওয়েলী প্রণীত পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, ৫১ পৃ.)

এই বিষয়টা একান্তভাবে ভাষার প্রকাশের বিষয়—উহাকে চিত্রে কি করিয়া দেখান যাইতে পারে ? চিত্রকর কিন্তু নির্ভয়। তিনি একটি খাড়া পাহাড় আঁকিলেন, তার ডানদিকে বসাইলেন একটি কাক—সূর্যের প্রতীক; বাঁদিকে বসাইলেন একটি খরগোস—চন্দ্রের প্রতীক; পাহাড়টি মহাশূন্য পাখী, অদ্ভুত জন্তু, গাছ ইত্যাদিতে পূর্ণ; একটা মানুষ হাঁটু গাড়িয়া ধনু টানিয়া তীর নিক্ষেপে উদ্যত। এই ছবিটি আমি দেখি নাই, সুতরাং ছবি হিসাবে উহা সুন্দর কি অসুন্দর বলিতে পারিলাম না, না হইবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু আসল বক্তব্য এই, চিত্রকর এইস্থলে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত ভাষাশ্রয়ী আর্টের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়াছেন।

ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও বর্ণরেখাশ্রয়ী চিত্রকলা পরস্পরের অস্পর্শ্য, চিত্রকলার ইতিহাস হইতে উহা কোনক্রমেই প্রমাণ হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্লাইভ বেল চিত্রকলার যে সংজ্ঞা দিতে গিয়াছেন, উহা না লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরদের মতামত ও কর্মপদ্ধতি, না চিত্রকলার ইতিহাস, না বিচারবিশ্লেষণ—কাহারও দ্বারাই সমর্থিত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা একটা অনুদার গোঁড়ামি, শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত গোঁড়ামিকে সাধারণের উপর চাপাইবার চেষ্টা। কেহ যদি ভাষার মুখাপেক্ষী বলিয়া গানকে বা অপেরাকে সংগীতের পর্যায় হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে যে সংকীর্ণতা দেখান হইবে, ক্লাইভ বেল প্রমুখ সমালোচকদের পক্ষ হইতে চিত্রকলাকে বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও সেই ধরণের সংকীর্ণতা।

এই সংকীর্ণতা এড়াইয়া চিত্রকলার ধর্ম নির্ণয় করিতে হইবে। এমন কোন থিওরী আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না যাহার ফলে আবহমানকাল হইতে যাহা চিত্র বা চিত্রকলার লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে উহাকে চিত্রকলা বা চিত্র হইতে নির্বাসিত করিতে হয়। এই সংকীর্ণ পথ ধরিলে চিত্রকলার থিওরী আর চিত্রসাপেক্ষ থাকিবে না, চিত্র থিওরী-সাপেক্ষ হইয়া উঠিবে এবং অবশেষে এই সংজ্ঞাহীন সংজ্ঞায় আসিয়া পৌছিতে হইবে যে, চিত্রকলা উহাই যাহাকে চিত্র-সমালোচকেরা চিত্র বলেন। বর্তমানকালে এই তামাশা যে না চলিতেছে তাহা নয়, কিন্তু উহাকে তামাশা ভিন্ন আর কিছু জ্ঞান করিবার কারণ দেখি না।

চিত্রকলা মিশ্র আর্ট

এই পথ ছাড়িয়া চিত্রকলার ধর্মান্বেষণ 'ইন্ডাক্টিভ' বিশ্লেষণের দ্বারা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা দুইটি জিনিস দেখিতে পাইব। প্রথমটি এই যে, চিত্রকলার ধারা সব যুগে এক ছিল না, সব দেশেও এক নয়, দেশে দেশে কালে কালে পরিবর্তনশীল। চিত্রকলার উদ্দেশ্য বা প্রেরণাও সব যুগে এক ছিল না। এই যে আমরা এখন চিত্রকে ব্যক্তিগত সৌন্দর্যভোগের উপকরণ এবং গৃহসজ্জা বলিয়া মনে করি উহা তিন চার শ বছরের বেশী পুরাতন ধারা নয়। যে নৈসর্গিক চিত্রকে এখন সকলেই চিত্রকলার একটা আবর্জনীয় অংশ বলিয়াই গণ্য করেন, উহাও ইউরোপীয় চিত্রকলায় সপ্তদশ শতাব্দীর আগে চিত্রের আখ্যানাংশ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে নাই, এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে।

দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদের চোখে পড়ে তাহা এই চিত্রের রূপ যেমন বিচিত্র, রসও তেমনই

বহুধা। গান একটা 'কম্পোজিট' বা মিশ্র আর্ট, একথা সকলেই জানেন ; কারণ গানে কবিতা ও স্বর দুইই আছে, দুটিই অবর্জনীয়, অথচ দুইটির পরস্পর সম্পর্ক কি তাহা এ পর্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, এমন কি গানে কাব্য বা কথার স্থান কতটুকু, সুরেরই বা স্থান কতটুকু, উহা লইয়া ঝগড়া মিটে নাই, মিটিবারও নয়। তবু গান উপভোগে এই মিশ্রতার জন্য আমদের কোন বাধা জন্মে না। তেমনই চিত্রকেও মিশ্র আর্ট বলিয়াই মানিতে হইবে—মানিতে হইবে উহাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের যেমন স্থান আছে, আখ্যান বা বর্ণনা এমন কি নীতিপ্রচারের পর্যন্ত তেমনই স্থান আছে ; উহার দ্বারা সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি যেমন ন্যায্য, আবেগের তৃপ্তিও তেমনই ন্যায্য। শুধু তাই নয়, উহাতে আখ্যান বহু প্রকারের হইতে পারে ; বর্ণনা বহু প্রকারের হইতে পারে, নীতিপ্রচার বহু প্রকারের হইতে পারে ; উহার সৌন্দর্য বিশ্বের সৌন্দর্যের মতই বহু বিচিত্র হইতে পারে ; সুতরাং চিত্রোদ্ভূত মানসিক প্রতিক্রিয়াও বহু প্রকারের হইতে পারে।

এত বৈচিত্র্যের উপরেও আর একটা বিচিত্রতার সম্ভাবনা মানিতে হইবে, তাহা এই—একটি চিত্রেই একাধিক রস ও একাধিক লক্ষণ মিলিতে পারে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সেটি অতি পরিচিত। লেওনার্দোর মোনা লিজা।

ভাজারি উহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা পূর্বোদ্ধৃত একটি বিবরণ হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উহা রিনেসেন্সের যুগের ফ্লোরেণ্টাইন চিত্রকরের চোখ। তাঁহার দৃষ্টির পিছনে রহিয়াছে, দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎকে একান্তভাবে, মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিবার আশঙ্কা। এই উপলব্ধি শুধু চোখের দ্বারা হয় না, উহার জন্য স্পর্শেরও প্রয়োজন। তাই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেণ্টাইন চিত্র আমাদের স্পর্শানুভূতিকে এতটা সজাগ করিয়া তুলে। ফ্লোরেণ্টাইন চিত্রকলার এই ধর্ম মোনা লিজায় পূর্ণভাবে বর্তমান। ভাজারি মোনা লিজার যে-সব অবয়বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিয়া শুধু চুলের দিকে চাহিলেই এই জিনিসটা অনুভব করা যায়। মনে হয় ঐ উন্মুক্ত চিক্কণ কেশভার ত্বকে ঠেকিয়া সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলিতেছে। এইজন্যই ইটালিয়ান চিত্রকলার বিচক্ষণ সমালোচক বেরেনজন বলিয়াছেন, "মোনা লিজাতে স্পর্শরস যেমন তীব্র ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, এক ভেল্যাসকুয়েথ ভিন্ন অন্যত্র, কিংবা রেমব্রাণ্টের ও হ্যগার শ্রেষ্ঠ চিত্র ভিন্ন অন্যত্র, তাহার তুলনা খোঁজা বৃথা।" ("দি ফ্লোরেণ্টাইন পেণ্টার্স অফ্ দি রেনেসন্স", তৃতীয় সংস্করণ, ৬৫।৬৬ পৃ.)

কিন্তু ওয়াল্টার পেটার কি চক্ষে মোনা লিজাকে দেখিয়াছেন এখন তাহা স্মরণ করুন। পেটারের "রিনেসেন্সে" লেওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রবন্ধের সেই বিখ্যাত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের অবমাননা করিব না, অনুবাদ করিতে গিয়া পেটারের লাঞ্ছনা করিব না, শুধু এইটুকু বলিব, উহা ভাজারির অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনুভূতি, কবির অনুভূতি, রোমাণ্টিক কবির অনুভূতি। এই অনুভূতিকে বেরেনজন সাহিত্যিক অনুভূতি বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, একটু ব্যঙ্গও করিয়াছেন।[৬] তবু মানিতে হইবে, ওয়াল্টার পেটারের

৬ হ্যানে—পূর্বোদ্ধৃত পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় 'দি ট্রাজেডি অফ্ মি. বেরেনজনস্ থিওরী অফ্ আর্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে একটি স্থান দ্রষ্টব্য ; ও বেরেনজন প্রণীত "থ্রী এসেজ ইন্ মেথড" পুস্তকে ৯৫ পৃ. দ্রষ্টব্য।

অনুভূতিও সংগত, তাঁহার ব্যাখ্যাও একদিক হইতে ঠিক। মোনা লিজা চিত্রে মোনা লিজার প্রকৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু পিছনের শ্যামধূসর প্রস্তরমালা ও বিসর্পিত জলপ্রবাহের কথা ধরিলেও পেটারের মনে যে ভাব জাগিয়াছে উহার যাথার্থ্য অনুভব করা যায়।

চিত্রের যুগ্মধর্ম

চিত্রকলার রূপ ও রস যে বিচিত্র (অন্তত একাধিক) তাহা মানিতেই হইবে।[৭] তবে মোটের উপর এই বহু বিচিত্র রূপ ও রসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে রূপের কথাই ধরা যাক্।

আমাদের আবেগ ও রসানুভূতি বর্জন করিয়া চিত্রকে শুধু যথাযথভাবে দেখিলে চিত্রকলায় আমরা দুইটা জিনিস পাই—(ক) **বিশুদ্ধ** দৃশ্য ও (খ) **আখ্যানমূলক** দৃশ্য। মনে রাখিতে হইবে, চিত্রমাত্রেই দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু, সুতরাং উহাদিগকে শুধু "আখ্যান" ও "দৃশ্য" এই দুই ভাগে ভাগ করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। কিন্তু সব চিত্রই দৃষ্টিগ্রাহ্য হইলেও, একটু প্রণিধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই, চিত্রার্পিত সব দৃশ্য এক পর্যায়ের নয়—উহাদিগকে পরিষ্কার দুইটি পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলি শুধু চোখে দেখিবার জিনিস, যেমন কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা গৃহের অভ্যন্তর, বা ফলফুলের ছবি, উহাদের মধ্যে চোখে দেখিবার জিনিস ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু কতকগুলি ছবিতে দৃশ্যের অতিরিক্ত আরও কিছু থাকে, চিত্রার্পিত দ্রষ্টব্য বস্তুর সহায়তায় উহারা আমাদিগকে কিছু বলে। এই বক্তব্য কখনও বা হয় কোন গল্প, কখনও বা হয় কোন একটা ঘটনা, আবার ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও হইতে পারে। চিত্রের ভিতর দিয়া চিত্রকর যাহা বলিতে চায় এবং বলে, তাহা কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই বিষয়ে চিত্রকরের সাহিত্যিকের মতই অবাধ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বক্তব্য বিষয় যতই বিচিত্র হউক না কেন, সবগুলিই "বক্তব্য", এই কারণে এই জাতীয় চিত্র একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পর্যায়ে পড়ে, উহাদিগকে বিশুদ্ধ দৃশ্য বলা যায় না। এই শ্রেণীর চিত্রে দৃশ্য ভাষার কাজ করে, অর্থাৎ ভাষাতে যেমন ধ্বনির অতিরিক্ত কোন না কোন অর্থ থাকে, তেমনই এই সকল চিত্রে দৃশ্যবস্তুতে দৃশ্যাতিরিক্ত কোন না কোন অর্থ থাকে। বিশুদ্ধ দৃশ্যমূলক চিত্রে এই অর্থ থাকে না, উহা শুধু দেখিবার জিনিস।

এবারে চিত্রদ্রষ্টার মানসিক অনুভূতির কথা ধরা যাক্। এখানেও আমরা দুইটি পর্যায়ে পাই—(অ) শুধু দ্রষ্টব্য বিষয়ের উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধি হইতে জাত রসোপভোগ; (আ) দ্রষ্টব্য বিষয় হইতে কারুণ্য, হাস্য, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি মানস আবেগের এবং ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি মানসিক ধারণার উপকরণ সঞ্চয়।

---

৭ না মানিলে কি কুযুক্তি ব্যবহার করিতে হয় উহার একটি কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত স্বয়ং বেরেনজন দিয়াছেন। তিনি রাফায়েল এবং পেরুজিনোর অঙ্কিত স্ত্রীমূর্তির প্রতি অনুরাগ নানা জায়গায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই অতিকমনীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণা সুন্দরীদের চিত্র তাঁহার মত স্পর্শ-থিওরী প্রচারকের কাছে প্রীতিজনক হইতে পারে উহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু বেরেনজন বলেন, উহাতে অসংগতি কিছুই নাই, এই তৃপ্তি খুবই ন্যায্য, কিন্তু উহার সহিত আর্টের কোন যোগ নাই, এই সকল স্ত্রীমূর্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, স্পর্শানুভূতিকে স্পর্শ করে না। (হ্যানে, পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, ৬৫ পৃ.)। চিত্রে আমাদের হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তিও হয়, সৌন্দর্যানুভূতির পরিতৃপ্তিও হয় এই কথা মানিলে চিত্রকলার একটি থিওরী প্রচার করিবার সার্থকতা থাকে না।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার (অ) পর্যায়ের উপলব্ধি চিত্রের ডিজাইনের উপলব্ধি নয়, চিত্রার্পিত বিশিষ্ট বস্তুটির বা বস্তুসমষ্টির উপলব্ধি। যেমন ধরুন, কোন চিত্রকর একটি কলসী আঁকিলেন। ডিজাইন হিসাবে দেখিলে আমরা উহাকে শুধু সুসমঞ্জস বৃত্তাংশ বা গোলকাংশ হিসাবে দেখি, কিন্তু চিত্র হিসাবে দেখি কলসী হিসাবে—আমরা উহার আকৃতি, স্থূলত্ব, ধাতব ধর্ম, এমন কি ভার পর্যন্ত অনুভব করি; 'ডিজাইন' এই অনুভূতিকে সহায়তা করে মাত্র। চিত্র যত উচ্চশ্রেণীর হয় চিত্রলিখিত বস্তুর অনুভূতিও আমাদের ততই তীব্র হয়, ততই আমাদের মনকে আলোড়িত করে। দৃশ্যবস্তুকে এই ভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে সাধারণ মানস আবেগ বা ধারণার কোন স্থান নাই, দৃশ্যবস্তু সাক্ষাৎভাবে আমাদের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। এই অনুভূতির যে একটা নিজস্ব রস আছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বাস্তবজগতের যে কোন জিনিস দেখিবার সময়েই অনুভব করিয়াছেন।

এই ধরণের অনুভূতির খুব ভাল দৃষ্টান্ত আমরা পাই রেমব্রাণ্টের একটি চিত্রে। চিত্রটির বিষয় অতি তুচ্ছ—একটি বালক একটি ডেস্কের পিছনে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এই চিত্রটি দেখিবার সময়ে বক্তব্য বিষয়ের কথা আমাদের মনে উদয় হয়ই না—আমরা শুধু চিত্রার্পিত বস্তুগুলির বস্তুসত্তা অনুভব করি—কাঠকে কাঠের পরাকাষ্ঠা হিসাবে দেখি, অঙ্গুষ্ঠের চাপে বালকের গাল যেখানটাতে টোল খাইয়াছে, সেই জায়গাটাতে জীবন্ত ত্বক ও পেশীর উপর জড়শক্তির ক্রিয়া আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। ভেরমিয়ারের "সংগীত-শিক্ষা"ও এই ধরণের চিত্রের আর একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ছবিটি দেখিবার সময়ে উপাখ্যানভাগের কথা আমাদের মনে উঠে না, আমরা শুধু দেখি গৃহাভ্যন্তরের আয়তন, আলো-ছায়ার সমাবেশ, ভিত্তি দেয়াল ও ছাদের পরস্পর সম্পর্ক, ও আসবাবপত্র এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ। তেমনই মিকেল এঞ্জেলোর চিত্রে আমরা বিশেষ করিয়া অনুভব করি, মানবদেহের বস্তুসত্তা, টারবর্খের চিত্রে অনুভব করি রেশমী কাপড়ের বিশিষ্ট ধর্ম, বেরেনজন এই শ্রেণীর চিত্রের ধর্ম বুঝাইতে গিয়া এই কয়েকটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন—"মেটেরিয়্যাল্ সিগ্‌নিফিক্যান্স্ অফ্ ভিজিবল্ থিংজ।" চিত্রদ্রষ্টার মানসিক অনুভূতির যে দিকটাকে (অ) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, উহার উপজীব্যও কি তাহা নির্দেশ করিবার জন্য আমিও এই কথাগুলিই ব্যবহার করিব। আমি বলিব, এই উপলব্ধি 'মেটেরিয়্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজে'র উপলব্ধি।

(আ) পর্যায়ের উপলব্ধি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কারণ উহা অনেকাংশে বাস্তব জগতের লৌকিক উপলব্ধির অনুরূপ। বেরেনজনের কথা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি (আ) পর্যায়ের উপলব্ধির প্রধান অবলম্বন—"ইমোশ্যনাল অ্যাণ্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজ।"

তাহা হইলে আমরা চিত্ররূপের দুটি পর্যায় পাইতেছি—উপরোক্ত (ক) এবং (খ); চিত্রোপলব্ধিরও দুটি পর্যায় পাইতেছি—উপরোক্ত (অ) এবং (আ)। এখন বলা প্রয়োজন, কোন বিশেষ চিত্ররূপ কোন বিশেষ চিত্রোপলব্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট নয়—অর্থাৎ (ক) পর্যায়ের রূপ যে (অ) পর্যায়ের উপলব্ধির উদ্রেক করিবে বা (খ) যে (আ)-রই করিবে তাহার কোন অর্থ নাই। একই পর্যায়ের চিত্ররূপ দুই পর্যায়ের চিত্রোপলব্ধিরই উদ্রেক করিতে পারে বা যে কোনটারই উদ্রেক করিতে পারে। ইহার অর্থ আরও একটু

বিশদ করা প্রয়োজন। ধরুন, আমরা একটা বিশুদ্ধ নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি দেখিতেছি। চিত্ররূপের দিক হইতে উহা যে বিশুদ্ধ দৃশ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু চিত্রোপলব্ধির দিক হইতে এই ছবি দেখিয়া চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা আমরা যেমন অনুভব করিতে পারি, তেমনই শান্তি, বিস্ময়, বা ভয়ও অনুভব করিতে পারি। (ক), (খ), (অ), (আ)-র মধ্যে সন্ধিবিচ্ছেদ কিভাবে হইবে তাহা নির্ভর করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট চিত্র ও বিশিষ্ট দ্রষ্টার উপর। কিন্তু মোটের উপর ইহাই দেখা যায়, প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্ব একটা ঝোঁক আছে বর্ণনির্বাচন ও বর্ণসংযোগের বেলাতে যেমন প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্বতা পরিষ্কার বোঝা যায়, তেমনই চিত্ররূপ এবং চিত্রোপলব্ধির বেলাতেও আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, একজন চিত্রকরের একপ্রকার চিত্ররূপ ও চিত্রোপলব্ধির প্রতি ঝোঁক, অন্যের অন্য প্রকারের প্রতি ঝোঁক। প্রত্যেক চিত্রকরই একটা বিশেষ চিত্ররূপের সঙ্গে বিশেষ চিত্রোপলব্ধির সমন্বয় করিয়া নিজস্ব একটা স্টাইল সৃষ্টি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাফায়েলে আমরা উপরোক্ত দুই প্রকারের চিত্ররূপ ও চিত্রানুভূতি প্রায় সমান সমান পাই। কিন্তু সেজানের মধ্যে পাই (ক) ও (অ)-এর সংযোগ। আবার প্রি-রাফায়লাইটদের মধ্যে পাই প্রায় বিশুদ্ধ (খ) ও (আ)-র সংযোগ।

আর একটা কথা বলিলেই, এই নীরস বিশ্লেষণ সমাপ্ত হয়। কথাটা এই—প্রত্যেক শ্রেণীর চিত্রেই চিত্রকর দুই প্রকার সৃষ্টির প্রয়াস করিতে পারেন। প্রথমত তিনি নিজেকে বাস্তব জগতের দৃশ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন, এবং বাস্তব জগতের দৃশ্যকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিবার ফলে বিশেষ অর্থপূর্ণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন। কিংবা তিনি পারেন, কল্পনার সাহায্যে বাস্তব জগতের উপাদানকে এইভাবে রূপান্তরিত করিতে যাহাতে আমাদের মনে সম্পূর্ণ অসাধারণ ও অলৌকিক কতকগুলি দৃশ্যের বা সত্তার ধারণা জন্মে। রিয়্যালিস্টিক উপন্যাস ও রূপকথার মধ্যে যে তফাত এই দুই ধরণের চিত্রের মধ্যেও সেই তফাত। সাহিত্যে যেমন দুইই ন্যায্য, চিত্রেও তেমনই দুইই ন্যায্য।

৫

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রধর্ম

এতক্ষণে প্রসঙ্গের অবতারণা হইল। সকলেই উপক্রমণিকার ভারে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন নিশ্চয়। এই বাগ্‌বিস্তারের দুইটি কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিব, হয়ত পাঠক সংগত মনে করিবেন। প্রথম কথা এই, গগনেন্দ্রনাথকে উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর বলিয়াই আমি জ্ঞান করি, সুতরাং আমার বিশ্বাস তাহার সম্বন্ধে আলোচনাও শ্রদ্ধা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক হওয়া উচিত। চিত্রকলা ও চিত্রকর সম্বন্ধে গোটাকতক ছেঁদো কথা বলিয়া দায়মুক্ত হওয়া অতি সহজ কাজ, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথকে লইয়া এই প্রকার আলোচনা করিলে তাহার অবমাননা হইত।

দ্বিতীয় কৈফিয়ত এই, গগনেন্দ্রনাথের অভিনবত্ব, বহুমুখীনতা ও নিজস্বতা এত বেশী যে, তাহার চিত্রের আলোচনা পরিচিত সূত্র বা 'ফরমুলা'র সাহায্যে করা সম্ভব নয়। নব্যবঙ্গীয় ও 'কিউবিষ্ট'—এই দুইটি 'ফরমুলা' দিয়া এতদিন পর্যন্ত তাহার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রতি

যৎপরোনাস্তি অন্যায় করা হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন একটা উপমানের সঙ্গে উপমিত করিয়া তাঁহার চিত্রধর্ম নির্ধারণ করিতে গেলে, সম্ভবত—দুধ বকের মত, বক কাস্তের মত, সুতরাং দুধ কাস্তের মত—এই ন্যায় অনুযায়ী সত্য অপেক্ষা অসত্যেরই প্রচার করা হইত। তাই তাঁহার চিত্রগুলিকে বিশেষ স্মরণে রাখিয়া চিত্রকলার সাধারণ ধর্ম ও লক্ষণের পর্যায় ভেদ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আমার ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে, সুতরাং আশা করি পাঠকের কাছেও আমার বক্তব্য বেশী পরিষ্কার হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, গগনেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' চিত্রকর এই 'ফরমুলা' ব্যবহার করিয়া আমি সহজেই ত্রাণ পাইতে পারিতাম, এবং কথাটা অসংগতও হইত না। কিন্তু এও ঠিক, পাঠক আমার অর্থ বুঝিতেন না। 'রোমান্টিক' কথাটা সাহিত্যের বেলাতে একভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বিশিষ্ট একটা অর্থে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্যলাক্রোয়া গেরিকো প্রভৃতি চিত্রকরের প্রসঙ্গেই এই কথাটি চিত্রকলার আলোচনায় প্রধানত ব্যবহৃত হয়। দ্যলাক্রোয়া ও গেরিকোর চিত্রধর্ম ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনুভূতি অন্যপ্রকার। রূপকথার লেখক হ্যানস এণ্ডারসন যে অর্থে রোমান্টিক, গগনেন্দ্রনাথকে বরঞ্চ অনেকটা সে অর্থে রোমান্টিক বলা যাইতে পারে। হ্যানস এণ্ডারসন কি অর্থে রোমান্টিক তাহার ব্যাখ্যা না করিলে, এই মন্তব্যেরও কোন সার্থকতা থাকে না। সুতরাং যাইতে হইবে গোড়াকার কথায়, একটা পরিচিত ও প্রচলিত সূত্রের অনুবৃত্তি করিলে চলিবে না।

পর্যায় নির্ণয়

প্রথমে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের একটা হিসাব লওয়া যাক্। বিষয়বস্তু বা চিত্ররূপ অনুযায়ী ভাগ করিলে তাঁহার চিত্র এই কয়েকটা শ্রেণীতে পড়ে—(১) ব্যঙ্গচিত্র, (২) প্রতিকৃতি, (৩) পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী, বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবন সংক্রান্ত চিত্র ; (৪) ঘটনা বা ক্রিয়াত্মক চিত্র, যেমন "মন্দিরদ্বারে" ; (৫) স্থানীয় দৃশ্য (কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গ দুইএরই) ; (৬) সম্পূর্ণ কাল্পনিক দৃশ্য বা প্রতিকৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে গগনেন্দ্রনাথ উপরোক্ত (ক) অর্থাৎ "বিশুদ্ধ" দৃশ্য ও (খ) "আখ্যানমূলক" দৃশ্য দুইই আঁকিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহার চিত্রের মধ্যে (ক) পর্যায়ের চিত্র (খ) পর্যায়ের চিত্রের অপেক্ষা অনেক বেশী ; শুধু চিত্ররূপের কথা ধরিলে গগনেন্দ্রনাথ দৃশ্যঘেঁষা চিত্রকর।

কিন্তু চিত্রোপলব্ধির দিক হইতে তাঁহার চিত্রে বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্য নাই বলিলেই চলে। বিশুদ্ধ দৃশ্যের ভিতর দিয়াও তিনি দ্রষ্টার মনে যে জিনিসটার উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন উহা উপরোক্ত (আ) পর্যায়ের রস—অর্থাৎ ভয় বিস্ময় প্রভৃতি মানস আবেগ ও ভালমন্দ প্রভৃতি মানসিক ধারণা। ইহাকেই ইংরেজীতে আমি "ইমোশ্যনাল অ্যাণ্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ ভিজিবল্ থিংজ" বলিয়াছি। সুতরাং চিত্ররূপ ও চিত্রোপলব্ধি যোগ করিলে গগনেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধানত (ক) ও (আ)র সমন্বয় দেখিতে পাই।

এই জিনিসটা কিন্তু খুব সহজপ্রাপ্য নয়। যদিও আগে বলিয়াছি, চিত্ররূপের যে কোন পর্যায়ের

সহিত চিত্রোপলব্ধির যে কোন পর্যায়ের সংযোগ ঘটিতে পারে, তবু, সাধারণত, দ্রষ্টাকে বাদ দিয়া শুধু চিত্রকরের হিসাব লইলে দেখা যায়, যে চিত্রকর "বিশুদ্ধ দৃশ্য আঁকেন, তাঁহার নিজের চিত্রোপলব্ধি সাধারণত আবেগ বা ধারণামূলক না হইয়া নির্ভাঁজ দৃষ্টিমূলক অর্থাৎ (অ) পর্যায়ের হয়। গগনেন্দ্রনাথ এই নিয়মের একেবারে সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে তাঁহাকে সেজানের সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যায়। সেজানের চিত্র যেখানে আখ্যানমূলক, সেখানেও উপলব্ধির সময়ে বিশুদ্ধ দৃশ্যাত্মক চিত্রে রূপান্তরিত হইয়া যায়। গগনেন্দ্রনাথের চিত্র যেখানে দৃশ্যমূলক সেখানেও আবেগাত্মক বা ধারণাত্মক হইয়া উঠে।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। এই প্রবন্ধের সঙ্গে কয়েকটি কাকের ছবি ছাপা হইয়াছে। বিষয় হিসাবে এটি দৃশ্যাত্মক ছবি—কারণ একেবারে 'ষ্টিল্ লাইফ' জাতীয় না হইলেও পাখির ছবিতে আবেগ বা ধারণা ফুটাইবার অবকাশ খুবই কম। বিশুদ্ধ দৃশ্যের দ্বারা শুধু বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইবার ইচ্ছা থাকিলে চিত্রকর এই ছবিটিতে কাকের অবয়ব ও গতির বিশিষ্টতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। কাকের শরীর ঘুঘু, পায়রা, চড়াই, এমন কি চিলের শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের—অত্যন্ত আঁটসাঁট, শক্ত, বৃত্তাংশ হইয়াও যথাসম্ভব সোজা কাটা কাটা রেখার দিকে ঘেঁষা। বসিয়া থাকিলে এক শুকনো ডাল ও শুকনো ডাল দিয়া গড়া নিজের বাসা ভিন্ন সবুজ পাতাওয়ালা গাছের সহিত সে কখনও খাপ খায় না। কাকের গতি, কি শূন্যে কি মাটিতে, সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। হাঁস যখন সাঁতার কাটে তখন সে জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, চিল যখন উড়ে তখন সে-ও বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু কাক উড়িবার সময়ে কখনও বায়ুর সঙ্গে মিশে না। কাকের ওড়া দেখিলে মনে হয় যেন বায়ু অপেক্ষা ভারী একটা জিনিস বাহ্যিক কোন 'মোটিভ ফোর্সে'র' জোরে বায়ু কাটিয়া চলিতেছে—ঠিক যেন একটা ঢিলের শূন্যে গতি। তৃতীয়ত, কাক সামাজিক বিহঙ্গ, কিন্তু তাহাদের সামাজিকতা ষ্টক্ একস্‌চেঞ্জ বা হাটের সামাজিকতার মত, কাজের কথায় আবদ্ধ। কাকের দল পায়রার মত দল বাঁধিয়া বসিয়া অসার আড্ডা দিতেছে তাহা কখনও দেখা যায় না।

কাকের বস্তুসত্তা ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা থাকিলে চিত্রকর কখনও কাকের এই বস্তুধর্মগুলি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে কাকের শরীর অত্যন্ত কোমল ও কমনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাকের ওড়া ভাসিয়া থাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাকের সামাজিকতা পদ্মপত্রে জলের মত সংযোগ ও বিয়োগের একেবারে নিক্তিধরা 'ইকুইলিব্রিয়াম' না হইয়া প্রায় প্রেমাবিষ্ট নরনারীর আলিঙ্গনের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলির টান, কালির ঘনতা-লঘুতা ও কম্পোজিশ্যনের ফলে গগনেন্দ্রনাথের কাক 'রিফর্মড' ও 'রোমান্টিক' কাকে পরিণত হইয়াছে—যেন গগনেন্দ্রনাথ কাকের ওকালতী করিয়া কাকের প্রতি আমাদের স্নেহ জন্মাইতে চাহিতেছেন। ইহার অর্থ—দৃশ্যে আবেগের প্রবেশ।

কিংবা 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম সংস্করণের সহিত প্রকাশিত তাঁহার দৃশ্যচিত্রগুলির কথা ধরুন। এই চিত্রগুলিতে আমরা যে শুধু চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা অনুভব করি তাহাই নয়—বরঞ্চ তাহা বড় একটা করিই না—আমাদের মন দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিসগুলির অতিরিক্ত একটা ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই ভাবাবেশের স্বরূপ কি তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পড়িলেই বোঝা যায়। এই ছবিগুলিতে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্যগুলি আঁকিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চিত্রে যতটা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনকেও আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৯ পৃষ্ঠায় বটগাছের গোড়ার একটি ছবি আছে। প্রাচীন বৃক্ষের গোড়ার

একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য গুণ (সুতরাং গুণোপলব্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট রসও) আছে। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে তাহা উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা নাই, তিনি এই গাছটির সহিত জড়িত রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকেই বিষয়বস্তু করিয়া লইয়াছেন।

"পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট;
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?"

গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বটে, শুধু বট গাছ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনও আসিয়া পড়িয়াছে। ৯৮ পৃষ্ঠায় "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে," ও ১৫৫ পৃষ্ঠায় "আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না" এই দুটি চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনা মিলাইয়া দেখিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হইবে।

অনেকেই বলিবেন, চিত্রকর. যদি কবির মনোভাবকেও এভাবে ধরিয়া দিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই ত তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সার্থক একদিক হইতে হইয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন্ দিক হইতে হইয়াছে তাহা বোঝা দরকার। এক প্রকার দেখাও অন্যপ্রকার দেখাতে সুগভীর পার্থক্য আছে। গগনেন্দ্রনাথের এই চিত্রগুলিতে যে দৃষ্টির পরিচয় পাই, উহার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" এই চৈতন্য মনস্তাত্ত্বিকের চৈতন্য নয়, কবির চৈতন্য—অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর সহিত অন্য ভাব অর্থাৎ আবেগ বা ধারণার যোগ। শুধু এই ভাবে দেখিলেই যে আমাদের দেখা জীবন্ত ও তীব্র হইয়া উঠে তাহা নয় ; রবীন্দ্রনাথ যাহাকে চৈতন্য বলিয়াছেন উহা বর্তমান না থাকিলেও আমাদের দৃষ্টি সমানভাবেই তীক্ষ্ণ, অর্থগ্রাহী, ও আনন্দদায়ক হইতে পারে। তখন দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অর্থগ্রাহিতা ও আনন্দসঞ্চার করিবার ক্ষমতা আসে দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তুর একাত্মতা হইতে। এই দৃষ্টির কথাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার "টিটার্ন অ্যাবী" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতার ৬৬-৮৫ পংক্তিতে বলিয়াছেন, এবং দৃষ্টির ফলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা এই কবিতারই ৩৭-৪৫ পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টি চৈতন্যনিরপেক্ষ, সাধনার আনন্দের মত। যে সকল চিত্রকর বিশুদ্ধ দৃশ্যের সহায়তায় আমাদিগকে বস্তুসত্তা উপলব্ধি করান, তাঁহাদের চিত্র হইতে আমরা এই জাতীয় রসই উপভোগ করি। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের রস স্বতন্ত্র।

চিত্রকলায় কিউবিষ্ট 'মোটিফ' সর্বদাই বিশুদ্ধ নকশা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যেও গগনেন্দ্রনাথ যে আবেগ উদ্রেক করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কালো-শাদায় কিউবিষ্ট ধাঁচে অঙ্কিত গৃহাভ্যন্তরের চিত্র হইতে এই গৃহাভ্যন্তর আমাদিগকে শুধু বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, আমাদের মনে একটা অলৌকিক মায়াপুরীর ধারণা জন্মাইয়া ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করে।

ব্যঙ্গচিত্র ও উপাখ্যানমূলক চিত্র স্বভাবতই আবেগ বা ধারণাত্মক, সুতরাং গগনেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর যে সব ছবি আঁকিয়াছেন উহারা যে আমাদের মনে এই ধরণের ভাবেরই সঞ্চার করে তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গগনেন্দ্রনাথের সব চিত্রেরই প্রধান লক্ষণ—আবেগ ও ধারণার সংযোগ, ইংরেজীতে আমি যাহাকে বলিয়াছি—"ইমোশ্যনাল অ্যাণ্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ থিংজ।" এই সকল 'ইমোশ্যন' ও "আইডিয়া" বা আবেগ ও ধারণাকে সংক্ষেপে "ভাব" বলা যাইতে পারে। এই ভাবেরই উপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত—এই কারণেই তাঁহার চিত্রধর্মকে আমি প্রথমেই ভাবাত্মক বলিয়াছিলাম।[৮]

ভাবের রোমান্টিকতা

গগনেন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসাবে শুধু যে ভাবধর্মী তাহাই নয়, তাঁহার ভাবেরও একটা বিশিষ্ট নিজস্ব ধর্ম আছে। চিত্রের ভাব সাহিত্যের ভাবের মতই নানাপ্রকারের হইতে পারে। উহাতে নৈতিক উপদেশ যেমন থাকিতে পারে, তেমনই নিছক তামাশাও থাকিতে পারে; করুণ বা বাৎসল্য রস যেমন থাকিতে পারে, তেমনই বীর বা রুদ্ররসও থাকিতে পারে। স্প্যানিশ চিত্রকর গোইয়া ভাবধর্মী, তাঁহার চিত্রে সাধারণত মানবজীবনের দুঃখ, গ্লানি, অবিচার, উৎপীড়ন, লালসা, হৃদয়হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ভাবের দিক হইতে রাফায়েল বা মুরিলোর চিত্র কখনও সাধারণ মানুষের স্নেহ মমতার স্তর ছাড়াইয়া উঠে নাই। গগনেন্দ্রনাথের ভাবের বিশেষ ধর্ম—উহা রোমান্টিক। তাঁহার এই রোমান্টিক ভাবের একটা নিজস্ব চেহারা ও সুর আছে। উহা ব্যক্তিগত সুতরাং অকপট। গগনেন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক পথ ধরিয়াছেন উহা ছাঁচে ঢালা রোমান্টিকতা নয়, অনুকরণও নয়।

এই রোমান্টিকতার কয়েকটা বিশিষ্ট লক্ষণ ধরিতে পারা যায়। প্রথমত, উহাতে সুদূরের প্রতি একটা টান আছে, কালের দূরত্বের কথা বলিতেছি, দেশের সুদূরত্বের নয়। রোমান্টিক কবি বা চিত্রকর মাত্রেই সুদূর দেশের ঘটনাবলী বা দৃশ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন। দ্যলাক্রোয়ার "কিয়সের হত্যাকাণ্ড", গেরিকোর "মেডুসা জাহাজের ভেলা" ও জেরারের "মিসেনাস অন্তরীপে করিনা"র কথা স্মরণ করুন। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু সুদূরের অন্বেষণে সুদূর দেশে একেবারেই যান নাই। তাঁহার সব চিত্রই তাঁহার নিজের চোখে দেখা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ। বরঞ্চ চিত্রের ভিতর দিয়া দেশ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুবই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়—কলিকাতা, উত্তর-নদীয়া ও পাবনা অঞ্চল, এবং বীরভূম, ব্যস ঐ পর্যন্ত। কলিকাতার মধ্যেও আবার তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজেকে শ্যামবাজার, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, চোরবাগান অঞ্চলেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে নূতন কলিকাতার নাম গন্ধও নাই।

৮ একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ নিতান্তই আবশ্যক মনে করি। "মন্দির-দ্বারে" চিত্রটি নামেও উদ্দেশ্যের দিক হইতে আখ্যান-মূলক ও ভাবাত্মক, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দৃশ্যমূলক ও বস্তুসত্তাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখুঁত ড্রয়িং ও কম্পোজিশ্যনের সহায়তায় এই চিত্রটি আমাদের দৃষ্টিকে মুহূর্তের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং চিত্রার্পিত দৃশ্যটি বিশুদ্ধ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু হিসাবে আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ করে। এই ছবিটি ভাবের উদ্রেক করেই না বলা চলে। এই ধর্মের আভাস গগনেন্দ্রনাথের কোন কোন চিত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর কোথাও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

এমন কি তিনি যে স্ত্রী ও পুরুষের চেহারা আঁকিয়াছেন, তার সবগুলিই খানদানী কলিকাতাবাসীর মুখ। তাঁহার ব্যঙ্গচিত্রে যে মুখ দেখা যায়, তাহা কলিকাতার বাহিরে বাংলার কোথাও মিলিবে না।

দেশসম্পর্কে এত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও গগনেন্দ্রনাথ সুদূরত্বের ধারণা জন্মাইয়াছেন কালের ব্যবধান টানিয়া। পুরীর মন্দিরের দৃশ্য যে ছবিটিতে আছে, উহা বিবেচনা করুন। বর্তমানে পুরীর মন্দিরের যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় উহা চিত্রে সম্বদ্ধ করিয়া গগনেন্দ্রনাথ অতিসহজেই এমন একটি দৃশ্য দেখাইতে পারিতেন যাহা আমাদিগকে মেরিয়োঁর এচিং-এর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি কিন্তু উহার ধার ঘেঁষিয়াও যান নাই, শত শত বৎসর পিছাইয়া গিয়া নীলাচলের সেই রূপ দেখাইয়াছেন যাহা চৈতন্যদেবকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

অনেক সময়ে আবার গগনেন্দ্রনাথ এতদূরও যান নাই, "দূরত্ব-রস" ফুটাইবার ও উপভোগ করিবার জন্য অন্য একটা পথ ধরিয়াছেন। কাল গণনা করিলে বাল্যকাল পূর্ণবয়স হইতে বেশী দূর নয়, কিন্তু উপলব্ধির দিক হইতে বহু দূরে মনে হয়। ইহার কারণ বাল্যের চৈতন্য ও পূর্ণবয়সের চৈতন্যের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই চৈতন্যবৈষম্যের জন্যই বাল্যকালকে পৃথিবীর শৈশবের সমতুল্য সুদূর অতীতের মত জ্ঞান হয়। চিত্রে বাল্যে দৃষ্ট দৃশ্য বা মুখচ্ছবি আঁকিয়া গগনেন্দ্রনাথ দূরত্বের ধারণা জন্মাইয়াছেন। যে কলিকাতার দৃশ্য তিনি আঁকিয়াছেন, উহা সমসাময়িক কলিকাতা নয়, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেকার কলিকাতা। ড্যানিয়েলের আঁকা ছবি দেখিলে মনে যেমন একটা রোমান্টিক ভাব জাগে, গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্র দেখিলেও তেমনই বহুবিস্মৃত জিনিসকে স্মরণ করিলে যেমন হয় তেমনই একটা সকরুণ ব্যাকুলতা জাগে। গগনেন্দ্রনাথের অন্য চিত্রেও অবিরত পুরাতনের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—ব্যঙ্গ চিত্রগুলিতেও ইহার অপ্রতুল নাই।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিকতার আর একটা লক্ষণ—লোকোত্তর অনুভূতির প্রতি আসক্তি। লৌকিক জগতের লৌকিক অনুভূতিতে তাঁহার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কোন পরিচিত কাহিনী বা ঘটনাকে পরিচিত লক্ষণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি সর্বদাই নূতন আশ্লেষ এবং বিশ্লেষের ("অ্যাসোসিয়েশ্যন" ও "ডিস্যাসোসিয়েশ্যন") সহায়তায় পরিচিত বস্তুকে অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "নবহুল্লোড়" শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্রমালায় অপ্রত্যাশিত আশ্লেষের দুইটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। একটি—জগদীশের ধ্যানভঙ্গ; অপরটি—বুড়োবাংলার গঙ্গাযাত্রা। দুটি ব্যঙ্গচিত্রেরই বিষয় নন-কোপারেশ্যন আন্দোলন। প্রথম চিত্রটিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্রুতিকটু ধ্বনির সহিত জগদীশচন্দ্রকে যেভাবে যুক্ত করা হইয়াছে, ও দ্বিতীয়টিতে সমসাময়িক জনসভার প্যাণ্ডেলে বাংলার প্রাচীন আভিজাত্যকে যেভাবে টানিয়া আনা হইয়াছে, উহা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই অসংগতিপূর্ণ। এই সংযোগের সম্ভাবনা আগে আমাদের মনে জাগেও নাই বলিয়া যেন উহা আরও বেশী রসসঞ্চার করে। রেমি দ্য গুঁম্যো এই নূতন আশ্লেষকে বাহবা না দিয়া পারিতেন না।

অন্য চিত্রের মধ্যেও উহা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে "বিজয়ার দৃশ্য", "অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা", এবং "উদয়-সাগরের তীরে পদ্মিনী", এই তিনটি ছবির উল্লেখ করা যায়। বিজয়ার দৃশ্য আমাদের যেমন পরিচিত, পদ্মিনীর উপাখ্যান এবং অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনীও আমাদের কাছে তেমনই

জানি। কিন্তু নাম না দেখিয়া এই ছবি তিনটি দেখিলে, অতিপরিচিত বিষয়ের ছবি দেখিতেছি তাহা সহজে মনে হইবে না। কিন্তু নাম দেখামাত্র মনে একটা বিস্ময়-উদ্দীপক ধাক্কা লাগিবে। তবে চিত্রকরের অভিনবত্ব অন্যায্য বলিয়া মনে হইবে না, শুধু মনে হইবে পুরাতন জিনিস রূপান্তরিত হইয়া নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। এই নূতন রূপের মধ্যে পরিচিতকেই দেখিতেছি, কিন্তু উহা জলেস্থলে যে আলো কেহ কখনও দেখে নাই তাহার রশ্মিপাতে বিভাময় হইয়া উঠিয়াছে।

গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার তৃতীয় লক্ষণ—সূক্ষ্মতা। শুধু সূক্ষ্মতা বলি কেন—এই সূক্ষ্মতা সূক্ষ্মতার স্তর ছাড়াইয়া ছায়াজগতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ড ও ডন জুয়ানের সহিত কীটসের "লা বেল দাম সঁ মেয়ার্সি" বা কোলরিজের "ক্রিস্টাবেলের" যে প্রভেদ সাধারণ রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনুভূতির সেই প্রভেদ। এই ধরণের রোমান্টিক ব্যাকুলতাই পেটার মোনা লিজার বর্ণনায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কালিদাসও উহারই আভাস দিয়াছেন। অদৃষ্টপূর্ব রূপ চাক্ষুষ করিবার যে প্রয়াস আমরা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের মধ্যে পাই, তাহা সব সময়েই সফল হইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু অন্তত ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়—গগনেন্দ্রনাথ—"চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"

গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রাবলীতে দুইটি বিভিন্ন ধারায় এই রোমান্টিক অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত, তিনি বাস্তব জগৎ ও জীবনের দৃশ্যের মধ্যে রোমান্টিক রস খুঁজিয়াছেন, এই সকল দৃশ্যের রোমান্টিক রূপ দিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পর বা কোন কোন মুহূর্তে তাঁহার রোমান্টিক মনোভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, বাস্তব জগতের কাঠামোর মধ্যে তিনি আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। তখন এই রোমান্টিক অনুভূতি বাঁধন ছিঁড়িয়া নিজের জগৎ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, নিজের জগৎ সৃষ্টি না করিতে পারা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। এই কারণে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে রহিয়াছে বাস্তব জগতেরই চিত্র, রোমান্টিক রসাশ্রিত; অন্যদিকে রহিয়াছে, একেবারে অবাস্তব ও কাল্পনিক একটা রোমান্টিক জগৎ। শেষোক্ত জগতে পৌঁছিয়া গগনেন্দ্রনাথ রোমান্টিক অনুভূতির স্রোতে একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন,—বাস্তবকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিজের রোমান্টিক দৃষ্টির অনুকূল করিয়া লইয়াছেন; এবং বাস্তবের সহিত ততটুকুই সম্পর্ক রাখিয়াছেন যতটুকু না রাখিলে লোকের মনে প্রত্যয় জন্মান যাইবে না।

কোন রোমান্টিক ঔপন্যাসিক উপন্যাসে নিজের রোমান্টিক অনুভূতিকে তৃপ্ত করিতে না পারিয়া যদি রূপকথাও লিখিতেন তাহা হইলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা দেখিতে পাইতাম, চিত্রের ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি দুইটি শ্রেণীতে পড়ে—একদিকে "চিত্রোপন্যাস", আর একদিকে "চিত্র-রূপকথা"। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই "দ্বিমুখীনতা" একেবারে বিরল নয়, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে উহার কথা পড়ি নাই।

গগনেন্দ্রনাথের ষ্টাইল ও টেকনিক ও তাঁহার চিত্রের মূল্যবিচার আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

পুরীর মন্দির, ব্যঙ্গচিত্র ও প্রতিকৃতিগুলির ব্লক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ও "সারস্বত সমাজ"

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি উপেক্ষার প্রদোষালোকে ম্লানায়মান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইনি সেই জাতীয় ক্ষণজন্মাদের মধ্যে একজন যাঁহারা "দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে।"[১]

যে পলি মাটির উপর আজ বাংলার অন্যতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত তাহার সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ যতই পরোক্ষ হউক না কেন উপেক্ষণীয় নহে। অবশ্য, আমাদের এই উপেক্ষায় তাঁহার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, লজ্জা আমাদেরই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন:

"তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"[১]

'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' বা 'সারস্বত সমাজ' নাম, নিতান্ত শৌখিন সাহিত্যিকদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রবীণ ও আগ্রহবান নবীন সাহিত্যিকদের নিকট একেবারে নূতন নহে। এই 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠার "নিষ্ফল অধ্যবসায়ের" মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'-এর সহিত তাঁহার পরোক্ষ যোগ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে:

"বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্যপরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।"[২]

এই 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠানটির ক্ষণস্থায়ী অঙ্কুরিত জীবনের প্রথম মুদ্রিত পরিচয় সমসাময়িক 'ভারতী'-তে[৩] 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই দিয়াছেন:

'বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ও বঙ্গ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই বোধহয় শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন" নামক বঙ্গসাহিত্যবিজ্ঞানদর্শনসঙ্গীত[৪] প্রভৃতিবিষয়িনী একটি সমালোচনী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার অনুষ্ঠান-পত্র ও নিয়মাবলী হইতে কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ইহা হইতে সঙ্কল্পিত সভার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

---

১ 'জীবনস্মৃতি' পৃ. ২৬৬-২৬৭

২ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি' পৃ. ২৪০

৩ দ্রষ্টব্য "ভারতী", ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ বা 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' পৃ. ৩০৯-৩১৯

৪ "সঙ্গীত": সারস্বত সমাজের পরিকল্পনা বর্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অপেক্ষা এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ছিল বলিতে হয়।

"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের[৫] অনেক শুভ ফল আছে :—

১। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখা-শুনা হয় ও সৌহার্দ্দ্য জন্মে।

২। পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান-প্রদান হওয়ায় একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

৩। এই বিদ্বজ্জন সম্মিলনের উপলক্ষে আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কল্পে বহুবিধ শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনাদির অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথা সৃষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, ও তৎসঙ্গেসঙ্গে বঙ্গভাষায় এক সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দ সমূহ বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয় তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(২) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদ পত্র বা প্রবন্ধ পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৩) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গলা গ্রন্থ সমালোচিত হইবে অথবা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ অন্যভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৯) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা সমক্ষে উপস্থিত করিলে সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(১২) যে অধিবেশনে সমালোচনা পাঠ হইবে—লিখিত সমালোচনা তর্ক-বিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থ সঙ্গে করিয়া লইয়া সভাপতি তাহার পরের অধিবেশনে সংক্ষেপে তাঁহার মত লিখিয়া আনিয়া পাঠ করিবেন।

(১৩) সভার অন্যান্য কার্য-বিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনের সংক্ষিপ্তসার ও তর্ক বিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায় সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-পত্রে প্রকাশিত হইবে। সভায় যে কোন মত ব্যক্ত হইবে তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০)[৬] সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে সভ্যদিগের

---

৫ তুলনীয়, 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামক সাহিত্যিক সম্মিলন : প্রথম আহূত, জোড়াসাঁকোর বাটিতে ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে।

৬ সম্ভবত এই ক্রমিক সংখ্যা ১৪ হইবে।

মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট বিষয়সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির কাজ না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

এতদ্ব্যতীত এই সভার গঠন সম্বন্ধে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক নিয়ম ছিল, নিষ্প্রয়োজন বোধে এই প্রবন্ধে লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু "সভার মুখ্য উদ্দেশ্য তিনটি" সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন:

"প্রথম, বঙ্গ ভাষার অভাব মোচন। দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বর্দ্ধন। তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন।"

এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘজীবী হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহাকে সার্থক করিয়া তোলার কাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অনুজ রবীন্দ্রনাথও মনপ্রাণ ঢালিয়া উদ্যোগী হইয়াছিলেন। নিজের সেই অধ্যবসায়টুকুর পরিচয় তিনি তাঁহার কোনো প্রকাশ্য লেখাতেই স্পষ্টত রাখিয়া যান নাই। এই সম্মিলনের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগটুকু আজ আকস্মিকভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তাঁহার নিজের লেখা দুইটি লুপ্তপ্রায় প্রতিবেদন হইতে। এই সভার রবীন্দ্রনাথ যে অন্যতম সম্পাদক ছিলেন সে তথ্যও এতদিনে প্রথম জানিলাম। কোনো অনুষ্ঠানের সম্পাদকরূপে কার্য করা তাঁহার জীবনে সেই প্রথম। বয়স তাঁহার তখন একুশ বৎসর।

রবীন্দ্রভবনে ইদানীং সংগৃহীত যে পাণ্ডুলিপি হইতে ইতিপূর্বে বৈশাখ ১৩৫০ সালের মাসিক 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' রবীন্দ্রনাথকৃত 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল সেই পাণ্ডুলিপির শেষাংশে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনের নিম্নমুদ্রিত কার্যবিবরণ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে।[৭]

সারস্বত সমাজ

১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার

---

৭ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পাণ্ডুলিপিখানি সম্ভবত একটি খাতার খুচরা কতকগুলি পাতার সমষ্টি (৩৭-৩৮ খানি মোট পাতা)। রচনাকাল প্রধানত ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ কবির প্রথম বিলাত যাত্রার পূর্বে আমেদাবাদ বাসের কাল ও তাহার অব্যবহিত প্রাক্কাল। 'শৈশব সংগীত'-এর কয়েকটি কবিতা, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" গানটির প্রথম পাঠ, এবং 'লীলা', 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি গাথাগুলির কিছু কিছু অংশ ইহাতে আছে। 'কুমারসম্ভব' তৃতীয় সর্গের অনুবাদেরও দুইটি পাঠ ইহাতে আছে। সম্ভবত ইহার দ্বিতীয় এবং সংশোধিত অনুবাদটি পুনরায় সংশোধিত হইয়া 'ভারতী'র প্রথম বর্ষে (১২৮৪) মাঘ মাসে 'সম্পাদকের বৈঠক' (পৃ. ৩২৯-৩৩১) বিভাগে 'মদন ভস্ম' নামে প্রকাশিত হয়।

সাহায্য করিতে হইলে কি কি কার্য্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ বানানের উন্নতি সাধন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দ বিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষর বিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম সকল বাঙ্গলায় কি রূপে বানান করিতে [হইবে তাহা][৮] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে "ভিক্টো [রিয়া বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্তস্থ "ব" সহজেই [? প্রয়োগ] হইতে পারে। ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাঙ্গলায় বিস্তর [গোল] যোগ ঘটিয়া থাকে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজেব কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করা যায়—ইংরাজী isthmus "ডমরু-মধ্য" কেহ বা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনটাই হয়ত সার্থক হয় নাই।—অতএব এই সকল শব্দ নির্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন—এই সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে—যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী[৯] পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। স্থির হইল—বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন চারিটি নামের[১০] মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম[১১] নিম্নলিখিত মতে পরিবর্ত্তিত হইল ;—

"যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

[সমাজের] চতুর্থ নিয়ম[১২] নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে নূতন সভ্য গৃহীত

---

৮ এই অংশের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়াছে। অন্যত্রও নষ্ট অংশে বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া হইল।

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার ভারতীর প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি সম্ভবত এই খসড়া হইতেই চয়ন করিয়াছিলেন।

১০ সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাবিত ইংরাজি নামটি (বর্তমান প্রবন্ধে পরে উল্লিখিত হইয়াছে) ইহাদের মধ্যের একটি।

১১ দ্রষ্টব্য : পূর্বোদ্ধৃত খসড়া নিয়মাবলীর (২) ও (৩) নং নিয়ম

১২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চতুর্থ নিয়ম উদ্ধৃত করেন নাই।

হইবেন। সভ্যগ্রহণকার্য্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক। সমাজের চতুর্ব্বিংশ নিয়ম[১৩] নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল ;—

সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে সভ্য এককালে ১০০ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাকে ঐ বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্ম্মচারীরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ডাক্তার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৪]

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

কবি নিজেই পরবর্তীকালে লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।[১৫]" 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে[১৬] এই সভার সহিত বঙ্কিমবাবুর যোগের আর একটু উল্লেখ আছে :

"বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে 'Academy of Bengali Literature'[১৭] রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।"[১৮]

এই সভার পরবর্তী আর একটি অধিবেশনের (অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) রবীন্দ্রনাথ লিখিত কার্যবিবরণ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন। সভাটির বর্তমান অধিবেশনে কিঞ্চিৎ সাফল্যের নির্দেশ রহিয়াছে। ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া আবহাওয়া কাটাইয়া সভা এখন 'আলবার্ট হলে' সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।[১৯] কার্যবিবরণটি সাধারণ্যে সুবিদিত নয় বলিয়া নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

১৩ এই নিয়মও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই।

১৪ সারস্বত সমাজের যে দুইটি মাত্র অধিবেশনের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে, দুইটিই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত দেখিয়া মনে হয় সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য তিনিই সম্পাদন করিতেন।

১৫ 'জীবনস্মৃতি' পৃ, ২৪১

১৬ দ্রষ্টব্য পৃ. ১৮২

১৭ তুলনীয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর আদি নাম—'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' (The Bengal Academy of Literature)।

১৮ সম্ভবত এই নাম বঙ্কিমচন্দ্র বীম্‌স্ সাহেবের পূর্ব্ব প্রচারিত একটি প্রস্তাব হইতে লইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ'—জে. বীম্‌স্ কর্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানপত্রের বঙ্গানুবাদ—'বঙ্গদর্শন', ১২৭৯ আষাঢ়

১৯ 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী'-র ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমাদের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ইহার

"১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরুমধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, channel, mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsula-কে বাঙ্গালায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তি সুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিয়মের ব্যাভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার কাম্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল।" এই উক্তিটির প্রথমাংশ অপেক্ষা শেষাংশই প্রণিধানযোগ্য। এ-পর্যন্ত আমরা মাত্র দুইটি অধিবেশনের সংবাদ পাইয়াছি।

পরিভাষা—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়ত ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় White mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।[২০]

বক্তা বলিলেন, অল্প বয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পরে পরে উত্থাপিত ও গ্রাহ্য হইল:—

প্রথম—ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়—তদ্বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি বসিবে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমিতিব সভ্য হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তৃতীয়—তিনমাস পরে উক্ত সমিতির কার্য্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

চতুর্থ—যে সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিতে সমর্পণ করিবেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।[২১]

এই কার্যবিবরণীর সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে তবেই জীবনস্মৃতির নিম্নোদ্ধৃত অংশের সম্যক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি:

"বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদেব আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল[২২]।

২০ তুলনীয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত খসড়া নিয়মের ৩ (ক)

২১ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (পৃ. ১১২—১১৬)

২২ তুলনীয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ১৩০৮ সালে 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' পুস্তিকাটির বিতরণ। শিশু প্রতিষ্ঠান হইলেও সমাজের কার্যপদ্ধতিতে পরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের ছিল।"[২৩]

পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সার্বভৌম ক্ষেত্রে শব্দতত্ত্ব ও পরিভাষা সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার যে পৌরোহিত্য রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭-৮ সালে করিয়াছিলেন তাহার বীজ বপনের সূচনাও যে এই সারস্বত সমাজের আদিযুগে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কার্যপরিচালনায় মূল পরিচালকদের (সভাপতি ও কনিষ্ঠ সম্পাদকের) পক্ষে কোনোপ্রকার শৈথিল্য বা পটুত্বের অভাবও এই কার্যবিবরণী হইতে আমরা লক্ষ্য করি না। মুদ্রিত প্রস্তাব যাহা প্রেরিত হইত সভ্যগণ তাহার আলোচনাও যে শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সহিত করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিম্ন মুদ্রিত পত্র হইতে :

দেওঘর, ৪ আষাঢ় [১২৯০]

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু[২৪]—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব[২৫] পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না। ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণ তন্ত্রের লোক; কেহ কাহার কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "Irritabile vates trition." আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এইবেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে।[২৬] আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্যপ্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এবিষয়ে আমাদিগের হাত পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English channel একটি উপসাগরের নাম; channel শব্দে কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ

---

২৩ 'জীবনস্মৃতি' পৃ. ২৪১

২৪ বলাবাহুল্য পত্রখানি রবীন্দ্রনাথকে লিখিত।

২৫ রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত রাজেন্দ্রলাল কৃত পরিভাষার ছাপানো প্রথম খসড়া। আমরা ইহা দেখি নাই, কাহারো সংগ্রহে থাকিলে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

২৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির পক্ষে ষাট বৎসরের পুরাতন এই বাক্যগুলি আজও কিছু কম মূল্যবান নহে।

উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্বল্পসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের কথার উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতি শব্দও ভুক্ত থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।"[২৭]

এইরূপ সুষ্ঠু আয়োজন এবং এমন সুযোগ্য সম্পাদক থাকা সত্ত্বেও 'সারস্বত সমাজে'-এর অকাল মৃত্যু ঘটিল। কয় বৎসর এই শিশু প্রতিষ্ঠান জীবিত ছিল তাহাও সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবত ইহার অপমৃত্যুর পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার প্রথম জাহাজ 'সরোজিনী' লইয়া স্বদেশী জাহাজের ব্যাবসায় নামেন।

প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধের[২৮] উপসংহারেই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন:

"আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেক গুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই এক স্থানে সমবেত হইয়াছেন—এক্ষণে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলীর ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজেব ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত এক হৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনেব পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে, সে কেবল বাঙ্গালীর আর একটি কলঙ্কধ্বজা স্থাপনেব নিমিত্ত।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনেই সৎপরামর্শ লাভ করিয়াছিলেন—"বড় বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।"[২৯] সে পরামর্শ শেষ পর্যন্ত পালন করেন নাই বলিয়াই সম্ভবত আদি উদ্যোক্তার এই সংশয়। কিন্তু সভার সম্পাদক নিজেও পরবর্তীকালে যখন অগ্রজের স্বরে স্বর মিলাইয়া বলেন—"হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না"[৩০] তখন তাঁহার অনুযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়াও আমরা এই তথ্যটুকু স্মরণ করি যে, 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠার পর সম্পাদকের জীবনে পারিবারিক নানা বিপর্যয় ঘটিয়াছিল—সমাজের জীবনেও হয়তো সে-সকল ঘটনা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে।

---

২৭ পত্রখানি মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল

২৮ 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন'—ভারতী, ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ

২৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৮২

৩০ জীবনস্মৃতি, পৃ. ২৪১

চিঠিপত্র

পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

Geneva

পুপুমণি

দাদামশায়ের অবস্থা খুব খারাপ। টেবিলে কাগজপত্র ছড়াছড়ি যাচ্চে, রঙীন কালীর দোয়াতগুলো সমস্ত এলোমেলো—কলম পেন্সিল কোথায় কি আছে তার ঠিকানা নেই। চষমা চোখে থাকে অথচ খুঁজে বেড়ায়। একটা মস্ত ঝোলা কাপড় পরে থাকে, তাতে লাল রং নীল রং হলদে রঙের দাগ। আঙুলে হাতে রঙের দাগ লেগে থাকে, সেই হাত দিয়ে টেবিলে খেতে যায় লোকেরা দেখে মনে মনে হাসে। রোজ রোজ তার সেই এক ঝোলা কাপড়খানা দেখেও তাদের হাসি পায়। ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠে বসে থাকে তখন আর কেউ ওঠে না। ক্রমে বেলা ছটা বাজে, সাতটা বাজে, আটটা বাজে—তখন আরিয়াম সাহেব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্তিরে আপনার ঘুম হয়েছিল তো। দাদামশায় বলে, হাঁ, বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল। তার পরে ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে—খবর পায় পাশের ঘরে খাবার এসেচে। গিয়ে দেখতে পায়, একটা ডিম সিদ্ধ, রুটি টোষ্ট, মাখন আর চা। খেয়ে সেই টেবিলে এসে বসে। বসে বসে লেখে। এণ্ড্রুজ সাহেব মাঝে মাঝে এসে গোলমাল করে যায়। লোকজন দেখা করতে আসে। বেলা দশটা এগারোটা হয়। তখন হঠাৎ মনে পড়ে এইবার স্নান করতে হবে। স্নান করে এসে কেদারায় বসে বিশ্রাম করে। তার পরে লাঞ্চ্। শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন ইত্যাদি। তার পরে কিছু বিশ্রাম, কিছু কাজ, কিছু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। এমনি করে দিন চলে যায়। সাড়ে চারটার সময় চা। সেই সঙ্গে পাঁচজনের সঙ্গে বকাবকি। তারপর আটটা বাজলে খাওয়া। সেইরকম শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন। লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে রাত হয়ে যায়। তারপরে দাদামশায় শুয়ে পড়ে বিছানায়। তারপরে সমস্ত রাত্তির যে কি হয় তা সে জান্‌তেও পারে না। আজ আর সময় নেই। ইতি ২১ আগষ্ট, ১৯৩০

দাদামশায়

২

পুপুমণি

আমি কোথায় আছি সে তুমি মনে করতে পারবে না। একটা মস্ত বাড়ি, চমৎকার বাগান, যতদূর চেয়ে দেখা যায় বড় বড় গাছের বন। আকাশে মেঘ করে আছে, খুব শীত, বাতাসে লম্বা লম্বা গাছের মাথা তুল্‌চে। অমিয়বাবু আছেন মস্কৌ সহরে, আরিয়াম গেছেন আর এক জায়গায়, আমার সঙ্গে আছেন ডাক্তার টিম্বার্স। ঘড়ি কাছে নেই কিন্তু বোধ হয় এখন সকাল আটটা হবে। আমি যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলুম তখন জানলার বাইরে দেখলুম অন্ধকার, আকাশভরা তারা। চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলুম। তার পরে

যখন অল্প একটু আলো হল বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। প্রথমে বাবাকে একটা বড় চিঠি লিখেচি তার পরে তোমাকে লিখচি। কিন্তু খিদে পেয়েচে। এখনি হয়তো এখানকার দাসী ডিমরুটি আর চা নিয়ে আসবে। তুমি হয়ত এতক্ষণে জেগেছ, তোমার কোকো খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে গেছ কি ? কিন্তু তোমাদের ওখানে হয়ত মেঘ করে বৃষ্টি হচ্চে। আজ বিকেলে মোটর গাড়ি চড়ে এখান থেকে আবার মস্কৌ সহরে চলে যাব। সেখানে একটা হোটেলে আমরা থাকি। এখানকার মতো এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি নয়, আর সেখানে যে খাবার জিনিস দেয় সেও ভালো নয়। তাই ইচ্ছে করে শান্তিনিকেতনে চলে যাই। এবারে সেখানে ফিরে গিয়ে আর কিছুতেই নড়ব না। কেবল ছবি আঁকব। আর ভোরের বেলা বনমালী গরম কফি আর রুটি টোস্ট্‌ নিয়ে আসবে। তার পরে সেই কাঁকর বিছানো বাগানে বেড়াতে যাব, একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে। তার পরে—এখন থাক্‌। খাবার এসেছে। কি এসেছে বলি। কফি, রুটি, মাখন, মাছের ডিম, দুরকমের চিজ্‌, ক্রিমের দই আর দুটো ডিম সিদ্ধ। তাছাড়া, আঙুর, পিয়ার, আপেল। খাবার হয়ে গেলে পর গরম জলে স্নান করে এসে আবার লিখতে বসেচি। এখন মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে—রোদ্দুর দেখা দিয়েছে—গাছের ডালগুলো বাতাসে নড়চে আর পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌চে, আর কত রকমের পাখী ডাক্‌চে তাদের চিনিনে। আজকের আর সময় নেই। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০।

দাদামশায়

৩

পুপুমণি,

বেশি দেরী কোরো না। এইবার চলে এসো। কেননা পাণ্ডবদের এবার খুব মুস্কিল। বন থেকে ফিরে এল, তেরো মাস কেটে গেল। কিন্তু দুষ্ট দুর্য্যোধন বল্‌চে কোনোমতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। লড়াই করতে হবে। তাই বলচি তাড়াতাড়ি এসো, নইলে লড়াই বন্ধ হয়ে থাক্‌বে। ভীম তাহলে ছট্‌ফট্‌ করে মরবে—তার গদা দেয়ালের কোণে ঠেসান দিয়ে রেখেছে। সে থেকে থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌চে দুঃশাসনকে একবার পেলে হয়। অর্জ্জুনের ইচ্ছে, আর একটু দেরি না করে কর্ণের বুকে পিঠে তীর মেরে মেরে তিনশোটা ছেঁদা করে দেয়। তুমি এলেই তখনি লড়াই স্বরু হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্রে হাজার হাজার তাঁবু পড়ে গেছে—কত হাতি কত ঘোড়া কত রথ তার ঠিক নেই।—ধীরেন কাকা থেকে থেকে পাল্লারামের[১] পেটে ফাউণ্টেন্‌ পেনের খোঁচা মারচে, পাল্লারাম চেঁচিয়ে উঠ্‌চে। দিনদা থাকলে পাল্লারামের রক্ষা ছিল না। বনমালীর মাথায় সেই টুপিটা নেই, তার বুদ্ধিও অনেকটা কমে গেছে। ২০ আষাঢ় ১৩৩৮।

দাদামশায়

১ 'সে'-র সন্ধানে পাল্লারাম দাদামশায়কে ভয় দেখাতে এসেছিল—"মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দ্দান, বনমালীর মতো রং কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরজাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপরে হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি"—দাদামশায় তার একখানা ছবি এঁকে নিয়েছিলেন—যারা পাল্লারামকে দেখেনি তাদের জন্য ছবিটা 'সে' বইতে ছেপে দেওয়া হয়েছিল।

৪

পুপুদিদি

তুমি যখন দার্জ্জিলিং যেতে লিখেচ তখন নিশ্চয় যাব। কিন্তু মা যদি গরম কাপড় না দেয় তাহলে শীতে মরে যাব। তোমার ওভারকোট আমার গায়ে হবে না। ওদিকে সে[২] এসে আমার বালাপোষখানা গায়ে দিয়ে চলে গেছে। বৃষ্টিতে তার নিজের ছেঁড়া চাদরখানা ভিজে গিয়েছিল সেইটে ফেলে দিয়ে গেছে। বনমালীকে ঐ চাদরটা দিতে চাইলুম সে নিলে না। ওটাকে সরবৎ ছাঁকবার কাজে লাগাব মনে করচি। আমার হলদে রঙের ভালো চটি জোড়াটাও সে নিয়েচে।

ইলিষ মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এলুম। ইলিষ মাছের ডিম ভাজা ছিল সে বললে আমি খাব। তাকেই দিলুম। তবু তার ক্ষিদে ভাঙে না। লাউ দিয়ে বড়ি দিয়ে ঘণ্ট তৈরি হয়েছিল সেটাও খেলে। তার পরে পায়েস খেলে দুবাটি, শেষকালে দুটো আতা। বলে গেল, চা খাবার সময় আসবে, তার জন্যে যেন নিমকি তৈরি থাকে। নিমকির সঙ্গে দই দিয়ে শসার চাটনি খাবে এই তার ফরমাস।[৩] ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদামশায়

৫

পুপুদিদি

তুমি ভীষণ গরমে শুকিয়ে যাচ্চ খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি এখান থেকে দুই এক পসলা ভালো জাতের বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছি—পেয়েছ কিনা খবর দেবে। বোধ হয় মাঝে মাঝে আরো কিছু কিছু পাঠাতে পারব অতএব তোমার হংস পরিবারের জন্যে বেশি ভাবনা কোরো না। আমি এখানে নির্বাসনে আছি, শ্যামলী এখনো আমার আসন প্রস্তুত করেনি—যখন সে তৈরি হয়ে ডাক দেবে আমিও দেরি করব না। হয়তো দু হপ্তাখানেক দেরি হতে পারে। তোমাদের ঘাস তো সব শুকিয়ে গেল সকাল বেলায় হাঁস চরাবার জায়গা পাও কোথায়? প্রথম কিছুদিন বোটে ছিলুম—সামনের ঘাটে লোক জমা হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। লিখচি পড়চি খাচ্চি আঁকচি ঘুমোচ্চি সমস্তই তাদের দৃষ্টির সামনে। বাইরে এসে বস্‌লে তারা নৌকার পাশে এসে ভিড় করে—লুকিয়ে থাকতে হোত কামরার মধ্যে,—শেষকালে এই খাঁচার থেকে বেরিয়ে পড়তে হোলো। এখন আছি গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে—চারদিক খোলা, গঙ্গা একেবারে গা ঘেঁষে চলেছে—

---

২ "নাৎনীর ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে, নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। কাজটা একলাই সুরু করেছিলুম কিন্তু মালমসলা এতই হালকা ওজনের যে নির্ব্বিচারে পুপুও দিল যোগ।... এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা।...এই যে আমাদের মানুষটি—একে আমরা শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি।"

৩ 'সে'-র আরো অনেক ফরমাস ছিল—"লোকটার দিব্যি খাবার সখ। ফরমাস ক'রে মুড়োর ঘণ্ট, লাউ-চিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁছেপুঁছে খায়। এক-একদিন সখ যায় আইসক্রিমের।...লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চমচম।"

আরামে আছি। লোকজনের সমাগম সম্পূর্ণ নেই তা বল্‌তে পারিনে। সদর দরজা বন্ধ করে তাদের কতকটা ঠেকানো যায়। আম ঝুড়ি বোধ করি পেয়েছ—কিছু খেয়ো কিছু বিতরণ কোরো। ইলিষ মাছ পাঠাবার চেষ্টায় আছি। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

দাদামশায়

৬

পুপুদিদি

তোমার হাঁসের জন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি যেখানে বসে লিখচি তার জানলার সামনে রোজ তারা চরতে আসে, গুণে দেখিনি, কিন্তু দলের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় তারা সুস্থ শরীরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে—ডানায় ডানায় তাদের অতগুলো কুইল্‌ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তারা চিঠি লিখতে পারে না এই দুঃখ জানিয়ে তারা কঁ্যা কঁ্যা করে চেঁচায়—তাই তাদের হয়ে আমাকেই লিখতে হয়। কিন্তু তোমার হাঁসের ডিমগুলোর কোনো সাড়াশব্দ নেই—তাদের খবর বলতে পারব না, এটুকু এজানি রান্নাঘরে তাদের গতি হয়নি। কিন্তু তোমার বন্ধু গাঙ্গুলি মশায় হাঁসের ডিমের মতো নয়—তাঁর গলা এখানকার সব আওয়াজ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্চে—তাঁকে ডাকাতে ধরেনি একথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ১৭ অক্টোবর

দাদামশাই

৭

পুপুদিদি

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি করে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তা ছাড়া তোমার গাঙুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার সুনন্দা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসেদের মতই ভদ্র,—মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসেদের চেয়ে এক হিসাবে ভালো—প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরি করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময় পেরে উঠিনে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরি করে সেটা খেলে, প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু ঘিয়ের ময়ান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্চে—তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর ঘিয়ের কিছু লোকসান হয় নি। তোমার বাবা ব্যস্ত আছেন প্রতিদিন পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে—আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই। ইতি ২২।১০।৩৫

দাদামশায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ - চৈত্র ১৩৫০

বিষয়সূচী

স্ফুলিঙ্গ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৯
লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	২৩১
রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঋতুচক্র	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	২৪৩
মৃচ্ছকটিক কার রচনা ?	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	২৬২
ওঁ পিতা নোঽসি	শ্রীরানী মহলানবীশ	২৬৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	২৭৫
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	২৮৯
চিঠিপত্র	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯৬
ছন্দঃ	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	২৯৯
ধারাবাহী	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০২
গোলদীঘি	শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩০৬
মুসলমান-যুগে পাট ও চট	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	৩১১
অবনীন্দ্রনাথ	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	৩১৮
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও নেপালচন্দ্র রায়	শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী	৩২৭
আশ্রমবন্ধু	সম্পাদকীয়	৩৩০
বাংলাভাষায় যতিচিহ্নের প্রথম প্রবর্তন	শ্রীমদনমোহন কুমার	৩৩৫
রবীন্দ্রনাথের রচনায় আরবী ফারসী শব্দ	মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	৩৩৬

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য   শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন   শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৪॥০, বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৩॥০

চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় :

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বিশ্বভারতী কার্যালয়

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা   টেলিফোন : বড়বাজার ৩৯৯৫

চিত্রসূচী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্র

উমা	২২৯
মা	২৪৪
শিশু ভোলানাথ	২৭৬
তিন বিন্দু মধু (১৯৪৩)	২৯২
যৌবনে অবনীন্দ্রনাথ	৩২৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৩২৭

কাঠ- ও লিনো- খোদাই ইত্যাদি

শ্রীকেশব রাও, শ্রীসুখময় মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও শ্রীকানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ - চৈত্র ১৩৫০

স্ফুলিঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

তোমার মঙ্গলকার্য তব ভৃত্যপানে
অযাচিত যে প্রেমেরে ডাক দিয়ে আনে,
যে অচিন্ত্য শক্তি দেয়, যে অক্লান্ত প্রাণ,
সে তাহার প্রাপ্য নহে, সে তোমারি দান ॥

২

সফলতা লভি যবে, মাথা করি নত,
জাগে মনে আপনার অক্ষমতা যত ॥

৩

আগুন জ্বলিত যবে, আপন আলোতে
সাবধান করেছিল মোরে দূর হতে।
নিবে গিয়ে ছাইচাপা আছে মৃতপ্রায়,
তাহারি বিপদ হতে বাঁচাও আমায় ॥

৪

ডুবারি যে সে কেবল ডুব দেয় তলে,
যেজন পারের যাত্রী সেই ভেসে চলে ॥

৫

বেছে লব সব-সেরা, ফাঁদ পেতে থাকি,
সব-সেরা কোথা হতে দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান, থাকি করজোড়ে,
সব-সেরা আপনিই বেছে লয় মোরে ॥

৬

স্নিগ্ধ মেঘ তীব্র তপ্ত আকাশেরে ঢাকে
আকাশ তাহার কোনো চিহ্ন নাহি রাখে।
তপ্ত মাটি তৃপ্ত যবে হয় তার জলে
নম্র নমস্কার তারে দেয় ফুলে ফলে॥

৭

আলো আসে দিনে দিনে,
রাত্রি নিয়ে আসে অন্ধকার।
মরণসাগরে মিলে শাদা কালো গঙ্গাযমুনার॥

৮

হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে,
"ভালো বেসেছিল কবি, বেঁচে ছিল যবে॥"

৯

আকাশে ছড়ায়ে বাণী অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।
শুনিতে না পায় জন্তু, মানুষ চলেছে সুর খুঁজি॥

১০

শেষ বসন্ত রাত্রে
যৌবনরস রিক্ত করিনু বিরহবেদনপাত্রে॥

১১

আপনার রুদ্ধদ্বার-মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে।
আপন বাহিরে মেলো চোখ,
সেইখানে অনন্ত আলোক॥

১২

মুহূর্ত মিলায়ে যায়, তবু ইচ্ছা করে
আপন স্বাক্ষর রবে যুগে যুগান্তরে॥

১৩

দিগন্তে পথিক মেঘ চলে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু লেখে আকাশেতে॥

লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মূল হইল তাহার ভাবসম্পদ্। জাতীয় জীবন ও ইতিহাস যেমন এই ভাবসম্পদের প্রকাশ তেমনি তাহার পরিপূর্ণতর প্রকাশ হইল সাহিত্যে ও সঙ্গীতে।

বৈদিক যুগের সাহিত্যে নানাবিধ সঙ্গীতের কথা আছে, নৃত্যগীত ও বাদ্যের বহু উল্লেখ আছে। ভারতে যে শুধু যাগযজ্ঞই অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে যজ্ঞবেদির চারিদিকে নৃত্যগীতবাদ্যাদির এবং অভিনয় প্রভৃতিরও উৎসব চলিত। সেই যুগের সঙ্গীতের সব কথা না জানিলেও এখন সামবেদের গানে তখনকার দিনের সঙ্গীতের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদাঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের আরও কিছু পরিণতি দেখা যায়। তার পর শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সঙ্গীতের সঙ্গে বৈদিক সঙ্গীতের সংঘর্ষের কথাও আমরা পুরাণাদিতে জানিতে পারি। পুরাণে রীতিমত সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা আছে। সপ্তস্বর রাগরাগিণী প্রভৃতির আলোচনা তখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বেদাঙ্গে ও পুরাণে আমরা নারদের উল্লেখ পাই।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে প্রথমে সঙ্গীতকে ততটা আমল দিতে চাহে নাই, কিন্তু পরে ধর্মপ্রচারের জন্য তাহাদিগকেও সঙ্গীতের সহায়তা লইতে হইয়াছে। ভাগবতেরাই সঙ্গীতশাস্ত্রকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেন। এখনকার দিনের ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্যের মূলে যে স্বরসম্পদ তাহা বৈদিক সঙ্গীত অপেক্ষা ভাগবত সঙ্গীতের কাছেই অধিক ঋণী। পুরাণগুলিতে ভাগবত সঙ্গীতের কথা অনেক পাওয়া যায়।

পুরাণের পর নারদ ছাড়া সঙ্গীতশাস্ত্ররচয়িতা তিনজন মুনির নাম বিশেষ ভাব পাই। তাঁহাদের রচিত শাস্ত্র এখনও বিশেষ মান্য। তাঁহাদের নাম দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ। এই যুগেই সঙ্গীতের মার্গ ও দেশীয় (অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল এবং পপুলার) এই দুই পদ্ধতি রীতিমত চলিয়াছে। দেখা যায় যাহা এক যুগে দেশীয় তাহাই পরবর্তী যুগে মার্গ বা ক্লাসিক্যাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কৌলীন্য লাভ করিয়া সে-ই আবার পরবর্তী দেশীয় সঙ্গীতের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব যুগের সঙ্গীতের কথা আজ আমার আলোচ্য নয়।

ইহার পরে ক্রমে আসিল 'সঙ্গীতরত্নাকর'-প্রণেতা শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি আচার্যগণের যুগ। শার্ঙ্গদেব কাশ্মীরবংশীয় হইলেও দক্ষিণ-ভারতের দেবগিরিপতি যাদবকুলনৃপতি সিঙ্ঘণের আশ্রিত ছিলেন। সিঙ্ঘণের কাল ১২১০ হইতে ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই সঙ্গীতরত্নাকর এই কালের মধ্যেই কোনো সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে। তাহারও পূর্বের অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত একটি শিলালিপি পাওয়াতে তখনকার দিনের সঙ্গীতবিদ্যার অনেক কথা জানা গিয়াছে। শিলালেখটি পাওয়া গিয়াছে মান্দ্রাজ প্রদেশের পুদুকোট্টাই রাজ্যে কুডুমিয়মালয় নামক স্থানে। এই সপ্তম শতাব্দীর শিলালেখ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সঙ্গীতরত্নাকরের মধ্যে বহুশত বৎসরের ব্যবধান। ইহার মধ্যে ভারতের ইতিহাসে কম ঘটনা ঘটে নাই। তাহার মধ্যে কি পুরাণপ্রণেতাদের পরে কোনো সঙ্গীতাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই ?

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব ছিলেন বঙ্গাধিপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ের মানুষ। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১] আজ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের অপেক্ষা ভাল গীতসংগ্রহ রচিত হয় নাই। এই গীতগোবিন্দে ভাল রূপ রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। কাজেই বুঝা যায় বাংলাদেশে তখন সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। সেই গীতগোবিন্দ শার্ঙ্গদেবের পূর্বেই রচিত। এমন অবস্থায় সেই যুগে বাংলা দেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের বড় বড় আচার্যও ছিলেন, এইরূপ আশা করা অন্যায় নহে। বহুদিন এইরূপ আচার্যের সন্ধান করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল সেইরূপ আচার্য আছেন। সেই আচার্যের নাম লোচন পণ্ডিত, এবং তাঁহার গ্রন্থের নাম রাগতরঙ্গিণী। এই গ্রন্থখানি ১৯১৮ সালে পুনা নগরে মুদ্রিত হয়। পণ্ডিত দত্তাত্রেয় কেশব যোশী মহাশয় গ্রন্থখানি প্রকাশিত করেন। ১৯২০ সালে সঙ্গীতমকরন্দ গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত মঙ্গেশ তেলঙ্গ মহাশয় ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের যে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থখানির নাম নাই, যদিও ইহা তাঁহাদেরই মণ্ডলীর একজন পণ্ডিতের দ্বারা দুই বৎসর পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। আসল কথা, গ্রন্থখানির দিকে তখন কাহারও তেমন কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থখানির মূল পুঁথিখানি পাওয়া যায় এলাহাবাদে। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ যোশী মহাশয় তাহা নকল করিয়া পুনাতে ছাপাইবার জন্য প্রেরণ করেন।

তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, লোচন পণ্ডিত কোন্ প্রদেশের লোক এবং কোন্ সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত। এই গ্রন্থমধ্যে দেশী ভাষার গানের নমুনা রূপে বিদ্যাপতির গান আছে। বিদ্যাপতি হইলেন মিথিলাপতি শিবসিংহের (১৩৯৯) আশ্রিত। তাহা ছাড়া রাগতরঙ্গিণীতে ইমন (পৃ. ৫,৭,১০), ফিরোদস্ত (পৃ. ৯) প্রভৃতি রাগের নাম আছে। এই সব রাগের নাম প্রথম দেখা দেয় অমীর খুসরুর সময়ে। খুসরু ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীনের সভাসদ্ (১২৯৫-১৩১৬)। এই সব দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিলেন লোচন পণ্ডিত চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। অথচ পুষ্পিকা শ্লোকের হিসাবে রাগতরঙ্গিণী আরও অনেক পূর্বেকার গ্রন্থ।

শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর এমন একখানি গ্রন্থ যে পরবর্তী ভারতীয় সব সঙ্গীতাচার্যই পূর্বাচার্যদের মধ্যে তাঁহার নাম না করিয়া পারেন নাই। লোচন পূর্বাচার্যদের মধ্যে শার্ঙ্গদেবের নাম করেন নাই। শার্ঙ্গদেবও লোচনের নাম করেন নাই। তবে লোচনের গ্রন্থ এতটা নাম করার মত গ্রন্থও নহে এবং তাহা বহু দূর দেশে অল্প পূর্বে লেখা।

মুসলমানী রাগ-তালের নাম আছে বলিয়া রাগতরঙ্গিণী পরবর্তীকালের বলিতে গেলে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরের কাল লইয়াও টানাটানি পড়ে। সঙ্গীতরত্নাকর যে-যাদবরাজ সিঙ্ঘণের আশ্রিত তাঁহার রাজত্বকাল পূর্বেই বলা হইয়াছে ১২১০ হইতে ১২৪৭। কাজেই তাঁহার গ্রন্থ ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইতে পারে না। অথচ সঙ্গীতরত্নাকরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুরষ্কতোড়ী, তুরষ্কগৌড় রাগ আছে। এই সব রাগ যদি অমীর খুসরুর হয় তবে তাহা ১২৯৫-১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। তবে এই সমস্যার মীমাংসা কি ?

---

১ Chintaharan Chakravarti, in Indian Historical Quarterly, Vol. III, pp. 186ff

আসল কথা, যে-সব শাস্ত্র সর্বদা ব্যবহার করিবার তাহাতে পরবর্তী সব প্রয়োগও অঙ্গীভূত না করিলে চলে না। তাই অনেক সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে পরবর্তী রোগ ও ঔষধের স্থান করিয়া লইতে হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রও সর্বদা ব্যবহার করিবার। তাই আসল গ্রন্থের মূল তত্ত্বকথার মাঝে মাঝে যোজন ও উদাহরণস্বরূপে পরবর্তীকালের রাগ ও গান লিখিত পুঁথিতে গৃহীত হইয়া থাকিবে।

লোচন পণ্ডিত বলেন, মার্গ এবং দেশী অর্থাৎ লোকপ্রচলিত গান দুই রকম। অর্থাৎ তাঁহার সময়েও এই ভেদটি ছিল।

মার্গদেশীবিভেদেন গীতং তু দ্বিবিধং মতম্।—পৃ. ২

তাহার পর উদাহরণস্বরূপে দেশপ্রচলিত

মিথিলাপভ্রংশভাষয়া
শ্রীবিদ্যাপতিকবিনিবদ্ধা মৈথিলগীতগতয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে।—পৃ. ২

ইহার পর পুঁথিতে যে মৈথিল গান ছিল তাহা দত্তাত্রেয় কেশব যোশী মহাশয় মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তকে বাদ দিয়াছেন। মূল সংস্কৃতটুকুই তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন।

লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীতে এবং শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরে, উভয় গ্রন্থেই আমরা কিছু কিছু মুসলমানী রাগরাগিণীর নাম পাই। তাহাতে হয় বলিতে হয় উভয় গ্রন্থই পরে রচিত, বা পরে এইগুলি প্রয়োজনবোধে সন্নিবেশিত অথবা মুসলমানী শাসন তৎতৎ প্রদেশে আসিবার পূর্বেই এই সব মুসলমানী রাগরাগিণী ভারতে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানী রাগনাম সত্ত্বেও যদি শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরকে আমরা তাঁহার উল্লিখিত আশ্রয়দাতার সময়কালেরই ধরিয়া লইতে পারিয়া থাকি তবে লোচনকেও তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজার কালেরই লোক ধরিয়া লইতে পারি। লোচনের রাজার কালের ও লোচনের দেশের কথা পরে বলা যাইবে।

তথাপি কেহ যদি লোচনকে তাঁহার পুষ্পিকা-বর্ণিত কালের সুযোগ না দিতে চাহেন, তবু কাছাকাছি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পুস্তকে সেই যুগে পরিজ্ঞাত বল্লাল সেনের সময় যে তা পাই ইহাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ হৃদয়নারায়ণ প্রভৃতি লোচনকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লোচন-কৃত আরও গ্রন্থ ছিল যাহা পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থেই তিনি তাঁহার রচিত 'রাগ-সঙ্গীতসংগ্রহ' গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন—

এতেষাং প্রপঞ্চস্তু মৎকৃতরাগসংগীতসংগ্রহে অন্বেষ্টব্যঃ।—পৃ. ২

এই গ্রন্থখানির কোনো সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। লোচন পণ্ডিতের সময়ে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে আরও বহুতর গ্রন্থ প্রচলিত ছিল (পৃ. ৮)।

স্বরসংস্থানসংজ্ঞা প্রকরণটি লোচন খুব বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা বিশেষজ্ঞদের কাছে আদরণীয় হইবে (পৃ ২, ৩)।

লোচনের মতে প্রাচ্য রাগ বারোটি। তাহাদের নাম ও লক্ষণ তিনি দিয়াছেন। ইহারাই জনক রাগ। ইহা হইতে বহু রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা জন্য রাগ। ভৈরবী হইতে দুইটি, গৌরী হইতে

সাতাশটি, কর্ণাট হইতে কুড়িটি, কেদার হইতে তেরটি, ইমন হইতে চারটি, সারঙ্গ হইতে পাঁচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাশ্রী হইতে দুইটি, টোড়ী-পূর্বা-মুখারী-দীপক এই প্রত্যেকটি হইতে এক-একটি, এই মোট ৮৬টি জন্য রাগ।

ইহাদের লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ অবরোহ তিনি লেখেন নাই। বলিয়াছেন সেগুলি অন্যত্র দেখিয়া লইতে, বিস্তরভয়ে লোচন এখানে তাহা লিখিলেন না—

এবং তত্তদ্রাগস্বরারোহাবরোহাস্ত্বন্যত্র দ্রষ্টব্যাঃ। ইহতু বিস্তরভয়ান্ন লিখিতাঃ।—পৃ. ৮

কাজেই দেখা যায় তখন সেই দেশে সাধারণে প্রচলিত 'আরোহ অবরোহ' দেখাইবার মত অন্য বহু গ্রন্থও প্রচলিত ছিল।

লোচনের আলোচিত সপ্ত শুদ্ধ স্বর দ্বাবিংশ শ্রুতির মধ্যে যথাস্থানেই অবস্থিত। তাঁহার উপদিষ্ট বিকৃত স্বর হইল শুদ্ধ স্বরেরই তীব্র বা কোমল রূপ। কাজেই শুদ্ধ স্বরই মুখ্য স্থানাধিকারী। অহোবল মিশ্রও তাঁহার সঙ্গীতপারিজাতে লোচনের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন। সঙ্গীতপারিজাত হইল উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের একটি মহারত্ন। সঙ্গীতপারিজাত লিখিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে পারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। অধ্যাপক হেমেন্দ্রলাল রায় তাঁহার Problems of Hindusthani Music গ্রন্থের পরিশিষ্টে লোচনের শ্রুতিবিচারের একটি কোষ্ঠক বা চার্ট দিয়াছেন। তাহাতে লোচনের শ্রুতি ও স্বর বিষয়ক সম্বন্ধবিচার প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হইয়াছে। লোচন শুদ্ধ সপ্ত স্বর ছাড়া কোমল ঋষভ, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতম মধ্যম, কোমল ধৈবত, তীব্রতর নিষাদকে কাকলি অর্থাৎ বিকৃত স্বর রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কেশব দত্তাত্রেয় যোশী মহাশয়ের গ্রন্থশেষেও এইরূপ একটি স্বরপত্রক আছে যাহাতে রাগতরঙ্গিণীর ভিতরের কথা কোষ্ঠকে দেখানো হইয়াছে। রাগতরঙ্গিণীর জন্য-জনক রাগপত্রকও যোশী মহাশয় রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থশেষে দিয়াছেন। পূরবাতে লোচন তীব্র ধৈবত ব্যবহার করিয়াছেন[২]। তালের কথায় লোচন বলিলেন চঞ্চৎপুট চাচপুটাদি। এই সব অতি প্রাচীন তাল (পৃ. ২)।

তাঁহার সময়েই ভৈরবী রাগে দুই রকম মত দাঁড়াইয়াছে। লোচনের মতে ভৈরবীতে শুদ্ধ সপ্ত স্বর হইবে। কিন্তু লোচনের সময়েই ভৈরবী রাগে কেহ কেহ ধৈবত কোমল ব্যবহার করিতেন। কিন্তু লোচনের এই ভৈরবী তত পছন্দসই ছিল না, কারণ তাহা অশুদ্ধ আর তাহারও পরের কথা তাহাতে রাগটি তেমন অনুরঞ্জকও হয় না—

অন্যে তু ভৈরবীরাগে কোমলং ধৈবতং বিদুঃ।
তদশুদ্ধং যতস্তাদৃক্ নায়ং রাগোঽনুরংজকঃ॥—পৃ. ৪

নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ সৃষ্ট হইত। সেই সব রাগ গুণীদের মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল। সেই সব সংকর রাগের মিশ্রণেও বহুতর সংকর রাগ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া তখনকার দিনের সঙ্গীতশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তাই লোচনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রকরণ হইল—

সকলদেশসাধারণ-গুণিগণপ্রসিদ্ধরাগসংকরাঃ।—পৃ. ৮-১২

ঠাসা ৯৭টি পংক্তিতে তিনি শুধু তাহাদের নাম ও জনক রাগের নাম দিয়াছেন। তাহাও হইল

২ Roy, Problems of Hindusthani Music, p. 135

"সকলসংগীতসিদ্ধা রাগসংকরাঃ" (পৃ. ১২)। ইহা ছাড়া নানা প্রদেশে নানা ঘরানায় গুণীদের মধ্যে আরও সব সংকর রাগের প্রচলন হয়তো ছিল।

কোন্ কোন্ রাগ কোন্ কোন্ সময়ে গেয় তাহার বিষয়েও লোচনের সময়েই মতভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাই তিনি প্রাচীন মতের কথা বলিতে গিয়া তুম্বুরু নাটক হইতে পুরাতন গান-কাল দিয়াছেন (পৃ. ১২); তার পর তাঁহার সময়কার পরবর্তী অর্বাচীন মতও তিনি দিয়াছেন (পৃ. ১৩)। এই দুই মতে তখনই এত ভেদ দাঁড়াইয়াছে যে এই দুই মতের সামঞ্জস্য সাধন করা তাঁহার মতেও তখন অসম্ভব ছিল।

তুম্বুরু নাটক প্রাচীন মতের হইলেও বেশ উদারদৃষ্টিসম্পন্ন। তাই বোধ হয় লোচন আগ্রহসহকারে এই মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তুম্বুরু নাটকে দেখা যায়, দেশভাষা যেমন একটু একটু ভেদে অনন্ত প্রকার তেমনি রাগও একটু একটু ভেদে অনন্ত প্রকারের। তাই রাগ ও তালের সীমা সংখ্যা দিয়া অন্ত করা অসম্ভব—

দেশভাষাবিভেদাশ্চ রাগসংখ্যা ন বিদ্যতে।
ন রাগাণাং ন তালানামন্তঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥—পৃ. ১৩

তুম্বুরু নাটক গ্রন্থ বোধ হয় পূর্বদেশীয়। কারণ ইহাতে দুর্গামহোৎসব এবং দেবীপক্ষে দুর্গামহোৎসব পর্যন্ত প্রভাতে গেয় আগমনীর মত গানের কথা আছে—

ইন্দুত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
প্রাতর্গেয়স্তু দেশাখো ললিতঃ পটমংজরী ॥—পৃ. ১২

গৌড় বঙ্গদেশে শাস্ত্রশাসনের বন্ধন একটু কম ছিল। তাই শাস্ত্রপন্থীরা এই দেশের এইরূপ উদারতাকে কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই। তুম্বুরু নাটকে সেই কারণেই শাস্ত্রানুসারে নহে স্বরবৈচিত্র্যের রঞ্জকতাবশতই রাগের সময় নির্দেশ করা হইয়াছিল—

যথা কালে সমারব্ধং গীতং ভবতি রংজকম্।
অতঃ স্বরস্য নিয়মাদ্ রাগেঽপি নিয়মঃ কৃতঃ ॥—পৃ. ১৩

তবে রঙ্গভূমিতে প্রকরণ অনুসারে সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রির গান গাহিতে হয়। রাজসভায় রাজার ইচ্ছায়ও সেইরূপ করিতে হয়। তাই রঙ্গভূমিতে ও রাজ-মজলিশে কালদোষ চলে না।

রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে।—পৃ. ১৩

লোচনের গ্রন্থে জনক ও জন্য রাগের আলোচনা করাতে মনে হয়, তিনি দক্ষিণী মতের কথা বলিতেছেন। বাংলা দেশে অস্থিমজ্জায় আছে দ্রবিড়। বাংলা দেশে সেন-রাজারা আবার আসিয়াছিলেন কর্ণাট হইতে। লোচন ছিলেন সেন-রাজাদের আশ্রিত। কাজেই দক্ষিণী মত তাঁহার গ্রন্থমধ্যে থাকিতে পারে। বাংলা দেশে কীর্তনের তালগুলিও উত্তর-ভারতের তালের সঙ্গে মেলে না।

যে সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান্ শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাঁট লইয়া আসেন। সেই বাঁট দেখিয়া আচার্য ভাতখণ্ডে বলেন, "এ কি ! এসব যে মালাবারের জিনিস !"

সুরতালে ও নৃত্যশাস্ত্রে প্রবীণ জয়দেব ছিলেন "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী"। গীতগোবিন্দে যে সব রাগের নাম পাই তাহা গুর্জরী, বসন্ত, মালব গৌড়, কর্ণাট, দেশাখ, দেবী বরাড়ী, গোণ্ডকিরী, মালব,

দেশবরাড়ী, ভৈরবী, রামকিরী, বরাড়ী, বিভাস। মহাপ্রভুর যুগের দশকুশী, লোফা প্রভৃতি তাল গীতগোবিন্দে নাই। গীতগোবিন্দের নিঃসার প্রভৃতি তালের নাম পরবর্তী যুগে নাই। নিঃসার, যতি, একতাল, রূপক, একতালী, অষ্টতাল গীতগোবিন্দে তাল রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নারায়ণ তীর্থের "কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী", ভদ্রাচলীয় রামদাস স্বামীর ভদ্রাচলীয় কীর্তন, ভক্ত পুরন্দর বিঠ্‌লের "দেবের নামস" প্রভৃতি কীর্তনগ্রন্থ গীতগোবিন্দের পদানুসরণ করিলেও আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃত কীর্তনসঙ্গীতে জয়দেবই একচ্ছত্র সম্রাট। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস এই তিনজনের কীর্তনে মহাপ্রভু বাঁচিয়া ছিলেন এবং বাংলার বৈষ্ণবদের এই তিনজনই প্রধান উপজীব্য।

সমস্ত ভারতে জয়দেবের সমাদরে বাংলার গৌরব। জয়দেব ছিলেন বঙ্গাধিপতি লক্ষণ সেনের সময়কার মানুষ। গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে জয়দেব যে কয়জন সমসাময়িক গুণীর নাম করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন উমাপতিধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন ও কবিরাজ ধোয়ী (শ্লোক ৪)। লোচন ছিলেন লক্ষণ সেনের পিতার যুগের মানুষ। আর কোনো প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য বাংলা দেশে জন্মিয়াছেন কিনা জানিনা, তবে ভট্টাচার্যকৃত নন্দদীপিকা গ্রন্থের কথা সঙ্গীতমকরন্দ গ্রন্থের পরিশিষ্টে মঙ্গেশ তেলঙ্গ মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

লোচন বাংলা দেশের লোক বলিয়াই "দুর্গামহোৎসবের" পূর্ববর্তী দেবীপক্ষে গেয় আগমনী গানের সুরগুলির কথা এত যত্নে তুম্বুরু নাটক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ইন্দুত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।—পৃ. ১২

এতক্ষণ যাহা আলোচিত হইল তাহাতে ইতিহাস-শাস্ত্রপন্থী ব্যক্তিগণের যথেষ্ট উৎসাহ না থাকিতেও পারে। কারণ, সঙ্গীত প্রভৃতি সরস বিষয় লইয়া তাঁহাদের কি কাজ? তাই এখন লোচন পণ্ডিতের সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ লইয়া ঐতিহাসিক স্থান ও কাল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। হল্‌দি বাঁটা যাঁহাদের কাজ তাঁহারা শালগ্রাম পাইলেও তাহা দিয়া হল্‌দি বাঁটিবেন। এবং হল্‌দি বাঁটিতে দেখিলেই তাঁহারা মনে করিবেন, এই দেখিতেছি শালগ্রামের যথার্থ ব্যবহার চলিয়াছে। র‍্যাফেলের চিত্র পাইলেও মুদি তাহাতে মশলাই বাঁধিবে। কাজেই আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে, এখন হল্‌দি বাঁটিতেই প্রবৃত্ত হইব।

এই রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থখানি আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক সমস্যার পূরণে যে বিশেষ সহায়তা দান করিতেছে তাহাই এখন দেখানো যাইতেছে। রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে "দশ দণ্ড" শব্দ প্রয়োগ দেখিয়া বিষ্ণু সুথতনকর মহাশয় মনে করিয়াছিলেন গ্রন্থকার বাংলা বা মিথিলা দেশের লোক (ভূমিকা, পৃ. ২)। আর সপ্তর্ষি-গণনার দ্বারা কালনির্দেশ দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয়তো লোচন কাশ্মীরের লোক (ভূমিকা, পৃ. ২)। কিন্তু "দণ্ড" শব্দ তো বঙ্গ মিথিলার বাহিরেও চলে। কাশী প্রভৃতি প্রদেশেও "দণ্ড" শব্দের প্রয়োগ আছে।

সপ্তর্ষি-গণনা কাশ্মীরে সমধিক প্রচলিত হইলেও ভারতের অন্যত্র তাহা অজ্ঞাত নহে। কাশীর কমলাকর ভট্ট তাঁহার তত্ত্ববিবেক গ্রন্থে সপ্তর্ষি-গণনার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, কাশীতেও তখন সপ্তর্ষি-গণনা জানা ছিল। সপ্তর্ষি-গণনার মতে ইহাই কল্পিত যে, সপ্তর্ষি প্রতি নক্ষত্রে একশত বৎসর থাকে। কাজেই এই গণনায় শত সংখ্যার স্থলে নক্ষত্রের নাম মাত্র করিয়া শেষ দুইটি

সংখ্যা অর্থাৎ দশক ও একক মাত্র দেওয়া হয়। এই সপ্তর্ষি-গণনাতেও দুই মত প্রচলিত। এক মতে কলিযুগের আগু হইতেই সপ্তর্ষি-গণনা ধরা হয়, দ্বিতীয় মতে কল্যব্দ হইতে ২৫ বৎসর বাদ দিয়া সপ্তর্ষি-গণনা শুরু হয়। কাশ্মীরে প্রথম মতটি খুব কম চলে। দ্বিতীয় মতেরই সেখানে সমাদর। কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মতের কথাই পাওয়া যায়। যথা—

লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্
সপ্তত্যাভ্যধিকং জাতং সহস্রং পরিবৎসরাং ॥—তরঙ্গ ১, শ্লোক ৫২

অর্থাৎ ১০৭০ শকাব্দে ২৪ লৌকিক সম্বৎ বা সপ্তর্ষি সম্বৎ ছিল, ইহাতে দ্বিতীয় মতই সমর্থিত। কাশ্মীরসংলগ্ন হিমালয়স্থিত চম্বা রাজ্যের পুরাতন লেখে ১৫৮২ শকাব্দে ৩৬ সপ্তর্ষি-সম্বৎ লিখিত। ইহাও দ্বিতীয় মতেরই সমর্থক। বুলারের উদ্ধৃত কাশ্মীরী পণ্ডিতসমাজসম্মত এই শ্লোকেও দ্বিতীয় মতেরই সমর্থন দেখা যায়।[৩]

কলের্গতৈঃ সায়কনেত্রবর্ষৈঃ
সপ্তর্ষিবর্যাস্ত্রিদিবং প্রযাতাঃ।
লোকে হি সংবৎসরপত্রিকায়াং
সপ্তর্ষিমানং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥

কাশ্মীরের বাহিরে যে সপ্তর্ষি-গণনা দেখা যায় তাহাতে কল্যব্দ হইতে প্রথম ২৫ বৎসর বাদ দেওয়ার প্রথা বড় একটা দেখা যায় না। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে দেখা যায় যখন সপ্তর্ষি বিশাখা নক্ষত্রে ছিল তখন ১০৮২ শকাব্দ—

ভুজবসুদশমিতশাকে···
বর্ষৈকষষ্টিভোগে
মুনয়স্ত্বাসন্ বিশাখায়াম্ ॥

১০৮২ শাকে কলিগতাব্দ ছিল ৪২৬১ বৎসর। প্রথম ২৭ নক্ষত্রের ২৭০০ বৎসর বাদ দিলে থাকে ১৫৬১ বৎসর, তাহার পরেও ১৫টি নক্ষত্র ১৫০০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তখন চলিয়াছে ষোড়শ নক্ষত্র বিশাখার কাল। বিশাখার ও স্থিতির ভোগের তখন একষট্টি বৎসর চলিতেছিল। তাহা হইলেই দেখা যায় লোচন-প্রোক্ত শকাব্দ এবং সপ্তর্ষি-গণনার কল্যব্দ ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। এই সপ্তর্ষি-গণনাতে কল্যব্দ হইতে পঁচিশ বৎসর বাদ দেওয়া হয় নাই। এই বাদ না দেওয়াটা কাশ্মীরের বাহিরেই বেশি প্রচলিত। তাই মনে হয়, লোচন বোধ হয় কাশ্মীরের বাহিরেই হইবেন। কাশ্মীরের বাহিরের হইলেও তিনি ঠিক কোথাকার লোক? "দণ্ড" শব্দের দ্বারা তাহার মীমাংসার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। এই উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকেই তিনি নিজেই তাহা সুন্দর সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। কারণ পূর্ণ শ্লোকটি এই—

ভুজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্‌বল্লালসেনরাজ্যাদৌ
বর্ষৈকষষ্টিভোগে মুনয়স্ত্বাসন্ বিশাখায়াম্ ॥—পৃ. ১৪

৩ মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা, "ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা", ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৬০

বল্লাল সেনের নাম জানিলে বিষ্ণু সুখতনকর মহাশয়ের আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত না। বল্লাল ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত রাজা। বাংলা দেশেও সপ্তর্ষি-গণনা ছিল। কাশ্মীরের সঙ্গে বাংলার অনেক যোগ ছিল। উভয় দেশেই পাণিনির স্থলে চলে কলাপ ব্যাকরণ। বৈদ্যকশাস্ত্রে তন্ত্রে ও শৈবাগমে বাংলার ও কাশ্মীরের চিরদিনই ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। উভয় দেশেই সেই একই টীকাটিপ্পনীর সমাদর। সপ্তর্ষি-গণনাতেও বাংলার যোগ আছে, তবে তাহা কল্যব্দ হইতে পঁচিশ বৎসরের বাদ না দিয়া।

বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময় লইয়া অনেক বিরোধ আছে। কাহারও মতে বল্লালপুত্র লক্ষ্মণের প্রবর্তিত লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে[৪]। ডাক্তার কীলহর্নের মতে তাহার আরম্ভ ১১১৮-১১১৯ সালে[৫]। অথচ বল্লালের প্রণীত দানসাগর রচিত হয় ১০৯০ শকাব্দে, এবং বল্লালের অদ্ভুতসাগর রচিত হয় ১০৯১ শকাব্দে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই দুইখানি গ্রন্থের রচনা তারিখেরই প্রামাণিকতা স্বীকার করেন।

লক্ষ্মণাব্দের সহিত বাংলা দেশের বল্লালসেন-লক্ষ্মণাদির সময়ের কোনো যোগ নাই। লক্ষ্মণাব্দ ধরিয়া কাজ করিতে গেলেই নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখাইয়াছেন, লক্ষ্মণাব্দ হইল বিহার প্রদেশের পীঠীপতি সেনরাজগণের প্রবর্তিত[৬]। ডি আর. ভাণ্ডারকর মহাশয় Inscription of Northern India প্রকরণে সেনরাজগণের নাম করিয়াছেন[৭] কিন্তু তাহাতে বল্লালের কোনো কাল দেওয়া হয় নাই।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই সকল কারণে এবং তখন ভাল তাম্রশাসনাদির সহায়তা না পাওয়ায় ভুল সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বল্লালের কাটোয়া তাম্রশাসন, লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন দেখিলে দেখা যায় তাহাতে উল্লিখিত গ্রামগুলির নাম পর্যন্ত এখনও মেলে। কাজেই সেই সব তাম্রশাসন আলোচনা করিলে ইতিহাসগত বিচারের ক্ষেত্রে প্রভূত উপকার পাওয়ার কথা।

লক্ষ্মণ সেনের আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায় পাবনা জেলায় মাধাইনগরে। 'ঐতিহাসিক চিত্র' (১৮৯৯, ১ম খণ্ড, পৃ ৯২-৯৪) পত্রে শ্রীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী তাহার এক পাঠ উদ্ধার করেন। তাহার পর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[৮] এবং এন. জি. মজুমদার[৯] তাহার উপর কিছু কাজ করেন। কিন্তু তাহাতে আরও কাজ করার অবকাশ আছে। মাধাইনগর শাসন লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যপ্রাপ্তির ২৫শ বৎসরে সম্পাদিত।

পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে

৪ J. Beames, Indian Antiquary, 1875, p. 300

৫ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলার ইতিহাস", প্রথম ভাগ, পৃ. ২৯১

৬ Dr. H. C. Ray Choudhuri, Sir Ashutosh Mukerji Jubilee Commemoration Volume, on Oriental Pt. II, Pp. 1-5

৭ Epigraphia Indica, Appendix, Vol XIX-XXII, p. 403

৮ J. A. S. B., 1909, pp. 467ff.

৯ Inscriptions of Bengal, Vol. III, Pp. 106ff.

লক্ষ্মণ সেন রাজা হয়েন[১০]। রাও বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয়ও জ্যোতিষী গণনার দ্বারা সেই মতকে সমর্থন করেন[১১]। লক্ষ্মণ-রাজত্বের ২৫শ বৎসর হইল ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কার্তিক মাসে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ নদীয়া আক্রমণ করেন[১২]। লক্ষ্মণ সেনের বয়স তখন আশি বৎসরের কাছাকাছি। তিনি নদীয়া ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে শ্রাবণ তারিখে সেখানে রাজ্যের দুর্গতি শান্তির জন্য ঐন্দ্রী মহাশান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্রমাসে এই যজ্ঞের দক্ষিণার জন্য ভূমিদানসূচক মাধাইনগর তাম্রশাসন সম্পাদিত হয়।[১৩] অদ্ভুতসাগরেও রাজ্যের দুর্গতিদূরকরণার্থে ঐন্দ্রী মহাশান্তি যাগের বিধান আছে।

লক্ষ্মণ সেনের আর একখানি তাম্রশাসন বহুকাল পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জয়দেবপুরের নিকটবর্তী ভাওয়ালের রাজাবাড়ি গ্রামে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাম্রশাসনখানি সেখানকার জমিদার লোকনারায়ণের হস্তগত হয়। লোকনারায়ণের পুত্র রাজা গোলোকনারায়ণ শাসনখানি ১৮২৯ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্‌টার্‌স্‌ সাহেবকে দেন। সঠিক পাঠোদ্ধারের জন্য ওয়াল্‌টার্‌স্‌ সাহেব তাহা এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী এইচ. এইচ. উইলসন্‌ সাহেবের কাছে পাঠান। তিনি ১৮২৯ সালে ৬ই মে সোসাইটির সভাতে এই শাসনখানি সম্বন্ধে কিছু বলেন। ১৮৩৩ সালে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিয়ান হইয়া উইলসন্‌ সাহেব যখন যান তখন বোধ হয় এই শাসনখানি সঙ্গে লইয়া যান। সেখানে তাহা প্রায় একশত বৎসর উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া থাকে।

ষাট বৎসর পূর্বে লিখিত নবীনচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের ভাওয়ালের ইতিহাসে এই তাম্রশাসনখানির উল্লেখ ছিল। অথচ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং জেনারল কানিংহাম সেন রাজাদের সময়বিচারের সময় এই তাম্রশাসনখানির খোঁজ পান নাই। নবীনচন্দ্র ভদ্র মহাশয় ষাট বৎসর পূর্বে যে ভাওয়ালের ইতিহাস লেখেন তাহাতে এই হারানো তাম্রশাসনের কথার উল্লেখ করেন। তাহা দেখিয়া ঢাকা ম্যুজিয়ামের সুযোগ্য ক্যুরেটর শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইহার খোঁজে প্রবৃত্ত হন। ঢাকা বিভাগের কমিশনার জে ডি. র‍্যান্‌কিন্‌ ছিলেন ঢাকা ম্যুজিয়ামের প্রেসিডেণ্ট। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত এশিয়াটিক জর্নাল অ্যাণ্ড মন্থলি রেজিস্টার[১৪] একখণ্ড র‍্যান্‌কিন্‌ সাহেব ভট্টশালী মহাশয়কে দেখান। তাহাতে ১৮২৯ সালের ৬ই মে তারিখের এশিয়াটিক সোসাইটির সভার এক রিপোর্ট ছিল। সেই রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া ভট্টশালী মহাশয় ১৯২৭ সালের ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টালিতে এক উপাদেয় প্রবন্ধ লেখেন (পৃ. ৮৯)। ১৭৯০ সালে প্রাপ্ত, ১৮২৯ সালে উল্লিখিত প্রবন্ধের পুনরালোচনা হইল ১৯২৭ সালে। দুই আলোচনার মধ্যেও প্রায় একশত বৎসরের ব্যবধান। ভট্টশালী মহাশয়[১৫] বহু বিচারের পর এই বিষয়ের সুন্দর

---

১০ Indian Historical Quarterly, Vol. III. Pp. 186ff.

১১ Epigraphia Indica, XXI, Pp. 215-216; Arch. Survey Report, 1934-35, p. 69

১২ Nalini Kanta Bhattasali, Parganati Era, Indian Antiquary, 1923

১৩ Bhattasali J. R. A. S. B., Vol. VIII, 1942, No 1, pp, 18-20

১৪ Vol. XXVIII, July-December, 1929 p. 709

১৫ J. A. S. B. Vol. VIII, 1942, No. 1

সিদ্ধান্ত করেন, তাহাতে দেখানো হয় শাসনখানি রাজা লক্ষ্মণসেনের। মাধাইনগরের শাসনের ইহা অনুরূপ এবং লক্ষ্মণ সেনের ২৭শ রাজ্যাব্দে ইহা সম্পাদিত।

ইহার পরে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লিতে (পৃ ৩০০) ডাক্তার এইচ এন. র‍্যাণ্ডেল এক প্রবন্ধ লেখেন। র‍্যাণ্ডেল সাহেব ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ভার পাইয়া এক সিন্দুকে আবদ্ধ চব্বিশ খানি তাম্রশাসন পান। তাহার মধ্যে এইখানিও ছিল। পরে অনেক চেষ্টায় তাম্রশাসনখানি ভট্টশালী মহাশয়ের হাতে আসে (ঐ, পৃ. ২-৩)।

এই রাজাবাড়ী শাসনে দেখা যায় লক্ষ্মণ সেন ছেলেখেলার মত বাল্যকালে গৌড়েশ্বরকে হটাইয়া দেন (ঐ, পৃ ২৩)। দেবপাড়া শাসনে আছে লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন। বিজয় সেন ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হইতে প্রায় ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (ঐ)। তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন প্রায় ১১৬০ খ্রীঃ হইতে ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য করেন। ১১৬১ সালে গোবিন্দ পাল বল্লালের হাতে পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন (ঐ)। বিজয় সেন পালদের পরাস্ত করিয়া বরেন্দ্রের বহু স্থান অধিকার করেন। অদূর মন্দিরবাসী প্রদ্যুম্নেশ্বরই তাহার সাক্ষী। এই যুদ্ধ খুব সম্ভব ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। হয় তো তরুণ লক্ষ্মণ সেনও সেই যুদ্ধেই যোগ দিয়াছিলেন (ঐ)। তাহাতেই রাজাবাড়ী তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে—

দৃপ্যদ্ গৌড়েশ্বরশ্রীহটচরণকলা যস্য কৌমারকেলিঃ॥ —১৯শ পংক্তি

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ছাব্বিশ মাইল উত্তরে নিমদীঘীতে পাল ও সেন রাজাদের মধ্যে এই যুদ্ধ ঘটে। তৃতীয় গোপাল ইহাতে প্রাণদান করেন।[১৬]

রাজাবাড়ীর তাম্রশাসনখানি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ২৭শ বৎসরে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক মাসে সম্পাদিত। কাজেই দেখা যাইতেছে বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস লক্ষ্মণ রাজত্বের ২৭শ বৎসরে ১১২৭ শকাব্দে যে সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলন করেন তাহাতে ঐতিহাসিক অসঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। আমার অগ্রজোপম সতীর্থ শ্রদ্ধেয় রামাবতার শর্মা এই সদুক্তিকর্ণামৃতের সম্পাদন আরম্ভ করেন[১৭] এবং পরে আমাদের বিদ্যাভবনের সুযোগ্য ছাত্র হরদত্ত শর্মা তাহা সমাপ্ত করেন। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থখানি তখনকার দিনের একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহগ্রন্থ। সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রস্তাবনার মধ্যেই শ্রীধরদাস লক্ষ্মণ সেনের নাম করিয়াছেন। ইহার পূর্বে বৌদ্ধভক্ত কবির সংগৃহীত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় গ্রন্থও বাংলা দেশেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাহার সময় সম্ভবত একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দী। দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত মাত্র একখানি পুঁথি হইতে ১৯১১ সালে এফ. ডব্‌লিউ টমাস বাংলা এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন। লোচন পণ্ডিত বাংলা দেশেই যে তাঁহার রাগতরঙ্গিণী রচনা করেন তাহাও বাংলা দেশেরই গৌরব।

লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গের পথে কামরূপের দিকে যাত্রা করেন। কিছুকাল তিনি শীতললক্ষ্যা তীরে ধার্য গ্রামে বাস করেন। সেই পুরাতন ধার্য গ্রামের নিকটেই এখনকার রাজাবাড়ী গ্রাম। এখনকার ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালের মধ্যে ইহা অবস্থিত।

---

১৬ Bhattasali, Indian Historical Quarterly, XVII, pp. 207ff.

১৭ A. S. B., 1912.

এই রাজাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানিতে উক্ত স্থান ও নদী প্রভৃতির পরিচয় এখনও যে রাজাবাড়ী গ্রামের আশেপাশে পাওয়া যায় তাহা ভট্টশালী মহাশয় মানচিত্রাদিসহ সুন্দররূপে একে একে দেখাইয়াছেন।[১৮] এইখানেই রাজধানী ধার্যগ্রাম হইতে বল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত (ঐ, পৃ. ৩৩) মহারাজাধিরাজশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বাগুনা আবৃত্তিতে স্থিত বসুশ্রী চতুরকের (ঐ, পৃ ৩৫) ভূভাগ দান করিতেছেন। দানের পাত্র হইলেন কৃষ্ণদেব শর্মার প্রপৌত্র, জয়দেব শর্মার পৌত্র, মহাদেব দেবশর্মার পুত্র মোদ্গল্ল্য (মৌদ্গল্য)-গোত্রজ্ঞ সামবেদ-কৌথুমশাখাচরণাবধায়ী পাঠক শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্মা। দেখা যাইতেছে ঢাকা জেলায় ভাওয়ালকে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ধরা হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনখানির ২৯শ পংক্তিতে সমাপ্তি বাক্যে আছে "সং ২৭। কা দিনে ৬" অর্থাৎ ২৭শ রাজ্যাব্দের ৬ই কার্তিক তারিখে। তাহাতেই দেখা যায় সদুক্তিকর্ণামৃতের পুষ্পিকা শ্লোকে ঠিকঠাক দিনই উল্লিখিত হইয়াছে।[১৯]

শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেঽব্দে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুন বিংশেষু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥

ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়াটার্লি পত্রে যেখানে[২০] শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ সালে রাজ্যারম্ভ করেন, সদুক্তিকর্ণামৃতের এই শ্লোকটি তিনি সেখানেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণ রাজ্যাব্দের ২৭শ বৎসরে সৌর ফাল্গুনের ২০শ দিবসে সদুক্তিকর্ণামৃত রচিত হয়। কাজেই দেখ যায় রাজাবাড়ী তাম্রশাসন এবং সদুক্তিকর্ণামৃত উভয়ই লক্ষ্মণরাজ্যাব্দের ২৭শ বৎসরে সম্পাদিত। তবে তাম্রশাসনখানি সম্পাদিত হয় কার্তিক মাসে (১২০৪ খ্রীঃ), সদুক্তিকর্ণামৃত সমাপ্ত হয় ফাল্গুনে (১২০৫)। কাজেই আমাদের হিসাবে একই বৎসরে হইলেও ইংরাজি হিসাবে পর বৎসরে। রাজাবাড়ী তাম্রশাসন ও সদুক্তিকর্ণামৃত উভয়েই উভয়কে সমর্থন করে। তখন লক্ষ্মণ সেন অতি বৃদ্ধ। তাঁহার তখন ৮৩ বৎসর বয়স হইয়াছে। ইহার পর আর কয় বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু রাজার এই শেষকালের তাম্রশাসনখানি যদি পরে রাজপুরুষগণের দ্বারা মান্য না হয় সেই ভয়ে খুব সম্ভব দানগ্রহীতা পদ্মনাভ কয়েকবার এই দান সমর্থন করাইয়া লইয়াছেন। তাই তাম্রশাসনখানিতে খোদিত আছে "শ্রী নি" (দানসাক্ষী দেবতার নাম), "মহাসাং নি" (মহাসান্ধিবিগ্রহিক), "শ্রীমদ্‌রাজ নি" (রাজা স্বয়ং), "শ্রীমদনশঙ্কর নি" (রাজার বিরুদ), "সাহসমল্ল" (বোধহয় যুবরাজ)। একই তাম্রশাসনে এতবার সমর্থন করানো আর কোথাও দেখা যায় না।[২১]

---

১৮ J. R. A. S. B. Vol. III, 1942 pp. 1, Pp. 6-14

১৯ Indian Historical Quarterly, 1927, p. 188

২০ Indian Historical Quarterly, 1927, Pp. 186-189

২১ J. R. A. S. B. Vol. III, 1942, 1931, Pp. 22-23

বল্লালের দানসাগর রচিত হয় ১০৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই দানসাগরের রচনাকালও ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে বল্লালের রাজ্যারম্ভকাল ইহা সমর্থন করে। ১০৮৯ শকাব্দে বল্লাল সেন তাঁহার অদ্ভুতসাগর রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থের শেষ অংশ বল্লালপুত্র লক্ষ্মণ সেন সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থখানি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত মুরলীধর ঝা প্রকাশিত করেন (প্রভাকরী কোম্পানী, কাশী, ১৯০৫)। এই পুস্তকেও বল্লালরাজ্যারম্ভ কাল যে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ তাহার সমর্থন পাই। রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে এই মতই সমর্থন করেন[২২]। ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও এই কালই মান্য করিয়াছেন।[২৩] ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর সমর্থনের কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাজেই নানাভাবেই দেখা যায় ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দেই বল্লাল সেনের রাজ্যারম্ভ কাল এবং ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার সমাপ্তি। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন রাজ্যপ্রাপ্ত হন।[২৪] এইসব প্রমাণে দেখা যায় বল্লাল-পিতা বিজয় সেন ১০৯৫ হইতে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করেন। ১১৬০-১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বল্লাল রাজত্ব করেন (ঐ, পৃ. ২৩)। ১১৭৮ হইতে লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেন, ১২০৫ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বের সাক্ষ্য মেলে। তাহার পর আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

বল্লাল রাজ্যপ্রাপ্তির খ্রীষ্টাব্দ যদি ১১৬০ হয় তবে তাহা শকবৎসরে দাঁড়ায় ১০৮২ অব্দ।

এই সব প্রমাণের সঙ্গে আর-একটি নূতন প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে—লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থের পুষ্পিকা-শ্লোকের প্রমাণ। তিনিও বলেন—

ভুজবসুদশমিতশাকে
শ্রীমদ্‌বল্লালসেনরাজ্যাদৌ।
বর্ষৈকষষ্টিভোগে
মুনয়স্ত্বাসন্‌ বিশাখায়াম্‌॥

ইহাতেও সূচিত হয় ১০৮২ শকাব্দ। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে সেই বৎসর কলিগতাব্দ ছিল ৩২৬১। সপ্তর্ষি-গণনামতে প্রথম ২৭ নক্ষত্রের ২৭০০ বাদ দিলে দাঁড়ায় বাকি ১৫৬১। আবার ১৫টি নক্ষত্র বাদ দিলে ১৫০০ বৎসর। তবেই দেখা যায় ১৬শ নক্ষত্র বিশাখার তখন চলিতেছিল ৬১ বৎসর। তাহাতে শকাব্দ ও কলিগতাব্দ ঠিকঠাক মিলিয়া গেল। এই হিসাবও পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই ১০৮২ শকাব্দ ছিল বল্লাল সেনের রাজ্যাদি—"শ্রীমদ্‌বল্লালসেনরাজ্যাদৌ"। কাজেই পূর্ববর্তী সব প্রমাণকেই আবার সমর্থন করিল লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীর এই পুষ্পিকা শ্লোক। বোধহয় বল্লাল রাজ্যপ্রাপ্তির শুভদিনে রাজসভায় সঙ্গীতগুরু তাঁহার এই নবরচিত পুস্তকখানি উৎসবোচিত উপহারের মত সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

বৈদিক ও পৌরাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রের পরে যে দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গীতশাস্ত্র পাই তাহার পরে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রথম আচার্যের গ্রন্থ পাই এই লোচনপণ্ডিতকৃত রাগতরঙ্গিণী। ইহার পরে আসিল মহা আচার্য শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরের যুগ (১২১০-১২১৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

---

২২ Chronology of the Sen Kings, J. R. A. S. B., 1921, Pp. 6-16

২৩ Sir Ashutosh Mukherjee Jubilee Commemoration Volume, on Oriental Pt. II. p. 1-5

২৪ J. R. A. S. B., Vol. VIII. 1942, No. 1, Pp. 22-23

রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঋতুচক্র

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের নাটকের তিনটি ধাপ আছে।

প্রথম ধাপে কতকগুলি নাটক যাহাতে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া মানব পাত্রপাত্রী; প্রকৃতি তাহাতে অল্পই স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ধাপে কতকগুলি নাটক. প্রত্যক্ষত যাহার পাত্রপাত্রী প্রকৃতি—মানুষের কথা তাহাতে কেবল ব্যঞ্জনাতেই ধ্বনিত। মাঝখানে একটা ধাপ আছে, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহাকে মানব ও প্রকৃতির সীমান্তপ্রদেশ বলা চলিতে পারে; প্রথম ধাপের মানবীয় গুরুত্ব কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও তৃতীয় ধাপের প্রাকৃতিক প্রাধান্য শুরু হয় নাই। প্রকৃতি এখনো পটভূমিতে পড়িয়া আছে। কিন্তু সে পটভূমি নির্জীব ও—অর্থহীন নহে। এই নাটকগুলি পড়িলে মনে হয় কবির নাট্যজগতে একটি প্রধান চরিত্র প্রবেশের মুখে এখনো তাহার সবটা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই; এখনো সে নেপথ্যের আড়ালে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার দূরাগত পায়ের শব্দ, উত্তরীয়ের আভাস, চুলের সুগন্ধ, সুরের মূর্ছনা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এইসব নাটকে প্রকৃতি পটভূমিতে আছে বটে, কিন্তু সে নিজে পটভূমি নয়—কবির ইঙ্গিত পাইলেই মানবচরিত্রকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া নিজে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া বসিবে। তৃতীয় ধাপের নাটকে প্রকৃতির তরুলতা, নদী, বায়ু, চন্দ্র, মেঘ এবং ঋতুপর্যায় যেমন মূর্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, এখনো তেমন ঘটে নাই; এখনো প্রকৃতি মানব-পরিবেশের বাহিরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই আছে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে তাহার ভাব-বিনিময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, মানুষের সুখদুঃখের ছায়া তাহার দর্পণে বিম্বিত, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে সচেতন; কেবল মানুষের জীবনের মধ্যে যেসব বস্তু নিরর্থক বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত পরিপূরক ভাবে দেখিলে তাহা অর্থদ্যোতক হইয়া ওঠে; মানুষ যে স্বয়ম্পূর্ণ নয়—এমন কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িয়া যায়, এবং বিদ্যুৎ-বিকাশের ক্ষণিকতায় দেখিতে পাওয়া যায় মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয়াই জগৎটা সম্পূর্ণ।

একমাত্র মানব-পরিবেশের ধ্যানেই মানব-জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে, এমন কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ আছে; মানব-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আতিশয্যজাত সংকীর্ণতা হইতে ইহার উৎপত্তি। সৌভাগ্য-বশত ভারতীয় কবিদের চিত্তকে এই উগ্র সূক্ষ্মতা বিদ্ধ করিতে পারে নাই। প্রাচীনদের মধ্যে কালিদাস ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শকুন্তলার তপোবন কেবল প্রাকৃতিক পটভূমি মাত্র নয়—তাহার প্রাকৃতিকত্ব রক্ষা করিয়াও কবি তাহাকে সজীব সহৃদয় করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

> আমি মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ছিল না।
>
> —কাব্যের উপেক্ষিতা, 'প্রাচীন সাহিত্য'

কিন্তু একথা মনে করাও অসংগত নয় যে, তপোবনবিচ্যুতা শকুন্তলাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই দুষ্যন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি হয়তো ইহাই বলিতে চান যে, প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ, প্রকৃতি হইতে খণ্ডিত মানুষ নিরর্থক—এত নিরর্থক যে তাহাকে চিনিতেই পারা যায় না।

শকুন্তলাতে প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে তাহা সজীব সহৃদয় কিন্তু তাহা প্রকৃতিই রহিয়া গিয়াছে— তাহাকে মানবরূপ দিয়া রূপক নাটকের পাত্রপাত্রী সাজানো হয় নাই।

> …তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতর যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া, এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই। —শকুন্তলা, 'প্রাচীন সাহিত্য'

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ধাপের নাটকে প্রকৃতি প্রকৃতিই থাকিয়া সজীব, সহৃদয় এবং মানব জীবনের মধ্যে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে তাঁহার তৃতীয় ধাপের অধিকাংশ নাটক রূপক নাটকের ঠাটে রচিত, তাহাতে প্রকৃতির মুখে কথা ও গান বসানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপে নয়খানি নাটক আছে—অচলায়তন, বিসর্জন, শারদোৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী, এবং রাজা ও রানী, তপতী। তপতীকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই কয়খানি নাটক মনোযোগ দিয়া পড়িলে দেখা যাইবে—ইহার ভিতর দিয়া বৎসরের ঋতুচক্র ঘুরিয়া আসিয়াছে—এবং এই আবর্তন গতানুগতিক মাত্র নয়—প্রত্যেক নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে এক-একটি ঋতুর ভাবসংযোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ নাটকের মানব পাত্রপাত্রীর জীবনে যে লীলা চলিতেছে প্রকৃতির পরিবেশে সেই একই ভাবের লীলা—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক; ভারতীয় কবির প্রকৃতির নখদন্ত হইতে জীবরক্তের ধারা ঝরিয়া পড়ে না।

অচলায়তন নাটকের ঘটনাকাল গ্রীষ্ম, ইহার অন্ত্যভাগে নববর্ষার সমাগম।

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক; ইহার নাটকীয় চরম মুহূর্ত শ্রাবণের শেষ দুইদিনে সংঘটিত; শেষতম দৃশ্যটির সময় শরতের প্রথম প্রভাত।

শারদোৎসব বলা বাহুল্য শরৎকালের নাটক—কিন্তু সে-শরৎ আগমনীর শরৎ, অর্থাৎ ঋতুর প্রথম অংশ। ডাকঘরও শরৎকালের নাটক বটে কিন্তু সে-শরতে বিজয়ার বিষাদের সুর লাগিয়াছে, কখন শরৎ অজ্ঞাতসারে হেমন্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

রক্তকরবীর সময় হেমন্তের শেষ এবং শীতের প্রারম্ভ; ইহাকে পৌষমাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বসন্তকালের নাটক রাজা ও রানী, রাজা এবং ফাল্গুনী।

এমনি করিয়া এই কয়খানি নাটকের ভিতর দিয়া ঋতুচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।

এইবারে দেখা যাক নাটকগুলিতে মানবলীলা ও ঋতুলীলার ভাবের কি রাখী-বিনিময় হইয়াছে।

গ্রীষ্ম-বর্ষা: অচলায়তন

অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম ও বৃথা আচারের আবর্তনে অচলায়তনের অধিবাসীদের মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বাহিরের গ্রীষ্মের কঠোরতার যে লীলা চলিতেছে অচলায়তনিকদের মনেও সেই একই লীলা। গ্রীষ্ম যতই

দুঃসহ হোক তার পরে বর্ষার স্নিগ্ধতা আছে একথা সত্য বটে, কিন্তু গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দুঃসহতার মধ্যে মনে হয় বুঝি ইহার আর শেষ নাই, বুঝি ইহাই একমাত্র প্রকৃতির বিধান, বুঝি ইহাই আদি এবং অন্ত।

মহাপঞ্চকের ঠিক ইহাই মনের কথা। সে অচলায়তনের ক্রিয়াকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে বড়ো আর কিছু জানে না—এই গণ্ডীর বাহিরে যে একটা বৃহৎ জগৎ আছে তাহাও বোধ করি ভালো করিয়া মানে না। সে আচারের তাপে শুষ্ক হইতে হইতে একটি সজীব রুদ্রাক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই শুষ্ক রুদ্রতারও একটা শক্তি আছে; মহাপঞ্চকের সংকীর্ণ নিষ্ঠা তাহাকে সেই শক্তি দান করিয়াছে। এই শক্তির বলেই গুরু যখন অপ্রত্যাশিত পথে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া আসিলেন—তখন একমাত্র মহাপঞ্চকই গুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সাহস করিয়াছে।

মহাপঞ্চক গুরুকে বলিতেছে :

মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনি ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির ক'রে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় ক'রে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির ক'রে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল ব'লে বোধ হচ্ছে।...

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ ক'রে এই বসলুম, যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক ক'রে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

মহাপঞ্চক মূর্তিমান গ্রীষ্ম; গ্রীষ্মের শুষ্কতা ও শক্তি দুই-ই তাহাতে আছে; আচারের অনুবর্তন তাহাকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে বটে কিন্তু তাহার ফলেই সে সংহত হইয়া উঠিয়া শক্ত হইয়াছে। এই শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই গুরু তাহাকে পছন্দ না করিলেও শ্রদ্ধা করিয়াছেন; কিন্তু উপাধ্যায় প্রভৃতি আর যেসব অভাজন এখানে আছে, যাহারা আচারপালনে কেবল ক্ষুদ্রই হইয়াছে, শক্তিমান হয় নাই—গুরু তাহাদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় পর্যন্ত করেন নাই।

এই গেল গ্রীষ্মের একটা রূপ। তার পরে আছেন অচলায়তনের আচার্য। বাহিরের গ্রীষ্মের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সামঞ্জস্য আছে—তাঁহার হৃদয়ও শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আছে; তিনি জানেন জীবনে আচার আছে, আনন্দও আছে; বর্ষা আপন নিয়মে আসে—আনন্দ

কেমন করিয়া আসে আচার্য জানেন না। অচলায়তনের ক্রিয়াকর্ম যে সমস্তই ব্যর্থ তাহা তিনি জানেন—এ সমস্ত ছাড়িয়া আনন্দের সন্ধান করা উচিত বুদ্ধির বলে তাহাও বুঝিতে পারেন—কিন্তু অভ্যাসের গণ্ডী তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আচার ও আনন্দ, অভ্যাস ও সহজ স্ফূর্তি, গ্রীষ্মের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও নববর্ষার উদার স্নিগ্ধতার মধ্যে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত। তাঁহার চরিত্রে ট্রাজেডির উপকরণ কিছু কিছু আছে। একদিকে তিনি মহাপঞ্চকের নিঃসংশয় সংকীর্ণতাকে ঈর্ষা করেন, আর একদিকে পঞ্চকের অকুতোভয় উদ্দামতাকে কামনা করেন।

আচার্য জানেন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা অবশ্যই আসিবে—কিন্তু কেমন করিয়া আসিবে, কবে আসিবে জানেন না—শুষ্ক অচলায়তন ও শুষ্কতর হৃদয়ের উপরে নববর্ষা-সমাগমের আশায় তিনি অধীর উন্মুখ হইয়া আছেন।

আচার্য ব্রহ্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

> জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

এই কাতরোক্তিতে আছে বর্ষার আহ্বান, নূতন প্রাণের সরস বর্ষার আহ্বান। গুরু যখন আসিলেন তিনি একাধারে বাহিরের বর্ষা ও মনের বর্ষণ সঙ্গে করিয়াই আনিলেন। তাঁহার আগমনে অচলায়তন স্নিগ্ধ হইল—মন সরস হইল; বাহিরের বর্ষা ও রসের বর্ষণ পরস্পরের পরিপূরক হইয়া নূতন অর্থ লাভ করিল।

অচলায়তনের শুষ্কতার মধ্যে যুবক পঞ্চক নববর্ষার দূত। আয়তনের হৃদয়হীন মূঢ়তা তাহাকে নীরস করিয়া ফেলে নাই—আচারের অত্যাচার হইতে সে যে শুধু নিজেকে রক্ষা করিয়াছে তাহা নয়, অপর সকলকেও ইহার বিরুদ্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। রসের অভাবে আচার্যের হৃদয় যখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে পঞ্চক তখন নববর্ষার আহ্বান ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে :

> তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে, আজ নৃত্য কর্‌ রে নৃত্য কর্‌।

অচলায়তনিকদের মধ্যে একমাত্র পঞ্চকই জানে যে বর্ষাতেই মুক্তি, রসের বর্ষণেই অচলায়তনের শুষ্কতা দূর হইবে—এবং সে বর্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দাদাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ উপলক্ষ্যে পঞ্চক বলিতেছে :

> ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।

এই যে শুষ্কতা তাহা কেবল গ্রীষ্মের নয়, রসাভাবের, যে রসাভাবকেই অচলায়তন সিদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; এই যে বর্ষা তাহা কেবল ঋতুবিশেষের নয়, তাহা মনের, যে লক্ষ্যের দিকে অভিচালিত

করিবার জন্য গুরুর আগমন আসন্ন; পঞ্চক সহজাত বুদ্ধির বলেই জানে যে সরসতাতেই মুক্তি, আনন্দই লক্ষ্য।

গ্রীষ্মের তাপ যখন চরমে ওঠে তখন বর্ষণ নামে; অচলায়তনের শুষ্কতা যখন এতদূর হইয়াছে যে বিনাদোষে বালক সুভদ্রকে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের আসনে বসাইতে উদ্যত; চণ্ডক নামে শোণাপাংশু যুবককে তপস্যা করিবার অপরাধে অচলায়তনের রাজা নিহত করিলেন, তখন বর্ষণ নামিল। গুরু অচলায়তনে আসিলেন—সঙ্গে বর্ষণ আসিল, বাহিরে বর্ষাঋতু, মনে রসের বর্ষণ; মনে মুক্তির উদার গম্ভীর মেঘ-গর্জন।

আচার্য ও পঞ্চক দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত। এদিকে অচলায়তনে গুরু প্রবেশ করিয়াছেন। গুরুর আগমন ও বর্ষার অবতরণ—পঞ্চক ও আচার্যের মনে একার্থক।

> পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ ক'রে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পরে বজ্র। আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।
>
> আচার্য। ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপন-দেখা বৃষ্টি।
>
> পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

গুরু আচার্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য দর্ভকপল্লীতে আসিয়াছেন। আচার্য তাঁহাকে বলিলেন:

> আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের ক'রে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাইনে—আমাকে একটু রস দাও।
>
> দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা? এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ দুর্যোগ একে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক্‌না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

বর্ষায় তো মুক্তি আসিল—কিন্তু অচলায়তনের কি ব্যবস্থা করিলেন? তিনি মহাপঞ্চককে বিদায় দিলেন না—কেবল পঞ্চককে আয়তনের আচার্য করিয়া দিলেন। মহাপঞ্চক জীবনের কঠোরতার প্রতীক—পঞ্চক প্রতীক রসের; জীবনের পক্ষে দুটিরই প্রয়োজন সমান। আবার মহাপঞ্চক ও পঞ্চক সহোদর ভ্রাতা। এই সম্বন্ধের দ্বারা কবি বলিতে চান যে কঠোরতা ও সরসতার মধ্যে সত্যকার বিরুদ্ধতা নাই; বরঞ্চ প্রচ্ছন্ন প্রেমের সম্বন্ধই আছে, নাড়ীর যোগ আছে; কেবল দৃষ্টিদোষের জন্যই তাহাদের পরস্পরবিরোধী মনে হয়, এবং দৃষ্টির অস্বাভবিকতা ঘুচিয়া গেলে তাহাদের সহোদরত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। অচলায়তনিকরা রসের দিকটা একেবারে উপেক্ষা করিয়া কঠোরতার সাধনায় হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিল—সাধনার এই হেরফের ঘুচাইবার জন্যই গুরুর আবির্ভাব। গ্রীষ্মকালের খরতাপে এই নাটকের আরম্ভ, নববর্ষার স্নিগ্ধতায় ইহার অবসান; গ্রীষ্ম ও বর্ষা, কঠোরতা ও সরসতা, মহাপঞ্চক ও পঞ্চক মিলিয়া মানবজীবনের সাধনার পরিপূর্ণ রূপ।

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক—কেবল তাহার নাটকীয়তার চূড়ান্ত শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষাকালের শেষরাত্রে ঘটিয়াছে; পরের দিন অর্থাৎ শরতের প্রথম প্রভাতে ইহার অবসান।

বর্ষা-শরৎ : বিসর্জন

বিসর্জনের মত মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ নাটকে বর্ষার লীলা প্রকাশের অবসর অত্যন্ত অল্প— যেটুকু বা আছে তাহাও যেন কবি তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই। জয়সিংহের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বর্ষার মেঘাড়ম্বরে, অবিশ্রাম বর্ষণে, বিদ্যুৎ-চমকে, বজ্রাঘাতে ও গর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ ছিল। জয়সিংহের হৃদয়ের সরসতা ও আবেগ বর্ষার স্নিগ্ধতা ও শ্যামশ্রীর দোসর। বিসর্জন নাটকে কবি এই সুযোগ গ্রহণ না করিলেও রাজর্ষি উপন্যাসে করিয়াছেন।

> তাঁহার [জয়সিংহের] আরো সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যাম বল্লরীর পল্লব-স্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ সকল প্রাণের কথা, ভালোবাসার কথা বড়ো কেহ একটা জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।
>
> মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দ— কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে। —রাজর্ষি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিসর্জন নাটকে এসব কিছুই নাই—বোধকরি নাটকে ইহার স্থানও নাই; রাজর্ষির জয়সিংহের প্রকৃতি-প্রীতি বিসর্জনে অপর্ণার প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে; রাজর্ষির প্রকৃতি বিসর্জনের অপর্ণা।

ধ্রুবকে হত্যা-চেষ্টার অপরাধে রঘুপতির নির্বাসনদণ্ড হইয়াছে—তখন রঘুপতি রাজাকে বলিলেন :

> আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
> নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
> তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর
> শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তার পরে
> শরতের প্রথম প্রত্যূষে, চলে যাব
> তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
> আর ফিরাব না মুখ।

বিসর্জন নাটকে শ্রাবণের এই শেষ দুইদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষার অন্তিম প্রহরের অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি হইতেছে; মন্দিরে রঘুপতি জয়সিংহের জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছেন—জয়সিংহ রাজরক্ত আনিতে গিয়াছে। এখানে রঘুপতির অন্তরে যে ঝড় বহিতেছে বাহিরের ঝড় তাহার অনুরূপ, আবার বর্ষার অন্তিম প্রহর যেমন ঝড়ে জলে আপনাকে একেবারে

নিঃশেষ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প, তেমনি জয়সিংহের এতদিনের দ্বন্দ্বেরও আজ অবসান হইয়াছে—সে রাজরক্ত উপলক্ষ্যে নিজের রক্তপাত করিতে কৃতসংকল্প।

রাত্রির বিষম দুর্যোগে রঘুপতি জাগ্রতা দেবীর তাণ্ডব দেখিতেছেন—নিজের বলি সংগ্রহ করিবার জন্য যেন তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন।

এতদিনে, আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী।
ওই রোষ-হুহুংকার। অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী। ওরা ওই বুঝি তোর
প্রলয়-সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্ব-মহাতরু।

জয়সিংহ আত্মরক্তদান করিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির চৈতন্য হইল; রক্তপানপুষ্ট মূঢ় দেবীপ্রতিমাকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিল।

পরদিন শরতের প্রথম দিবসটি নাটকের শেষ দিন। গুণবতী দেবীর বলি লইয়া প্রবেশ করিলেন, তিনি দেবীকে পাইলেন না, কিন্তু স্বামীকে নূতন করিয়া লাভ করিলেন, গোবিন্দমাণিক্যও সেই সময়ে পূজার্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুপতির জয়সিংহকে আর পাইবার উপায় নাই বটে, তিনি অপর্ণার মধ্যে নূতন করিয়া জয়সিংহকে পাইল। যে-শরতের প্রথম প্রত্যুষে রঘুপতির অভিশপ্ত দগ্ধরাজ্য ছাড়িয়া যাইবার কথা ছিল, সেই প্রত্যুষে রক্তপিপাসু দেবীই এই রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। শরৎকাল দেবীর, যিনি সকলের মাতা, আগমনের সময়। কবি শরতের প্রথম প্রত্যুষটির উপরে জোর দিয়া, এই দিনটিকেই নাটকের চূড়ান্ত করিয়া, ইহাই যেন বলিতে চান যে, এতদিন পরে জীবজননীর আগমন হইল, এবং তাঁহার আগমনের পূর্বেই শ্রাবণের শেষ দুর্যোগের মধ্যে জীবরক্তপায়ী যে পাষাণকে লোকে মাতা বলিয়া মনে করিত, সে ত্রস্তভাবে পলায়ন করিল।

শরৎপ্রারম্ভ : শারদোৎসব, ঋণশোধ

শারদোৎসব ও তাহার রূপান্তর ঋণশোধ শরৎকালের নাটক। সে শরৎও আবার শরতের প্রারম্ভ, শেষ নয়। শরৎ একসঙ্গে আগমনী ও বিজয়ার কাল, আনন্দের ও বিষাদের। এই দুইখানি নাটকে শরৎ-প্রারম্ভের আগমনীর আনন্দের সুর—শরৎশেষের বিজয়ার বিষাদের সুর আছে ডাকঘর নাটকে, যদিচ ইহাও শরৎকালেরই নাটক।

শারদোৎসব-ঋণশোধে কবির প্রধান বক্তব্য এই যে জগতের কাছে আমার সর্বদা প্রেমের ঋণ বহন করিতেছি, শরৎকালে সেই ঋণশোধের পালা; শরতের প্রকৃতির মধ্যে কবি ঋণশোধের সেই ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তরে এই ঋণশোধের ভাবটি জাগ্রত করিতে হইলে আগে বাহিরে শরতের সঙ্গে রঙে ও ভাবে এক হইতে হইবে—তবে ভিতরে বাহিরে সত্য একাত্মকতা স্থাপিত হইবে।

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রীর মনে এই বড় ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে, বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মত ঝলমল ক'রে উঠল, তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ বেদনায় উপচে পড়ছে। —ঋণশোধের ভূমিকা

সম্রাট বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজত্বের পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য রাজ্যের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন এই ঋণশোধ ব্যাপারে কেবল তিনিই পিছাইয়া ছিলেন—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিমুহূর্তে প্রেমের ঋণশোধ করিতে কতই না কষ্ট সহ্য করিতেছে।

সন্ন্যাসী। ওকে [উপনন্দকে] সবাই ভালবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে, সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে। —ঋণশোধ

উপনন্দও প্রেমের ঋণশোধ করিতেছে। তাহার গুরু বীণকার সুরসেন লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছেন—উপনন্দ স্বেচ্ছায়, সানন্দে, ছুটির আনন্দে-ভরা শরৎকালে প্রেমের ঋণের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়া পুঁথি নকল করিয়া ঋণশোধ করিতে উদ্যত।

ঠাকুরদা। হায় হায়, তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়। আর এমন দিনেও ঋণশোধ।··

সন্ন্যাসী। বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে? ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না!··· —শারদোৎসব

উপনন্দ সুন্দর, কেননা সে প্রেমের দুঃখ বহন করিতেছে; শরৎকালও যেমন ঋণশোধ করিতেছে, উপনন্দও তেমনি ঋণশোধে ব্যস্ত; প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে একই ভাবের অনুবর্তন চলিতেছে।

শরতের ঋণশোধের ভাবটি জীবনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে মিলনটা বাহির হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

সন্ন্যাসী। বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো—নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কি ক'রে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব। —শারদোৎসব

এ তো গেল কেবল বাহিরের মিল। ভিতরের মিল কি করিয়া হইবে? কবির দৃষ্টিতে শরতের মধ্যে একটা আসক্তিহীন উদার অকিঞ্চনতার ভাব আছে—এই ভাবটি মনের মধ্যে লাভ করিলে শরতের সঙ্গে অন্তরের একাত্মতা ঘটিবে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। একথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার ক'রে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি, কেবল আছে তার রং, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি থাকে সেকথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ঐ রকমই হাল্কা, সে ঐ রকমই নিরর্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্য রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে। আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ঐ ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই, ফসলের আয়োজন করছে। —শারদোৎসবের ভূমিকা

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে শরতের অন্তর্গত ভাবটি কি, এবং কেন সম্রাট বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। "রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।" বিজয়াদিত্য রাজ্যকে যথার্থভাবে লাভ করিবার জন্যই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। শুধু মানুষ রাজা নয়, ঋতুরাজ বসন্তও রবীন্দ্রনাথের মতে সন্ন্যাসী, সে বৈরাগী। সত্য কথা কি, রাজসন্ন্যাসীই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজা।

শারদোৎসবে ছেলের দলের তাৎপর্য কি তাহাও এই অংশে আছে; এবং এত সম্রাট ও রাজা থাকিতে উপনন্দের মত একটি বালক মাত্র ইহার নায়ক কেন তাহাও বোধ করি আর অস্পষ্ট নাই।

শরতের মধ্যে যে 'ছুটির খুশি'র কথা কবি বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে সত্যকার কাজের কোনো বিরোধ নাই—কারণ প্রেমের ঋণশোধ করিবার জন্য উপনন্দ যেমন পংক্তির পর পংক্তি লিখিতেছে অমনি ছুটির পর ছুটি পাইতেছে।

এই ছুটির খুশিতে বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়াছেন; কবিশেখর কিসের যেন সন্ধানে বহির্গত। ছেলের দল ঠাকুরদাকে লইয়া বেতসিনীর তীরে বাহির হইয়াছে; উপনন্দ গুরুর ঋণশোধে বাহির হইয়াছে; রাজা সোমপালের দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা যায়; লক্ষেশ্বর-পুত্র ধনপতির নামতা ছাড়িয়া বেতসিনীর ধারে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করে; এমন কি লক্ষেশ্বরেরও এক-একবার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িতে মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

শরৎশেষ: ডাকঘর

ডাকঘর নাটকের ঘটনার সময় শরৎকাল, ইহাকে শরৎশেষ বা হেমন্তের প্রারম্ভ বলিয়াছি। ইহার ঘটনার সময় যে শরৎ তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাটকের মধ্যেই আছে—কিন্তু শরতের শেষভাগ এমন উল্লেখ নাই, আমার অনুমানমাত্র।

ডাকঘর নাটক বারংবার পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে শারদোৎসবের শরতের সঙ্গে কেমন যেন ইহার শরতের প্রভেদ আছে। শারদোৎসব শরৎপ্রারম্ভের, ডাকঘর শরৎশেষের। যদি ইহা শরৎ-প্রারম্ভের হইত, তবে ইহাতে পূজার উল্লেখ থাকিত—সে উল্লেখের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ইহার স্বল্প কথোপকথনে, ঘটনার বিরলতায়, রোগীর পাণ্ডুমুখচ্ছবিতে, বর্ণনীয় বস্তুর স্বচ্ছতায় পাঠককে, আমাকে অন্তত হেমন্তের আবহাওয়াকে মনে করাইয়া দেয়।

> দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে সকলেরই যখন খাওয়া হয়ে যায়, পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনের ঐ কোণের ছায়ায় ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে—তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং!

আবার:

> দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—

আবার:

> আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কি মনে হচ্ছিল।

পুনরায়:

> আমাদের জানালার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

এই কথাগুলিতে এবং সমস্ত বইখানিতে অস্পষ্ট একটা হেমন্তের আভাস আছে। বিশেষ, ডাকঘরের

বিষাদের সঙ্গে বিজয়ার বিষাদের একটা সাদৃশ্য অনুভূত হয়, আর আগমনীর আনন্দ যদি শরৎপ্রারম্ভের হয়, বাকি সমস্ত ঋতুটা বিজয়ার বিষাদের অশ্রুছায়ায় পরিম্লান।

শরতের মধ্যে একটা ব্যাকুলতার ভাব আছে; মনটাকে অভ্যস্ত ঘরের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া অনির্দিষ্ট দূরত্বের দিকে অভিক্ষেপ করিয়া দেয়। "আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।" কি চায় নিজেই সে জানে না। অমল জানে না সে কি চায়—কেবল একটা পরমব্যাকুলতার ভাব তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে। দইওয়ালার ডাক শুনিলে তার মন উদাস হইয়া যায়, পাহারাওয়ালার হাঁক শুনিলে তার মন উদাস হইয়া যায়, পথে পথিক দেখিলে তাহার নিরুদ্দেশের মুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, এত কাজ থাকিতে ডাকঘরের কাজটি তাহার পছন্দ - যাহার কাজই হইতেছে কেবল পথে পথে চলিয়া চলিয়া বেড়ানো; নীল আকাশ দেখিয়া তাহার মনে হয় সে হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে; ঠাকুরদার সঙ্গে সে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হাল্কা জিনিসের দ্বীপে, না জানি কোন্ সমুদ্রের তীরে সে চলিয়া যাইতে চায়। বিশিষ্ট কোনো স্থান তার লক্ষ্য নয়—সেটা উপলক্ষ্যমাত্র; চলিয়া যাওয়াটাই তাহার লক্ষ্য। মনের এই ব্যাকুলতার ভাব, মানবচিত্তের এই চিরন্তনী ব্যাকুলতা শরতের মধ্যে আছে।

> প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপর ঝিকিমিকি করিতে থাকে,…তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবলি চলি চলি করে।…
>
> —"শরৎ", 'পরিচয়'

অমল মানুষের মনের সেই চলি চলি ভাব; ঋতুর ব্যক্তিত্ব ও মানুষের ব্যক্তিত্ব এক হইয়া গিয়াছে।

একটি লক্ষ্য করিবার ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথের দুইখানি শরৎ-সম্বন্ধীয় নাটকেই নায়ক দুটি বালক, উপনন্দ ও অমল। কেন এমন হইল? শরতের সঙ্গে শৈশবের কি কোন মিল আছে?

> আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশিরমূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।
>
> তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মত।…
>
> শরতের রংটি প্রাণের রং।…এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে।…বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব।…ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই…। —"শরৎ", 'পরিচয়'

কবির মনে শরৎ ও শিশুর ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে; কবির কাছে শরৎ শিশু, আবার শিশু শরৎ। কাজেই শরৎকালের নাটক লিখিবার সময়ে স্বভাবতই দুটি বালককে নায়ক করিয়াছেন—যাহাদের শৈশব এখনো ভালো করিয়া কাটে নাই।

শরতের চলি চলি ভাবটা বয়স্ক মানুষের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা পড়ে না কারণ শিক্ষা, সংস্কার ও সংসারের দায়িত্বে তাহার মনের উপর একটা স্থূল আবরণ পড়িয়া গিয়াছে—বালকের স্থূলহস্তাবলেপহীন মনে সেইজন্যই এই 'চলি চলি'র বিশুদ্ধ রূপটি চোখে পড়ে।

শীতকাল : রক্তকরবী

রক্তকরবী শীতকালের নাটক। ইহার পুরোভূমিকায় যক্ষপুরী, পটভূমিকায় ফসল-কাটার মাঠ; যক্ষপুরীর বীভৎস গর্জনকে ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ফসল কাটার গান কানে আসে—আর এই দুই ভূমিকার মধ্যে সেতুবন্ধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নন্দিনীর।

আগের কয়খানি নাটকে ঋতুর ভাবে ও মানুষের ভাবে যেমন মিল, রক্তকরবীতে তেমনি অমিলটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; এখানে ঋতুর ভাবে ও মানুষের ভাবে দ্বন্দ্বটাই দেখানো হইয়াছে; এই দুই বিপরীতমুখী শক্তিকে, মাঠ ও খনি, ফসল কাটা ও খনি খোদাই, গর্জন ও সংগীত, রঞ্জন ও রাজা, প্রেমের লীলা ও প্রাণের প্রচণ্ডতাকে নন্দিনী দুই হাতে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া পিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যক্ষপুরীর খনি খোদাই শব্দে একটু ছেদ পড়িলেই দূর হইতে শোনা যায়:

> পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে
> আয়, আয়, আয়।
> ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
> মরি হায়, হায়, হায়।

এই গানটিই, এই ভাবটিই রক্তকরবী নাটকের পটভূমি-সংগীত; কখনো তাহা শোনা যায়, কখনো যায় না, কিন্তু নাটকের পটভূমিতে নিরন্তর ইহা নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে।

ঋতুর ও মানুষের দ্বন্দ্বটাই এই নাটকের লক্ষ্য করিবার মতো, শীতকাল ফসল কাটার সময়—আবার তাহা খোদাই-কাজের পক্ষেও প্রশস্ত; একদিকে নবান্নের পরিপূর্ণ আহ্বান, আর একদিকে ধ্বজাপূজার মদিরা-পিচ্ছিল বীভৎসতা, একদিকে মাটির তলাকার মৃত সোনা, আর একদিক সোনার রঙের ফসল; একদিকে যক্ষপুরীর জালে বিধৃত প্রাণের প্রচণ্ডতা, অন্যদিকে নির্বাধ প্রান্তরের অনায়াস উদারতার মধ্যে প্রেমের লীলা; রাজা ও রঞ্জন;—অথচ রহস্য এই যে, রাজা ও রঞ্জন উভয়েই এক ধাতুতে গড়া আর উভয়ে এক ধাতুতে গড়া বলিয়াই দুজনেরই প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণ।

এই নাটকের মূলে এই একটা দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে নন্দিনীর মন্থরকাতর প্রেম ব্যথায় রক্তিম হইয়া রক্তকরবী রূপে ফুটিয়া উঠিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বসন্ত: রাজা ও রানী, রাজা, ফাল্গুনী, তপতী

রাজা ও রানী, তপতী

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজার মতো ঋতুরাজ বসন্ত সন্ন্যাসী; বাহিরে তাহার ঐশ্বর্য অন্তরে তাহার বৈরাগ্য; "অন্তরে তার বৈরাগী গায়"; যে কেবল বাহিরের সম্পদে মুগ্ধ হইল সে কিছুই দেখিল না, যে ভিতরের উদাসীকে দেখিল, সে-ই দেখিল। কিন্তু বসন্তের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের মনে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যে-বয়সে তিনি রাজা ও রানী লিখিতেছিলেন তখন বসন্তের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্বটি তাঁহার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় নাই, অর্ধগোচরভাবে অবশ্যই ছিল।

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার সম্বন্ধের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই সুমিত্রাকে

পাইবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার কারণ, বিক্রমদেব বসন্তের বাহিরটাকে কেবল দেখিয়াছেন, সেখানে ঐশ্বর্য, এবং ভোগরতি, অন্তরে যেখানে বৈরাগ্য ও আসক্তিহীনতা সেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই; তিনি প্রেমের বিলাসকেই দেখিয়াছেন, প্রেমের আত্মবিসর্জনপরতাকে দেখেন নাই; কাজেই তিনি প্রেমে তৃপ্তি পান নাই, সুমিত্রাকে পাইয়াও পান নাই; বিক্রদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই ঢেউ তুলিয়া আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নাটকে বসন্তের ভাবটি কবির কাছে অর্ধগোচর; সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষ নয়।

রাজা ও রানীর রূপান্তর তপতী সুপরিণত বয়সে লেখা, তখন কবির মনে ঋতুর ভাবের ক্রমবিকাশ স্পষ্টরূপ ধরিয়াছে, কাজেই রাজা ও রানীর চেয়ে তপতীতে বসন্তের আইডিয়াটি পরিণততর; সত্য কথা বলিতে কি, তপতীর কাহিনী এই আইডিয়াটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কবি লিখিয়াছেন:

> সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।
>
> রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।
>
> —তপতী, ভূমিকা

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই ইহা সত্য নয়, এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই রচনার দোষ হইয়াছে। মানব-জীবন ও বসন্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে যে ঐক্য আছে তাহা স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলে নাটকের ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক পরিণামের দিকেই যাইত—অযথা কুমার ও ইলার প্রেম-কাহিনীর অসংগতির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত না। তপতীতে এই দোষ কবি শুধরাইয়া লইয়াছেন; এই ভাবটি পরিস্ফুট হওয়াতে রচনা, অন্তত এই দোষপরিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরবর্তী রাজা এবং ফাল্গুনীতে বসন্তের আইডিয়াটি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, এবং কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত সেই আইডিয়ার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই।

রাজা

রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া চলিতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? শারদোৎসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন, "রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।" শরতের মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব যদি থাকে তবে ঋতুরাজ বসন্ত একেবারে সন্ন্যাসী—সে রাজসন্ন্যাসী; তাহার যা কিছু ঐশ্বর্য তাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসন্ত সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধারণা; পরবর্তী নাটকে কাব্যে সংগীতে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবর্তিত হয় নাই।

এই নাটকে দুটি রাজা আছেন, এক রাজা যাঁহার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ, দ্বিতীয় ঋতুর রাজা বসন্ত। দুজনের মধ্যেই কবি ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋতুরাজের অনন্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু অন্তরে

তাহার রিক্তসম্পদ্ সন্ন্যাস। অপর রাজারও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মূর্তি, ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরের মধ্যে তিনি একক, রূপহীন, তিনি অরূপরতন।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যে এই বসন্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জ্বল সাজ ও অন্তরের বৈরাগীর গেরুয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। যে হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দেখিল তাহার দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই।

রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঋতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন; তিনি রাজার বাহিরের ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনো সত্য তিনি স্বীকার করেন না; তাই তিনি ছদ্মবেশী সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন। ইহা তাঁহার লোভের দৃষ্টি।

দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়—দেখিলে ভুল হইবে; সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়। একসময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল—কিন্তু এখন সে একপ্রকার ভক্তি করিতে শিখিয়াছে। তাহার চোখে রাজা কেমন? রানীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিতেছে:

> হাঁ, তাই বল'ব—সুন্দর নয়! সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য! যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হ'ল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলায় মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয়, এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত দৃষ্টি নয়—ইহা ভক্তির দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয়, এবং প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতম ভাবে বুঝিতে পারে নাই।

এই নাটকে কেবল ঠাকুরদা গোড়া হইতে রাজাকে সত্যভাবে জানেন—কারণ তাঁর দৃষ্টি ভালোবাসার দৃষ্টি—তিনি নিজেকে রাজার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই যখন তিনি গান করেন

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

তখন তাহা একাধারে ঋতুরাজ ও তাঁহার রাজার যথার্থ পরিচয় বহন করে। তাই ঠাকুরদা বলেন, "আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।" অর্থাৎ তাঁহার রাজার বাহিরে পদ্মের কোমলতা ও সৌন্দর্য, আর ভিতরে বজ্রের বিবিক্ত কঠোরতা।

কবি বলিতে চাহেন ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাইবার উপায়। যে সেই দৃষ্টিলাভ করিয়াছে তাহার কাছে বাহিরের ঐশ্বর্য ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তবে এই অভিজ্ঞতা অনেক দুঃখে লাভ করিতে হয়; রানী সুদর্শনার এই দুঃখের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিলাভের ইতিহাসই 'রাজা' নাটকের প্রাণবস্তু।

ইহার আগে দেখিয়াছি মানুষের জীবনলীলার অনুরূপ কবি প্রকৃতির লীলাতে দেখিয়াছেন। এখানে কিন্তু অর্থদ্যোতনা গভীরতর। এখানের আর মানুষের লীলা নয়—স্বয়ং জগৎপতির লীলার অনুরূপ প্রকৃতির মধ্যে কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের যে আপাত-বিরোধ, ঋতুরাজের প্রকৃতির মধ্যেও যেন তারই প্রতিধ্বনি; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকারূপে ঋতুরাজকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পটভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের ঐক্য ঘটিয়া গিয়াছে।

অন্তর ও বাহিরের যে বিরোধ, ঐশ্বর্য্য ও সন্ন্যাসের যে বিরোধ তাহা আপাত-বিরোধ মাত্র। ঋতুরাজ যথার্থ ধনী বলিয়াই বসন্তের ক্ষণিক উৎসবশেষে ঐশ্বর্যের প্রচুরতাকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়া কখন একদিন অকস্মাৎ বৈশাখের বীতরাগ গীতহীন শুষ্কতৃণ মাঠের মধ্য দিয়া দগ্ধতাম্র দিগন্তের দিকে এমন অনায়াসে যাত্রা করিতে পারে।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

বিশ্বরাজের লীলাও অনুরূপ। বাহিরে তাঁহার আলোয় আলোময়—তার মধ্যে একটি অন্ধকার ঘরে রানীর সঙ্গে তাঁর মিলন; বাহিরে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য কিন্তু রানী তাঁহাকে চোখে দেখিতে পান না; বাহিরে তাঁহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; তাঁহার ধ্বজায় পদ্মের মধ্যে বজ্র আঁকা, তিনি বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি; যে তাঁহার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হয়, তাহাকেই তিনি সম্মান দেন; তিনি নিজের রাজভক্ত বিদ্রোহী রাজাদের ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ লোকদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সঞ্চরণ করেন; তিনি নিজের প্রিয়তমা রানীকে অন্ধকার ঘরের নির্বিঘ্নতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ধুলার উপরে বিশ্বজনের সম্মুখে নিরবগুণ্ঠন নগ্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কারণ সুদর্শনায় প্রভু

কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দ-রসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। —অরূপ রতনের ভূমিকা

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী ফাল্গুন মাসের নাটক। ইহার পটভূমিকা ও পুরোভূমিকায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক হিসাবে পূর্বোক্ত সবগুলি নাটকের চেয়ে ইহার গুরুত্ব বেশি। পূর্বোক্ত নাটকগুলিতে কবি মানুষের লীলা ও প্রকৃতির লীলাতে ঐক্য দেখিয়াছেন; রাজা নাটকে বিশ্বরাজ ও ঋতুরাজের লীলাতে ঐক্য ধরা পড়িয়াছে; ফাল্গুনীতে আর কেবল ঐক্য মাত্র নয়, প্রকৃতির লীলাই যেন মানুষের লীলাকে বুঝিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানবজীবনের সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিবার সোনার কাঠি যেন প্রকৃতির শিয়রের তলে রহিয়াছে। এই কথাটির উপরে একটু জোর দিতে চাই। কারণ আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষকে বুঝিবার সাধনা করিলেও প্রত্যক্ষত চরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; পরোক্ষে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন মাত্র; তিনি প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্প, দোসর করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির লীলার মধ্যেই মানুষের লীলার ছবি যেন দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার শেষের জীবনের কাব্যসাধনা প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্পরূপে দাঁড় করাইতে নিযুক্ত; প্রকৃতির শান্তিসরোবরে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড মানবজীবন স্নিগ্ধ হইয়া অখণ্ড পূর্ণতায় প্রতিফলিত হইয়াছে, কবি তাহাই নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; প্রত্যক্ষত মানবজীবনের দিকে তাকাইবার আকাঙ্ক্ষা এই ভাবে পূরণ করিয়া লইয়াছেন। মানুষের বিকল্প প্রকৃতি হইয়া উঠিবার ইতিহাসে ফাল্গুনী একটি পতাকাস্থান, বা মোড় ঘুরিবার মুখ। বলাকা ও ফাল্গুনী সমসাময়িক; ইহার পর হইতে অধিকাংশ কাব্যে নাট্যে সংগীতে মানবমুখী কবি প্রকৃতিমুখী হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিমুখিতাও মানবমুখিতা, কারণ প্রকৃতি মানুষেরই বিকল্প বা symbol।

ফাল্গুনী নাটকের গঠনপ্রণালী দেখিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে। ইহাতে চারটি অঙ্ক, আর প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা। প্রত্যেক অঙ্কের নাটকীয় পাত্রদের মনোভাবকে গীতিভূমিকায় প্রকৃতির সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার গুরুত্ব এত বেশি যে এক-একবার মনে হয়, ফাল্গুনীতে প্রকৃতি আর পটভূমি মাত্র নয়, ইহাই যেন পুরোভূমি, মানুষের লীলাটাই যেন পটভূমিতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহা ফাল্গুনীর পক্ষে সর্বতোভাবে সত্য না হইলেও পরবর্তী অধিকাংশ গীতিনাট্য ও কাব্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য।

> রাজা। এ নাটকে গান আছে নাকি?
>
> কবি। হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে। —ফাল্গুনীর ভূমিকা

গীতিভূমিকার ও নাটকের অঙ্কের একটা তালিকা দেওয়া গেল :

নবীনের আবির্ভাব। যুবকদলের প্রবেশ। প্রবীণের দ্বিধা। সন্ধান। প্রবীণের পরাভব। সন্দেহ। প্রত্যাগত যৌবনের গান। প্রকাশ।

এবার দেখা যাক গীতিভূমিকায় ও নাটকে কি করিয়া মিলিয়া গিয়াছে।

> রাজা। গানের বিষয়টা কি?
>
> কবি। শীতের বস্ত্রহরণ।
>
> রাজা। এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায়নি।

কবি। বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

রাজা। এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা?

কবি। বাকিটা প্রাণের কথা।

রাজা। সে কি রকম?

কবি। যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে ব'লে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধর্‌ল তখন—

রাজা। তখন কি দেখলে?

কবি। কি দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

রাজা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয় কি আলাদা নাকি?

কবি। না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

—ফাল্গুনীর ভূমিকা

এইভাবে গীতিভূমিকায় ও নাটকে, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে, গানের বিষয়ে আর প্রাণের বিষয়ে ঐক্য সংঘটিত হইয়াছে।

ফাল্গুনীর যুবকের দল চিরন্তন বুড়াকে ধরিবে বলিয়া পণ করিয়াছিল—জীবনের রহস্যগুহার ভিতর হইতে সে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল সে চিরন্তন নবীন; সে আর কেহ নয় যুবকদলের নবীন সর্দার—শীতের হিমল গুহাটার ভিতর হইতে ঠিক এমনি ভাবেই বসন্ত বাহির হইয়া আসে।

এই যে বসন্ত, এই যে যৌবন, দুটিই এক; ইহা বাস্তব নয়, বসন্ত ও যৌবনের আদর্শায়িতরূপ। বয়সের যৌবন একবার মাত্র আসিয়া চলিয়া যায়—আর এ যৌবন ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসে, দুঃখের মধ্য দিয়া যখন সে আসে তখন আর যায় না।

ফাল্গুনীর ভূমিকায় যে রাজা আছেন তাঁহার একটি চুল পাকিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বৈরাগ্য সাধনের আয়োজন করিতেছিলেন। এমন সময়ে কবি আসিয়া পাকা চুলটাকে লক্ষ্য করিয়া শুধাইলেন:

কবি। ওটাকে আপনি ভাবছেন কি?

রাজা। যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা।

কবি। কারিকরের মতলব বোঝেননি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।

রাজা। কই রঙের আভাস তো দেখিনে।

কবি। সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

রাজা। চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর।

কবি। মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হ'ল তো হোক না। আর এক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

—ফাল্গুনীর ভূমিকা

পৃথিবীর যৌবন যেমন শীতের অভিজ্ঞতায় জর্জরিত হইয়া তবেই বসন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের যৌবন তেমনি জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া, শাদা চুলের তুষারপাত পার হইয়া

নূতন আকারে দেখা দেয়—কবি যাহাকে বলেন চিরযৌবন, যাহা কখনো পুরাতন হয় না—কিম্বা যাহা একমাত্র সত্য যৌবন।

কবি এই যৌবনকে বলিতেছেন আসক্তিহীন যৌবন। এই যৌবনই সত্যভাবে জীবনকে এবং শিল্পকে ভোগ করিতে জানে, কারণ সে ত্যাগ করিতেও শিখিয়াছে। কবি রাজাকে বলিতেছেন, এই নাটক দেখিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিবেন, যাহাদের চুলে পাক ধরিয়াছে।

রাজা। সে কি কথা কবি?

কবি। হাঁ, মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়। —ফাল্গুনীর ভূমিকা,

নাটকের প্রারম্ভে যুবকদলের যে যৌবন তাহা আদৌ আসক্তিহীন নয়, কারণ তখনো তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা বাকি আছে। চতুর্থ দৃশ্যে যখন তাহাদের ভালোবাসার পাত্র চন্দ্রহাস গুহার মধ্যে চলিয়া গেল, সন্দেহ ও রাত্রির দ্বিগুণিত অন্ধকারে ভালোবাসার পাত্রকে হারাইয়া যৌবনের আর এক রূপ তখনই তাহাদের চোখে পড়িল। এই অভিজ্ঞতারই তাহাদের প্রয়োজন ছিল।

চলার মধ্যে যদি কেবল তেজ থাকত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে, তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি জগৎটা কেবল 'পাব', 'পাব' বলছে না, সঙ্গে সঙ্গেই বলছে 'ছাড়ব', 'ছাড়ব'।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

যেমন যৌবন সম্বন্ধে তেমনি বসন্ত সম্বন্ধেও :

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে?

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

এখানে আসিয়া রাজা নাটকের বসন্তে ও ফাল্গুনীর বসন্তে মিলিয়া গিয়াছে :

ঠাকুরদা। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে

এ যে ফাল্গুনীর ঝরাপাতার সুর।

বাউল। সে [চন্দ্রহাস] বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।

এ কি রকম বসন্ত? একই সঙ্গে ঝরাপাতার সুর, কান্নার সুর, আবার লড়াইয়ের সংবাদ! বিস্ময়ের কিছু নাই। এ বসন্ত যাঁহার প্রতীক তাঁহার ধ্বজায় যে পদ্মের মাঝখানে বজ্র অঙ্কিত।

ফাল্গুনীর যৌবনের দল দুঃখের অভিজ্ঞতার পরে যখন চন্দ্রহাসকে পাইল, ভালোবাসার পাত্রকে পাইল, তখনি যথার্থ পাওয়া হইল; তাহারা চুল না পাকাইয়াও নিরাসক্ত যৌবনের তটভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল।

এই নাটকে এক অন্ধ বাউল আছে, একসময়ে সে চোখে দেখিতে পাইত, এখন সে অন্ধ। চন্দ্রহাস তাহার কাছেই বুড়ার সন্ধান পাইয়াছে। সেই বুড়া যখন প্রকাশ পাইল দেখা গেল সে চির-যৌবন। এই নিরাসক্ত যৌবনের সন্ধান কেবল সে-ই দিতে পারে চোখে দেখার উপরে যাহার ভরসা নাই। রাজা নাটকের রাজাও চোখে দেখিবার নহেন, বরঞ্চ চোখে দেখিতে গেলেই ভুল হইয়া বসে।

এখানেও ভাবের দিকে উভয়ত্র ঐক্য আছে। ফাল্গুনীর নিরাসক্ত যৌবন, যাহা বসন্ত বই আর কিছু নয়, তাহা চোখে দেখিবার নয়। রাজা নাটকের রাজা যাঁহার প্রতীক বসন্ত, তাহাকেও চোখে দেখিবার নয়। দুই নাটকেই দেখি, ঋতুরাজ ও বিশ্বরাজ, মানুষের যৌবন ও পৃথিবীর যৌবন নানা দিক দিয়া ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, কাজেই নানা ভাবে তাহাদের মধ্যে লক্ষণের একত্ব দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি, মানব ও ভগবান আর সমান্তরাল না থাকিয়া একটা আর-একটার উপরে আসিয়া পড়িতেছে, অলক্ষ্যে কখন্ মিশিয়া গিয়া এক বলিয়া মনে হইতেছে, পরস্পরের সান্নিধ্যে নূতনতর অর্থ লাভ করিতেছে—এ এক বিচিত্র লীলা।

কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতির গুরুত্বই কবির কাছে বেশি—অন্তত সেই গুরুত্বের দিকেই কবির সাধনা ও শিল্প অগ্রসরশীল।

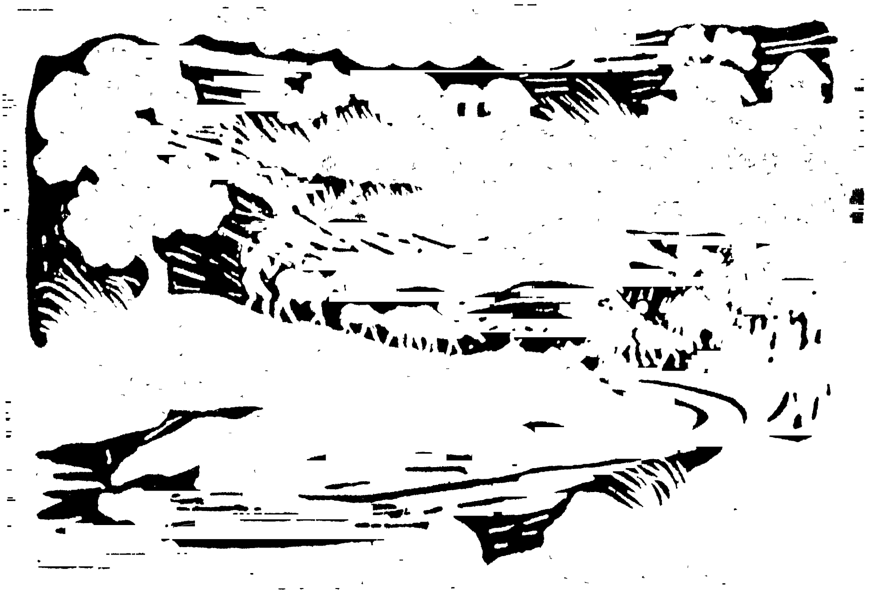

শ্রীকেশব রাও

মৃচ্ছকটিক কার রচনা ?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কালিদাস ও ভাস উভয়েরই সনতারিখ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার, তার পরিচয় কালিদাস নিজমুখে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে গোড়াতেই তিনি বলেছেন—ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদের মত আমি প্রথিতযশস্বী নাট্যকার না হলেও, আমার এই নূতন নাটক আমি আর্যমিশ্রদের কাছে উপস্থিত করতে সাহসী হয়েছি। কারণ, যা-কিছু পুরনো তাই যে ভালো, আর যে রচনা নতুন তাই যে অগ্রাহ্য, তা অবশ্য নয়।—সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদ্বয়ের কোনো নাটক আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভাসের প্রায় সমস্ত নাটক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে কীথ (Keith) অনুমান করেন যে, ভাস কালিদাসের ১০০ বছর পূর্বে তাঁর সব নাটক রচনা করেন। কালিদাসের কাল খুব সম্ভবতঃ ৪০০ খ্রীস্টাব্দ। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভাস হচ্ছেন ৩০০ খ্রীস্টাব্দের লেখক।

ভাসের নাটক যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন আমি মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত একটি ইংরেজী প্রবন্ধে ভাসকে নারায়ণ কাণ্বের সমসাময়িক বলি। সে প্রবন্ধটি পড়ে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আমাকে বলেন যে, তিনি আমার সংগৃহীত facts থেকে আমার মত গ্রাহ্য করেন। অপরপক্ষে জার্মানির খ্যাতনামা ওরিয়েণ্টালিস্ট জেকবি আমাকে বলেন, ভাস যে-প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন, তার থেকে বোঝা যায় তিনি নারায়ণ কাণ্বের পরবর্তী লেখক।

মৌর্যবংশের শেষ রাজাকে তাঁর স্নুঙ্গ সেনাপতি পুষ্যমিত্র বধ করে নিজে রাজা হয়ে বসেন। পরে স্নুঙ্গ বংশকে ধ্বংসপূর্বক নারায়ণ কাণ্ব তাঁদের সিংহাসন দখল করেন। ভাস যদি নারায়ণ কাণ্বের সমসাময়িক হন, তাহলে তাঁর কাল হয় খ্রীস্টপূর্ব।

সে যাই হোক, মেনে নিচ্ছি যে, ভাসের আনুমানিক তারিখ হচ্ছে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ, এবং কালিদাসের ৪০০। সংস্কৃত ভাষায় মৃচ্ছকটিক নামে একখানি একঘরে নাটক আছে। অর্থাৎ এর অনুরূপ দ্বিতীয় নাটক নেই। এই মৃচ্ছকটিক কার লেখা ও কবে লেখা, তা আজও জানা নেই। বিলিতী ওরিয়েণ্টালিস্টরা এসম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। কীথ বলেন, মৃচ্ছকটিক ভাসের পরে এবং কালিদাসের পূর্বে লেখা। বহু সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার লেখকের নাম উল্লেখ করেন। ভাসের নাটকে তাঁর নাটক যে কার রচিত, সে বিষয় কোন উল্লেখ নেই। কালিদাসের নাটকে তা আছে। তার পরবর্তী সব নাটকেই নাট্যকারের নাম আছে; তার বেশি কিছু নেই। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে লেখকের লম্বা পরিচয় দেওয়া আছে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ রাজা, তাঁর নাম শূদ্রক; তিনি ছিলেন চতুর্বেদ, কামশাস্ত্র, হস্তী-বিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী; তিনি একশো বৎসর দশদিন বয়সে আগুন জ্বালিয়ে তাতে পুড়ে মরেন। এই অদ্ভুত কথা যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, সে ধারণা আমার নেই। কীথ

তা বিশ্বাস করেননি। শূদ্রক ব'লে যে কোন রাজা কবি ছিলেন, একথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। কীথ বলেন, কেউ ছিল না ; এ হচ্ছে একটা বাজে কিংবদন্তি। এর পর সূত্রধার আরো একটি শ্লোকে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের আরম্ভেই তাঁর পূর্বেকার প্রথিতযশা নাট্যকারদের নামোল্লেখ করেছেন, তা আগেই বলেছি। যদি তাঁর পূর্বে মৃচ্ছকটিক লেখা হত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তার রচয়িতার নাম উল্লেখ করতেন।

এখন মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্কের লেখক কে, তা আমরা জানি। ভাস "দরিদ্র চারুদত্ত" নামক একখানি নাটক লেখেন। সে নাটকের প্রথম চার অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে, পরের অংশ পাওয়া যায়নি। মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্ক "দরিদ্র চারুদত্ত" থেকে আগাগোড়া চুরি। তফাতের ভিতর এই যে, যিনি মৃচ্ছকটিক লিখেছেন তিনি অপরের লিখিত অনেক কথা এতে যোজনা করেছেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ভাসের লিখিত কতকগুলি শ্লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেগুলি প্রায় সবই "দরিদ্র চারুদত্ত" থেকে উদ্ধৃত। যথা ঘোর অন্ধকারের এই চমৎকার উৎপ্রেক্ষাটি—লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।

কোন প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে মৃচ্ছকটিকের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই,—আছে সাহিত্যদর্পণে ; আর সে গ্রন্থ গত দু-তিনশো বৎসরের মধ্যে লেখা। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে অভিনব গুপ্ত "দরিদ্র চারুদত্তের" নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি যে খণ্ডিত পুস্তক, তা ঘুণাক্ষরেও বলেননি। এর থেকে অনুমান করছি যে, অভিনব গুপ্তের সময়ে সে নাটক সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। ভাসের অন্যান্য সমস্ত নাটকগুলিই পুরোপুরি পাওয়া গেছে, কেবল "দরিদ্র চারুদত্তের" এই খণ্ডিত রূপ। এর কারণ বোধ হয়, যিনি মৃচ্ছকটিক নামে এটি চালাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি এর উপর হস্তক্ষেপ করেছেন।

সূত্রধার প্রথমে মৃচ্ছকটিকের কবির নাম ক'রে এবং তাঁর রূপগুণের পরিচয় দিয়ে, তারপরেই এ নাটকে কি কি আছে তার ফর্দ দিয়েছেন। কি দেশী, কি বিলিতী, কি প্রাচীন, কি নবীন, কোন নাটকেই ইতিপূর্বে এ-জাতীয় table of contents দেখিনি। সে ফর্দটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

> অবন্তিপূর্যাং দ্বিজসার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
> গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা ॥
> তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাম্।
> খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা চকার সর্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ ॥

অস্য বাংলা :

"উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামে, ব্রাহ্মণজাতীয় অথচ বাণিজ্যব্যবসায়ী এক দরিদ্র যুবক ছিলেন এবং বসন্তকালের শোভার ন্যায় বসন্তসেনা নামে একটি গণিকা সেই চারুদত্তের গুণে অনুরক্ত হইয়াছিল।

রাজা শূদ্রক সেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনার নির্দোষ রমণোৎসব, নীতির প্রচার, ব্যবহারের মোকর্দমার দোষ, খলের চরিত্র এবং দৈব—এই সমস্তই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, মৃচ্ছকটিকের চোর কবির সম্মুখে একটি আদর্শ নাটক ছিল ; যার থেকে তিনি এই বিষয়-সূচী নিয়েছেন। এবং আমার বিশ্বাস মৃচ্ছকটিক হচ্ছে ভাসের লিখিত সমগ্র "দরিদ্র চারুদত্তের" একটি চোরাই সংস্করণ। এখানে ওখানে দু-চারটি শ্লোক সংযোজন এবং বর্জন ছাড়া এই

শূদ্রক কবি, তিনি যিনিই হোন, আর বিশেষ কিছু করেননি। প্রথমত, মৃচ্ছকটিকে প্রধান পাত্র হচ্ছেন নায়ক চারুদত্ত এবং নায়িকা বসন্তসেনা। তাদের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার হচ্ছে সংস্মরতোৎসব। নীতিপ্রচারের পরিচয় সমস্ত নাটকখানিতে পাওয়া যায়। এক শকার ছাড়া আর কেউ চারিত্র্যভ্রষ্ট নন। চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা থেকে আরম্ভ ক'রে শকারের ভৃত্য স্থাবরক পর্যন্ত ঘোর বিপদে পড়ে সকলেই নিজের নিজের চারিত্র্য বজায় রেখেছেন। এবং সে কথা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন। খলস্বভাব হচ্ছে শকারের স্বভাব। দরিদ্র চারুদত্তের প্রথম চার অঙ্কের ভিতর বিট শকারকে বলেছেন পশুর নব অবতার। ব্যবহারদুষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় মৃচ্ছকটিকের নবম অঙ্কে। প্রথম অঙ্কেই চারুদত্ত বলেছেন যে, দারিদ্র্যের একটি মহা দোষ এই যে, পাপকর্ম অন্যে করলেও দরিদ্র ব্যক্তি তার জন্য দোষী হয়ে পড়ে। শর্বিলক চারুদত্তের বাড়ীর সিঁদ কেটে বসন্তসেনার গচ্ছিত অলংকার চুরি করেছিল। সেই চৌর্যের জন্যে trial sceneএ চারুদত্ত দোষী সাব্যস্ত হন। সুতরাং দরিদ্র চারুদত্তে যে একটি trial scene থাকবে তার ইঙ্গিত সে নাটকের প্রথম অঙ্কেই পাওয়া যায়। দরিদ্র চারুদত্তের চতুর্থ অঙ্ক শেষ হয়েছে এই কথায়, দুর্দিন উপস্থিত। পঞ্চম অঙ্ক পাওয়া যায়নি। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে চারুদত্তের প্রথম কথা হচ্ছে: দুর্দিন উপস্থিত। এই দুর্দিনে মেঘ ও বৃষ্টির ভিতর বসন্তসেনার অভিসারের বর্ণনায় সে অঙ্ক পরিপূর্ণ। আমার ধারণা তার অনেক শ্লোক ভাসের রচিত। কোন্ কোন্ শ্লোক, সে কথা পরে বলব।

মৃচ্ছকটিক কোন্ সময়ে লেখা এবং কার লেখা, তা আজও অজ্ঞাত। কীথের মত পণ্ডিতও বলেন নাটকখানি দু-হাতে রচিত। প্রথম চার অঙ্ক ভাসের, শেষ দু-অঙ্ক অজ্ঞাতকুলশীল অন্য কোন কবির। এ কথা যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দশ অঙ্কই ভাসের লিখিত, তাহলে মৃচ্ছকটিকের সমস্যা আর থাকে না। তখন মৃচ্ছকটিককে আমরা দরিদ্র চারুদত্তের একটি পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ বলে গ্রাহ্য করতে পারি। আর তখন এই চোর কবির বৃথা সন্ধান আমরা করব না। কীথ সাহেব বলেন যে, ভাসের লেখা হলে, অপর যিনি তার উপর হস্তক্ষেপ করেছেন, তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে "inexcusable plagiarism"।

অথচ কীথ স্বীকার করেন যে, মৃচ্ছকটিকের প্রধান গুণ হচ্ছে তার সহজ এবং সরল ভাষা, যা ভাসের ভাষার অনুরূপ। আর তার আর একটি গুণ হচ্ছে "wit and humour"। তিনি বলেন, এ গুণও মৃচ্ছকটিকের কবি ভাসের কাছ থেকে পেয়েছেন। যদি সবটা ভাসের লেখা ব'লে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সকল গোলই মিটে যায়।

আমি সে-কারণে সমস্ত নাটকখানি ভাসের রচনা বলেই ধরে নিচ্ছি। এর পরে ভাসের স্বপক্ষে আর কি কি প্রমাণ পাওয়া যায়, তার বিচার করব। এবং এই চোর কবি কোন্ সময়ে "দরিদ্র চারুদত্ত"কে ঈষৎ রূপান্তরিত করেছিলেন, তারও তারিখ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

২

কীথ বলেন যে মৃচ্ছকটিক দু-হাতের লেখা। আমি তা স্বীকার করি। সমস্ত নাটকখানি ভাসের রচিত। কিন্তু "দরিদ্র চারুদত্তের" প্রথম চার অঙ্কের অন্তরে অপর কোন অজ্ঞাতকুলশীল চোর কবি

যেমন অনেক কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, শেষ ছয় অঙ্কের ভিতর তেমনি কিছু কিছু গদ্যপদ্য তিনি নিশ্চয়ই প্রবেশ করিয়েছেন। কীথ বলেন, মৃচ্ছকটিকে একটি প্রণয়কাহিনী আছে, আর একটি রাজনৈতিক বিপ্লবকথা আছে। "দরিদ্র চারুদত্তের" প্রথম অংশে এই রাজনৈতিক বিপ্লবের কোন উল্লেখ নেই। অতএব তাঁর মতে মৃচ্ছকটিকের চোরকবি এই সমস্ত ব্যাপারটি প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তাতেই এই নাটকের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব। গ্রীক কমেডিতে নাকি এরকম ব্যাপার আছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিক ব্যতীত অপর কোনো সংস্কৃত নাটকে নেই। "দরিদ্র চারুদত্তে" উজ্জয়িনীর রাজা পালককে হত্যা করা হয়। কিন্তু আমি বলি ভাস পূর্বেও এই রাজনৈতিক বিদ্রোহ অবলম্বন করে নাটক লিখেছেন। Regicide হচ্ছে তাঁর বালচরিতের প্রধান ঘটনা। সুতরাং এরকম রাজনৈতিক ঘটনার জন্যে কোন গ্রীক নাটকেরও দোহাই দেবার দরকার নেই, চোরকবির নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিরও তারিফ করবার দরকার নেই। "দরিদ্র চারুদত্তে" প্রথম থেকেই রিভল্যুশনের যে আবহাওয়া রয়েছে, শেষকাণ্ডে তারই পরিণতি হয়।

পূর্বে বলেছি যে, মৃচ্ছকটিকের অন্তর থেকে কোন্ কোন্ শ্লোক ভাসের, তা উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। কিন্তু পরে ভেবে দেখছি যে, সে একরকম অসাধ্যসাধন হবে। ধরুন, আমি যদি কোন কোন শ্লোককে ভাসের লেখা বলি, অপরে তা গ্রাহ্য করতে বাধ্য নয়। এবং আমার কথা যে ঠিক, তাও আমি প্রমাণ করতে পারব না। বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোচক ওয়াল্টার পেটার তাঁর Appreciations নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের কোন্ কোন্ কবিতা খুব উচ্চ শ্রেণীর আর কোন্গুলি ছাইপাঁশ, তা যদি কেউ বেছে নিতে পারে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, কবিতা কাকে বলে সে জ্ঞান তার আছে। আমি নিজেকে এ-জাতীয় সমজদার বলে মনে করিনে। তাহলেও মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে বর্ষা সম্বন্ধে অসংখ্য সুভাষিতাবলীর কোন কোনটি ভাসের রচিত বলে আমার মনে হয়। বর্ষা সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে অসংখ্য কবিতা আছে। বর্ষা যে মেঘরূপ হাতিতে চড়ে বিদ্যুৎরূপ পতাকা উড়িয়ে, বজ্রধ্বনিরূপ ঢাক বাজিয়ে আসে, এ কথা কালিদাসও বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন মেঘ 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।' এসব উপমার পুনরুক্তি বহু সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু যে বর্ণনায় সম্পূর্ণ নূতনত্ব আছে আর যা অতি সহজে বলা হয়েছে, সে উপমাগুলি ভাসের রচিত বলে মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়। আমি মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্ক থেকে এইরকম কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

১. মেঘো জলার্দ্রমহিষোদর ভৃঙ্গনীলো বিদ্যুৎপ্রভা-রচিত-পীত-পটোত্তরীয়ঃ।
আভাতি সংহতবলাক-গৃহীত শঙ্খঃ খং কেশবোঽপর ইবাক্রমিতুং প্রবৃত্তঃ ॥

২. বিদ্যুৎপ্রদীপশিখয়া ক্ষণনষ্টদৃষ্টাঃ।
ছিন্না ইবাম্বরপটস্য দশাঃ পতন্তি ॥

৩. বিদ্যুজ্জিহ্বেনেদং মহেন্দ্রচাপোচ্ছ্রিতায়তভুজেন।
জলধর-বিবৃদ্ধ-হনুনা বিজৃম্ভিতমিবান্তরীক্ষেণ ॥

৪. তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্।
সংগীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ ॥

মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কের নাম হচ্ছে দুর্দিন অঙ্ক। এই দুর্দিন অঙ্ক শ্লোকে ঠাসা। চারুদত্ত শ্লোক আওড়ান, বিটও তাই করেন, আর বসন্তসেনা প্রাকৃতভাষিণী হলেও এক্ষেত্রে প্রাকৃত ত্যাগ করে দেদার সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন। উল্লিখিত চতুর্থ শ্লোক তাঁরই মুখের। এটি ভাসের রচিত, না কোন অজ্ঞাতকুলশীল কবির? তার আগে যে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছি, সেগুলির বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং চারুদত্ত। আর এ ক'টি যে ভাসের রচিত, এ আমার অনুমান। এ অনুমান যাঁর খুশি গ্রাহ্য করতে পারেন বা না পারেন। কিন্তু শেষটি যে ভাসের হাত থেকে বেরিয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পঞ্চম অঙ্কে বিটের উক্ত দু-একটি শ্লোক আমি ভাসের রচনা বলে সন্দেহ করি। যাক্ এ সব কথা। এ অনধিকারচর্চা আর বেশি করব না।

"দরিদ্র চারুদত্ত"কে মৃচ্ছকটিকে রূপান্তরিত কে করেছে, তা ঠিক না বলতে পারলেও, কোন্ সময় করা হয়েছে তা বলতে পারি। মৃচ্ছকটিক দণ্ডীর দশকুমারচরিতের সমসাময়িক ব'লে কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস। দণ্ডীর নাম সকলেই জানেন। তাঁর লিখিত দুখানি গ্রন্থ আছে,—একখানি দশকুমারচরিত, অপরখানি কাব্যাদর্শ। এ দুখানি গ্রন্থ যে একব্যক্তির লেখা, ডাক্তার সুশীলকুমার দে প্রভৃতি তা স্বীকার করেন না। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। কাব্যাদর্শ নামক অলংকারের আদি গ্রন্থ অষ্টম খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লেখা নয়। হর্ষচরিতের কবি বাণভট্ট ও বাসবদত্তার লেখক সুবন্ধু সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। বাণভট্ট হর্ষচরিতের প্রথমেই কতকগুলি পূর্বকবির নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দণ্ডীর নাম উল্লেখ করেননি। সুতরাং দশকুমারচরিতের রচয়িতা দণ্ডী যে ঠিক কোন্ সময়ের লোক, তা বলা কঠিন; সম্ভবতঃ বহুকাল পরের। "দরিদ্র চারুদত্তের" দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক জুয়ো খেলে সুবর্ণ হেরে পালাচ্ছে; কিন্তু জুয়োর আড্ডার কোন বর্ণনা নেই। মৃচ্ছকটিকে তার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। দশকুমারচরিতেও আছে। "দরিদ্র চারুদত্তের" দ্বিতীয় অঙ্কে চারুদত্তের গৃহে ন্যস্ত বসন্তসেনার অলংকার চুরির একটি বর্ণনা আছে। এ চোর হচ্ছে সজ্জলক, মৃচ্ছকটিকে যার নাম হয়েছে শর্বিলক। সজ্জলক সিঁদকাটার পূর্বে প্রথমেই বলেছে—নমো খর্পটায়। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয় অঙ্কে শর্বিলক চুরির আগে দোহাই দিয়েছে কর্ণীসুতের, যিনি চৌর্যশাস্ত্রের রচয়িতা। দশকুমারচরিতেও এই কর্ণীসুতেরই নাম পাওয়া যায়। তারপর সংবাহক যে পালিয়ে গিয়ে একটি জীর্ণ মন্দিরে দেবতা হয়ে বসে, এ গল্প হয়ত বা দশকুমারচরিতে পড়েছি, নয়ত কথাসরিৎসাগরে।

কথাসরিৎসাগর খ্রীস্টীয় ১১শ শতাব্দীতে লেখা। "দরিদ্র চারুদত্তের" চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনার বাড়ির অর্থাৎ গণিকালয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, মৃচ্ছকটিকে তার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এর অনুরূপ বর্ণনা পরবর্তী লেখকদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকের গায়ে এ সব বর্ণনা চোর কবি যোজনা করেছেন। তিনি যদি দণ্ডী না হ'ন, তাহলে তিনি দশকুমারচরিত ও কথাসরিৎসাগর থেকে এ অংশ চুরি করেছেন। আর এক কথা। শূদ্রক নামে একটি কবি ছিলেন, তাঁর রচিত দুটি ভাণ আমি চতুর্ভাণ নামক পুস্তকে পড়েছি। তিনি কর্ণীসুতের নাম করেছেন, এবং একজনকে পরোপকার-রসিক বলে বিদ্রূপ করেছেন। মৃচ্ছকটিকে ষষ্ঠ অঙ্কেও এই পরোপকার-রসিক বলে অপরকে বিদ্রূপ করবার পরিচয় আমরা পাই। এবং অষ্টম অঙ্কে সুবন্ধুর নাম পাই। এই সকল কারণে মনে হয় এই শূদ্রক

হয়ত "দরিদ্র চারুদত্ত"কে মৃচ্ছকটিকে পরিণত করেছেন। এ শূদ্রক ভারতবর্ষের অতি অধোগতির সময়কার কবি।

মৃচ্ছকটিকে সুবন্ধুর নাম পাওয়া যায়। আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে, পূর্ণভদ্র সুরীর (১১৯৯ খ্রী.) পঞ্চতন্ত্রে কর্ণীসুতের উল্লেখ আছে। যথা :

যতো রাজ্ঞঃ কর্ণীসুতকথানকে কথ্যমানে ইত্যাদি।

এই গল্পটি পড়লে বোঝা যায় যে খ্রী. দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির ছড়ার মত কর্ণীসুতের কথানক (ছোটগল্প) ব'লে রাজাদের ঘুম পাড়াত।

আমার এ নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লেখবার উদ্দেশ্য এই দেখানো যে, সমগ্র "দরিদ্র চারুদত্ত"ই মৃচ্ছকটিকের অন্তরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। এবং মৃচ্ছকটিক ৩৫০ খ্রীস্টাব্দে লেখা হয়নি। "দরিদ্র চারুদত্ত" মৃচ্ছকটিকে রূপান্তরিত হয়েছে খুব সম্ভব খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর পরে। অর্থাৎ ভাসের ৬০০ বৎসর পরে। এই চোর কবি যিনিই হোন্, তিনি নাট্যকার না হলেও পাঠ্য সংস্কৃত শ্লোক লিখতে পারতেন।

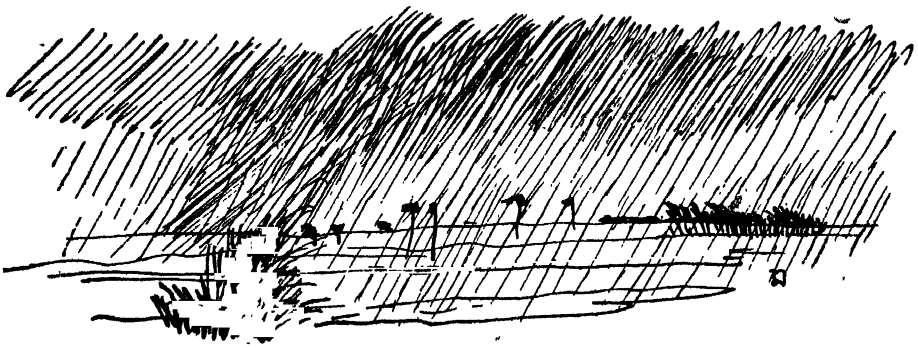

ওঁ পিতা নোঽসি

শ্রীরানী মহলানবীশ

কবি একদিন উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক নিয়ে আলোচনা করতে করতে বললেন "ব্রাহ্মসমাজে একটি শ্লোককে বাংলায় তর্জমা করতে গিয়ে একটা চরণের মানে এমন বদলে দেওয়া হয়েছে যাতে করে সমস্ত শ্লোকটাই আমার মতে নিরর্থক হয়ে গেছে। ঐ যে "রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্ তেন মাম্ পাহি নিত্যম্" এর বদলে বলা হয়েছে "দয়াময় তোমার অপার করুণা দ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করো" এটা প্রথম চরণগুলোর সঙ্গে মোটেই খাপ খায়নি। কারণ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই দুটো জিনিসকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে আসল মন্ত্রটাতে। যেমন অসত্য না থাকলে সত্যের, অন্ধকার না থাকলে আলোর, মৃত্যু না থাকলে অমৃতের মানে নেই, তেমনি রুদ্র না থাকলেও তাঁর প্রসন্নতার কোনো তাৎপর্য থাকে না। সেখানে তাঁকে শুধু দয়াময় বলা ভুল। কারণ তাঁর রুদ্রমূর্তিও যে সংসারে দেখছি সেটা তো অস্বীকার করতে পারিনে। তাই উপনিষদ তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা না ক'রে চেয়েছেন তাঁর প্রকাশ। সে প্রকাশ বিশ্বজগতের সব জিনিসের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের অন্তরের মধ্যে তা অনুভব করি ততক্ষণ আমার ভয় ঘোচে না, ততক্ষণ তিনি আমার কাছে রুদ্ররূপেই দেখা দেন। তাই তো প্রার্থনা "অসত্য থেকে আমাকে সত্যেতে নিয়ে যাও, অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোতিতে, মৃত্যু পার হয়ে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করো। হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও; হে রুদ্র তোমার দক্ষিণমুখ যেন সর্বদা আমি দেখতে পাই!" রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করা কি ক'রে সম্ভব হয় যদি না তাঁর প্রকাশ নিজের হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করি? আমার মতে সমস্ত প্রার্থনার মূল কথাটা হচ্ছে "আবিরাবীর্মএধি"। তিনি তো স্বপ্রকাশ, নিজেকে সর্বত্রই প্রকাশিত রেখেছেন কিন্তু সেটা আমাকে কোনো সান্ত্বনা দেয় না যদি না সেই প্রকাশকে আমি দেখতে পাই আপন অন্তরের মধ্যে। অসত্যের মাঝখানে থেকে সত্যের মহিমা বুঝব কেমন ক'রে? অন্ধকার ভেদ ক'রে আলোর জন্যে এই কান্না মেটাবে কে? মৃত্যুর অন্তরে যে অমৃতলোক সেই লোকে উত্তীর্ণ হব কোন্ শক্তিতে? এ সবই সম্ভব হয় যদি সেই 'আবিঃ'কে আপনার অন্তরের মধ্যে অনুভব করি। সেই অনুভূতি যখনি সত্য হয়ে ওঠে কেবল তখনই আমি বুঝতে পারি রুদ্রের শাসনটাই একমাত্র সত্য নয়, তার আড়ালে তাঁর প্রসন্নমুখ সর্বদাই আমার জন্য রয়েছে। আমি আমার আপনার দীনতাবশতঃ যখন তা দেখতে পাইনে তখনই আমার যত কান্না যত ভয়। তখন তাঁকে 'দয়াময়' ব'লে কেবলি দয়া ভিক্ষা করতে চাই। কিন্তু বিধাতা তো আপন নিয়মকে আমার জন্য লঙ্ঘন করতে পারেন না, এতটা প্রশ্রয় আশা করাই মূঢ়তা। তাই অবোধ শিশুর মতো কেবলি "আমাকে দয়া ভিক্ষা দাও" বলে কাঁদলে চলবে কেন। মা যখন সন্তানকে শাসন করেন সে মনে করে মা নির্দয় হচ্ছেন, তাকে দণ্ড না দিলেই যেন দয়া করা হ'ত, কিন্তু আসলে তো তা নয়। সেই দণ্ডটাই যে তাঁর দয়া,

শৈশবদশা কাটিয়ে উঠলে তবে তা আমরা বুঝতে পারি। মায়ের রুদ্রমূর্ত্তির আড়ালে যে তাঁর দক্ষিণমুখ রয়েছে তা যখন সন্তান দেখতে পায় তখন তার কান্না থেমে যায়। তাই বলছিলুম অসত্যের পাশে সত্য, অন্ধকারের পাশে আলো, মৃত্যুর পাশে অমৃতের উল্লেখ যেমন করা হয়েছে তেমনি রুদ্রের পাশে দক্ষিণমুখের কথাটা বলাই চাই। নইলে সমস্ত মন্ত্রটাই নিরর্থক হয়ে যায়। এটা কিন্তু আমার বাবামশায় করেননি। তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানের মধ্যে তিনি মন্ত্রটাকে ঠিকই রেখেছিলেন। এই রুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে দয়াময়কে আনার জন্য দায়ী তাঁর পরের যাঁরা তাঁরা।"

আমি বললাম, "আপনি এটা কোনো জায়গায় লেখেন না কেন? সত্যিই এখন বুঝতে পারছি আপনার আপত্তির কারণটা। এর আগে এই প্রার্থনামন্ত্রকে এত ভালো ক'রে আমি কখনো বুঝতে পারিনি আজ আপনি বুঝিয়ে দেওয়াতে যেমন ক'রে বুঝলাম। তাই বলছি যে অনেকেরই হয়তো আমার মতো সহজ হয়ে যাবে যদি আপনি এইরকম বুঝিয়ে কোনো জায়গায় লেখেন।"

বললেন, "আর কত লিখব? 'লেখা তো লিখেছি ঢের'।[১] তোমার একটা গুণ আছে যে তুমি আমার কাছ থেকে কথা টেনে বের করতে পারো, তাই তোমার কাছে আমি এত বকে যাই। এই আজই দেখো না এতক্ষণ যা বললুম এ তো প্রায় একটা পুরো বক্তৃতা বললেই হয়। তুমি মাঝে মাঝে এক-একটা প্রশ্নের খোঁচা লাগালে আর আমি গড় গড় ক'রে বলে গেলুম এবং তুমি ভালোমানুষটির মতো চুপ করে বসে শুনলেও। ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে কিনা, তাই ছেলেবেলা থেকে লম্বা লম্বা বক্তৃতা শোনা অভ্যেস আছে, কি বলো?" ব'লে হাসতে লাগলেন।

এটা লিখে ফেলবার জন্য আমি আবার জেদ করায় তখন বললেন, "দেখো, আরো দুঘণ্টা হয়তো আমি বকে যেতে পারি, কিন্তু লিখতে আমার বেজায় কুঁড়েমি। এত ছোটোখাটো খুচরো কাজ, লেখা, মাসিকপত্রের দাবি, বিশ্বভারতীর কর্ত্তব্য, সব আমার মনের উপর এমন চেপে বসে থাকে যে আর ভালো লাগে না। একটু ছুটি পেতে ইচ্ছে করে। এর উপর আবার তুমিও পীড়াপীড়ি কোরো না লিখবার জন্যে। এই তো তোমাকে মুখে মুখে এতখানি বললুম, তুমিই না হয় কোথাও লিখে রেখো।"

সেদিন কবি কথা বলবার ঝোঁকে ছিলেন, আবার আরম্ভ করলেন, "উপনিষদের আর একটা মন্ত্রও এইরকম আছে যেটা সম্বন্ধে আমার বার বার মনে হয়েছে যে একটু বুঝিয়ে না দিলে তার মানেটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। সেটা হচ্ছে 'ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।' হঠাৎ শুনেই শ্লোকটা কি রকম খাপছাড়া ঠেকে,—ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত করো, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো, কারও ধনে লোভ কোরো না—এটা কি যথেষ্ট পরিষ্কার হ'ল? প্রথম লাইনটা তো বুঝলুম, কিন্তু দ্বিতীয়টা? ত্যাগের দ্বারা ভোগ কি ক'রে করব, ত্যাগ এবং ভোগ একই সঙ্গে কি ক'রে সম্ভব? কিন্তু যদি একটু ভেবে দেখো দেখবে মানেটা খুবই পরিষ্কার। যেই ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎসংসারকে আচ্ছাদিত দেখা সম্ভব হবে অমনি আর ছোটো জিনিসের মধ্যে মন আবদ্ধ থাকতে চাইবে না। মন তখন আপনিই সব বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে উঠবে।

[১] "লেখা তো লিখেছি ঢের এখন পেয়েছি টের সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুষ।" —"পত্র", মানসী

তাই ভোগ যখন করব তখনও ভোগের বস্তু সম্বন্ধে আসক্ত হয়ে পড়ব না। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার মানেই হ'ল তাই। আসক্তি যদি না থাকে তাহলে যে-কোনো মুহূর্ত্তেই যে-কোনো বস্তু ত্যাগ করা সম্ভব। তাই বলেছে 'মা গৃধঃ'। এইটাই হ'ল সব চেয়ে বড়ো উপদেশ যে, লোভ কোরো না। এই পরের ধনে লোভ এবং নিজের ধনে আসক্তি নিয়েই তো যত অশান্তি, যত হানাহানি। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছে প্রথমেই 'ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বম্' ব'লে। আগে সেইটে অভ্যাস করতে হবে। তার পরে সবটাই সহজ, কারণ যার জীবনে সমস্ত জগৎসংসারকে প্রতি তুচ্ছ বস্তুকেও ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখা সম্ভব হয়েছে তার আর ভাবনা কি? সে সব-কিছুর মধ্যে থেকেও সব-কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তখন মনে কোনো আসক্তি থাকে না, লোভ থাকে না, একেবারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই লোভ এবং আসক্তিই তো মানুষকে পরাধীন করেছে। তাই মানুষ সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উপনিষদ তো সন্ন্যাসী হতে বলেননি। সব-কিছুর মধ্যেই নিরাসক্তভাবে বাস করতে বলেছেন, লোভকে একেবারে সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রে। আসক্তি এবং লোভকে কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে যায় যদি গোড়াকার উপদেশটা জীবনে সাধন করি 'ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' নইলে সংসার ত্যাগ করলেও আসক্তি আমাকে ত্যাগ করে না। সন্ন্যাসীর জীবনেও নিজের ছোটো-আমিকে বড়ো করে তোলবার লোভ হয়। তখন সে গুরু হয়ে বসে, নিজের শিষ্যর সংখ্যা বাড়াবার দিকে মন দেয়, ধর্ম্মকে নিয়ে কেনাবেচা শুরু করে, আরো কত কি। সে আসক্তি কি গৃহীর আসক্তির চেয়ে কম? 'মা গৃধঃ' তখন তার কানে পৌঁছয় না। এইজন্যে বুদ্ধদেবও এই লোভকেই একেবারে জড়সুদ্ধ নষ্ট করতে বলেছেন। মনকে একেবারে আসক্তিমুক্ত করা বড়ো সহজ কথা নয়, তবে একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়—এটা আমি নিজের জীবনে দেখেছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত এর জন্যে চেষ্টা করতে হয়। নিজের ছোটো-আমিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই বড়ো-আমির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলে সে ভারি আরাম। তখন আর কিছুই মনকে বিচলিত করতে পারে না। তাই আমি প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠে চুপ ক'রে ব'সে নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করি। এক-একদিন পারিনে, শক্ত হয়। কিন্তু আবার কোনো-কোনো দিন দেখি ফস্ ক'রে বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই আমার ছোটো-আমিটা ঐ দূরে আলাদা হয়ে বসে রয়েছে যাকে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো সেই মানুষটা। সেই লোকটা অতি তুচ্ছ। তার রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, আরো কত ক্ষুদ্রতা আছে, সে অতি সাধারণ একটা মানুষ, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে সে চঞ্চল হয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তার চেয়ে অনেক বড়ো। আমাকে ছোটো সুখ-দুঃখ নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না, আমার মনের গভীর শান্তির ব্যাঘাত কেউ করতে পারে না, আমি যেন নিজেকে সেই বিরাটের মধ্যে বিলীন দেখতে পাই। এটার জন্য কি কম চেষ্টা করতে হয়—প্রতিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে তবে সহজ হয়ে আসে।

"রোজ শেষরাত্রে জেগে সূর্য্যোদয়ের আগে পর্য্যন্ত নিজের মনকে আমি স্নান করাই। শান্তম্ আমার মন্ত্র। রাত্রেও শুতে যাবার আগে আমি সেইজন্য খানিকক্ষণ একা ব'সে থাকি। সেই সময়টা আমার নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার সময়। সারাদিন কত তুচ্ছ কারণে নিজের

কাছে, নিজের পরাজয় ঘটে, তাতে মন ক্লিষ্ট হয়ে থাকে, রাত্রে শুতে যাবার আগে মনকে শান্ত ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিতে না পারলে, আরাম পাইনে। আর শেষরাত্রে আমার নিজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবার কাজ চলতে থাকে। সেই সময়টা খুব ভালো সময়। বাইরের কোনো কোলাহল থাকে না, নিজেকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই তো ভোরবেলাটা যারা ঘুমিয়ে নষ্ট করে তাদের উপর আমার রাগ ধরে, বিশ্রী লাগে দেখতে। বাবামশায় যখন ছেলেবেলায় পাহাড়ে আমাকে শেষরাত্রে তুলে দিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে ভোর চারটের সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করাতেন তখন ভাবতুম উনি এরকম কেন করেন? আর একটু বেশীক্ষণ কেন আমাকে বিছানায় থাকতে দেন না? কিন্তু এখন কৃতজ্ঞ হই তিনি আমার এই ভোরে ওঠার অভ্যেস করিয়ে দিয়েছিলেন ব'লে। নইলে দিনের সব চেয়ে ভালো সময়টা আমি ঘুমিয়ে কাটাতুম বুঝতেও পারতুম না যে কতখানি বঞ্চিত হলুম।

"তোমরা আশ্চর্য্য হও এত কম ঘুমিয়েও আমার শরীর খারাপ হয় না দেখে। আমার তো মনে হয় বেশী ঘুমোলেই শরীর খারাপ হয়। ছেলেবেলায় যখন পৈতে হয় তখন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে দিনে ঘুমোব না—দিবানিদ্রা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। তখন নতুন ব্রহ্মচারী, খুব উৎসাহের সঙ্গেই সব নিয়ম পালন করতুম। ছেলেবেলার সেই নিয়ম জীবনে বরাবর পালন করেছি, দিনে ঘুমোনো অভ্যেস করিনি। তাই এখন কাউকে দিনে ঘুমোতে দেখলে ভাবি, জীবনের অধিকাংশ সময় এরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে, ভোগ করলে কতটুকু? আমার মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে-সব নিয়ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছিল সেগুলো খুব প্রয়োজনীয়। নইলে শরীর মন দুয়েরই কিরকম থল্‌থলে চেহারা হয়ে যায়, আঁটসাঁট বাঁধন থাকে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গায়ত্রী জপ করবার নির্দ্দেশ, দিবানিদ্রারূপ ব্যসন পরিত্যাগ করা, আহারে সংযম, এ সবই শরীর মন দুটোকেই বেশ শক্ত জোরালো ক'রে গড়ে তোলবার জন্যে। আমার বাবামশায়ের এগুলোর প্রতি আস্থা ছিল, তাই তো আমাদের ছেলেবেলায় এত কড়া রকম ক'রে মানুষ করেছিলেন। কোনোরকম প্রশ্রয় দেননি, অথচ সব বিষয়ে তৈরী ক'রে তোলার দিকে নজর ছিল। আমরা তো ধনী-ঘরের ছেলে, কিন্তু আমাদের জন্যে কোনোরকম বিলাসিতার আয়োজন ছিল না। আজকালকার অতি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলেরাও আমাদের চেয়ে বেশী ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়। আমরা ছেলেবেলায় দোলাই গায়ে দিতুম, শীতের দিনে একটা সুতি পিরানের উপর আর একটা পিরান চড়াতুম গরম কাপড়ের বদলে। খাবারের ভার চাকরদের উপরে ছিল, তারা দয়া ক'রে যা দিত তাই খেতুম। কিন্তু নিয়মিত ভোরে উঠে খালি গায়ে ধুলোমাটি মেখে পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে হ'ত, ডন ফেলতে হ'ত। কুস্তি শেষ হবার আগেই মাষ্টার এসে ব'সে আছেন। একজনের পর একজন চলেইছে, সেই সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত আর কোনো ফাঁক ছিল না। সে যে কত রকমের বিচিত্র শিক্ষার ধারা সে আর কি বলব। একেবারে সর্ব্ববিষয়ে বিশারদ্ ক'রে তোলবার ব্যবস্থা। এমন কি, একটা মানুষের কঙ্কাল নিয়ে একজন মাষ্টারের কাছে আমাদের দেহের প্রত্যেকটা হাড়ের নাম পর্য্যন্ত শিখতে হয়েছিল। সেটা আমার বেশ ইনটারেষ্টিং লাগত। একসময় আমাদের ক্ষুদ্রতম হাড়েরও নাম আমি জানতুম—কেউ ঠকাতে পারত না। এখন সব ভুলে গেছি। এর মধ্যে সব চেয়ে দুঃখের দশা ছিল ইস্কুলে যাওয়া। সেই সময়টা রোজ ছটফট করেছি পালাবার জন্যে। ছোড়দিদি যখন বেণী

দুলিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে যেতেন তখন মনে মনে ভাবতুম আমি কেন ছোড়দিদির মতো মেয়ে হয়ে জন্মাতুম না, তা হলে তো আর ইস্কুলে যেতে হ'ত না। এখন ভাবি কি সর্ব্বনেশে ইচ্ছেই আমার হ'ত—ভাগ্যি মেয়ে হয়ে জন্মাইনি। খুব ফাঁড়া কেটে গেছে, কি বলো? না, তোমার কাছে ব'লে ভালো করিনি, কথাটা বিশেষ পছন্দ হবে না, কারণ তুমি তো বলো তোমার আবার ফিরে ফিরে কেবলি মেয়ে হয়ে জন্মাতে ইচ্ছে। কি যে তোমার বুদ্ধি! একবার মেয়ে হয়েও কি বুঝতে পারলে না যে কতখানি বঞ্চিত হয়েছ। একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি।"

আমরা দুজনেই খুব হাসতে লাগলাম। দু-একটা এ-কথা সে-কথার পর আমি বললাম, "পিতা নোঽসি মন্ত্রটা আমার খুব ভালো লাগে। তার কারণ বোধ হয় নিজের বাবার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এত স্পষ্ট এত সত্য করে অনুভব করি যে ভগবানকে পিতা বলে ডাকলে যে কি বোঝায় তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না।"

কবি বললেন, "তোমার কথাটা আমি খুব বুঝতে পারছি। মেয়েদের কাছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধটা এত বেশী বড়ো যে কোনো অ্যাবষ্ট্রাক্ট ধারণা নিয়ে তারা তৃপ্তি পায় না। সেইজন্যেই তারা বড়ো বড়ো আদর্শের পিছনে পুরুষের মতো পাগল হয়ে ছোটে না, কিন্তু যাকে ভালোবাসে তার জন্যে অনায়াসেই সব-কিছু ছাড়তে পারে, প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারে, দরকার হলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও দ্বিধা করে না। আমার তো মনে হয় যখনি কোনো মেয়ে বড়ো কিছু একটা আইডিয়া বা আদর্শের জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করে তখনি খুঁজে দেখলে দেখা যায় তার পিছনে কোনো "ব্যক্তি" রয়েছে, যার প্রতি ভালোবাসা তাকে এই পথে টেনে বের করেছে। সে ভালোবাসাকে আমি ছোটো করছিনে। বস্তুত ভালোবাসা যখন বড়ো কেবল তখনি সে আসক্তিমুক্ত। তখনি সে নিজেকে এমনি করে দান করতে পারে, স্বার্থপরের মতো প্রিয়জনকে নিজের কাছে বেঁধে রাখবার চেষ্টা না ক'রে তার আদর্শের কাছে, তার কাজে, নিজেকে উৎসর্গ করে। আমার বিশ্বাস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, সিষ্টার নিবেদিতা, সকলেরই এই এক ইতিহাস। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যেও যদি এই ফাঁকটুকু রাখতে পারা যায় তাহলে আর সংসারে কোনো অশান্তি থাকে না, পরস্পর পরস্পরের বন্ধন না হয়ে সহায় হয়ে ওঠে। স্ত্রী তখন পুরুষের চিন্তায় কর্ম্মে প্রেরণা জোগায়, সংসারের সকল দুর্গম পথ অতিক্রম করবার শক্তি দেয় এবং পুরুষ তার পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে আপন বীর্য্যের দ্বারা সকল অকল্যাণ হতে রক্ষা করে। এইজন্যেই আমাদের দেশে স্ত্রীকে শক্তি বলেছে, কারণ পুরুষের জীবনে প্রায় সকল মহৎ চেষ্টা বা কর্ম্মের জন্যই নারীর প্রেরণার প্রয়োজন আছে। হয়তো সে সব সময়ে এ-কথা জানেও না, কিন্তু তার অবচেতন-মন ঠিক রাস্তা দিয়েই তাকে নিয়ে যায়। জগতের সব বড়ো বড়ো আর্টিস্ট কবি, এমন কি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের জীবনেও এ-কথা সত্য। তাই তো আমরা তোমাদের শক্তি ব'লে পুজো করেছি। কিন্তু এতবড়ো শক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় যখন আসক্তির বশে তোমরা পুরুষকে বাঁধবার চেষ্টা করো। তখন সব চেয়ে যে মুক্তি দিতে পারত সেই সব চেয়ে বড়ো বন্ধন হয়ে ওঠে, খাঁচার পাখির মতো মন ছটফট করে পালাবার জন্যে, তার আনন্দ ঘুচে যায়, তাই যে বাঁধবার চেষ্টা করে সেও বঞ্চিত হয়। পুরুষ তার কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেই আপন মর্য্যাদা খুঁজে পায়, সেখানেই সে বড়ো। আপন আসক্তির দ্বারা স্ত্রী সেই বড়ো জায়গা থেকে তাকে নীচে নামিয়ে আনলে নিজেরও তাতে অসম্মান, এ-কথাটা যদি সে না ভোলে তাহলে আর কোনো গোল থাকে না। সহজ আনন্দের মধ্যেই দুজনের জীবন

পরিপূর্ণতা লাভ করে, সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই আগে যে বলছিলুম 'মা গৃধঃ'—এই উপদেশটি সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। জীবনের সর্ব্বত্রই এই এক রিপু আমাদের সব কিছুকে বিষিয়ে তোলে। এরই সামনে জন্যে যারা চারিদিকে ইতরের মতো সম্মান নিয়ে প্রশংসা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, নিজেকে বাড়িয়ে সকলের তুলে ধরবার নির্লজ্জ চেষ্টা করে, তারা বুঝতে পারে না নিজেরাই নিজেদের কি নিদারুণ অপমান করছে, কারণ লোভের দ্বারা তাদের দৃষ্টি যে আচ্ছন্ন। সংসারে অনেক মেয়েকে দেখেছি ঈর্ষায় তাদের মন ভরে ওঠে যদি তার প্রিয়জন, সে স্বামীই হোক সন্তানই হোক বা বন্ধুই হোক, তাকে ছাড়া, আর কারো প্রতি একটু মনোযোগ দিয়েছে। এমন কি স্বামীর কর্ম্মের প্রতিও একটা বিমুখতা আসতে আমি দেখেছি যদি স্বামী স্ত্রীর চেয়ে কর্ম্মকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। এইসব মেয়েরাই ছেলের বিয়ের পরও আশা করে যে তখনও বউর চেয়ে তার প্রতিই ছেলের বেশি আকর্ষণ থাকবে। এরা সর্ব্বদাই নিজের ইচ্ছে ও আসক্তির গণ্ডীর মধ্যে আপন প্রিয়জনকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করছে। দেখলে আমার এত বিশ্রী লাগে। ভাবি, ও বুঝতে পারছে না যে এত প্রাণপণ ধরে রাখবার চেষ্টার দ্বারাই তাকে আরো সহজে হারাচ্ছে। বাইরে থেকে যখন বাধ্য হয়ে ধরা দিতে হয় তখনই মন সব চেয়ে বেশি বিদ্রোহ করে এবং দূরে সরে যায়। এই সহজ সত্যটা মানুষ ভুলে যায় কেবল লোভের দ্বারা। মন যেখানে আসক্তিশূন্য সেখানে ভালোবাসায় সে কি আনন্দ। বিধাতা তো সেইজন্যেই আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন, জোর ক'রে তো ভালোবাসাননি, এমন কি বিদ্রোহ করবার স্বাধীনতাও আমাদের দিয়েছেন। সেইজন্যেই না আকাশে বাতাসে এত আনন্দ। এ কথা মানুষ কেন ভোলে? সম্পত্তির মতো ক'রে যখনই কিছু পেতে চাই তখনই আমরা তা হারাই; নইলে আমার আনন্দ কে কেড়ে নিতে পারে? মেয়েদের আরো বেশি ক'রে এ কথা মনে রাখা দরকার কারণ তাদের কাছে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা বেশী সত্য বলেই তার আসক্তিও অত্যন্ত প্রবল।

"তোমাকে যে বলছিলুম যে তোমার 'পিতা নোঽসি' মন্ত্রটি ভালো লাগার মানে আমি খুব বুঝতে পারছি তার কারণ আমার মেয়ের জীবনে এটা খুব স্পষ্টভাবে আমি দেখেছি। আমার মেজ মেয়ে রানীর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি। তার মৃত্যুর সময় তার মা বেঁচে ছিলেন না। সমস্ত অসুখের মধ্যে আমিই তার সেবা করেছিলুম শেষ পর্য্যন্ত। তোমরা হয়তো এখন কল্পনাও করতে পারো না আমি আবার কি ক'রে এতবড়ো রুগীর সেবা করতে পারি। কিন্তু সত্যিই পারতুম। কত সময় সারা রাত পাখার বাতাস করেছি কিন্তু একটুও ক্লান্তি বোধ করিনি। তার বাবার হাতে ছাড়া ওষুধ কি পথ্য খেতে ভালো লাগত না। সর্ব্বদা তার বাবাকে কাছে চাই। যদিও তার বিয়ে হয়েছিল তবু তার সমস্ত মন জুড়ে বসে ছিল তার বাবা। আলমোড়াতে যখন তাকে চেঞ্জে নিয়ে যাই তখন তার অসুখ খুব বেশী। তাকে খুশি রাখবার জন্যে রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে ব'সে শোনাতুম, যাতে কিছুক্ষণও অন্তত রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। এমনি করেই আমার "শিশু" বইখানা লেখা হয়েছে—ও কবিতাগুলো রানীর অসুখের সময় লিখেছিলুম। অল্পদিন পরে অসুখ বাড়ল, বুঝলুম ওখানে রাখা আর ঠিক হবে না তাই সেইদিনই ওকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলুম। কি করে এনেছিলুম সেদিন, শুনলে অবাক হবে। স্থির করেছি ওকে আর ওখানে রাখব না অথচ যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলুম না। ওর তখন শরীরের এমন অবস্থা যে একেবারে শুইয়ে না আনলে চলবে না। বহু কষ্টে অনেক বেশি টাকা কবুল করে কতকগুলো কুলিকে

রাজি করালুম একেবারে খাটশুদ্ধ ধ'রে ওকে পাহাড় থেকে নাবাতে। কাঠগুদাম হচ্ছে রেল্‌-ষ্টেশন, আলমোড়া থেকে আশি মাইল বোধ হয় বড়ো রাস্তা দিয়ে। কিন্তু পাহাড়ি পায়ে চলা পথ ধরলে ত্রিশ-বত্রিশ মাইলেই ষ্টেশনে পৌছনো যায়। স্থির করলুম রানী যাবে খাটে, আমি ওর সঙ্গে হেঁটে। সন্ধ্যাবেলা যখন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে ষ্টেশনে পৌছেছি শুনি গাড়ি তার আগেই ছেড়ে গেছে। সারারাত আমাদের কাঠগুদামে অপেক্ষা ক'রে পরের দিন গাড়ি ধরতে হবে। একে পথশ্রমে রানীর শরীর আরো খারাপ, নিজেও ক্লান্তিতে উদ্বেগে অবসন্ন, তার উপর আর এক বিপদ হ'ল থাকবার জায়গা নিয়ে। ডাকবাংলোতে কয়েকটি ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ আগেই এসে দখল জমিয়ে বসেছে, তারা কিছুতেই আমাদের জায়গা দিতে রাজি হ'ল না। অনেক করে বললুম, আমার মেয়ে অসুস্থ, এইরকম বিপদে পড়েছি, কিন্তু সম্ভবত অসুখ বলেই তারা আরো বিশেষ ক'রে আপত্তি করল আমাদের নিতে। অগত্যা ষ্টেশনের কাছেই একটা ছোট্টো ধরমশালা মতো খুঁজে বের ক'রে তার দোতলায় একটা ঘরে রানীকে নিয়ে গিয়ে শোয়ালুম। নীচে একটা কাঠের গোলা, উপরে ছোটো দুখানা ঘরে এইরকম বিপন্ন যাত্রীদের রাত্রে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা। সেরাত্রে সেখানেই রুগীর বিছানার কাছে বসে কাটল। তুমি ভাবতে পারো এখন যে আমি একা একা এইরকম করে অতবড়ো একটা রুগীর সমস্ত ব্যবস্থার বোঝা বহন করতে পারি? এককালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শক্তি তোমাদের কারো চেয়েই কিছু কম ছিল না। এখন ভারি তুমি 'হেড নার্স' হয়েছ। ঐ দেখো আবার তোমাকে একটা খোঁচা দিলুম। যাক্‌গে, যা বলছিলুম—পথের দুঃখ তখনো ফুরোয়নি। পরদিন রেলে তো রওনা হওয়া গেল, কিন্তু যাত্রা ফুরোবার আগেই আর এক বিপদ। মাঝখানে কোন্‌ একটা ষ্টেশনে ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মোগলসরাই হবে, গাড়ি থামতে রানীর জন্যে একটু দুধ জোগাড় করতে নেমেছি—বেঞ্চির উপরে আমার মনিব্যাগটা রেখে গিয়েছি তখনই ফিরে আসব ব'লে, এসে দেখি আমার টাকার থলেটি অন্তর্হিত, কে নিয়েছে খুঁজে বের করবার চেষ্টা বৃথা। মনে মনে অত্যন্ত রাগ হ'ল, কিছু টাকা সঙ্গে নেই অথচ অতবড়ো একটি রুগী সঙ্গে রয়েছে। গাড়ি ছেড়ে দিল। নিষ্ফল রাগে যখন মন অত্যন্ত চঞ্চল, হঠাৎ মনে হ'ল—আচ্ছা বোকা তো আমি। এরকম করে মনের শান্তি নষ্ট ক'রে লাভ কি, তার চেয়ে মনে করলেই তো পারি টাকাটা যে নিয়েছে সে চুরি ক'রে নেয়নি, আমি নিজে ইচ্ছেপূর্ব্বক তাকে ওটা দান করলুম। হয়তো আমার চেয়েও তার ওটার বেশি প্রয়োজন। তাই আমি দানই করছি। যেই ভালো করে এ-কথা মনকে বলালুম, ব্যস্‌, সে তখনি শান্ত হয়ে গেল। নিজের মনকে দিয়ে যখন সত্যি করে এরকম কিছু বলাতে পারি তার পরই দেখি সব গোল চুকে যায়।

"সেবারে রানীকে কলকাতায় আনার কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমাকে বললে—বাবা, পিতা নোঽসি বলো। আমি মন্ত্রটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। তার জীবনের চরম মুহূর্ত্তে কেন সে 'পিতা নোঽসি' স্মরণ করল তার ঠিক মানেটা আমি বুঝতে পারলুম। তার বাবাই যে তার জীবনের সব ছিল, তাই মৃত্যুর হাতে যখন আত্মসমর্পণ করতে হ'ল তখনো সেই বাবার হাত ধরেই সে দরজাটুকু পার হয়ে যেতে চেয়েছিল। তখনো তার বাবাই একমাত্র ভরসা এবং আশ্রয়। বাবা কাছে আছে জানলে আর কোনো ভয় নেই। সেইজন্যে ভগবানকেও পিতা রূপেই কল্পনা ক'রে তাঁর হাত ধরে অজানা পথের ভয় কাটাবার চেষ্টা করেছিল। এই সম্বন্ধের চেয়ে আর কোনো সম্বন্ধ তার কাছে বেশি সত্য হয়ে ওঠেনি। তাই তোমারও 'পিতা নোঽসি' ভালো লাগে শুনে আমার রানীর কথা মনে পড়ল—বাবা, পিতা নোঽসি বলো। তার সেই শেষ কথা যখন-তখন আমি শুনতে পাই—বাবা, পিতা নোঽসি বলো।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী বাংলা ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের অষ্টাশী বৎসরের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের বিবরণ তিনি এই পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তিরই ইতিহাস। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে এমন বহু সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন যাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ হইয়াছিল। আত্মজীবনীতে ইহার কোন-কোনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা সামান্য উল্লেখ আছে মাত্র। মহর্ষির জীবনচরিতও কয়েকখানি লিখিত হইয়াছে। তাঁহাব প্রথম-জীবনের কথা প্রধানতঃ আত্মজীবনীর উপরই নির্ভর করিয়া লিখিত হওয়ায় এ-সব পুস্তকে তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মধারার আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করা হয়ত সম্ভব হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ নিজ আচরণ দ্বারা রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে একটি আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসমাজে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে ইহা একটি বড় কৃতিত্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মবোধ কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় জগৎ আশ্রয় করিয়া জাগ্রত ও বর্দ্ধিত হয় নাই, স্বদেশীয় মানবসাধারণের কল্যাণে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এইজন্য তিনি ধর্ম্মবীর হইয়াও কর্ম্মবীর ছিলেন। তাই ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় যেমন, লোকহিতেও তেমনি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ও কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য করি। তাঁহার জীবনের এই দিক্‌টির কথাও বিশদভাবে আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রথমেই একটি কথা বলা প্রয়োজন। গত শতকের প্রথমার্দ্ধের সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জনহিতকর কার্য্যের বহুতর পরিচয় মিলে। এই সব পত্র-পত্রীতে প্রকাশিত তথ্যের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত। তবে তাঁহার আত্মজীবনী হইতেও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। মহর্ষির ছাত্রজীবন সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলিব।

ছাত্রজীবন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় ১৫ মে ১৮১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যখন আট কি নয় বৎসর বয়স তখন পিতা দ্বারকানাথ তাঁহাকে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে[১] (পৃ. ৫৬) লিখিয়াছেন :

> শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কালেজও ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত।

---

[১] বিশ্বভারতী সংস্করণ। এই প্রবন্ধে এই সংস্করণই অনুসরণ করা হইয়াছে।

রামমোহন রায়ের স্কুল 'এংলো-হিন্দু স্কুল' বা 'হিন্দু স্কুল' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের কৈশোরের শিক্ষা এখানেই পরিসমাপ্ত হয়। এখানকার শিক্ষার প্রভাব তাঁহাতে অতিমাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। কাজেই এই স্কুলটি সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এংলো-হিন্দু স্কুলটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। প্রথম প্রথম ইহার পরিচালনার ব্যয়ভার রাজা রামমোহন রায় একাই বহন করিতেন। পরে বন্ধুগণের অর্থসাহায্যও তিনি কিছু কিছু পাইয়াছিলেন। সে-যুগের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জর্ন্যালে'র সহকারী সম্পাদক এবং বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রায়ের সেক্রেটরী স্যাণ্ডফোর্ট আর্নট এই স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইংরেজী-বাংলা দুই-ই এখানে বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। রামমোহন-বন্ধু ও শিষ্য একেশ্বরবাদী উইলিয়ম এডাম এই স্কুলের 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক ছিলেন। হিন্দু কলেজ, পটলডাঙ্গা স্কুল (ডেভিড হেয়ার স্কুল) এবং ভবানীপুরস্থ জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল নামক প্রথম শ্রেণীর স্কুল ও কলেজের মত এই স্কুলেরও খ্যাতি তখন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই স্কুলে ধনী ও দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে ব্যবহারে কোনরূপ তারতম্য করা হইত না ; পাঠে সকলেই সমান সুযোগ পাইত। এই বিশেষত্বটি বিদেশীদেরও চোখ এড়ায় নাই। 'বেঙ্গল ক্রনিক্ল্' ১৮২৮, ১০ই জুন তারিখে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লেখেন :

"To the intelligent observer it must also have been an additional source of gratification to notice among the scholars several of the children of the native gentlemen who contribute to the support of the school, in no respect distinguished from those who receive their education gratuitously."*

দেবেন্দ্রনাথ কৈশোরে রামমোহন রায়ের স্কুলেই স্বদেশপ্রেমের প্রথম পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ; বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া একাধিক বার পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। সে-যুগে স্কুল-কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা বিশেষ ঘটা করিয়া হইত। দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া এই সব অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। সম্পাদকেরা নিজ নিজ পত্রিকায় ছাত্রদের কৃতিত্ব, পারিতোষিক-প্রদান, বিদ্যালয়ের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেন। উপরি-উদ্ধৃত অংশটি এইরূপ একটি মন্তব্য হইতে গৃহীত। এই সব মন্তব্য হইতে অনেক নূতন কথা জানা যায়। এংলো-হিন্দু স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণ পর পর দুই বৎসর 'বেঙ্গল ক্রনিক্ল্' ও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত হয়। পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া দেবেন্দ্রনাথ যে এই দুই বারেই পুরস্কার প্রাপ্ত হন তাহা বিবরণ দুইটি হইতে জানা যায়। 'বেঙ্গল ক্রনিক্ল্' ১৮২৮, ১০ই জানুয়ারী তারিখে লেখেন :

"At the close of the examination several prizes consisting of appropriate books were awarded to the deserving boys. They had been presented for the purpose by Mr. [David] Hare, Mr. Holcroft, and the gentlemen composing the committee of Unitarian Association.

---

* *Cf.* Ram Mohun Roy and the Progressive Movements in India. By J. K. Mazumdar, p. 264.

The boys thus singled out for efficiency were. . . Debendernauth Takoor; . . . and those rewarded for the regularity of their attendance were Ramapersaud Roy, ..."†

ছাত্রদের পরবর্ত্তী বাৎসরিক পরীক্ষা হয় ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ঐ বৎসর দেবেন্দ্রনাথ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮২৯, ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে পরীক্ষার বিবরণ দান-প্রসঙ্গে লিখিলেন :

"The following are the names of the pupils who most distinguished themselves and who received the prizes both as rewards for proficiency and regularity of attendance :—

"Third Class—Ramapersaud Roy and Debendranauth Tagore. . . . ‡

এই দুই বৎসরের পরীক্ষার বিবরণে দেবেন্দ্রনাথ ও রমাপ্রসাদ ছাড়াও কয়েক জন কৃতী ছাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, মথুরানাথ ঠাকুর, শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, নবীনমাধব দে, রাজা বাবু [রাজারাম] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরে ইঁহাদের কাহারও কাহারও নাম পাওয়া যাইবে।

এংলো-হিন্দু স্কুল চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ১৮২৭ সালে চতুর্থ ও ১৮২৮ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—ইহা আমরা দেখিলাম। রামমোহন রায় ১৮৩০, নবেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহার উপস্থিতিতে তাঁহারই স্কুলে দেবেন্দ্রনাথ বাকী দুই শ্রেণীতে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—পরোক্ষ প্রমাণে তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

১৮২৬, মে মাস হইতে হিন্দু কলেজের যুব-ছাত্রগণ ডিরোজিওর নিকটে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২৯-৩০ সন নাগাদ এই সব ছাত্র সকল ধর্ম্মের প্রতিই অনাস্থা জ্ঞাপন করিতে থাকেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যে স্বদেশের উন্নতির পথে অন্তরায়, এ-কথাও তাঁহারা এই সময়ে ঘোষণা করিতে শুরু করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যদি ১৮২৯ ও ৩০ এই দুই বৎসরও হিন্দু কলেজে পড়িতেন তাহা হইলে নব্যশিক্ষার ছোঁয়াচ নিশ্চয়ই তাঁহাতে লাগিত। নব্যশিক্ষা দেবেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তিনি উগ্রপন্থী ছাত্রদের মত হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, রামমোহন রায়ের স্কুলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল স্ব-দেশ, স্ব-ধর্ম্ম ও স্ব-সংস্কৃতির সংস্কার ও উন্নতিসাধন, কখনও বিলোপসাধন নহে। দেবেন্দ্রনাথ কৈশোরে এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রাবস্থাতেই উক্ত আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

সে-যুগে পটলডাঙ্গা স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মত এংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রবৃন্দও ডিবেটিং সোসাইটি বা বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'জন বুল' পত্রিকা একটি বিতর্কসভার বিবরণ ১৮৩০, ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' হইতে উদ্ধৃত করেন। এই বিবরণে দেখিতে পাই, হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুলের ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া এই স্কুলের ছাত্রগণ এংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্কসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব দিকে কৃষ্ণচন্দ্র বসুর

† Ram Mohun Roy and the Progressive Movements in India, p. 264-5.

‡ *Ibid.*, p. 270.

গৃহে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার সন্ধ্যাকালে এই সভার অধিবেশন হইত। এখানে ধর্ম্ম ব্যতীত সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইত।*

দেবেন্দ্রনাথ কোন্ তারিখে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, কত দিন এখানে অধ্যয়ন করেন—এ-সব বিষয়ে তাঁহার আত্মজীবনীতে কোন উল্লেখ নাই। তবে তিনি যে কিছুকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টারে' হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উক্ত রেজিষ্টার (পৃ. ৪৭১) লেখেন :

"Tagore Debendranath, Maharshi :

Entered Hindu College, shortly after the resignation of Derozio, 1831; left while in the 2nd class. . . . . ."

'রেজিষ্টারে'র উক্তিই মোটামুটি ঠিক বলিয়া মনে হয়। ১৮৩০ সনে এংলো-হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া পর বৎসরের আরম্ভেই দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া থাকিবেন। এই বৎসর ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কর্ম্মে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। ইহার পর কিছুকাল যাবৎ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন মত-উদ্দীপক শিক্ষা যাহাতে ছাত্রদের না দেওয়া হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন। মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ আড়াই কি তিন বৎসরকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কলেজের উন্নতিকল্পে পিতা দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা সুবিদিত। তিনি শুধু পুত্র দেবেন্দ্রনাথকেই কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন না, নিজেও ইহার ম্যানেজিং বা পরিচালনা কমিটির সদস্য-পদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৩, মার্চ্চ মাসে কমিটির অন্যতম সদস্য লাড্‌লিমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হেতু যে পদ শূন্য হয় তাহাতেই তিনি সদস্য নিযুক্ত হন।† দ্বারকানাথ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (আগষ্ট ১৮৪৬) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এংলো-হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজ উভয়ত্রই দেবেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেন। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা ও তত্ত্বোধিনী সভায় তাঁহাদের সহযোগিতা বিশেষ লক্ষণীয়।

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা

এংলো-হিন্দু স্কুলের শিক্ষার উচ্চাদর্শের কথা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য একটি ব্যাপারে সুপরিস্ফুট হইয়াছিল। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আরম্ভেই নব্যশিক্ষিত যুবকগণ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহারা যে-সব সভা-সমিতি বা বিতর্ক-সভা স্থাপন করেন তাহাতে যে শুধু নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতেছিলেন তাহা নহে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই এসমস্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সভা-সমিতি

---

* *Cf.* Ram Mohun Roy and the Progressive Movements in India, p. 271.

† রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৩৩, ১৪ই মে ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এ কথার উল্লেখ আছে।

প্রতিষ্ঠা করা এবং মাতৃভাষারই ভিতর দিয়া আলাপ-আলোচনা চালানো কম সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে। এংলো-হিন্দু স্কুলের তাৎকালীন ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ১৮৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ একটি সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সভা-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান-পত্রখানি প্রচারিত হয় :

আমাদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে যে মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭ই পৌষ [১৭৫৪ শক] রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভার অধিবেশন হইল। সভার নাম ধার্য্য হইল 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা,' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় যথাক্রমে ইহার সম্পাদক ও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের তখন বয়স মাত্র পনের বৎসর। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি ছাত্রমহলে নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাই সকলেই একবাক্যে তাঁহার উপরে সম্পাদকীয় গুরুভার অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার ও উন্নতি বিষয়ে সভায় একটি বক্তৃতা করেন। বঙ্গভাষার অনুশীলন-প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই সভার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। ইহার প্রথম অধিবেশনের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সভার বিবরণ প্রথমে 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' 'সম্বাদ কৌমুদী' হইতে ইহা উদ্ধৃত করেন। বিবরণটি এই :

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা।—১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।

প্রথমতঃ ঐ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানন্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই। অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আমাদিগের অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনার্থাকাঙ্ক্ষিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহাদিগকে সরলতা কহা উচিতকার্য্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুত জয়গোপাল বসু কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপদে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে উত্তমরূপে ইহার নির্ব্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। সভায় শ্রীযুত নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। তৎপরে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্টকরা কর্ত্তব্য। ইহাতে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা রাখা আমার ন্যায্য বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন

না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে দুই প্রহর চারি দণ্ড-সময়ে এই সভাতে সভ্যগণের আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল, অপর সভাপতি কহিলেন যে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলে সম্মতি হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতিমাসে সভাপতি পরিবর্ত্ত হইবেক কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাঁহাকে রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এবিষয়ে আলস্য না করিয়া সম্পাদনকর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন তবে তাঁহার সম্পাদনকর্ম্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্যকে ঐ পদাভিষিক্ত করিতে হইবেক কিন্তু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবেক একমাসের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্ত হইবেক না। অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে…শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যেপ্রকার সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার সভার তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য…।—কৌমুদী। শ্রীজয়গোপাল বসু।*

এই সময়কার বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' সভার গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' এই সভার উদ্দেশ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। জ্ঞানান্বেষণ লেখেন :

"Although the members are young they deserve great applause, having united together for so laudable a purpose."†

এই সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনাদি সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকগণের বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে এতাদৃশ আগ্রহ আজিও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সম্ভব আড়াই কি তিন বৎসর হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ১৮৩৪ সালে তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান খুল্লতাত রমানাথ ঠাকুরের অধীনে শিক্ষানবিশি আরম্ভ করেন। পিতা দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

ইহার পর পাঁচ বৎসর যাবৎ দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার আত্মজীবনীও এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে না। তবে এই সময়ে তিনি যে ভাবী কর্ম্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন 'নববার্ষিকী ১২৮৪'তে প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইতেছে। বাংলা ভাষা চর্চ্চায়ও তিনি অধিকতর অবহিত হইয়াছিলেন। 'শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নিবন্ধে উক্ত 'নববার্ষিকী' (পৃ. ২২১) লেখেন :

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২৪-৫

† Quoted by *Asiatic Journal*, July, 1833. Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 114.

"হিন্দু পরিত্যাগ করিবার পর ইহাঁর পিতা ইহাঁকে নিজস্থাপিত "কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানি" এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে ইহাঁর দুইটি শ্রেষ্ঠ বিষয়ে অনুরাগ জন্মে; ইনি সঙ্গীত এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে, ১৭৬০ শকে সঙ্গীত শিক্ষা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতেও প্রবৃত্ত হন এবং অবিলম্বে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেন।"

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কোন সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ১৮৩৮ সনের ১৬ই মে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র (The Society for the Acquisition of General Knowledge) কার্য্যারম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ বরাবর এই সভার সভ্য ছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কোষাধ্যক্ষ রাজকৃষ্ণ মিত্র। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি। এখানে ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই স্বদেশের হিতকর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। ১৮৪৩ সালে এই সভার অধ্যক্ষগণ 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার বহু সভ্য ইহার মাত্র দেড় বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভারও সভ্য হইয়াছিলেন। শেষোক্ত সভার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী সভা

১৮৩৯, ৬ই অক্টোবর [১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন] তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহার নাম দেওয়া হয় 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে এই সভার উক্ত নাম রাখা হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা' উভয়েরই কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগে এই দুইটি সভার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন:

"ইংরাজী লেখাপড়ার ফলও ঐ সময় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একটী সভা করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী, সামাজিক প্রণালী এবং শাসন প্রণালীর বিষয়ে যে সকল রচনাবলী এবং বক্তৃতা প্রচারিত করেন তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে, ইউরোপীয় মত সকল ক্রমশঃ এদেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।...কিন্তু আর একটী সভাও ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার ফল অধিকতর কালব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় কার্য্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্ত্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে।"

বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ইহা তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরও একটি মস্ত বড় অধ্যায়। আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে তিনি এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু ইহার জন্য সমসাময়িক অন্য কতকগুলি ব্যাপারও সমধিক দায়ী ছিল। তখনকার শিক্ষিত সমাজের স্ব-ধর্ম্মে অনাস্থা, স্ব-সংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা ও পরানুচিকীর্ষা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা ছিল ইহার ঠিক বিপরীত। হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অনাস্থা, অশ্রদ্ধা ও পরানুচিকীর্ষার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন এবং পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধভাবে আলোচনা ও প্রচারের জন্য যত্নপর হইলেন। পরোপকার পরম ধর্ম্ম—দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ইহা ছিল মূলমন্ত্র। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ৬৫) তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" ইহারও মূল কথা পরোপকার। নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে মাত্র দশজনকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সভার প্রথম তিন বৎসরের এবং 'প্রথম ও শেষ' সাম্বৎসরিক সভার বিবরণ তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ৬৫-৭০) বিশদভাবে দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৪ শকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহারই আগ্রহে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভারও এইসময় হইতে গ্রহণ করিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা অল্পকাল মধ্যেই ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। প্রথম চারি বৎসরে ইহার সভ্যসংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়: ১৭৬২ শক—১০৫ জন, ১৭৬৩—১১২, ১৭৬৪—৮৩ ও ১৭৬৫—১৩৮। চতুর্থ বর্ষ হইতে সভ্যসংখ্যা অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই আট শত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীগণ কি কি কারণে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে ভূদেববাবু তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' (পৃ. ৪০-১) লিখিয়াছেন:

"তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষায় প্রাচীন ব্যবস্থাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?"

তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ এই কয়টি উপায় পর পর অবলম্বন করিলেন—(১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (৩) শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচার এবং তদুদ্দেশ্যে বারাণসীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নার্থ চারি জন ছাত্র প্রেরণ। যতই দিন যাইতে লাগিল সভা শিক্ষিত সমাজে ততই প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজও ইহার বিষয় জানিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬ তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' লেখেন:

"As the Tuttobodhinee Society is become one of the first Societies among the rising generation of the Hindoos, and its history is very often sought in European quarters, we here give a short sketch of its rise and progress. This Society was founded in the 24th [?] Asheen, 1761, Bengali era [?] at the house of Baboo Dwarkanauth Tagore. It opened with about ten members and at a time when it was difficult to raise a sum of ten rupees for its support. But its number now amounts to more than five hundred and its monthly income

is about 400 rupees. Under the patronage of this institution some students have been sent to Benares to acquire a thorough knowledge of the Vedas, and a considerable number of students are now acquiring a knowledge of the English, Bengalee and Sanskrit languages, at the Bansberia School. The Society now contemplates erecting a large building in the town of Calcutta."

আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনরীরা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে লাগিয়া যান। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু বাঙালী এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা খ্রীষ্টান হইলেন না তাঁহারাও কতকগুলি বাহ্যিক দূষণীয় লক্ষণ দেখিয়া মূল হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাই দূষিত মনে করিতেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা নিজ কৃতিত্ববলে এই উভয়বিধ স্রোতেরই গতিরোধ করিয়া দিল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।* কিন্তু ভূদেববাবু তাঁহার পুস্তকে (পৃ. ৩৯-৪০) তত্ত্ববোধিনী সভার শক্তির কথা এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :

"তত্ত্ববোধিনী সভাও এই সময়ে বিশিষ্টরূপে আপন বল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইহার সভ্য-সংখ্যা আট শতের অধিক হইয়াছিল। এই দেশে বেদবিদ্যা প্রবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে চারিটি সন্তান † ঐ সভার ব্যয় বারাণসীধামে বেদাধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী উৎসাহশীল যুবদল মিশনরীদিগের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময় হইতেই এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের বৃদ্ধির পরিণাম হইল। ইহার পরেও কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান হইয়া যাইবে বলিয়া লোকের যে ভয় ছিল, ঐ সময় অবধি সেই ভয়ের হ্রাস হইতে লাগিল।"

ধর্ম্মপ্রচারে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই উৎসাহশীল যুবকদের অগ্রণী। আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁহার *India and India Missions* গ্রন্থে উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মেরও কুৎসা করিতে ক্ষান্ত হন নাই। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (আশ্বিন ও ফাল্গুন, ১৭৬৬ শক; আশ্বিন, ১৭৬৭ শক) ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ইংরেজীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি ১৮৪৫ সালের শেষে *Vedantic Doctrines Vindicated* নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ডাফপন্থীরা কতকটা নিরস্ত হইলেন।

ভূদেববাবু সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার যেরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা 'ভারতবর্ষীয় সভা' ‡ ও তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পর্কেও তিনি

---

* *The Calcutta Review,* Vol. III, No. IV (January—March, 1845): "The Transition-States of the Hindu Mind", pp. 132-41.

† আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (পরে, বেদান্তবাগীশ), তারানাথ ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রমানাথ ভট্টাচার্য্য।

‡ কেহ কেহ ভূদেব-লিখিত 'ভারতবর্ষীয় সভা'কে ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

অনুরূপ আলোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত বাগ্মী ও পার্লামেণ্ট-সদস্য জর্জ্জ টমস্‌ র সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এই ভারতবর্ষীয় সভা একটি কর্ম্মীসভায় পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সভা ও তত্ত্ববোধিনী সভা উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হইয়া বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীকে আত্মস্থ হইতে উদ্বোধিত করিতেছিল। এসম্বন্ধে ভূদেববাবুর উক্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

তাৎকালিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বদেশীয় সামাজিক দোষ সংশোধন করাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। ভারতবর্ষীয় সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এবং ব্যবস্থা-সম্পৃক্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তত্তদ্বিষয়ে দেশীয় জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশ করা, কিন্তু সভা ঐ সময়ে আপনাদিগের একমাত্র প্রকৃতকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা এক জন সুপ্রীম কোর্টের ইংরেজ উকীলকে [ডব্‌লিউ থিওবোল্‌ড্‌] আপনাদিগের সভাপতি করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কখন রাজধানী পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছিলেন, কখন পুলিশের দোষানুসন্ধান করিতেছিলেন, আর কখন বা বিধবাবিবাহের উপায় বিধান, কখন বহুবিবাহ নিবারণ, কখন স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে, যত দিন তত্ত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল ভারতবর্ষীয় সভাও আপন প্রকৃতকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকার কালের (১৮৪৪-৮) মধ্যে এই উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্ম্মপ্রণালী সংস্থাপন করিলেন, এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী [বাবু রামগোপাল ঘোষ] ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য্য বিষয়েই সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, আর ইহাঁরা যাহা করিতে পারেন তাহাও পরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম [অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী সভা] এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা বা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবী পরিবর্ত্তনসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল (পৃ. ৪১-৪২)

এই দুইটি সভার কার্য্য সুফলপ্রসূ ও বহুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ভূদেববাবু এসম্বন্ধেও উক্ত পুস্তকে (পৃ. ৪২) লিখিয়াছেন :

খ্রীষ্টীয় মিসনরীদের সহিত অনুক্ষণ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও আচার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় তাহার ফলেই সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। হিন্দুয়ানী যে কোন প্রকার প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতির বিরোধী নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। আবার ভারতবর্ষীয় সভার অনুষ্ঠিত পথেই দেশময় রাজনৈতিক সভা সকল স্থাপিত হইয়া এদেশীয় লোকদিগকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অভিজ্ঞ করিতেছে। কিন্তু এই দুই প্রধানকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা করা হয় নাই।"

খ্রীষ্টান মিসনরীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-রক্ষা-প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মসভার অধ্যক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেবকে প্রধান সহায়রূপে পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ১১৮) লিখিয়াছেন,—"রাজা রাধাকান্ত দেব আমাকে বড় ভালবাসিতেন।" রাধাকান্ত দেব তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন না বটে, তবে ইহার আদর্শের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

তাঁহার 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইত; এবং প্রতি খণ্ডই তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাকে উপহার দিতেন। তাঁহার জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্র এবং দৌহিত্র হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সৎকর্ম্মাদির দ্বারা হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল প্রগতিশীল উভয় শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিষয়ক মতবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ম্মপ্রণালী ঠিক তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। একারণ ১৮৫৯, মে মাসে [শক ১৭৮১, বৈশাখ] সভার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।*

ইহার যাবতীয় সম্পত্তি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পিত হইল। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজকে আত্মস্থ করিতে এবং বঙ্গ-সন্তানদের মন স্বাজাতিকতার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে তত্ত্ববোধিনী সভার কৃতিত্ব অসামান্য। সভার কার্য্যে যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যবস্থা-দর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রমাপ্রসাদ রায়, অমৃতলাল মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ স্মরণীয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার উপায়ত্রয়

এতক্ষণ তত্ত্ববোধিনী সভার লোকহিতের কথা সাধারণভাবে বলিলাম। যে-যে উপায় অবলম্বনে ইহা সার্থক করিয়া তোলা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সে-যুগের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে। এখানে

---

* তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হইবার তারিখ কেহ কেহ ১৮৫৯ জানুয়ারী ও কেহ কেহ ১৮৫৯ ডিসেম্বর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রথম তারিখটি একেবারেই ঠিক নয়। কারণ ১৭৮১ শক, বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (পৃঃ ১২) এই বিজ্ঞাপনটি আছে,—

"সাম্বৎসরিক সভা।

"আগামী ২৬ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক। তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদায় কার্য্যবিবরণ সাধারণরূপে সভ্যগণকে অবগত করা যাইবেক এবং ১২ নিয়মানুসারে তৎকালে অন্য যে কোন কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবেক, তাহাও যথানিয়মে নিষ্পন্ন হইবেক অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
সম্পাদক"

এই সাম্বৎসরিক সভার বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আর প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই সভাতেই যে তত্ত্ববোধিনী সভা তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ পরবর্ত্তী ১১ই পৌষ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় ট্রষ্টী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দান করিয়াছেন।...তত্ত্ববোধিনী সভা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজী ও বাঙ্গলা অক্ষরাদি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—মাঘ ১৭৮১, পৃঃ ১২৫)। দ্বিতীয় তারিখটীও যে ঠিক নয় তাহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মাত্র বলিতেছি। ১৮৩৫ সাল হইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-দান নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয়। অতঃপর নানা স্থানে ইংরেজী বিদ্যালয় অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। বাংলা পাঠশালাগুলি তখন উৎসাহের অভাবে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে বসিল। ওদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা নানাস্থানে অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক বলিয়া এখানে ছাত্রও বিস্তর জুটিল। এখানকার শিক্ষাগুণে ক্রমে ছাত্রদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে, ইংরেজীই যেন তাহাদের মাতৃভাষা আর খ্রীষ্টধর্ম্মই তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম! সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ; সরকারী বিদ্যালয়ের অনুকরণে বা আদর্শে স্থাপিত বে-সরকারী শিক্ষালয়গুলিতেও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইত না। তখনকার শিক্ষাপদ্ধতির এই উভয়বিধ কুফল নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি বাংলা শিক্ষার উন্নতির জন্য হিন্দু কলেজের পরিচালনাধীনে ১৮৪০ সালের জানুয়ারী মাসে একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—কিশোর ছেলেদের বাংলার মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু সরকারী শিক্ষানীতি তখন যে খাতে চলিয়াছিল তাহাতে পাঠশালাটির উন্নতি হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। বাংলা পাঠশালায় ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হইত না। যুবক দেবেন্দ্রনাথও শিক্ষানীতির ত্রুটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহার সংশোধন বা সংস্কারও তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিলেন। সভা প্রতিষ্ঠার মাত্র আট মাস এবং বাংলা পাঠশালার কার্য্যারম্ভের মাত্র ছয় মাস পরে বঙ্গসন্তানদের বাংলার মাধ্যমে পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নব্য-ভারতের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য সাধনের আর একটি উপায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সভা প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি বৎসর পরে ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র হইতে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (পৃ. ৭৫-৭) এই পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কথা প্রায় সবই লিখিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি গ্রন্থ-কমিটি গঠন করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক হইলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনস্বী সাহিত্যিকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থ-কমিটির সদস্য ছিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে যাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইত তাহাই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত বা পুস্তকাকারে ছাপা হইত। ধর্ম্ম-প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, শাস্ত্রানুবাদ, সমাজনীতি, এবং কখন কখন রাজনীতি বিষয়ক আলোচনাদিও প্রকাশিত হইত। সহজ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় গুরু বিষয়ের আলোচনার পথপ্রদর্শক এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়-কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে কালীপ্রসন্ন সিংহ সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এক হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সে-যুগের চিন্তানায়ক বলা চলে। লোকহিতকর বহুবিধ

আন্দোলনের মূল আমরা ইহার আলোচনার মধ্যে প্রাপ্ত হই। শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনরীদের ষড়যন্ত্র হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মীদের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দিয়াছিল।

এই সব কথাই আর একটু বিশদভাবে এখানে বলিতেছি। গত শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম যখন বঙ্গীয় সমাজকে প্লাবিত করিতে উদ্যত হয় তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইহার বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করে যে অবিলম্বে ইহার গতি মন্দীভূত হয়। পত্রিকা (১ আষাঢ় ১৭৬৭) বঙ্গবাসীদের সজাগ করাইবার জন্য লেখেন, "কালস্বরূপ মিশনরীদিগকে দমন না করিলে তাহারা ভবিষ্যতে বল বা ছল পূর্ব্বক আমারদিগের সন্তানদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষ পান করাইতে নিমেষমাত্র কি গৌণ করিবেক ?" শারীরিক শক্তির উন্মেষ সম্পর্কে 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত'-লেখক বলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শারীরিক নিয়মাদি প্রচারিত হইবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ বাটীতে অঙ্গ-চালনার এক প্রকার প্রণালী আরব্ধ হয়। তথায় দেবেন্দ্রবাবু, অক্ষয় বাবু, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন।" (পৃ. ১২১)। এই ব্যায়াম চর্চ্চা পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু মেলার এক প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। বহুবিবাহ নিষেধক ও বিধবাবিবাহ সমর্থক প্রস্তাবও এই পত্রিকায় আলোচিত হইতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল (শক ১৭৭৬, ফাল্গুন ও শক ১৭৭৭, অগ্রহায়ণ)। এই পত্রিকা সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন (১৭৬৬ ভাদ্র, ১৭৬৭ শ্রাবণ ও ১৭৭২ শ্রাবণ)। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে প্যারীচরণ সরকার সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখনী ধারণ করেন (১৭৭২ অগ্রহায়ণ)। ইহার পর হইতেই শিক্ষিত সমাজে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশেষভাবে সুরু হয়। পত্রিকায় উক্ত আলোচনা প্রকাশের দশ বৎসর পরে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে এই সব অত্যাচারের একটি স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করেন। এই সকল লোকহিতকর আন্দোলনের মূলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আর ইহাদের অন্তরালে রহিয়াছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাবমূর্ত্তি। তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার পরেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া এই পত্রিকা সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার আর একটি উপায়ের কথাও এখানে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যার চর্চ্চা খুবই সামান্য ছিল। বঙ্গদেশে যাহাতে বেদচর্চ্চা সুষ্ঠুরূপে আরম্ভ হয় সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ অবহিত হইলেন। ১৮৪৫ সালে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং পর বৎসর তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রমানাথ ভট্টাচার্য্য বেদাধ্যয়নার্থ কাশীধামে প্রেরিত হন। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যের মধ্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহর্ষির আত্মজীবনীতেও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। রমানাথ ঋগ্বেদ, বাণেশ্বর যজুর্ব্বেদ, তারকনাথ সামবেদ এবং আনন্দচন্দ্র অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকেই টীকাসমেত উপনিষদ্-সাহিত্যও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কাশীধামের বেদাধ্যয়ন ও বেদ-চর্চ্চা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ১৮৪৭ সালের শেষে একবার তথায় গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ বৎসর নবেম্বর

মাসে আনন্দচন্দ্র বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। কার ঠাকুর কোম্পানীর পতন হইলে দেবেন্দ্রনাথ ব্যয়সংকোচ করিতে বাধ্য হইয়া ১৮৪৮ সালে অপর তিনজনকেও কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ইঁহাদিগকে স্বমত-পরিপোষক শাস্ত্রাদি গ্রন্থের সার-সংগ্রহের কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'বেদান্তবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন। আনন্দচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে বৃত হন। ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদক রূপে, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত উভয়েরই চর্চ্চায় সারা জীবন অবহিত ছিলেন। 'মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান' নামে বঙ্গভাষায় তিনি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে ঘরোয়া মতানৈক্য উপস্থিত হইলে, আনন্দচন্দ্র বরাবর দেবেন্দ্রনাথেরই অনুবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৫, ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন।[১]

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রচারকল্পে দেবেন্দ্রনাথ আরও যে একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও এখানে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজ হইতে সদ্যউত্তীর্ণ (১৮৪৫) রাজনারায়ণ বসুকে দিয়া তিনি ১৮৪৬ সাল হইতে উপনিষদের ইংরেজী তর্জ্জমা করাইতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে উচ্চাঙ্গের হিন্দু শাস্ত্রের মূলসমেত তর্জ্জমা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করিয়া দেশ-বিদেশে ইহার চর্চ্চা সম্ভব করিয়া দিয়াছিলেন। এবিষয়েও অগ্রণীদের মধ্যেই তাঁহার স্থান।

---

১ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মৃত্যুতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) লেখেন :

"আমরা অত্যন্ত দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক যে চারিজন পণ্ডিত বেদাধ্যয়নার্থ কাশীতে প্রেরিত হন বেদান্তবাগীশ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অধ্যয়নের ফল আমরা অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি বেদের অনেক প্রধান প্রধান অংশ অনুবাদ করিয়া আমাদের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এই বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা ও তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার একশত বৎসর পূর্ণ হইবে; এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকায় এই দুইটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে ভুল করা হইবে। নবীন বাংলার গঠনে তত্ত্ববোধিনীর যে দান তাহা জীবনের সমস্ত বিভাগকে ব্যাপিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সভা প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালীর ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল প্রকার জীবনেই আলোড়ন তুলিয়া বাংলায় এক নবজীবনের চেতনা জাগ্রত করিয়াছিল বলিয়া এই শতবার্ষিকী উৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব। বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ এই স্মারকোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া জাতির কৃত্যকেই পালন করিলেন।

এই দুইটি ঘটনার বিষয়ে বিশ্বভারতীর আহ্বানে বহু সুধীজন তাঁহাদের বক্তব্য বলিবেন, সেজন্য আমি এই দুইটি ঘটনার মূলে যে শক্তির প্রভাব দেখিয়াছি তাহার বিষয়ে আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত কিছু আলোচনা করিব।

মহর্ষিদেবের স্কুল পাঠারম্ভ হয়—রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে এবং এই স্কুলেই তিনি যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পড়িয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন যখন ইংলণ্ডে গমন করা স্থির করেন, তখন তাঁহার অবর্ত্তমানে স্কুলের শিক্ষা ঠিকমত চলিবে কিনা তাহা নিশ্চিত না জানাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহারই অনুরোধে আপনজনদিগকে ঐ স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মহর্ষি এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র হইয়া থাকিবেন। মহর্ষির জীবন চরিতকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে মহর্ষি হিন্দু কলেজেই বরাবর পড়িয়াছেন। কিন্তু ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের পরীক্ষাগ্রহণ ও যোগ্য ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে কৃতিত্বে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাজেকাজেই নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে এতদিন পর্য্যন্ত মহর্ষিদেব রামমোহন পরিচালিত অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের ছাত্রই ছিলেন।

এই স্কুলের ছাত্রদিগের চরিত্র গঠনে রামমোহনের সজাগদৃষ্টি ছিল। এই পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কেই ঐ ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা গেজেট পত্রিকা লিখিয়াছিলেন:

"As a founder of the institution, he (Rammohun) takes an active interest in its proceedings, and we know that he is not more desirous of anything than of its success, as a means of effecting the moral and intellectual regeneration of the Hindoos."

"স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রামমোহন ইহার পরিচালনা ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ও বেশ সক্রিয়ভাবে

সংযুক্ত, আমরা ইহাও জানি যে হিন্দুজাতির মানসিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণ সাধনে ইহা অপেক্ষা কোনও উৎকৃষ্টতর উপায় না থাকাতে ওই কার্য্যসাধনের উপায়রূপে তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।"

রামমোহনপন্থীদের তৎকালিক এই উক্তি ভিন্ন, প্রতিপক্ষের নিন্দাবাদ হইতেও ছাত্রদের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা প্রমাণিত হয়। সমাচার দর্পণের কস্যচিৎ কলিকাতা নিবাসী পাঠকের এক পত্র ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরের "দর্পণে" প্রকাশিত হয়। রামমোহনের তথাকথিত নানা অকীর্ত্তির পরিচয় দিয়া লেখক এই স্কুল স্থাপনে রামমোহনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন:

"His object was, since his doctrine was rejected by men advanced in years, by the instruction of children to bring them under his influence."

লেখক আরও বলিয়াছেন, ধীরে ধীরে ছাত্রগণ রামমোহনের প্রভাবাধীনে আসিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

রামমোহনের এই সক্রিয় প্রভাবের ফলও স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা স্থাপিত একটি সভার বিবরণ সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত হয়। সংবাদ কৌমুদী পাওয়া যায় না, কিন্তু কৌমুদী হইতে এই বিবরণটির অনুবাদ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বরের জন বুল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; সৌভাগ্যক্রমে সেই কাগজ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের কৃষ্ণকান্ত বসুজার বাটিতে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার এই সভার অধিবেশন হয়। সভায় ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনও আলোচনা চলিত না বটে, তবে অন্য সর্ব্বপ্রকার জাতীয় হিতকর বিষয়েরই আলোচনা চলিত। কিন্তু এই সভা সভ্যগণের জ্ঞানের পিপাসা ও অন্তরের জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে পারে নাই, তাই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ছাত্রদল "সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা" নামে আর একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি সমাচার দর্পণে সংবাদ কৌমুদী হইতে উক্ত সভার উৎসাহী সদস্য জয়গোপাল বসুর এক পত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল। ঐ পত্র হইতে জানা যায় ১৭৫৪ শকের ১৭ই পৌষ রবিবার বেলা এক ঘটিকার সময় রামমোহন রায়ের স্কুলে এই সভার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

সভা আরম্ভ হইলে,—বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য কোনও সভা না থাকাতে মুখ্যত সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সভা স্থাপন প্রয়োজন—বলিয়া তিনি বর্ণনা করেন। এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে যে দেশের একটি মহৎ উপকার হইবে, এই বিশ্বাসই যে তাঁহাদের উক্ত কার্য্যে প্রবৃদ্ধ করিয়াছে তাহাও জয়গোপাল বসু মহাশয় বলেন। বাংলা গদ্যের জনকস্থানীয় রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রভাবিত ছাত্রবর্গ যে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উৎসুক হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিলে নবীনমাধব দের প্রস্তাবে রমাপ্রসাদ রায় সভার প্রথম সভাপতি ও জয়গোপাল বসুর প্রস্তাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

নির্ব্বাচনান্তে সভাপতি ও সম্পাদক আপন আপন স্থান অধিকার করিলে সভার নিয়মাবলী প্রণয়ন আরম্ভ হয়। শ্যামাচরণ সেনের প্রস্তাবে সভার নামকরণ হয় "সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা" ও স্থির হয় স্কুলের পূর্ব্বের সভার ন্যায় ইহা ধর্ম্মালোচনাশূন্য হইবে না, ধর্ম্মালোচনাও ইহার বিষয়ীভূত হইবে।

সভার নামকরণটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। সভ্যদের সকল বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহা হইতেই সভার নাম "সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা"।

এই সভা স্থাপনের পর জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা ও ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকা এই সভার ভাষা, বাংলা ভাষা হওয়াতে ও গৌড়ীয় ভাষা প্রসার, সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়াতে স্থাপয়িতাদিগের প্রশংসা করেন। ইণ্ডিয়া গেজেট আরও বলেন যে মাতৃভাষা পরিপুষ্ট না হইলে শিক্ষার প্রসার সম্ভব নহে, পরিপুষ্ট মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রকৃত বাহন।

এই সভা স্থাপনের কিছুদিন পূর্ব্বে রামমোহন-ভক্তের দল সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নামে একটি সাময়িক পত্র[১] প্রকাশ করেন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে একখণ্ড বাঁধানো সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা আছে। তাহাতে যে অনুষ্ঠানপত্র ও ভূমিকা দেওয়া আছে তাহা হইতে দীপিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট অনুমিত হয়। ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে—নানা দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম-আচারাদি সম্পর্কে বিদেশে বহু পাঠ্য পাওয়া যায়, আমাদের দেশে কেবল মাত্র "দিগ্‌দর্শন" আছে, কিন্তু "দিগ্‌দর্শন" নামক সাময়িক পত্র জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারিতেছে না, কেননা

"দিগ্‌দর্শনে কেবল সংক্ষেপে কিছু বিবরণ আছে, তাহাও সকল দেশের নহে এ অবস্থায় আমরা পদব্রজে দেশবিদেশ পর্য্যটন করিতে পারি না অতএব লোকেরা স্বদেশে থাকিয়া অন্যদেশীয় বৃত্তান্তাদি প্রকাশকরণে উদ্যোগী হইয়াছি।"

এই পত্রে উত্তর প্রত্যুত্তর বাহির করিতে "বিদেশের বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র" ব্যতীত "দেশের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল" "অন্য দেশীয় পণ্ডিতদের তর্ক সিদ্ধান্ত" "আমাদের শাস্ত্র হইতে তদনুযায়ী বিষয় সকল যাহা সংস্কৃত না জানিলে জ্ঞাত হওয়া যায় না দেশের শাস্ত্র চরিত্র ও ব্যবহার যাহা সবিশেষ না জানিয়া অন্য দেশীয় লোকেরা নানা প্রকার দোষোল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করা।" "অন্য দেশীয় যে ব্যবহার দোষাবহ হওয়া সত্ত্বে আমাদের দেশে যেগুলিকে গ্রহণ করিতেছেন তাহার দোষ প্রদর্শন" প্রভৃতি ইহা প্রচারের উদ্দেশ্য।

প্রথম খণ্ডে "এতদ্দেশে গোরালোকের বসতি এবং জমিদারী বিষয়" ও "পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনে আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়" আলোচিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত

১। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে "সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা" সাময়িক পত্রিকা নহে, উহা একখানা পুস্তকমাত্র। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেলের ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকার "On the Spirit of the Native Newspaper" নামক যে প্রবন্ধ বাহির হয় তাহাতে দেখিতে পাই সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাকে স্পষ্টই "periodical" অর্থাৎ সাময়িক পত্র বলা হইয়াছে। গেজেট লিখিতেছেন :

"It would be unpardonable in us not to take notice of a periodical that has been but lately published. We allude to Surbo-tutto-Dypica."

অর্থাৎ, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সাময়িক পত্রিকার উল্লেখ না করিলে আমাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে। আমরা তৎদ্বারা সর্ব্বতত্ত্বদীপিকার কথাই বলিতেছি।

প্রবন্ধগুলি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উহা রামমোহন-দলীয় সাময়িক পত্রিকা। একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা স্থাপন হইতে মনে হয় যে উভয়ের যোগ আছে।

যোগ থাক্ বা নাই থাক্, একটি কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে রামমোহন-প্রণীত উপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র দেবেন্দ্রনাথের মনে যে জিজ্ঞাসা তুলিয়াছিল, গভীর ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানধারায় স্নানের যে বাসনা মহর্ষির জীবনে জাগ্রত হওয়াতে তাঁহাকে রামমোহনের প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট যে জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য উদ্বোধিত করিয়াছিল, সেই একই জিজ্ঞাসা হইতেই সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভার প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা ও তত্ত্ববোধিনী সভার স্থাপনা সম্ভব হইয়াছে। এই জিজ্ঞাসু মন লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার বান্ধববর্গ তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্য দিয়া এদেশের নবজাগরণের দীপশিখাটি সর্ব্বপ্রথম সার্থকভাবে প্রোজ্জ্বলিত করেন। জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগে এই সভার দান আজ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিবার সময় তত্ত্ববোধিনীর প্রাক্‌যুগের এই ক্ষুদ্র সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভাটিকে আমরা যেন না ভুলি।

মহর্ষির ধর্ম্মচেতনা যে সমস্ত অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে জাগ্রত হইয়া ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (৭ই পৌষ) তারিখে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষায় পর্য্যবসিত হয়, তাহার বীজ যে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলে পাঠকালীন রামমোহনের প্রভাবেই উপ্ত হয় তাহা মহর্ষির আত্মজীবনীতে মহর্ষিদেবই স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

> "শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। * * * আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্যদিনও দেখা করিয়া আসিতাম।"

এই সময়ে, দুর্গাপূজায় যোগ দিতে রামমোহন রায়ের অসম্মতি তাঁহার মনে যে জিজ্ঞাসা জন্মায় তাহারই পূর্ণ অর্থ দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবার কিছু পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> "এতদিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে রামমোহন রায় যেমন কোনও প্রতিমা পূজায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সংকল্প দৃঢ় হইল। আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম।"

এই দল বাঁধা ব্যাপার, উপনিষদের ছেঁড়া পাতা উড়িয়া আসা ও তাহা হইতে উহার অর্থ জানিবার ঔৎসুক্য জানিবার পূর্ব্বের ঘটনা। কারণ মহর্ষিদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যখন তিনি ভাইদের লইয়া প্রতিমা পূজা না করিবার জন্য দল বাঁধেন তখন

> "যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশার ভাব, তখন হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম।"

ছেঁড়া পাতা পাওয়ার সময় মহর্ষিদেব ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতেন। এই ছেঁড়া পাতায় "ঈশাবাস্যমিদং" শ্লোকের অর্থ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট শুনিয়া তিনি উপনিষদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার ফলে তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন পরে "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে,— ইংরেজি অক্টোবর ১৮৩৯ ; দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী অলকাসুন্দরীর মৃত্যু হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, এ সময়ে তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর ; সে হিসাবে এই মৃত্যুকাল ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই হওয়া উচিত। কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীতে দ্বারকানাথের উত্তর ভারত ভ্রমণের সময় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। এই উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে তাঁহার অনুপস্থিত সময়েই তাঁহার মাতা ইহলীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার দর্পণে[১] স্পষ্টই অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর ঘটনার উল্লেখ আছে এবং তাহা যে সেই সময়ে দ্বারকানাথের অনুপস্থিতিতেই ঘটিয়াছে তাহারই উল্লেখ আছে। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যু-তারিখ নির্ণয় করাতেই অলকাসুন্দরীর মৃত্যু ১৮৩৫ বলিয়া ধরা হয়, উহা বাস্তবিকই দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন একুশ তখনকার অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেরই ঘটনা। কাজেকাজেই ভাইদের লইয়া দল বাঁধা এই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর মৃত্যুর বহু পূর্ব্বেই স্কুলে পড়িবার সময়েই যে তাঁহার ধর্ম্মজীবনে প্রথম জাগরণ ঘটে তাহা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে মহর্ষিদেব স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশে অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়ন পথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন, সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল! অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

"প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম। পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল।"

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি রামমোহন রায়ের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দেবেন্দ্রনাথ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চয়ই তিনি ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেজন্য ১৮৩৮ শকের আষাঢ় সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের স্কুলে প্রবেশের কথা বলিয়াছেন, তাহা ভুল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার রামমোহন-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, মহর্ষি নিজে বলিয়াছেন যে রামমোহনের স্কুলে তিনি তাঁহার আট কি নয় বৎসর বয়সে ভর্ত্তি হন। সে হিসাবে উহার সময় ১৮২৫ কি ২৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়, এবং উহাই ঠিক বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

---

১ দ্রষ্টব্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ড ; শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "মহর্ষি-জীবনীর কয়েকটি তথ্যে সংশোধন ও সংযোজন", 'তত্ত্বকৌমুদী', মহর্ষির দীক্ষা-শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৫০

রামমোহন যে এই স্কুলের ছাত্রদের মনে ধর্ম্ম ও সমাজ জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দিতেছিলেন, তাহা প্রতিপক্ষের লেখা হইতে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যখন ইংলণ্ড গমন করেন তাহার অনতিপূর্ব্বে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে স্কুলের যে ছাত্রদল হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই স্কুল পরিত্যাগের সঙ্গেই রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই।

কৃষ্ণকান্ত বসুজার গৃহে স্কুলের ছাত্রদিগের আলোচনা সভা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ১৭৫৪ শকাব্দার ১৭ই পৌষ অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস আরম্ভ হইতেই সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভার প্রতিষ্ঠা হয় ও দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সভায় ধর্ম্মালোচনা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সভায় ধর্ম্মালোচনাও সভার বিষয়ীভূত হইল। এই ধর্ম্মালোচনা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ও একেশ্বরবিশ্বাসী বৈদান্তিকপন্থী ছিল। প্রাক্তন ছাত্রগণ দেবেন্দ্রনাথের মতিগতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এরূপ সভার সম্পাদক করিতে ইতস্তত করেন নাই। সভার যে বিবরণ সে সময়কার সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়ের অভিপ্রায় অনুসারে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াই সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এক ভগবানের আরাধনার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই আলোচনা হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মবোধ জাগিতে থাকে। তাহা হইলে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা ও তাহার পূর্ব্বেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতাদের সহিত দল বাঁধিয়া প্রতিমা পূজায় যোগ না দিতে সিদ্ধান্ত, প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে পিতামহীর মৃত্যুর পর মহর্ষির যে জাগরণ ঘটে তাহা ঠিক নহে; মহর্ষির আত্মিক জাগরণ ধীরে ধীরে হইতেছিল, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতামহীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে মাত্র।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য "আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার" এই কথা প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষিদেব নিজেই বলিয়াছেন; ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লওয়ার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর এই সভার বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহর্ষি স্পষ্টই বলেন যে, "ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য স্বরূপ, সর্ব্ব গত এবং বাক্য ও মনের অতীত" এবং ইহাই আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের সার ধর্ম্ম, বেদান্তের প্রচার অভাবে সাধারণে জানে না। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান হইবার জন্যই এই প্রতীকবিহীন ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন ও শাস্ত্রমর্ম্ম প্রচারই তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ।

এই সাম্বৎসরিক সভা হইয়া যাইবার পরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। মহর্ষিদেব আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "এই সাম্বৎসরিক সভা হইয়া যাইবার পরে ১৭৬৪ শকে আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিই।" এই যোগ দেওয়ার পরই তাঁহার চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনীর সংযোগ ঘটে। ঐ বৎসর-ই নির্দ্ধারিত হয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনার কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ করিবে ও তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে।

ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, সেইজন্য তাহার প্রচার ও

রামমোহনের গ্রন্থাদি পুনঃ প্রচার, জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের উদ্দেশ্য লইয়াই মহর্ষিদেব ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দীক্ষার পূর্ব্বেই যে তিনি "ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া" মাতিয়াছিলেন, তাহা একটি ঘটনা হইতে পিতা দ্বারকানাথের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য অতিথিকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। সেইদিন তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনের দিন। মহর্ষিদেব লিখিয়াছেন যে "আমরা সেইদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব। অতএব এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি ভোজের মজলিসে যাইতে পারিলাম না।" এই ব্যাপারে দ্বারকানাথ সজাগ হইলেন এবং যাহাতে "ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আমি [মহর্ষিদেব] না খারাপ হইতে পারি" সেই ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। কর্ত্তার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথের স্বগৃহে উপনিষদ পড়াইতে আসিতে বিদ্যাবাগীশের আর সাহস ছিল না, দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মন তাঁহাকে হেদুয়াতে রামচন্দ্রের নিকট উপনিষদ পাঠের জন্য লইয়া গেল।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের মনে সহসা ব্রহ্মচেতনা জাগরিত হয় নাই; রামমোহন ও রামচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মনে যে জিজ্ঞাসা বীজাকারে উপ্ত হইয়াছিল, নিজ সাধনায় তাহাই বনস্পতির আকার ধারণ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগকে আশ্রয় ও ছায়া দান করিতে থাকে।

শ্রীসুখময় মিত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রাণাধিক রবি

তুমি অবিলম্বে এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবে। তুমি সঙ্গে একটা বিছানা এবং একটা কম্বল আনিবে। তুমি এই পত্র জ্যোতিকে দেখাইয়া সরকারি তহবিল হইতে এখানে আসিবার ব্যয় লইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ির Return Ticket লইবে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২২ ভাদ্র ৫৪[১]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

মসূরী

ওঁ

প্রাণাধিক রবি

কারবার[২] হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতিসপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব। না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্য্যের গতি বিশেষ অবগত না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে কিছুই উপকার হইবে না।

আমার স্থানপরিবর্ত্তনে শরীরের কিছুই উপকার বোধ হইতেছে না। সকল উপায়ই ব্যর্থ হইতেছে। আমার এই জীর্ণ শরীরে সুস্থতার আর আশা নাই। ঈশ্বর তোমাকে কুশলে কুশলে রক্ষা করুন এই আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ। ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ৫৪

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

বক্সার[৩]

---

১ ব্রাহ্মসম্বৎ, বাংলা ১২৩৬ সাল হইতে গণনা আরম্ভ।

২ কারোয়ার।

৩ বক্সার [? গঙ্গাবক্ষে বজরায়]

ওঁ　　চুঁচুড়া
৭ ফাল্গুন ৫৪

প্রাণাধিক রবি

ইংরাজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌ[৪]কে লারেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদিগের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে। তাহার স্কুলে যাইবার কাপড় ও স্কুলের মাসিক বেতন ১৫ টাকা সরকারী হইতে খরচ পড়িবে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অনেক ভুল হয়— বিদ্যারত্নকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে। "হাতে লয়ে দীপ অগণন" আবার চৈত্র মাসের পত্রিকাতে তাহা ছাপাইয়া তাহার অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করিবে। হিমালয়েও আমার স্বাস্থ্য নাই, এই গ্রীষ্মালয়েও আমার স্বাস্থ্য নাই; আমার স্বাস্থ্য ইহার সেই অতীত স্থানে, যেখান হইতে রবি ও শশী প্রভা ও সুধা লাভ করে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ　　চুঁচুড়া
১৮ ভাদ্র ৫৫

প্রাণাধিক রবি

এই শনিবারের মধ্যে একদিন এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমি অতীব আনন্দিত হইব। যেদিন তুমি এইখানে আসিবে, সেই দিনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিবে— আমার স্নেহ জানিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ　　চুঁচুড়া
৬ আশ্বিন ৫৫

প্রাণাধিক রবি

কৈলাশচন্দ্র সিংহের বেতন আমার নিজ তহবিল হইতে দিতে শ্রীযদুনাথ চাটুয্যাকে অনুমতি করিলাম।

যদি সমাজে একজন গায়ক রাখিতে ২৫৲ টাকা মাসে মাসে বেতন লাগে তাহা সমাজ হইতেই পড়িবে। যেহেতু এ সমাজের নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের মধ্যে গণ্য। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

৪ রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবী, বিবাহ, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০।

ওঁ চুঁচুড়া

২০ আশ্বিন ৫৫

প্রাণাধিক রবি

আমি তোমার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম যে তোমার শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার মধ্যে একপ্রকার কষ্ট ও বুক "ধড় ধড়" করে। তুমি একেবারে পুষ্টিকর আহার ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার জন্যই তোমার এই দুর্ব্বলতা ও পীড়া। মৎস্য মাংস আহার না করিলে তোমার শরীর পুষ্ট হইবে না। তুমি নীলমাধব ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিধান পাও, তদনুসারে চল, এই আমার পরামর্শ ও উপদেশ। রামমোহন রায় আমাকে বলিতেন যে তুমি মাংস খাও না ভাল নয়,— চারাগাছে জল না দিলে সে কি সতেজ গাছ হয়?

আমার হৃদয়ে একটি বড় ব্যথা লাগিয়াছে— শ্রীকণ্ঠ বাবু আর এ লোকে নাই— তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিধবা কন্যার পত্রে এই সংবাদ কল্য অবগত হইলাম। তাঁহার কন্যা আমাকে লিখিয়াছেন যে "কি মধুর তব করুণা" গাইতে গাইতে একেবারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দিলেন। "হো ত্রিভুবননাথ" তাঁহার এই গানটি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রহিল এবং এই গানটি তাঁহার সম্বল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। আমার হৃদ্গত স্নেহ গ্রহণ করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ ৮ পৌষ ৫৫

প্রাণাধিক রবি

একটি ভাল হারমোনিয়াম ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ— শাস্ত্রীর নিকট হইতে শুনিলাম— অতএব তাহা ক্রয় করিবে। কিন্তু যে হারমোনিয়াম মেরামত করিতে দিয়াছ, তাহা তবে কি উপকারে আসিবে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

চুঁচুড়া

ছন্দঃ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

আমরা কবিতা লিখিয়া থাকি ছন্দে। এখানে প্রশ্ন হয় ছন্দকে সংস্কৃতভাষায় ছ ন্দ অথবা ছ ন্দঃ বলা হয় কেন? যাস্ক নিজের নিরুক্তে (৭.১২) বলিয়াছেন "ছন্দাংসি চ্ছাদনাৎ" অর্থাৎ আচ্ছাদন করায় ছন্দকে ছ ন্দঃ বলা হয়। বলাই বাহুল্য এখানে 'ছাদন' বা 'আচ্ছাদন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা চলে না, কেননা ছন্দের দ্বারা কিছু ঢাকা যায় না। অতএব ইহার কোন সাঙ্কেতিক বা লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

যাস্কের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির মূল হইতেছে নিম্নোক্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদের (১.৪.২)[১], অথবা অপর কোন বৈদিক গ্রন্থের এইরূপ বচন—

"দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্। তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্। যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।"

'দেবগণ মৃত্যুর ভয়ে ত্রয়ী বিদ্যায় প্রবেশ করেন। তাঁহারা (নিজেকে) ছন্দঃসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করেন। যেহেতু তাঁহারা এইগুলির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন সেই হেতু ছন্দঃসমূহের নাম ছন্দঃ।'

নিম্নলিখিত কথাটি দৈবতব্রাহ্মণে (৩.১৯) পাওয়া যায়—

"ছন্দাংসি [ছদয়তি][২] ছন্দয়তীতি বা।"

সায়ণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—

"ছন্দ সংবরণে। ছদয়তি বর্ণানি[তি]। তথা চ নৈরুক্তং ছন্দাংসি চ্ছন্দনাৎ।"

সায়ণের মত-অনুসারে উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা যায় যে, ছ ন্দঃ হইতেছে √ছ দ্ অথবা √ছ ন্দ্ ধাতু হইতে। ইহার অর্থ ছাদন করা।

√ছ দ্ ও √ছ ন্দ্ ধাতু বস্তুত একই, কিন্তু প্রকাশ পায় দুই আকারে, কখনো ছ দ্ এই আকারে, আর কখনো বা ছ ন্দ্ এই আকারে। যেমন √ম থ্—ম ন্থ্, ইহা বস্তুত একই ধাতু, কিন্তু কখনো পূর্ব ও কখনো পরের আকারে দেখা যায়। ম থ ন ও ম ন্থ ন এই উভয়ই আমরা পাই।

এখানে আমরা এই √ছ দ্—√ছ ন্দ্ হইতে নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দ আলোচনা করিব। ইহাতে আমাদের দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; আমরা জানিতে পারিব ঐ ধাতুটির মূল বা অভিপ্রেত অর্থটি কী, এবং কীরূপে ও কেন ছ ন্দ স্ শব্দটি ছন্দকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইল।

১। দুর্গাচার্য নিজকৃত নিরুক্তটীকায় কয়েকটি পাঠান্তরের সহিত এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২। অথবা [ছাদয়তি]। আমি এখানে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কৃত সংস্করণের উল্লেখ করিতেছি। ইহা নির্ভরযোগ্য নহে, কেননা ইহাতে অনেক ত্রুটি আছে। ইহায় পরবর্তী শব্দ দুইটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই স্থলে অন্তত এইরূপ একটি শব্দ মূলত ছিল। এই সংস্করণের সহিত মুদ্রিত সায়ণভাষ্যেও ভুল আছে।

বেদে 'প্রশংসা করা' বা 'সম্মান করা' ("অর্চতি-কর্মন্") এই ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত ধাতুসমূহের তালিকার মধ্যে নিঘণ্টুতে (৩.১৪) ছ ন্দ তি ও ছ দ য় তে এই দুইটি শব্দ র ঞ্জ য় তি শব্দের পর্যায়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি র ঞ্জ য় তি শব্দের অর্থ 'আনন্দিত করে'। ইহা হইতে বুঝা যায় উল্লিখিত √ছ দ্ — ছ ন্দ্ ধাতুরও অর্থ 'আনন্দিত করা'। একটা বৈদিক উদাহরণ দেওয়া যাউক। শতপথ ব্রাহ্মণে (৮.৫.২.১) উক্ত হইয়াছে—

"তান্যস্মা অচ্ছন্দয়ংস্তানি যদস্মা অচ্ছন্দয়ংস্তচ্ছন্দাংসি।"

'সেগুলি (অর্থাৎ ছন্দগুলি) তাঁহাকে (প্রজাপতিকে) আনন্দিত করিয়াছিল (√ছ ন্দ্)। যেহেতু সেগুলি তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছিল, সেই হেতু সেগুলির নাম ছ ন্দ ঃ।'

ঋগ্বেদে (৩.১২.১৫) 'কবিচ্ছদ' শব্দে √ছ দ্ ধাতুর অর্থ আলোচনীয়। এখানে এই শব্দটির অর্থ 'কবির আনন্দকর বা প্রীতিকর'।

বেদের ও মহাভারতের ভাষায় এরূপ অনেক প্রয়োগ আছে। পরবর্তী ভাষায় 'প্রলুব্ধ করিতেছে' এই অর্থে উ প চ্ছ ন্দ য় তি, ও 'প্রলুব্ধ করা' এই অর্থে উ প চ্ছ ন্দ ন শব্দ সুপ্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। 'আনন্দপ্রদ' এই অর্থে বিশেষণরূপে ছ ন্দ (অকারান্ত) শব্দ ঋগ্বেদে (যেমন, ১.৯২.৬) পাওয়া যায়। 'স্তবকর্তা' অর্থেও ইহার প্রয়োগ বেদে আছে (নিঘণ্টু, ৩.১৬)। আবার বিশেষ্যরূপে 'আনন্দ' ও 'ইচ্ছা' অর্থেও ইহার বহু প্রয়োগ আছে।

ছ ন্দ স্ শব্দের নিম্নলিখিত তিন অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায়—(১) ইচ্ছা, (২) ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্র বা বেদ, এবং (৩) কবিতার ছন্দ (ঃ)।

-অ স্ এই কৃৎ-প্রত্যয় প্রধানত ভাববাচ্যে হইলেও কখনো কখনো কর্তৃবাচ্যেও হইয়া থাকে, এবং বিশেষণরূপেও প্রযুক্ত হয়।

পূর্বে যাহা উক্ত হইল তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি যে, ছ ন্দ স্ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'আনন্দপ্রদ, প্রীতিকর'। ইহা প্রথমত ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্রকে বুঝাইত, কেননা ছন্দে রচিত হওয়ায় গান বা পাঠ করিবার সময় উহা সকলকে আনন্দিত করিত। পরে ক্রমে-ক্রমে যে অক্ষরবিন্যাসে বা ছন্দে ঐ বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল, এবং যাহা ইহাতে আনন্দের কারণ ছিল তাহাকেও বুঝাইতে ঐ শব্দটি প্রযুক্ত হইল।

যাস্ক, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ ও দৈবত ব্রাহ্মণের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে জানিয়াছি যে, আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দের নাম ছ ন্দঃ। এখানে আমরা ইহা একটু আলোচনা করিয়া দেখি। আলোচ্যস্থলে আচ্ছাদন শব্দে কোনরূপ সাঙ্কেতিক বা লাক্ষণিক আচ্ছাদন বুঝিতে হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব নিম্নলিখিতভাবে, অথবা এইরূপ অন্য কোনভাবে এই আচ্ছাদনকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে—

দেবগণ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া এমন মধুরভাবে বৈদিক ছন্দ গান করিয়াছিলেন যে, মৃত্যু তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই, যেন তাঁহারা আচ্ছাদিত ছিলেন, এবং এইরূপে তাঁহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, সায়ণ দৈবতব্রাহ্মণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বর্ণসমূহকে আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দের নাম ছন্দ (ঃ)। বর্ণ-শব্দে এখানে অক্ষর (syllable) ও মাত্রা বুঝিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাদের আচ্ছাদন বলিলে কী বুঝিতে হইবে? নিশ্চয়ই ইহা আক্ষরিক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কোন ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং আমার মনে হয়, এইরূপে, অথবা এইরূপ অন্য কোন প্রকারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে—

কোন ছন্দে অক্ষর বা মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে, আমাদের ইচ্ছামত ইহাতে কোন অক্ষর বা মাত্রার যোগ বা বিয়োগ করা চলে না, ইহা করিতে হইলে ছন্দোভঙ্গ হয়—ঠিক যেমন পেরেক দিয়া কোন বাক্স ঢাকিয়া বন্ধ করিলে তাহাতে কোন কিছু রাখা যায় না, বা তাহা হইতে কিছু বাহিরও করা যায় না। এই প্রকারে ছন্দ বর্ণকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

ছন্দ (ঃ) শব্দটি √ছদ্—√ছন্দ ধাতু হইয়াছে, ইহাই মনে করিয়া আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু উণাদিসূত্রে (৬৬৮—"চন্দেরাদেশ্চ ছঃ") বলা হইয়াছে যে, ইহা √চন্দ্ (<শ্চন্দ্) ধাতু হইতে। চকারটা ছকার হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ চ ন্দ স্ হইয়া গিয়াছে ছ ন্দ স্। এই ধাতুর অর্থ আনন্দদান করা। উভয় মতে অর্থের ঐক্য থাকিলেও ধাতুর ঐক্য নাই। শেষোক্ত মতটি কতটা গ্রহণ করিতে পারা যায়, পাঠকগণ ভাবিয়া দেখিয়া স্থির করিবেন।

ধারাবাহী

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুনেছি ছেলেবেলায় ভালোমানুষ ছিলুম। তাই বাবা কিম্বা মার কাছ থেকে বেশি বকুনি খেতে হয়নি। আমার দিদি আমার চেয়ে দুবছরের বড়। তিনি বাবার বেশি আদরের ছিলেন বলা বাহুল্য। মায়ের কাছে আমার বেশি আবদার চলত। বাবা কখনো আমাকে বকতেন না—কিন্তু তাঁকে করতুম ভয়ানক ভয়। দুষ্টুমি না থাকলেও একগুঁয়েমি যথেষ্ট ছিল। বিশেষত স্নান করতে আপত্তি নিয়ে রোজই বাড়িতে একটা হট্টগোল বাধত। মা একদিন না পেরে উঠে বাবার কাছে নালিশ জানান। বাবা এসে কিছু না বলে ভাঁড়ারঘরের আলমারির মাথায় তুলে বসিয়ে দেন। আরসোলা-মাকড়সার বাসার মধ্যে বসে থাকার চেয়ে স্নান করাই যে শ্রেয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। বাবার কাছে শাসনের দিক থেকে এই একমাত্র ঘটনার কথা মনে আছে। শারীরিক পীড়া দিয়ে আমাদের ভাইবোনদের কাউকে কখনো তিনি শাসন করেননি। যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়, তিনি শুরু থেকেই অধ্যাপকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এই বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষেধ। শান্তিনিকেতনে এখনো সেই নিয়ম পালিত হয়। মাঝে মাঝে অধ্যাপকদের এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা যে হয় না, তা নয়।

ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়ির যে চেহারা দেখেছি, তাকে কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন একান্নবর্তী পরিবারের সংসার বললে যথেষ্ট বলা হয় না। লোকজনের অভাব ছিল না। মনে আছে আমার দাদা বলেন্দ্রনাথ একদিন গুনতি করে দেখলেন, একশতের বেশি আত্মীয়স্বজন সেই বাড়িতে একসঙ্গে তখন বাস করছি। কিন্তু এই বাড়ির বিশেষত্ব যেটি সকলেরই চোখে পড়ত ও যার জন্য সকলে সেখানে আকৃষ্ট হয়ে আসতেন, সেটির সঙ্গে বড় পরিবারের বা ধনগৌরবের কোনো সম্পর্ক নেই। বহুমুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশে পাশাপাশি দুটি বাড়ি একাধারে বিদ্যা- ও কলা-মন্দিরের স্থান অধিকার করেছিল তখনকার দিনের কলকাতার শিক্ষিতসমাজে। মহর্ষি থাকতেন তেতলায়, সেখানে দেশবিদেশ থেকে কত না গুণী ও জ্ঞানী লোক রোজই তাঁকে দর্শন করতে আসত। বড়জ্যেঠামহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ভিতরবাড়ির এক কোটরে বসে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় নিবিষ্ট, তার সঙ্গে খেলাচ্ছলে কাগজের বাক্স তৈরি করা ও হাস্যরসাত্মক কবিতা লেখাও চলছে। তাঁর কাছে কেউ দেখা করতে এলে আমরা বাড়িসুদ্ধ লোক জানতে পারতুম, তাঁর সরল অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়িটাতে যেন হাসির ঢেউ খেলে যেত। নতুনজ্যেঠামহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতে থাকতেন না ; যখনই আসতেন হলঘরে পিয়ানো নিয়ে মেতে যেতেন—প্রায়ই তখন বাবার ডাক পড়ত—দুজনে মিলে নতুন গানের সুর তৈরি হতে থাকত। এ ছাড়া গানবাজনার মহড়া সব সময়ই চলত। দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথের বৈঠকে বিষ্ণু, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রভৃতি হিন্দী সংগীতের বড় বড় ওস্তাদদের গানে বা যন্ত্রসংগীতে বাড়ি মুখরিত থাকত।

বাবার কাছে আসতেন অন্য শ্রেণীর লোক। অত বড় বাড়ির মধ্যে বাবা কখন কোন্ ঘরে

থাকতেন তা বোঝা ছিল মুশকিল। অল্প বয়স থেকেই ঘর বদল করা তাঁর স্বভাব ছিল। দাদামহাশয়ের অনুমতি নিয়ে তিনি একবার একতলায়, একবার দোতলায়, কখনো তেতালায়, বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বাসা বাঁধতেন। মাকে এইজন্য নিত্যনতুন সংসার গুছিয়ে নিতে হ'ত। বাবার নিজের জন্য কোথাও এক কোণায় কোনো ছোট একটি নির্জন ঘর পৃথকভাবে থাকত। ভাঙা স্যাঁতসেতে ঘর নিয়ে তাকে ব্যবহারোপযোগী ও সুন্দর করে তোলার জন্য পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। ঘরটি বইয়ের সংগ্রহে বোঝাই থাকত বলা বাহুল্য; তার মধ্যে যেখানে যেটুকু ফাঁক পেতেন সেই সময়কার পছন্দমত ছবি ঝুলিয়ে দিতেন। একবার রবিবর্মার ছবিতে মোড়া হ'ল দেয়াল; তারপর সেগুলি যখন ভালো লাগল না, কোথা থেকে রামায়ণ-মহাভারতের অনেকগুলি অদ্ভুত রকমের ছাপা পট তার জায়গা নিল। এই রকম প্রায়ই সাজসজ্জার পরিবর্তন ঘটত। আসবাব সম্বন্ধেও তাঁর নিজের কতকগুলি নির্দিষ্ট পছন্দ ছিল। কখনো দোকান থেকে তৈরি আসবাব কিনতেন না। তাঁর পছন্দ অনুযায়ী জিনিস মিস্ত্রি দিয়ে ঘরে করিয়ে নিতেন। তার মধ্যে কোনোটা অদ্ভুতগোছের হলেও, তাঁর ফরমাসমত তৈরি আসবাব সম্বন্ধে তিনি গর্ব বোধ করতেন। যেখানেই যখন নড়ে বসতেন, সেগুলি টেনে নিয়ে যেতেই হবে। শান্তিনিকেতনে নিজের জন্য যে-সব নতুন গৃহ সম্প্রতি নির্মাণ করিয়েছিলেন—সেখানেও বহুকালের পুরানো ভাঙাচোরা আসবাবগুলি সযত্নে সাজিয়ে না রাখলে তাঁর মন খুশি হ'ত না।

ছেলেবেলায় দেখতুম প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী ও বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়রা প্রায়ই আসতেন বাবার কাছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আত্মীয়তুল্য ছিলেন—তাঁকে আমরা জ্যেঠামহাশয় বলে ডাকতুম; কিন্তু ডেপুটি হয়ে বিদেশে বেশি ঘুরতে হ'ত ব'লে জোড়াসাঁকোতে বড় আসতে পারতেন না। আমার যখন আট-নয় বছর বয়স হয়েছে, তখন চিত্তরঞ্জন দাসকে আমাদের বাড়িতে সর্বদাই দেখতুম। তিনি তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন—অল্প বয়স, কবিতা লেখবার খুব ঝোঁক। সব সময়ই কবিতার খাতা পকেটে থাকত, নতুন কিছু লিখলেই বাবাকে দেখাতেন। দাস সাহেব খেতে ভালোবাসতেন; আমরা তখন তেতলায় থাকি, কোর্টফেরতা বিকেলবেলায় বাড়িভিতরের গোল সিঁড়ি দিয়ে যখন দৌড়ে দৌড়ে উঠতেন, সিঁড়ি থেকেই তাঁর গলা শোনা যেত—"কাকীমা, লুচি ও পাঁঠার ঝোল চাই! ভয়ানক খিদে পেয়েছে—শীগ্‌গির চাপিয়ে দিন।" বলা বাহুল্য মা এই তরুণ কবির জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং সামনে বসিয়ে ভালো করে খাইয়ে তৃপ্তি বোধ করতেন। দাস সাহেবের বোনকে আমরা অমলাদিদি ব'লে ডাকতুম। তিনি কয়েক বছর আমাদের বাড়িতে মার কাছে ছিলেন। তাঁর অসাধারণ মিষ্ট গলা ছিল। তাঁর গলায় যে-সব সুর মানায়, সেই ধরনের গান বাবা তখন অনেক রচনা করেছিলেন। অমলাদিদির গলা পাখির গলার মত খেলত। তাই বাবা অনেক হিন্দী আলাপ প্রভৃতি ভেঙে বাংলা কথা দিয়ে তাঁর জন্য গান তৈরি করে দেন। রাধিকা গোঁসাইজির হিন্দী গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুব কাজে লাগত এই সময়।

তখন বাড়ির যুবকদের মধ্যেও প্রতিভার অভাব ছিল না। আমার দাদাদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চারজনেই বাবার খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। গৃহনির্মাণ বা গৃহের সাজসজ্জা বা বাগান করায় নীতুদাদার স্বাভাবিক দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল, যদিও এসব বিষয়ে তিনি কোনো শিক্ষালাভ করেননি। বাবাকে দাদামহাশয় যখন টাকা দিলেন একটা

পৃথক বাড়ি করার জন্য, বাবা নীতুদাদাকে ডেকে বললেন "বিশ হাজার টাকা পেয়েছি, তুমি এই দিয়ে আমাকে একটা দোতলা বাড়ি করে দাও। বাড়িতে আর কিছু থাকুক না-থাকুক একটা লম্বা ঘর থাকবে, আমি ইচ্ছামত তার ভিতর পার্টিশন দিয়ে যাতে ছোট বড় নানারকম খোপ বানাতে পারি।" নীতুদাদা লালবাড়ি, যাতে পরে বিচিত্রা হ'ল, আদেশমত তৈরি করলেন। বাবা যেমন বলেছিলেন সেইরকম বাড়ি হয়ে গেলে, দেখা গেল দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি বা সিঁড়ির ঘর নেই। বাড়িটায় সত্যসত্যই দুটি লম্বা ঘর ছাড়া তখন আর কিছু ছিল না। দশ-বারোটা বড় বড় আলমারি করানো হ'ল—বাবা সেইগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে বেড়া দিয়ে থাকবার মত কয়েকটি ছোট ঘর প্রস্তুত করলেন ! এইগুলি বছরে দুতিনবার করে ঠেলে এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে ঘরগুলির আকৃতি ছোট বড় করে নতুনত্বের স্বাদ মেটাতেন, যতদিন ঐ বাড়িতে বাস করেছিলেন। নীতুদাদা যতদিন বেঁচেছিলেন, মাঘোৎসবের জন্য ঠাকুরদালান ও তার সামনের উঠান সাজানোর ভার তাঁর উপর ছিল। স্বয়ং মহর্ষি তাঁর হাতে এর জন্য প্রত্যেক বছরে দু-তিন হাজার টাকা দিতেন। সাজানো সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল—এমন কি ও-বাড়ির ৫ নম্বরের আর্টিস্ট দাদারাও সাহস পেতেন না কোনো কথা বলতে। কোনোবার কেবল গোলাপ ফুল দিয়ে, কোনো বছর কাপড় বা কাগজ দিয়ে নানাবিধ কল্পনা খাটাতেন নীতুদাদা মাঘোৎসবের সাজে। মোট কথা, প্রত্যেক বছরেই অভিনব সাজ দেখিয়ে লোকদের চমৎকৃত করতে তাঁর খুব ভালো লাগত। একবার কেবল ঠকে গিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল মস্ (moss) দিয়ে উঠানের থামগুলি মুড়ে দেন ; কলকাতায় কোথাও মস্ পাওয়া গেল না, ভাবলেন পুকুরের পানা দিলে একই রকম দেখাবে। পানা দিয়েই সেবার সাজানো হোলো। মাঘোৎসবের সকাল-বেলায় অবনদাদারা দেখতে এলেন কেমন সাজ হয়েছে—উঠানে ঢুকেই ভালোমন্দ সমালোচনা না করে সকলে নাক চেপে ধরে সেখান থেকে দৌড় দিলেন। নীতুদাদা একটু মুচকে হেসে চুপ করে রইলেন। কিন্তু তখনই বাজারে ছুটল জগন্নাথ সরকার যত ল্যাভেণ্ডারের শিশি পাওয়া যায় কিনতে। উৎসবের পূর্বে পিচকারি করে ল্যাভেণ্ডার ছড়ানো হ'ল পানার গন্ধ দূর করার জন্য।

বলুদাদার অন্তরে সাহিত্যরস আছে বুঝতে পেরে, বাবা তাঁকে ছেলেবেলা থেকে নিজের কাছাকাছি রেখে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য পড়তে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি কলেজে যাননি, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য অল্পবয়সেই ভালোরকম আয়ত্ত করেছিলেন। মনে পড়ে গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাবেলায় খোলা ছাতে মাদুর পেতে বসে বলুদাদা মেঘদূত বা কুমারসম্ভব থেকে অনর্গল মুখস্থ আউড়ে যাচ্ছেন ও বাংলা মানে করে মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ক্রমাগত সংস্কৃত শুনে শুনে আমার মায়েরও সংস্কৃত জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মাকে দিয়ে বাবা একসময় রামায়ণের সংক্ষিপ্ত তর্জমা করান। সুরেনদাদাকে ভার দিয়েছিলেন মহাভারত থেকে মূল গল্পাংশ লিখতে, সেটা বই আকারে তখন ছাপা হয়েছিল। কয়েক বছর পর বইটির সার সংকলন ক'রে 'কুরুপাণ্ডব' নামে বাবা পুনরায় প্রকাশ করেন। মা রামায়ণ থেকে যে তর্জমা করেছিলেন সেটা অনুরূপ বই হ'ত ; কিন্তু তাঁর লেখা খাতাগুলি হারিয়ে গেছে—বহু সন্ধান করেও সেগুলি পাওয়া যায়নি। বলুদাদার লেখার অভ্যাস শুরু হ'ল "বালক" পত্রিকা থেকে। তার পর "ভারতী" ও "সাধনা"তে তাঁকে প্রায় প্রতিমাসেই প্রবন্ধ বা কবিতা দিতে হ'ত। বাবার কাছে যখন লেখা নিয়ে আসতেন, তিনি বুঝিয়ে বলে দিতেন কোথায় দোষ হয়েছে। বলুদাদা সংশোধন করে সেটা আবার তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন। অধিকাংশ সময় দ্বিতীয়বারেও লেখা পাশ

করতেন না ; কোনো প্রবন্ধ এমন হয়েছে পাঁচ-ছ'বার নতুন করে বলুদাদাকে দিয়ে লিখিয়েছেন যাতে তাঁর লেখা নিখুঁত হয় ও লেখাতে একটি কথাও অবান্তর না থাকে। বলুদাদারও তাতে কখনো শ্রান্তি বা বিরক্তি বোধ ছিল না। এইরকম অসাধারণ পরিশ্রম করিয়ে বাবা তখন লেখক তৈরি করেছেন।

বাড়িতে লোকজনের সমাগম লেগেই থাকত। তাছাড়া সামাজিক নানাবিধ অনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। তার মধ্যে একটি অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের জন্য আমার তা ভালোরকম মনে আছে। বাবারই উৎসাহে বোধহয় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল "খামখেয়ালী সভা," কারণ সভার না ছিল সভ্যের তালিকা, না ছিল কোনো লিখিত-পড়িত নিয়মকানুন। মাসে একবার সুবিধামত যে-কোনোদিনে বৈঠক বসত ঘুরে ঘুরে এক-একজন সভ্যের বাড়িতে। যাঁরা এই বৈঠকে এসে জুটতেন, তাঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো বিষয়ে কৃতী। আমাদের বাড়ির লোক ছাড়া অক্ষয় মজুমদার, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রিয়নাথ সেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, অর্ধেন্দু মুস্তফী, সন্তোষের প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রায়ই দেখতে পেতুম বৈঠক জমিয়ে বসতে। আমি তখন নিতান্ত বালক, এ রকম বৈঠকে প্রবেশ নিষেধ—কিন্তু আনাচেকানাচে ঘোরাঘুরি করতে ছাড়তুম না। বলা বাহুল্য খাওয়ার আয়োজন ভালোরকমই থাকত—কিন্তু ভোজের চেয়ে খাবার ঘরের সাজই ছিল প্রধান। প্রত্যেকবারই অভিনব কোনো পরিকল্পনা অবলম্বন করে সাজানো হ'ত। সভ্যদের মধ্যে নতুন ধরণের খাবার, নতুনরকমের সাজ নিয়ে বেশ রেষারেষি চলত। ভোজনশেষে আসল মজলিশ বসত। কবিতা ও গল্প পাঠ, গানবাজনা, অভিনয় নিয়ে রাত হয়ে যেত। খামখেয়ালী সভায় অভিনয় করার জন্যই "বৈকুণ্ঠের খাতা" রচিত হয়। প্রথম অভিনয়ে বাবা সেজেছিলেন কেদার, গগনদাদা বৈকুণ্ঠ ও অবনদাদা তিনকড়ি। এরকম অপূর্ব্ব অভিনয় আর কখনো দেখিনি। অক্ষয় মজুমদার মহাশয় একটি বৈঠকে "বিনি পয়সায় ভোজ" অভিনয় করে একাই আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। অর্ধেন্দু নানারকম লোকের caricature করে সকলকে হাসাতেন। অতুলপ্রসাদ সেন তখন যুবক, বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে সবে এসেছেন, গলার জোর ছিল—বিলাতী সুরে বাংলা গান রচনা করে শোনাতেন। কিন্তু বৈঠকের প্রধান অঙ্গ ছিল বাবার গান ও তার সঙ্গে নাটোরাধিপতির পাখোয়াজের সঙ্গত।

আমার জ্যেঠামহাশয়দের আমলে শুনেছি ছিল "বিদ্বজ্জন সভা"। বাবার আমলে তারই রূপান্তর হ'ল "খামখেয়ালী সভা"।

গোলদীঘি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"গোলদীঘির খবর !"

কথাটির মধ্যে শ্লেষের সুর প্রচ্ছন্ন। কিন্তু খবর যতই অবিশ্বাস্য হোক, আপনি একেবারে তাকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কারণ গোলদীঘির প্রতিটি ধূলিকণায় যে উন্নাসিক আভিজাত্য আছে, তা শহরের অন্য কোনো পার্কে নেই।

এমন একদিন ছিল, গোলদীঘিতে যে চিন্তা, জল্পনা ও বক্তৃতা হ'ত, পরের দিন তা বাগবাজার-বৌবাজারের কাগজে প্রকাশিত হয়ে সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। গোলদীঘি হ'ল বক্তৃতার জায়গা; এখানে এলে হয় আপনাকে একটা কিছু বক্তৃতা শুনতে হবে নয় দূরে কোনো একটি নিভৃত কোণে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু সেখানে গিয়েও রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। আর কিছু না হোক, দাঁতের মাজন অথবা কোষ্ঠশুদ্ধি মোদকের গুণাগুণ শুনতে হবে। কিংবা কোনো পেন্‌সনধারীর প্রলাপ।

এই যে গোলদীঘিতে বসে আছি এবং দেখছি হরেকরকমের দৃশ্য, বাগানের মধ্যে এবং বাইরে—আমার সাধ্য ও ভরসা নেই যে এর সম্পূর্ণ রূপটি ফুটিয়ে তুলি। তবে এই পার্ককে আমি ভালোভাবে চিনি, পুরানো অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে। আজ নয় দূরে সরে গেছি—এর চঞ্চলতা অথবা নিস্তব্ধতা দিনের পর দিন আর দেখতে পাই না। তবু গোলদীঘিতে ঢুকলেই মনে হয় যে এর সঙ্গে যে নাড়ীর যোগ একদা আমার ছিল, আজও তা একেবারে ছিন্ন হয় নি। অন্তত এর প্রাণের স্পন্দন আমি এখনও বেশ অনুভব করি। ছাত্রাবস্থায় গোলদীঘিকে এড়িয়ে গিয়েছি—এ-কথা মনে করলে আজ আপশোষ হয়। ভাবি, যদি আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতুম, তা হলে হয়তো একে আরও ভালো বুঝতুম। অবশ্যি, এমনিটাই হয়ে থাকে। যে জিনিস অতি নিকটের, সহজলভ্য, সে সম্বন্ধে মানুষের স্বাভাবিক উদাসীনতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও অতি-পরিচয়ের ফলে একটা নির্বিকার শীতলতা আসে যেটা অবজ্ঞারই নামান্তর। তাই এমন একদিন গেছে যে শুধু কলেজে যাওয়া-আসার সময়টুকুর জন্যে গোলদীঘিতে ঢুকেছি; নইলে দল বেঁধে বেড়াতে গেছি হেদুয়ায়, পিক্‌নিক করতে গেছি শিবপুরের বাগানে অথবা ইডেন গার্ডেনে।

তারপর নতুন কলকাতা যখন গড়ে উঠতে লাগল, কত নতুন পার্কেরই জন্ম হ'ল; যথা দেশপ্রিয় পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক। এ সব পার্কে বেড়ানো যায়, স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় নিত্য পরিক্রমাও করা যায়, কিন্তু গোলদীঘির আশেপাশে যে বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন, তা আর কোনো কোথাও মেলে না। যদি নির্জন জায়গা খোঁজেন, তা হলে সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারে অথবা হ্যালিডে পার্কে (অধুনা মহম্মদ আলি পার্কে) যেতে পারেন। সেখানে কেউ আপনাকে সহসা বিরক্ত করবে না। মাধববাবুর বাজার, পটলডাঙা, চাঁপাতলা, বৌবাজার অঞ্চলে আরও অনেক ছোটোখাটো পার্ক আছে যেখানে গেলে হয়তো আপনার মানসিক তৃপ্তি মিলতে পারে যদি আপনি জনতা-বিদ্বেষী হন। কিন্তু

গোলদীঘিই হ'ল একটি মাত্র জায়গা যেখানে আপনার স্বপ্ন-বিচরণ অবাধ ; নানা বয়সী ও নানা মেজাজের বাক্যবহুল খাঁটি বাঙালীর প্রাণস্রোতের মধ্যে বসে থেকেও আপনি নিরাসক্ত কূর্মনীতির অভ্যাস করতে পারেন। শহরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পার্কগুলিতে আজকাল অনেক জাতীয় লোকের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গোলদীঘি হ'ল মধ্য-কলকাতার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন এবং আশেপাশের সংকীর্ণ গলি থেকে অবাধগতি ও সর্বকর্মপটু মাদ্রাজীরাও নাক ঢোকাতে সংকোচ বোধ করে।

সত্যিই, গোলদীঘি হ'ল বাঙালী প্রতিষ্ঠান, খাঁটি ও ভেজাল-বর্জিত। এখন মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বিদেশী বণিক্ বাগানের রেলিঙের গায়ে নানা রঙের স্ববস্ত্রা-বিবস্ত্রা বিদেশিনীর তেলছবি সাজিয়ে রেখেছে। আরও আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি আশুতোষ বিল্‌ডিং, সেনেট হাউস, হেয়ার স্কুল-এর সামনে হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা কাপড়ের ছিট এবং রঙিন আভ্যন্তরীণ অঙ্গবাস মেলে ধরেছে। কিন্তু তারা জানেনা বাংলা দেশের উনিশ শতকের ইতিহাস। তারা বাংলা বর্ণপরিচয় পড়েনি, দেখেনি বাংলার বাঘের চেহারা। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে পুরানো বইএর শোভা অতটা দৃষ্টিকটু নয়, কারণ ঐখানেই দাঁড়িয়ে আমি অনেক ভালো দুর্লভ বইয়ের সন্ধান ও সওদা করেছি। কিন্তু গোলদীঘির পবিত্র চৌহদ্দি ও সীমানার মধ্যে এ সব দৃশ্য শুধু পীড়াদায়ক নয়, রীতিমত ব্যভিচার।

কল্পনা করুন উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের শিক্ষার কথা। রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, প্রসন্ন সর্বাধিকারী এবং অন্যান্য আরো অনেকে আপনার চোখের সামনে দাঁড়াবেন এই বাগানের ছায়াচ্ছন্ন কোণগুলিতে। ওধারে হিন্দু কলেজের রেলিং টপকে দশ-আনা ছ-আনা চুলের শোভায় মাইকেল বন্ধুবান্ধব-সমেত রুটি ও শিককাবাব খাচ্ছেন, অদূরে ভূদেব পুঁথি নাড়াচাড়া করছেন। সংস্কৃত কলেজের দোতলায় অধ্যক্ষের ঘর থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুঁটিরাম মোদকের দোকানের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে শিক্ষণীয় পাঠ্যপুস্তকের কথা ভাবছেন। এখানেই হয়তো ডেভিড হেয়ার, রিচার্ডসন, ডিরোজিও বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে মিশেছেন, কথা বলেছেন। তারপর, ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ চিন্তা করুন। উমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসু, 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণকুমার মিত্র ; হেরম্ব মৈত্র, হীরেন দত্ত, যদু সরকার এবং আশু মুখুজ্যে এবং আরও কত বিশ্রুতকীর্তি বাঙালী মনীষী এই বাগানের চারদিকে তাঁদের স্মৃতি ছড়িয়ে গেছেন। যে বাগানের সদর দরজায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর, খিড়কির দরজায় মসজিদ, মহাবোধি ও ব্রহ্মবিদ্যা, একপ্রান্তে হিন্দুর সংস্কৃত কলেজ অপর প্রান্তে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম শিক্ষামন্দির—সেখানে এতটুকু দুর্নীতির প্রশ্রয় থাকা উচিত নয়।

গোলদীঘির লাল সুরকির রজঃকণাগুলি বক্তৃতা ও উত্তেজনার স্বপ্নস্মৃতিতে আচ্ছন্ন কিন্তু গোলদীঘির নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ভালো ভাবেই জানে, এখানে যতই চেঁচামেচি, গলাবাজি ও মাইকেলী বিদ্রোহভঙ্গিমা অনুষ্ঠিত হোক না কেন, নিছক দাঙ্গাহাঙ্গামা কখনোই এখানে হ'তে পারে না। নিখিল-বঙ্গ ছাত্র-সভা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁরা কিছু করতে পারবেন না, কারণ বাগানের উত্তর সীমায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রসময় মিত্র ও ব্রহ্মকিশোরবাবুর স্মৃতি আজও অম্লান। এ বাগানের মধ্যে যদি কিছু হয় তা বাক্যবীর কারলাইলের পুঁথিগত বিদ্রোহ।

কিন্তু যখন স্কুলের ছাত্র ছিলুম তখন মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা শুনতে দাঁড়িয়ে যেতুম। মৌলবী লিয়াকত

সাহেব সুন্দর বক্তৃতা করতেন এবং শেষকালে ছেলেদের দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' বলাতেন। এখানে শুনেছি বাঙালী খ্রীষ্টান পাদরীর বাগ্মিতা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক বৃদ্ধ পক্বশ্মশ্রু প্রচারকের বক্তৃতা। ছেলেরা বড় খেপাত এই দুই নিরীহ ভদ্রলোককে যখনি তাঁরা বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়াতেন। একদিনের ঘটনা স্পষ্ট মনে পড়ে। খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি ত্রাণকর্তা যীশুর মহিমা কীর্তন করে যখন নামলেন তখন একটি অকালপক্ব ছেলে গিয়ে তাঁকে বললে, "আপনাদের ভগবান্ কিসে হিন্দু দেবদেবীর চেয়ে বড় যে খামোকা আপনি তাঁদের খাটো করলেন। ইংরেজি 'গড'কে ওলটালেই 'ডগ' হয়ে যায়, 'যীশু'কে ওল্‌টালেই তো খাবার 'সুজী' হয়ে যায়! এই তো আপনাদের মুরোদ। কিন্তু আমাদের যে 'নন্দনন্দন' সে-ই 'নন্দনন্দন'— যতই ওলটান আর পালটান।" ভারি মজা লাগত যখন দুটি বেঞ্চে যথাক্রমে ব্রাহ্ম প্রচারক এবং হিন্দু মিশনের বক্তা উঠতেন। দল-ভাঙানো চলত। কিন্তু সব চেয়ে ভালো লাগত উমেশ গুপ্ত মহাশয়ের বক্তৃতা। বৃদ্ধ সৌম্য চেহারা, মাথায় বিরাট পাগড়ি, হাতে একটা অখণ্ড লাঠি। শুনেছি তিনি বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁর সব কথা ভালো বুঝতুম না; এখন কিন্তু মনে হয় তিনি সত্যিই বুদ্ধিমান ও সুরসিক ছিলেন। তাঁর কাছে প্রথম শুনেছি প্রাচীন কালে আর্যরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন। পরদিন স্কুলে জিজ্ঞাসু মনে হেড পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে কথাটি পাড়তেই তিনি দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন, "ভাটপাড়ার কাছে বাড়ি কিনা, বামুনের ছেলে হয়ে বলবি বইকি এ সব কথা! সেকালের হিন্দুরা কি খেতেন তাতে তোর দরকার কি? আর সব বিষয়ে তোর সেই রকম আর্যশিক্ষা ও ব্রহ্মতেজ হয়েছে?"

যখন ছোট ছিলাম, তখন গোলদীঘির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল—সাঁতার এবং ওয়াটার-পোলো খেলা। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২০-২২ সাল পর্যন্ত যে দুটি খেলোয়াড়ের দল খুব নাম করেছিল, তারা হ'ল আহিরীটোলা ও কলেজ স্কোয়ার ক্লাব। সকালে তখন খুব জোর মহড়া চলত, আবার বিকেল না হতে হতেই ডাইভিং সাঁতার ও রোয়িং শুরু হ'ত। দশ-বারো বছর আগেও দীঘির উত্তর-পূব কোণে দুখানি জীর্ণ নৌকা পুরানো দিনের সাক্ষ্য দিত। প্রায় ত্রিশ বছর আগে য়্যুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে-এর পাণ্ডারা এই দীঘির বুকে নৌকাবিহার করতেন, বেশ মনে পড়ে। শিবপুরের বাগানের কাছে শোচনীয় নৌকাডুবি এবং দামোদরের বন্যায় হরিপাল-তারকেশ্বরে প্লাবনের পর থেকেই কলেজের ছাত্রমহলে বাচ্ খেলা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি ব্যায়ামের ধূম পড়ে যায়। একদিকে তখন শিশির ভাদুড়ির নেতৃত্বে পুরোদমে আবৃত্তি ও অভিনয়ের পালা চলেছে, অপরদিকে স্বদেশী আন্দোলন, পল্লী-উন্নয়ন, পাঠাগার-উদ্বোধন, ব্যায়াম-সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং মোহনবাগান, এরিয়ানস দলের ফুটবল খেলা সজোরে চলেছে। তখনকার দিনে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আদর্শ ছিল ভিন্ন, স্ফূর্তির ও আমোদেরও রকম-ফের ছিল। ছাত্ররা চা-পানে সাহিত্যচর্চায় ক্লান্ত হত না, এক-একজন ছিলেন রুদিন্ ও বাজারভের দ্বিতীয় সংস্করণ। এই গোলদীঘিতেই কতরকমের ছাত্র নিত্য হাজিরা দিত। কেউ সিগারেটখোর, কেউ বা বিদেশী নুন ছুঁতেন না। কেউ বা সাহিত্যানুরাগী, সামাজিক, উত্তেজনাপ্রবণ, তর্কপ্রিয়; কেউ বা স্থিরপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মচর্যে আস্থাবান, নীরব, গম্ভীর। রবীন্দ্রনাথ তখন ফ্যাশন মাত্র, শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব তখনও ভ্রূণাবস্থায়। তখনকার দিনে যুবকেরা সতেরো-আঠারো বৎসরের খুকী কল্পনা করতে পারতেন না; তাঁদের কাছে প্রভাত মুখুজ্যের বারো-তেরো বছরের মেয়ে যথেষ্ট ডাগর মেয়ে, যারা সুরসিক, সাংসারিকতায় সুপরিপক্ব এবং চৌদ্দ বছরেই অন্তত একটি সন্তানের জননী। সে সব দিন নেই।

তারপর এল ১৯২০ থেকে ১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের যুগ, যখন সারা ভারতে এসেছে নতুন প্রাণের সাড়া। নিরীহ গোলদীঘির জলেও সেই বিদ্রোহের ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। হেয়ার সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভের এক পাশে চলেছে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নচিন্তার সমস্যা, অপর পারে তখন গোখলে-তিলকের স্মৃতিতর্পণ ও গান্ধীজীর নতুন আন্দোলন। কেমন করে যে একটির পর একটি যুগ পার হয়ে যায়, গোলদীঘি তারই নীরব দর্শক। যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ বয়কট, বিদেশী বস্ত্র বয়কট, স্টেটসম্যান বয়কট এবং আরো বড়-বড় গুরুতর সমস্যা আলোচিত হয়েছে এই গোলদীঘির বেঞ্চের উপর। তাই বলছিলুম, এর জলে, এর গাছের পাতায় ও বাতাসে বাংলার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য—বাগ্মিতা। এমন একটা সময় এসেছিল যখন গোলদীঘির ভিতরে ও বাইরে লাল-পাগড়ি এবং খাকি-কোর্তা স্যব-ইন্‌স্‌পেক্টর মোতায়েন হ'ত বিকেল হলেই। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রুগী এবং অবসরপ্রাপ্ত হেড-অ্যাসিস্টেন্ট ও স্যব-ডেপুটির দল আর বেড়াতে আসতেন না। বেঞ্চে উঠলেই তখন বক্তাদের গ্রেপ্তার করা হ'ত এবং শুনেছি ধাপার মাঠ অথবা কামারহাটি পর্যন্ত পুলিশ-ভ্যান ভদ্রলোকের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে অবশেষে অজানা মাঠে-ঘাটে ছেড়ে দিয়ে আসত। তবু ছেলের দল আবার ভিড় করে আসত। এদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষার হলের সামনে মাটিতে গড়াত আবার কেউ-কেউ বা ঘণ্টা পড়লে পিছন-দরজা দিয়ে গোলামখানায় ঢুকত। এই গোলদীঘিতেই বসে দুপুর রোদ্দুরে পরীক্ষার্থীরা দ্বিতীয় পেপারের পড়া তৈরী করত; বৃদ্ধ অভিভাবক পুঁটুলি-গেলাস নিয়ে তাদের জলখাবার খাওয়াতে আসতেন। এমন দৃশ্যও চোখে পড়েছে, বাপ অথবা শ্বশুর ছাত্রটিকে বোঝাচ্ছেন, টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছেন ও বলছেন, "একবারটি বসে এসো বাবা, আমার মুখ-রক্ষে কর! তারপর তুমি যা চাইবে, তাই দেবো।" কিন্তু জামাই অথবা বংশধর ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুতেই গোলদীঘি ছেড়ে সেনেট হাউসে ঢুকবে না।

এর পরে যে যুগের সূত্রপাত হ'ল, তার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর যে নতুন কালের আমদানি, তার থেকে আমাদের সমবয়সীরা অনেকখানি দূরে সরে এসেছে। গোলদীঘি এই যুগকে কি ভাবে গ্রহণ করেছে জানি না। যে গোলদীঘি ছিল বাল্যকালে আমাদের বিস্ময়ের বস্তু বড়দের আড্ডাস্থল বলে, কৈশোর ও প্রথম-যৌবনে ছিল পরিচিত সঙ্গী, তার পর হ'ল অবহেলিত দুঃস্থ আত্মীয়, সেখানে এখন কোন্ আলাপচারীর কি স্বপ্ন বাসা বাঁধে, ঈশ্বরই জানেন। ফুটপাথে জ্যোতিষী ও পাখীওয়ালা গণৎকার এখনও বসে থাকে, কান-সাফ করবার সরঞ্জাম এখনও সাজানো থাকে, কিন্তু পশ্চিম-কোণের ছোটো দরজার পাশে আলু-কাবলিওয়ালা আর দাঁড়ায় না, পুঁটিরামের ভিড় কমে গেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ উধাও, পুরানো 'প্যারাগন'-এর পরিচিত ঠাণ্ডা সুগন্ধ আর ভেসে আসে না। পুরানো বইয়ের ফেরিওয়ালার পুঁজি কমে এসেছে, ব্যবসায় মন্দা পড়েছে। নতুন বইয়ের দোকানের স্বত্বাধিকারীদেরও এখন অচেনা লাগে। 'সেন ব্রাদার্সে' ভোলানাথবাবুর সৌম্য সহাস মূর্তি অদৃশ্য; 'বুক কোম্পানি'র গিরীন মিত্তির মশায়ের কথা কমেছে এবং স্বাস্থ্য ভেঙেছে। এখন গোলদীঘিতে কারা বেড়ায় কে জানে! বৃদ্ধের দল বড় আর দেখতে পাই না। গোলদীঘির বেঞ্চে সান্ধ্য বৈঠকে বাজারদর, পারিবারিক সুখদুঃখ, চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা কি তেমনি জমে? পশ্চিম পাড়ে কাঠের গম্বুজের নিচে জোড়া আঙুল নাচিয়ে শশীবাবু শুধু গায়ে বসে অপরূপ সুরে ছেলেদের রূপকথাও আর বলেন না। ছেলেদের ভিড়ও কমেছে। একা এই কোণটিতে বসে তাই ভাবছি—কম্‌রেডরা আজকাল কলেজ-ফেরত যান কোথায়।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রিয়তমকেও অনাত্মীয় মনে হয়। গোলদীঘিকে দেখাচ্ছে যেন বিষণ্ণ, হতশ্রী, বিগতস্বপ্ন। অবশ্য আশেপাশে কয়েকটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচে ভাড়াটে দোকানের সারি; হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের শিক্ষায়তনে নৈশ বাণিজ্য-বিভাগ। দীঘির উত্তর পুবে ও দক্ষিণে সাঁতারুদের বিশ্রামগৃহ। শরতের গোধূলি আস্তে আস্তে নেমে আসছে দীঘির জলে, তারি কিছুটা রঙ লেগেছে ওপারে মহাবোধি-বিহারের চূড়ায়। হঠাৎ মনে হ'ল যেন একখানি পরিচিত সিডান-কার পিছন দিকের হুড নামিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে দক্ষিণমুখো চলে গেল। আর থিওজফিক্যাল হলে হীরেন দত্ত মশায় ঋজু দেহে ঋজুতর ভাষায় উপনিষদের উপর বক্তৃতা দিচ্ছেন। তারপর কুলদা মল্লিকের ভাগবত পাঠ শুরু হবে। দূরে শাঁখ বাজল। এটা কি মাস? নাঃ—অগ্রহায়ণের এখনো দেরি আছে। হেমন্তের শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়ে কলার খোলায় নারিকেল-কাঠি আর গাঁদার মালা সাজিয়ে ইতু-পুজোর ঘট ভাসাতে ছোট-ছোট মেয়েরা কি আজও আসে গোলদীঘিতে? মাঝ-দীঘিতে একটা চটুল মাছ ঘাই মেরে উঠল—যেন জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব সন্ধ্যাবেলায় আগেকার মত আপন মনে দু-হাত্তা পাড়ি দিতে গিয়ে শাদা হাতটি তুললেন।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলদীঘি তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। সব পার্কেই আজকাল ভদ্রমহিলার অবাধ প্রবেশ, মেয়ে-ছেলেরা একসঙ্গে পড়ে ও বেড়ায়। এখানে কিন্তু সে দৃশ্য দুর্লভ। আর একটা কথাও ভাববার। এ দীঘির নকল আছে কলকাতায়—ঐ ওয়েলেসলি অঞ্চলে এমনি থামওয়ালা হর্ম্যবেষ্টিত চৌকো দীঘি পাওয়া যাবে। কিন্তু গোলদীঘির পারিপার্শ্বিক নকল করলেও প্রাণবস্তু মেলে না। এই তো উত্তর-কলকাতার গৌরবসম্পদ ডিম্বাকৃতি হেদুয়া রয়েছে। তারও আশেপাশে শিক্ষামন্দির। কিন্তু গোলদীঘির সঙ্গে তুলনা? প্রভাত মুখুজ্যে হেদুয়ার আনাচে-কানাচে যতই তাঁর গল্পের প্লট ফাঁদুন না কেন, গোলদীঘির নিজস্ব রোমান্স কিছুমাত্র তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। এক শতাব্দীরও উপর গোলদীঘি পড়ে আছে শিক্ষিত বাঙালীর পীঠস্থান হয়ে; এমনটি আর কোথাও হয় না। এর কোনো ধারে ফাঁক নেই; চারিদিকেই কড়া পাহারা। একই চতুষ্কোণ জমিতে মাইকেল-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মিলন আর কোথাও হয়েছে কি? শেষ পর্যন্ত, 'বিশ্বভারতী'ও গোলদীঘির ধারে আশ্রয় নিয়েছেন। ভালোই করেছেন।

আচ্ছা—রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ তো অনেকদিন এ পথে যাতায়াত করেছেন। কিন্তু হঠাৎ গোলদীঘিতে ঢুকে কোনোদিন বক্তৃতা করেছেন কিংবা বক্তৃতা দেবার আবেগ অনুভব করেছেন কি? বিদগ্ধ বীরবল কি কোনোদিন এখানে বসে কথায় শান দিতেন? আর এই বাগানের নাম 'বড়' গোলদীঘি-ই বা হ'ল কেন? 'ছোট' গোলদীঘির সঙ্গে এর সম্পর্কটা-ই বা কি? এককালে এ দুজনের মধ্যে কি প্রতিযোগিতা চলেছিল? নইলে 'সিটি' কলেজের দেখাদেখি ছোট গোলদীঘির মোড়ে 'সেঞ্চুরি' কলেজ স্থাপিত হ'ল কেন? এ বাগানটি তো নিতান্ত 'ছোট' নয়, এর দীঘিও অনেকদিন হ'ল বুজে গেছে এবং কস্মিন্‌কালেও এর গোলাকৃতি ছিল না। পূর্বযুগে এ দুটি জায়গা কি সহোদর প্রতিষ্ঠান ছিল যে দুজনেই বক্তৃতা শুনত বিকাল হলেই, এখন আর শোনে না এবং উপরন্তু নাম ভাঁড়িয়েছে?

রাত্রি হ'ল। কলুটোলার মোড়ে আর 'রিক্‌শা' দেখা যাচ্ছে না।

মুসলমান-যুগে পাট ও চট

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

বিষয়টি সাধারণ, কিন্তু আলোচনার অযোগ্য নয়। মুসলমান আমলে, বিশেষতঃ সায়েস্তা খাঁর সময় কি বাংলা দেশে পাটের চাষ হইত? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের প্রাচীরচিত্রের বিষয়-নির্বাচনের সময় এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। অষ্ট অলংকার পাট-কাপড়ের কথা আমাদের কাহারও কাহারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু পাটরানীর মত পাট-কাপড়ও পাটের তৈয়ারী না হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় পট্টবস্ত্র ও কৌষেয় বস্ত্র সমানার্থক। আবার পাট যে বাঙ্গালা দেশে বাহির হইতে আসে নাই তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ কেবল বাঙ্গালায় কেন উত্তর-ভারতের কোথাও এখনও বন্য পাটের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইংরেজ পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে পাটের উল্লেখ না থাকিবার কারণ আছে। ইংরেজীতে পাটকে জুট (Jute) বলা হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রক্সবার্গ (Roxburgh) সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করেন। সুতরাং তাহার পূর্ববর্তী কোন লেখকের গ্রন্থে যদি জুটের উল্লেখ না থাকে তবে বিস্ময়ের কারণ নাই। ডাঃ ওয়াটের মতে প্রাচীন হিন্দুদিগের এই উদ্ভিদটির সহিত পরিচয় ছিল। তবে খাঁটি পাট অপেক্ষা শণের ব্যবহারটাই সে সময় বেশী থাকিবার সম্ভাবনা। সংস্কৃত পট্ট শব্দ যে রেশমেরই নামান্তর ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। ওয়াট সাহেব বলেন যে উজ্জ্বল তন্তু (fibre) মাত্রকেই পট্ট বলা হইত। মহাভারতে পট্টজ এবং কীটজ উভয় শ্রেণীর পরিচ্ছদের উল্লেখ আছে। রেশম যখন কীটজ, তখন পট্টজ বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র রেশম না হইবারই কথা। তবে সংস্কৃত কোষকারেরা পট্টবস্ত্রকে কৌষেয় বস্ত্র বলিয়াছিলেন কেন? পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই পাটকে কোষ্টা বলা হয়। যে সূত্র বা তন্তু কোষস্থ ছিল তাহাই কোষ্টা। সুতরাং এইরূপ সূত্রে নির্মিত বস্ত্রকে কৌষেয় বলা অসংগত নহে। আমি মহাভারতের এই শ্লোকগুলি পড়ি নাই। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এই প্রশ্নের বিচার করিতে চেষ্টা করিব না। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে খাদ্য ও বস্ত্রের উপকরণ হিসাবে পাটের এত বেশী উল্লেখ পাওয়া যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের গ্রাম্য কবিগণ যে নালিতার শাক খাইতেন ও পাটের ব্যবসায়ের খবর রাখিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

একালের গৃহিণীরা পাটশাকের স্বাদ মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেকালের রান্ধুনীরা যে নালিতার পাতা ঘৃতে ভাজিয়া আপনাদের গুণপনার পরিচয় দিতেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। খুল্লনা জ্ঞাতি-ভোজনের জন্য :

ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি, নটেশাকে ফুলবড়ি,
চিঙ্গড়ী কাঁটাল বীচি দিয়া
ঘৃতে নলিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া ॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইণ্ডিয়ান প্রেসের সংস্করণ, পৃ. ১৬৩

সানকার সাধ ভক্ষণ উপলক্ষে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ নালিতার সুখ্যাতি করিয়াছেন :

আজিকার দিনে বড় মোর মনে
সাধ খাওাইবে তুমি ॥
পায়েসের পিঠা খাত্যে বড় মিঠা
নালিতা আর্ধ্যে সাতলা।
রোহিমাছ মুড়া মরিচের গুড়া
দিবে মর্ত্তমান কলা ॥

—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৩৮৩

নারায়ণ দেব লিখিয়াছেন :

বেতআগ তলিত করে বাইঙ্গন বারমাসি।
পাটসাগি তলিত করে উদিসা উর্ব্বসি ॥

—নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, পৃ. ৫৭

অন্যত্র :

কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে নালীতার পাতা।
নানা বেঞ্জন রান্ধে কি কহিব তার কথা ॥ —ঐ, পৃ. ১৮১

নারায়ণদেব ও কবি বংশীদাস যে কেবল নিজেরা পাটশাক বা ঘৃতপক্ব নালিতার পাতা খাইয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা এই মুখরোচক জিনিসটি বিদেশের বাজারে রপ্তানী করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। চাঁদ সওদাগর যখন দক্ষিণ পাটনে গিয়া নির্বোধ রাজাকে বস্তু বিনিময় উপলক্ষে বিষম প্রতারণা করিতেছিল তখন নারায়ণ দেব তাহার মুখে বলাইয়াছেন :

নলিতা নিবা একপাতি সোনা দিবা তের পাতি —ঐ, পৃ. ২১৪

দ্বিজ বংশীদাস উক্ত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

পুরান নালিতা পাতা সুগন্ধি ঝিকর।
তোমার প্রসাদে আমি জানি হে বিস্তর ॥

—শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ, গৌরলাল দে প্রকাশিত, পৃ. ১৩৭

গ্রামের বাজারে যাহারা নালিতা পাতা বা পাট শাক বিক্রয় করিত তাহারা যে পাটের অপর কোন ব্যবহার জানিত না তাহা নহে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ধনপতি বণিক যে সকল দ্রব্য লইয়া সিংহলে গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পাটও ছিল। বিনিময় দ্রব্যের পরিচয় উপলক্ষে তিনি প্রস্তাব করিতেছেন :

সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শণ বদলে, ধবল চামর,
কাচের বদলে নীলা ॥ —কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃ. ২০৯

আপত্তি হইতে পারে যে এখানে শুধু পাট বলা হয় নাই, পাট শণ বলা হইয়াছে ; সুতরাং আসলে বিনিময়ের বস্তুটি পাট নহে শণ। প্রত্যেক গ্রন্থেই যখন নালিতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তখন এই আপত্তি কতদূর গ্রহণীয় তাহা বিচারের বিষয়। কোষ্টা বা পাটকেই নালিতা বলা হয় ; শণকে কেহ নালিতা বলে না।

পাট কাপড়, পট্টবস্ত্র এবং পাটের কাপড় কি একই জিনিস ? ব্যাকরণের নিয়ম আমি ভাল করিয়া জানি না। কবিকঙ্কণ "সুরঙ্গ পাটের শাড়ি" (পৃ. ১২৭)-র উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কালকেতু দেবীর নিকট ধনপ্রাপ্তির পর :

পূরাতে জায়ার সাধ, কিনিল পাটের জাদ
শোভে তাহে মুকুতার বেড়ি। —পৃ. ৭৫

কবরী রচনার জন্য মুকুতার মালা দিয়া যে পাটের জাদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা রেশমের হইলেও হইতে পারে কিন্তু বিজয় গুপ্ত যে ক্ষৌম বাসকে "পাটের শাড়ী" বলেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদ সদাগরের বুড়ী ধাই "হাতেতে করিয়া হাঁড়ী, পরণে পাটের শাড়ী, শাক তুলিতে যায়" এবং "শাক তুলে আর গীত গায়।" তাহার পরিধেয় "কীটজ" বলিয়া মনে করি না। কেন, বলিতেছি।

বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দ ও বংশীদাস, মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে এই চারি জনই সমধিক প্রসিদ্ধ। অপর কবিগণের ভণিতাযুক্ত পদ ইঁহাদের কাব্যে সন্নিবেশিত হইলেও সমগ্র গ্রন্থ ইঁহাদের নামেই পরিচিত। ক্ষেমানন্দ ও নারায়ণদেবের সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় নাই। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং বংশীদাস এই তিন কবিই চাঁদ বণিকের দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের বিবরণ দিয়াছেন। সেকালে মুদ্রার তেমন প্রচলন ছিল না। সুতরাং পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বেশী হইত না, বিনিময় হইত। এই তিনজন কবিই বাঙ্গালীদিগকে অন্য দেশের লোক অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতেন এবং বস্তুবিনিময় উপলক্ষ্যে তাঁহারা বাঙ্গালীর বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং বিদেশীদিগের, বিশেষতঃ দক্ষিণের লোকের, বুদ্ধির অপকর্ষ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অন্য প্রসঙ্গেও তাঁহারা অবাঙ্গালীর আচার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। তিন কবিই দক্ষিণের রাজাকে চটের পোষাক পরাইয়া বোকা বানাইয়াছেন। প্রথমে বিজয় গুপ্তের কাব্য হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিব :

বিধাতা প্রসন্ন হইলে দৈবে মেলে ধন।
চট দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন ॥
রাজা বলে মিতা কও স্বরূপ বচন।
গাছের বাকল কেন আমার সদন ॥
দুই খানি চট মেলি দিল তার পায়।
পরম সন্তুষ্ট রাজার সর্ব্ব অঙ্গ ছায় ॥

* * *

মিতারে তুমিত পণ্ডিত মহাজন।
চিন্তিত হইয়া বল তুমি, দুর্ল্লভ পাটের ভূনি
ইহার বদলে কোন ধন ॥
আমার দেশের জাতি, জনকত আছে তাঁতি,
বুনাইতে অনেক দিবস লাগে।
কেবল ধীরের কাম, বস্ত্র বড় অনুপম,
প্রাণশক্তি টানিলে না ছিঁড়ে ॥
তোমার দেশের কাছে, আর যত দ্রব্য আছে,
চর দিয়া করহ বিচার।
পাঠাও তুমি চট চাহি, সর্বরাজ্যে ঠাঁই ঠাঁই
কোন দেশে চট নাহি আর ॥

*　　*　　*　　*

চান্দর ললিত ভাষে, খলখলি রাজা হাসে,
আপন হাতে চট মেলি চায়।
একখানি কাছিয়া পিন্ধে আর খান মাথায় বান্ধে
আর খান দিল সর্ব্ব গায় ॥

—বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত, পৃ. ১৩৩

বিজয় গুপ্ত কেবল রাজাকে নহে রানীকেও চট পরাইয়া ছাড়িয়াছেন। তিনি যে এই চটের ভূনিকেই পট্টবস্ত্র বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ যে লাচারী ছাড়িয়া তিনি যখন পয়ার ধরিয়াছেন তখনই বলিয়াছেন :

চান্দর ইঙ্গিতে ধনা আনন্দিত মন।
পট্ট বস্ত্র লইয়া যায় হরষিত মন ॥ ঐ, পৃ. ১৩৩

চটকেই যে পাটের শাড়ী বলা হইয়াছে তাহার আরও প্রমাণ আছে। রানী বলিয়াছেন :

হেন মনে লয় ধাই, পক্ষী হয়ে তথা যাই,
চটের বসন আছে যথা।
মিতার ঘরে যত চেডী, তারা পরে পাটের শাড়ী
বিদ্যাধরি হেন লয় মনে। ঐ, পৃ. ১৩৬

খুল্লনা তাহার দুঃখ-দুর্দশার দিনে যে খুঞা ধুতি পরিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় এই চটের বসন, পট্টবস্ত্রের দীন সংস্করণ। কারণ নারায়ণ দেবের মতে চট ও খুঞীয়া অভিন্ন। তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি :

চান্দো বোলে শুন তেড়া আমার উত্তর।
কাপড় ভেটাও গিয়া মিতার গোচর।
কাপড় মেলিয়া রাজা বোলে চাই চাই।
চুন হলদির ছাপ চটের কাবাই ॥
রাজা বলে স্তনরে পরদেসি সদাগর।
আমারে ভাড়িলা থুইয়া ইহেন কাপড় ॥
চটের কাবাই দিল চটের কমর বেড়ান।
চটের ইজার দিল চটের পাছড়া ॥
আউট গজ খুঞিয়া দিয়া মাথায় বান্ধিল।
ধোকড়া পিন্দিয়া রাজা বড় হরসিত হৈল ॥
ডানি বামে চাহে চট পরিধান করি।
দেখিয়া কৌতুক লোক রাজার অন্তপ্পুরি ॥
ফটিকের ফাটি দিল তাহার উপর।
পিত কড়ি শোভে যেন স্থঠান বানর ॥
রাজা বলে শুন মিতা আমার উত্তর।
কামড় ভেজায় গায় তোমার বসন ॥
চান্দো বোলে বড় স্থকী রহিবা প্রাণের মিত।
নোনা পানি খাইয়া শরিরে করে হিত।

বার হাতি শণের সাড়ি দিল সদাগর।
তাহারে লইয়া গেল বাড়ির ভিতর ॥
পরিয়া শণের সাড়ি দাড়াইল রাণির পাস।
নারায়ণ দেব কয় মনসার দাস ॥
লাচাড়ি ॥
মিতা কি ধন আনিয়া দিল মোরে।
তব খুঞীয়ার রূপে পরাণ বিদরে ॥
ধন্য মিতা ধন্য সদাগর।
তোমার দেশে উত্তম কারিগর।
সোণার মিতা হাতে ধরম তরে।
এহি কারিগর আনিয়া দেও মোরে ॥
মিতা মাস খায় লক্ষ টাকার পান।
বৎসরে তুলায় খুঞিয়া খান ॥
ছয় মাসে তুলায় এক হাতি।
নেত কুতুবা তুমি ঝাটে আন দেখি ॥
খুঞিয়া দেখি রাজা নেত কুতুবা ফালায় পাক দিয়া।
খুঞি মরম গিয়া খুঞিয়ার বালাই লইয়া ॥
খুঞিয়া পিন্দিয়া রাজা দেওয়ানেত বৈসে।
সোনার মুখেত রাজা খলখলি হাসে ॥
খুইঞা পিন্দিয়া খলখলি হাসে।
তেড়া বোলে পাইল বুদ্ধি নাশে ॥ —পৃ. ২১৭-২১৮

এইবার বংশীদাসের কৌতুকাংশ বাদ দিয়া কেবল প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

তুলই কাণ্ডারি জানে বাণিজ্যের ভাও।
নাও হতে খুলে আনি ভেটি ভরা যত তাও ॥
দিঘল পসর যত বড় বড় গড়া।
চিত্রবিচিত্র যত রাঙ্গা পাটের ডুরা ॥
রাঙ্গা পাটের থুপ ফুল সারি সারি।
চটের চান্দোয়া খসায় চটের মসারি ॥
চটের তুলিচা খসায় চটের বিছান।
চটের তাবু গ্রিদা খসায় আর সামিয়ান ॥
চটের পালঙ্গপোষ চটের বন্দিশ।
চটের ইজারবন্দ চটের বালিশ ॥
চট পিন্দিয়া রাজা বসিল সভাত।
কাজিরে বেড়িল যেন সেকের জমাত ॥

চটের কাপড়ে রাজা গাত্র চুলকায়।
চান্দ বলে পুণ্য বস্ত্র অধর্ম্মে খেদায়॥
মহাদেবী সবে পরে চটের মোটাখানি।
চটের পাচেড়া আর চটের উড়নি॥
চটের যত ধুতি তিনি পরে পুরোহিত।
শাস্ত্রে কহে শোন পাট অধিক পবিত্র॥ —পৃ. ১৪০-১৪১

টানাটানি করিয়াও যখন চটের কাপড় ছেঁড়া গেল না এবং অল্প টানিতেই "নেতের বসন" "খানখান" হইয়া গেল তখন আর এই অভিনব পরিধেয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রহিল না। বংশীদাসের "চিত্র বিচিত্র রাঙ্গা পাটের ডুরা" কবিকঙ্কণের "সুরঙ্গ পাটের সাড়ি"র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দুইটিই এক হওয়া অসম্ভব নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বিজয়গুপ্ত, কবিকঙ্কণ, নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দ ও বংশীদাসের সময় নালিতার শাক খাওয়া হইত এবং পাট ও পাট হইতে নির্মিত চটের ব্যবসায় হইত। এখন এই চারিজন কবির সময় নির্ধারণ করিতে পারিলেই স্থির হইবে সায়েস্তা খাঁর সময় পাটের প্রচলন ছিল কি না। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে "বংশীদাস কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকৃত "মনসামঙ্গল" ১৪৯৭ সালে অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৪৩৬)। কবিকঙ্কণের সময় সম্বন্ধে কোন মতভেদ আছে বলিয়া জানিনা। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন :

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা॥

সুতরাং ১৪৯৯ সাল অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত বলেন, "আমরা নারায়ণ দেবকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি বলিয়া মনে করি।" ৺দীনেশ বাবু নারায়ণদেবকে বিজয়গুপ্তের অগ্রবর্তী কবি মনে করা সংগত বোধ করেন নাই। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৮১) আমি দীনেশ বাবুর সঙ্গে একমত। নারায়ণদেবের খণ্ডিত গ্রন্থে কোন কোন পালা না পাইলেই তাহার গ্রন্থে ঐ সকল পালা ছিল না ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না। বিশেষতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গবাসী কবির লেখায় পারশী শব্দ থাকা সম্ভব নহে। নারায়ণ দেবের কাব্যে অন্ততঃ দশ-বারোটি পারশী শব্দ পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের বিস্তৃততর আলোচনা অন্যত্র করিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের পুস্তকের প্রারম্ভে রাজা বিষ্ণু দাসের ভাই ভারামল্ল ও বারাখাঁর নাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের কাব্য সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হইয়াছিল (পৃ. ১৫)।" এই অনুমান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়। বিজয় গুপ্তের পুথি রচনাকাল সম্বন্ধে একাধিক পাঠ পাওয়া যায় :

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক॥

এই পাঠ ঠিক হইলে হোসেন শাহের রাজত্বকালের সহিত পুস্তক রচনার তারিখের অসঙ্গতি হয় না। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ বাঙ্গালার সুলতান হয়েন। যদি বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকে (১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে)

"গীতের নির্ম্মাণ" করিয়া থাকেন তবে তিনি হুসেন শাহের রাজত্ব সময়েই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রাচীন পুথিতে এতদ্ব্যতীত আরও তুইটি পাঠ পাওয়া যায়—যথা

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক॥
এবং ছায়া শূন্য বেদ শশী শক পরিমিত।

এই তুই তারিখই হোসেন শাহের সমগ্র বাঙ্গালার আধিপত্য লাভের পূর্ববর্ত্তী। এই কারণে ডাঃ সুকুমার সেন আপত্তি করিয়াছেন যে ইহার একটি তারিখও নির্ভুল নহে অতএব বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনার কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। প্রাচীন পুথিতে লিপিকর প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কোন পুথি পাওয়া গিয়াছে কিনা জানি না। পাওয়া গেলে সকল সন্দেহের নিরসন হইত। কিন্তু এখানে কেবল এই তুইটি ছত্র লইয়াই বিচার করা চলে না। ইহার অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে (প্রভাতের ?) রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম॥

বিজয় গুপ্ত স্বয়ং ফতেয়াবাদের অন্তঃপাতী বাঙ্গরোড়া পরগণার অধিবাসী। সুতরাং তিনি সারা বাঙ্গালার সুলতানের কথা লিখিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। হোসেন শাহ বাঙ্গালার সুলতান হইবার পূর্ব্বে বহু দিন পর্যন্ত ফতেয়াবাদ শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেখানকার সাধারণ লোকের বিচারে তিনিই ছিলেন তাহাদের রাজা। অতএব বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনার নির্ভুল তারিখ সম্বলিত প্রথম পাঠ যদি অগ্রাহ্যও হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের একটিই বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলেও এই তুইটি তারিখের সঙ্গে সুপরিজ্ঞাত ইতিহাসের অসঙ্গতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী কালের কবিগণও নিজ নিজ অনুগ্রাহক ও ভুস্বামীকেই রাজা বলিয়া সম্মান করিয়াছেন, সর্বদা বাঙ্গালার সুলতানের নামোল্লেখ করেন নাই। কবিকঙ্কণ "বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ মানসিংহের" নাম জানিতেন কিন্তু "শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম ব্রাহ্মণ ভুমের পুরন্দরের" বারবার নামোল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ক্ষেমানন্দ চন্দ্রহাসের তনয় বলভদ্রের তালুকে ঘর করিতেন, তিনি "তাঁহার রাজতি শেষের কথা" লিখিয়াছেন বলিয়া কেহ এ পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সত্য অপলাপ করিবার অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। বিজয় গুপ্ত যদি হোসেন শাহ বঙ্গেশ্বর হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে নৃপতিতিলক বলিয়া অভিনন্দন করিয়া থাকেন তাহাতে ইতিহাসের অমর্যাদা হয় নাই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একাধিক গভর্নর জেনারেলকে সম্রাট, ভূপ ও রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয় গুপ্ত, ষোড়শ শতাব্দীর মুকুন্দরাম ও বংশীদাস এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কেতকা দাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাট ও পট্টজ চটের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সায়েস্তা খাঁর আমলে বঙ্গদেশের কৃষি ও বাণিজ্য সম্পদের মধ্যে পাটের গণনা করা ভুল হইবে বলিয়ামনে করা যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর ছবি। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, তাঁর ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের আর-একটি পরিচয় নূতন আদর্শের প্রবর্তক রূপে, এদিক দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং নবযুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি কোন অংশে কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ঐতিহাসিক মূল্য তথ্যের দ্বারা বিচার করা সম্ভব। তথ্যের সাহায্যে বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু এই আলোচনার দ্বারা তাঁর প্রতিভার একটা মূল্য বিচার করা সম্ভব হবে। এবং তাঁর ছবি একটা ঐতিহাসিক পটভূমি পাবে, এই মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪-৯৬)। তাঁর নিজের জীবনে এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি নূতন যুগের সূচনা করেছে। সে সময়ের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আমরা বুঝতে পারব।

একদিকে দিল্লী কলম, পাটনা কলম, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত দেশী চিত্রের যে গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল তার সংস্কারগত শিক্ষার বাঁধাবাঁধি নিয়ম, কিছুটা কারিগর-সুলভ ওস্তাদি এবং দেশীয় চিত্রের আলঙ্কারিক কাঠামো তখনও বজায় ছিল ; উত্তরে কাংড়া কলম, তথা রাজপুত ঢঙের কাজ অন্যান্য ধারার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সতেজ ছিল সত্য কিন্তু সবশুদ্ধ এ-সময়ে ভারতীয় চিত্র অলঙ্কারবহুল শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না। চিত্রের প্রাণ ও রসের দিক্ দিয়ে ভারতীয় চিত্র এসময়ে অতি দরিদ্র।

অন্যদিকে দেখি নবাগত ইউরোপীয় চিত্রের আদর্শ, বা ইউরোপীয় চিত্রের আদর্শ নামে তখন আমরা যে বস্তু গ্রহণ করেছিলাম, তার সাহায্যে ইউরোপীয় রূপকলার প্রাণের সন্ধান আমরা পাইনি, পরিবর্তে পেয়েছিলাম বিলাতি শিল্পসংস্কার (technical convention), বস্তুরূপকে অনুকরণ করবার কৌশল ; ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দেশী বিদেশী দুই ছবিতেই ছিল কৌশলের বিস্তার। আমাদের বিকৃত রুচির প্রতি লক্ষ্য করে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন :

> Nowhere does art suffer more from charlatanism than in India. . . . There is no respect for art in the millionaire who invests his surplus wealth in pictures and costliest furniture so that his taste may be admired or his wealth envied by his poor brethren.[1]

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রথম আমরা এমন এক রসবস্তুর প্রকাশ দেখি যে রস সমকালীন কোন চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তখনকার নব্য শিক্ষিতসমাজ কারিগরী কাজ দেখেই অভ্যস্ত। শিল্পবস্তু ও

[1] *The Basis for Artistic and Industrial Revival in India* by E. B. Havell.

রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করবার শিক্ষাও ছিল না, এবং সে শিক্ষা পাবার সুযোগও ছিল না। এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন সাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তখন বিদ্যার যাচাই করতেই একদল রসিক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এতে এ্যানাটমি নেই, প্রক্ষিপ্ত ছায়া (cast shadow) নেই, পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নেই কেন ? এই প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও নূতন পদ্ধতিকে কি চোখে দেখেছিলেন একটা উদাহরণ দিই :

ভারতীয় চিত্রকলার মূলসূত্র বোধ হয় এই যে এমন বস্তু আঁকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোন সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে, অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধতাই তথা-কথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রের নূতন-পন্থীগণের চিত্র সৌন্দর্য্যকল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙ্গুল ও হাত পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। এ্যানাটমির বিরুদ্ধ হইলেই যে কোন চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যোগ্য হয়। যে স্বাধীন কল্পনায় মানুষের হাত পা যোজনবিস্তৃত আকারে পরিণত হয় তাহা কল্পনার অভিধানের যোগ্য নয়। ভারতীয় চিত্রকলা অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানে কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না।[১]

চিত্র সমালোচনায় যুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্রূপ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি মোহ নব্য শিক্ষিত-সমাজের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল।

আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজের কথাই তখন অকাট্য। শারীরস্থানের জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, প্রক্ষিপ্ত ছায়া ছাড়া ছবি হতে পারে না— এই হুবহু নকল ও কাস্ট শ্যাডোর মোহ কেবল যে আমাদের শিক্ষিত-সাধারণকেই অন্ধ করেছিল তা নয়। পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, যাঁদের দেশীয় শিল্পের সঙ্গে এবং দেশীয় মূর্তিশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁরাও এই কাস্ট শ্যাডোর মোহ কাটাতে পারেন নি ; তাঁরাও বোধ হয় বিশ্বাস করতেন কাস্ট শ্যাডো-বর্জিত চিত্র হতে পারে না। এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ না হলে কি কোন পণ্ডিত বলতে পারেন "চীন দেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়ার সন্নিবেশের কোন চেষ্টার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া চীনা চিত্রকরদের শিক্ষাগুরু ভারতশিল্পীও যে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে ?"[২] —কেবল শিক্ষার অভাবে নয়, ভুল শিক্ষায় আমাদের চিত্ত তখন বিভ্রান্ত।

দেশীয় রূপকলা সম্বন্ধে অজ্ঞতার বশে আমরা যে নিকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অন্ধ অনুকরণ করছি, হ্যাভেলই প্রথম সে কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্র নিয়ে দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা আলোচনা করেছিলেন কিন্তু ভারতীয় শিল্পের নন্দনীয়তা (aesthetic quality) সম্পর্কে কেউ ঝোঁক দেননি। সাহস ক'রে হ্যাভেলই প্রথম বলেছিলেন :

---

১ সাহিত্য, ১৩১৭ বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২ ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা, রমাপ্রসাদ চন্দ —প্রবাসী, ১৩২০, অগ্রহায়ণ

It has been always my endeavour in the interpretation of Indian ideals to obtain a direct insight into the artists' meaning without relying on modern archaeological conclusions, and without searching for the clue which may be found in Indian literature.[২]

অধ্যয়নবিমুখ দাম্ভিকের উক্তি বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যাভেলকে বিদ্রূপ করেছিলেন। হ্যাভেলের এই মত অকাট্য নয় এবং ভারতীয় আদর্শ বোঝাতে তাঁকেও ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে সময়ে এই উক্তির প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল ছাড়া ডাক্তার কুমারস্বামী, উড্রফ্ সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টি পড়ল। যখন হ্যাভেল ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রবর্তনে যত্ন করছিলেন সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় (১৮৭১)। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পী বলে প্রচার করলেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত হচ্ছে, একথা পণ্ডিতরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। শিল্পশাস্ত্র উদ্ধৃত করে কেবলই তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের চিত্রের অভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন— অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুগামীদের কোন ছবিই ভারতীয় আদর্শে তৈরি হচ্ছে না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রমত তাঁরা অনুসরণ করছেন না, প্রাচীন তাল মান প্রমাণাদির সঙ্গে তাঁদের ছবির বিসদৃশ-রকম প্রভেদ। তাঁদের মত যে খুব যুক্তিহীন ছিল তা নয়। কারণ, সত্যই অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীনের দলভুক্ত নন; কিন্তু আধুনিক যুগের ভারতীয় মনকে তিনি যে প্রকাশ করতে পেরেছেন, একথা তখন পণ্ডিতরা হয়ত লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু এখন আমরা তা ভালো করেই বুঝতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হওয়ায় যদিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিরুদ্ধতা এসেছিল, অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল ভারতীয় চিত্রের নবজন্মদাতা হিসাবেই। হ্যাভেল বা কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বা তাঁর সম্প্রদায়ের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে ঝোঁক দিয়েছিলেন তার ভারতীয়ত্বের উপর:

The work of the modern school of Indian painters in Calcutta is a phase of the national reawakening. The subject chosen by the Calcutta painters are taken from Indian history, romance and epic, and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. Their significance lies in their distinctive Indian-ness. They are however by no means free from European and Japanese influences. The work is full of refinement and subtlity in colour and of a deep love of all things Indian; but, contrasted with the Ajanta and Moghal and Rajput paintings which have in part inspired it, it is frequently lacking in strength. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.[৩]

ভারতীয়ত্বের উপর ঝোঁক হ্যাভেলের কথায়ও আমরা পাই:

If neither Mr. Tagore nor his pupils have yet altogether attained to the splendid

---

[২] *The Ideals of Indian Art* by E. B. Havell

[৩] Dr. A. K. Coomaraswamy: quoted by V. Smith in *A History of Fine Art in India and Ceylon.*

technique of the old Indian painters, they have certainly revived the spirit of Indian art, and besides as every true artist will, invested their work with a charm distinctively their own. For their work is an indication of that happy blending of Eastern and Western thought.[4]

১৯১১ পর্যন্ত নব্য বাঙলার চিত্রকলার যে রূপ, তার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচয় এই দুই উক্তিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করছেন বা করেছেন কিন্তু সেই আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে, একথা দুইজনের কারো উক্তিতেই পাই না। এই সময়ে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তার আন্দোলন চলেছিল তারই অংশ বলে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী আর্টিস্ট, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা— কিন্তু যে ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথকে তখন দেখা হচ্ছিল তাঁর ভক্তরা তখনও তার রূপকলার ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁদের অস্পষ্ট। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল; এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যখনই তাঁরা আলোচনা করেছেন দার্শনিক চিন্তা, সাহিত্যের রূপক, ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছবি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা কি চোখে অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতেন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই:

ভারতশিল্পে নবীন উদ্যমের নেতাগণ যে কেবলমাত্র শিল্পের জন্য শিল্প কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত তা নয়; হিন্দু জাতির প্রকৃতিগত যে আধ্যাত্মিকতা তাহারো বিকাশে ইহারা সকলে সচেষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তা-প্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষিতার সহিত ভারতশিল্পের এই নব বিকাশের ঘনিষ্ট যোগ সুসংগত। ঠাকুরমহাশয়ের (অবনীন্দ্রনাথের) এই ছবিখানিতে (পুরীতে ঝড়, ১৯১১) আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাষ। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলতঃ যিনি এই প্রদর্শনীতে সূর্য্যালোক-উদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন তিনি নিরাশ মনে ফিরিবেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ভারতবর্ষের যে বাহ্যিক রূপ দেখিতে পান, প্রাচ্যসৌন্দর্য্য-লিপ্সু ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আঁকিতে চেষ্টা করেন এ-স্থানে সে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা অন্তরঙ্গ ও বিষাদাচ্ছন্ন একটি অতিপ্রাকৃত ভারতবর্ষ। রূপকাত্মক, আধ্যাত্মিক, ধর্মপ্রাণ ও চিন্ময়।[৩]

ছবিকে দার্শনিক বা কাব্যিক চিন্তা দিয়ে দেখবার এই চেষ্টা, এদেশে বা বিদেশে, অবনীন্দ্রনাথের স্বপক্ষীয়রা সকলেই করেছিলেন। ভারতীয় ছবি ভাবাত্মক কাজেই আধ্যাত্মিক, এই বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক ভাব ও দার্শনিক চিন্তা ছবিতে খোঁজবার চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টারই ফলে আজ অধিকাংশের কাছে আধুনিক ভারতীয় ছবি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, এখনও এই মোহ সম্পূর্ণ কাটে নি। যাঁরা এই জাতীয় ব্যাখ্যা সে সময়ে দিয়েছিলেন তাঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভাবের আধিক্য এমনি হয়েছিল যে, ছবি যে দেখবার জিনিস সে কথা আমরা প্রায় ভুলেছিলাম। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনরুদ্ধার কার্য চলেছে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের হাতে, এইতেই সকলে খুশী।

---

[4] E. B. Havell: quoted in *A History of Fine Art in India and Ceylon.*

৩ দ্রষ্টব্য ফরাসী পত্রিকা থেকে সংকলিত প্রবন্ধ: ভারত-চিত্রশিল্পের পুনর্বিকাশ, প্রবাসী, ১৩২০ শ্রাবণ, পৃ ৪৮৫

নতুন ছবিতে খুব বড় রকমের গভীর ভাব ভারতীয় চিন্ময় রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, একথা তখন বেশ ভাল রূপেই আমাদের মনে গেঁথেছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন ভাব ও ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকাতেই কবির ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, ছবির ক্ষেত্রেও যে তেমনি ভাব-প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা দরকার— সে কথা তখন কেউ মনে করতে পারেন নি। রূপের রেখার বর্ণের ঝঙ্কারে ভাব যুক্ত হলে তাকেই আমরা বলি ছবি। ছবির ভাষাকে চেনবার ঔৎসুক্য তখনও জাগে নি। এদিক দিয়ে কোন চেষ্টাও হয় নি। কেবল আদর্শকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল— কিন্তু ভারতীয় আদর্শ যেমনই হোক, রূপকলার ক্ষেত্রে সে আদর্শের প্রয়োগও প্রকাশ যে কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হ'ত তাঁরা যদি জানতেন :

The evolution of Indian art is organised by the rhythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influences. . . . Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, therefore, we find such minute prescriptions for proportions and movements. The relation of the limbs, every bend and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no overstrain, no inadequate expression, and no weakness ever will become apparent. The regulations are a code of manners.[৩]

এতক্ষণ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছিল তারই পরিচয় দিলাম। এইবার এই তর্কজাল অতিক্রম করে তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করলে কি আমরা পাই, দেখবার চেষ্টা করব এবং তাঁর সম্বন্ধে মতামতের বা মূল্য কতটা, তাও যাচাই করতে পারব।

২

দেশে ও বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন ব'লে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কোনদিন কোন কিছু চেষ্টা করে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন, 'ষড়ঙ্গ' লিখেছিলেন এবং 'ভারতশিল্প' গ্রন্থে ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ওকালতিও করেছিলেন, কিন্তু ছবি রচনার কালে সে মত তিনি অনুসরণ করেন নি। সংক্ষেপে, ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যের ভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের ১৩১৬ সালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকে তাঁর সে সময়ের মনোভাব পরিষ্কার দেখা যায় :

আমি দেখিয়াছি তোমরা কোন একটা সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিয়া গাছপালা ফলফুল জীবজন্তু দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্য্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তোমরা কি জান না সৌন্দর্য্য বাহিরের বস্তু নয় কিন্তু অন্তরের ? অন্তর আগে কবি কালিদাসের মেঘদূতের রস-বরষায় সিক্ত কর তবে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও, নব মেঘদূতের নূতন ছন্দ উপভোগ করিবে ; আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন।[৪]

---

৩ Dr. Stella Kramrisch in *The Modern Review* for December, 1922.

৪ প্রবাসী, ১৩১৬ কার্তিক, পৃ ৪৮৩

অবনীন্দ্রনাথের এই উপদেশের উদ্দেশ্য কি? তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বা ভাবের জগতে ছাত্রদের মনকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সেই ভাব কি ভাবে কোন্ উপায়ে তারা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নেই। বস্তুর বাইরের রূপটাই সব, তার অনুকরণই আর্ট, এই ধারণার বিপরীত মত দেখা দিল। বস্তুরূপটা কিছুই নয়, ভাবপ্রকাশের জন্য অনুকরণের কোনই প্রয়োজন নেই— এই মতকে চরম নন্দনাদর্শ (aesthetic ideal) বলা যেতে পারে। এই মত ব্যক্তিগত; জাতিগত আদর্শ একে বলা চলে না। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে, অবনীন্দ্রনাথ কোন দেশ বা কালের আদর্শ অনুসরণ করেন নি, নিজের রুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, বুদ্ধি দ্বারা সে আদর্শকে তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি সে আদর্শ গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়:

ভারতশিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি— তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমানুষি পুতুলমাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশকোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গিতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য। একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রীকমূর্তি আপোলো ভিনাস জুপিটার জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি— গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে— ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো।[৫]

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই মত, কাজেই এই মতের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিণতিতেও এই মতের কার্যকরিতা লক্ষ্য করা যায়।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী চিত্রের আলঙ্কারিক রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪) তারই প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু দেশী ছবির আলঙ্কারিক কাঠামো বিশুদ্ধ রইল না। তাঁর বিলাতী-অঙ্কনবিদ্যার প্রভাবে ক্রমে এমন একটা রূপ পেল তাঁর ছবি যা হুবহু বিলাতী মিনিয়েচার (miniature) নয়, দেশী আলঙ্কারিক পটও নয়— কিন্তু নতুন কালের নতুন ছবি যে ছবি সে সময় ছিল না কোথাও। দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বপ্রধান দান এই। আধুনিক যুগের উপযোগী রূপকলার ভাষা আমাদের দিলেন; সে ভাষা যতই অর্বাচীন হোক, তবু সেই ভাষার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ পেলাম আমরা।

১৮৮৪-৯৬ সালে যখন অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনা করছিলেন তখন তিনি অখ্যাত। ১৮৯৭ সালে ই.বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অবনীন্দ্রনাথ সাধারণের সামনে এলেন। ভারতীয়

৫ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, পৃ ৭৪-৭৫

আদর্শের নবজন্মদাতা বলে হ্যাভেল তাঁকে পরিচিত করলেন। দেশের লোক তাঁর ছবিতে 'অস্বাভাবিকত্ব', প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, লম্বা হাত-পা দেখে কি রকম মর্মাহত হয়েছিলেন সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। হ্যাভেলের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ মোগলচিত্র বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলেন। মোগল চিত্রকরদের আশ্চর্য অঙ্কনকৌশল ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর নিজের কথায়—'ছবিতে ভাব দিতে হবে'। এই 'ভাব' কথাটির অর্থ তখন তিনি কি বুঝেছিলেন তা কোথাও লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন নি। কিন্তু ছবিতে একটি পরিবর্তন দেখতে পাই যার প্রকাশ 'ভারতমাতা' (১৯০২) চিত্রে এবং যার পরিণতি 'ওমর খৈয়াম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। প্রথমেই দেখি, তাঁর প্রথম দিকের ছবির আলঙ্কারিক বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে। ছবিতে পটভূমির সমতলতা নষ্ট হয়ে দূরত্ব (space, depth) দেখা দিয়েছে। ছবিতে এই পরিবর্তন মোগল ও জাপানী চিত্রের সংস্পর্শে হয়েছে সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাতী (academic school) অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাবও যে ছিল আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্মরণ রাখি না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর টেকনিকের উপকরণ পেয়েছিলেন মোগল, জাপানী, এবং ইউরোপীয় শিল্পসংস্কৃতি থেকে। ইউরোপীয় ও জাপানী শিল্পসংস্কৃতির প্রধান গুণ ছিল বাস্তবিক (Naturalistic) প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে, সেই পদ্ধতির ছবিতে রূপের চটকদারিটাই সব। মোগল দরবারী পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক (Realistic), যাতে রূপের বাহার খোলে গুণের যোগ-বিয়োগে। অবনীন্দ্রনাথের টেকনিক যে স্বাভাবিক একথা এখন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ছবির স্বাভাবিকতা বিলাতি এ্যাকাডেমির মত নয়, জাপানীর মত নয়, মোগলের মতও নয়। এ স্বাভাবিকতা তাঁর নিজের। আরও বিচার করলে এই বলা চলে যে মোগল চিত্রের আলঙ্কারিক রূপ, তার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আরও একটু Real ক'রে স্বাভাবিক ক'রে তিনি দেখালেন। কিন্তু যে উপায়ে তিনি দেখালেন সেটা কোন বিশেষ রীতি নয়— একান্তভাবে তাঁর নিজের তৈরী, নিজস্ব ভাব প্রকাশের জন্য। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কনরীতির প্রবর্তক নন, তিনি স্টাইলের স্রষ্টা। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাঁর স্টাইল, উপেক্ষিত রয়ে গেছে দুই কারণে। প্রথম ও প্রধান কারণ, কেবলই তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কোঠায় ঠেলে দেবার চেষ্টা; দ্বিতীয় কারণ, অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি এবং তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে যে সময়ে তখন তাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী আশা ছিল ভারতীয় শিল্পী হিসাবেই— এইজন্য তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে নি, প্রাচীনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কতটা মোগলের কাছে পৌচেছেন সেইটাই দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর স্টাইল উপেক্ষা করে তাঁর ভাবের কথাই সকলে বলেছেন।

কোন দিক দিয়েই অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় চিত্রকরগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব অঙ্কনভঙ্গী স্টাইলের আলোচনায় আরও পরিষ্কার হল। তাঁর আত্মতন্ত্র ও একান্ত নন্দনাদর্শ, তাঁর রূপ-উপাসক (রূপানুকারী নয়) দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর আঁকবার স্টাইল, সব নিয়ে তাঁকে প্রাচীনের সগোত্র বলা চলে না। তিনি আধুনিক কালের অসামান্য প্রতিভাবান চিত্রকর—এরকম প্রতিভা দীর্ঘকাল ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নি। তবে কি ভারতীয় শিল্পাদর্শ আজও পুনরুজ্জীবিত হয় নি? অবনীন্দ্রনাথ কি ভারতীয় চিত্রের নূতন যুগের প্রবর্তক নন? এই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎভাবে দেবার দরকার নেই, তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাব।

বিশুদ্ধ প্রাচীন দেশী আর্ট অবনীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি চিত্রকলার আধুনিক রূপ দিলেন বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণের দ্বারা। বিদেশী সংস্কৃতিকে যে ভাবে তিনি নিজের করতে পেরেছেন সমগ্র এসিয়ায় তার তুলনা কম। যাঁরা এইভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম এবং কোন কোন দিক দিয়ে তিনি অদ্বিতীয়। জাপানে চীনে প্রাচীন পদ্ধতির বড় বড় ওস্তাদ আছেন, বিলাতীর অনুকারক আছেন, কিন্তু গ্রহণ করে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা দৈবাৎ চোখে পড়ে। স্বদেশীযুগের গোঁড়া মনোভাবের কাছে অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ হয়ত রুচিকর হত না, কিন্তু আজকের আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অপরের থেকে গ্রহণ করবার সাহস দিয়েছেন। তারপর, ভারতীয় পুরাতন কলাসংস্কৃতির প্রতি যে দৃষ্টি ফিরেছে সেজন্য হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর কাছে আমরা ঋণী এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবও অনেকখানি।

কিন্তু উড়িষ্যার পূর্বপ্রথাগত খোদাইকরা মূর্তি বা পাটনা কলমের ছবি নিয়ে আধুনিক মনকে সরস রাখা সম্ভব ছিল না। ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিয়েও দূর করা যেত না যদি অবনীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ না হ'ত। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, প্রাচীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হই নি। তারপর, যখন ইংলণ্ড এবং ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ছবির নামে কেবল বিদ্যার বাহাদুরি এবং ধূপছায়ার (shade and light-এর) ছড়াছড়ি চলেছে সেই সময় এই অনুকৃতির (naturalism-এর) মোহ কাটিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে হয়, অবনীন্দ্রনাথের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার আন্দোলন নয়। তাঁর সাধনার দ্বারা শিল্পবোধের, রসবোধের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এইদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী।

৩

এইবার ভাবের দিক দিয়ে বা রসের দিক দিয়ে কতটুকু বলে প্রকাশ করা যেতে পারে দেখা যাক্। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী প্রভাব রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের রসবোধের উন্মেষ এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্য এবং চিত্র এই দুই ধারায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা এমনভাবে এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে যে কোন্‌টি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র বলা শক্ত। সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং দুইয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; শুধু কথা শোনার সুখ; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি— ভাল করে দেখতে যাও কি ছবি ফুটে উঠল, ভাষার দমকে আর উপমার ঝঙ্কারে সবকিছু মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে আর-একটা ছবি। ভাষা, অলঙ্কার, ক্রমে ছবি, তাও মিলিয়ে আসে— মনের মধ্যে বাজতে থাকে শব্দের ঝঙ্কার; আবার মনে পড়ে যায় ভাষা, অলঙ্কার, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির টুকরো। তাঁর রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো আংলা— ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবি কিরকম তার উত্তরে বলতে পারি— বর্ণের ঝঙ্কারে ফুটে ওঠা রূপ। সাহিত্যে যেমন তাঁর শব্দের ঝঙ্কার ছবিতে তেমনি তাঁর বর্ণের ঝঙ্কার

আমাদের আকৃষ্ট করে। ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি রূপের আভাস আমরা পাই, কিন্তু বর্ণের আবরণের অন্তরাল থেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ আমাদের দেখা দেয়। তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে এই রূপের জগৎ যত কাছে আমাদের আসে, অন্য কোথাও দৈবাৎ এমন করে তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধিকাংশ স্থলেই একটু সুর একটু ইঙ্গিত দিয়েই তাঁর রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। এত মৃদু সেই ইঙ্গিত, এত ক্ষণিকের যে চিত্রকরের নিজেরই সন্দেহ জাগে, সব সুর কানে পৌঁছবে কিনা, সব ইঙ্গিতের অর্থ আমরা বুঝব কিনা। তাই আগে থেকে বলে রাখার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে নামের প্রবর্তন এবং এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নামের এত মূল্য দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা আর তাঁর ছবিরচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভঙ্গী— দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্যই বলা। বলবার জিনিসটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চাননি। দেখিয়ে তিনি কিছু চেনাতে চাননি। তিনি তাঁর সাহিত্যে, ছবিতে যা করতে চেয়েছেন তা তাঁরই কাছ থেকে আমরা শুনে নিতে পারি :

> শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি সত্যই রূপকথা— রঙের সুরে, রূপের ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

['উমা' চিত্রের ব্লক উদ্বোধন এবং 'শিশু ভোলানাথ' ও 'মা' চিত্রদ্বয়ের ব্লক প্রবাসীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

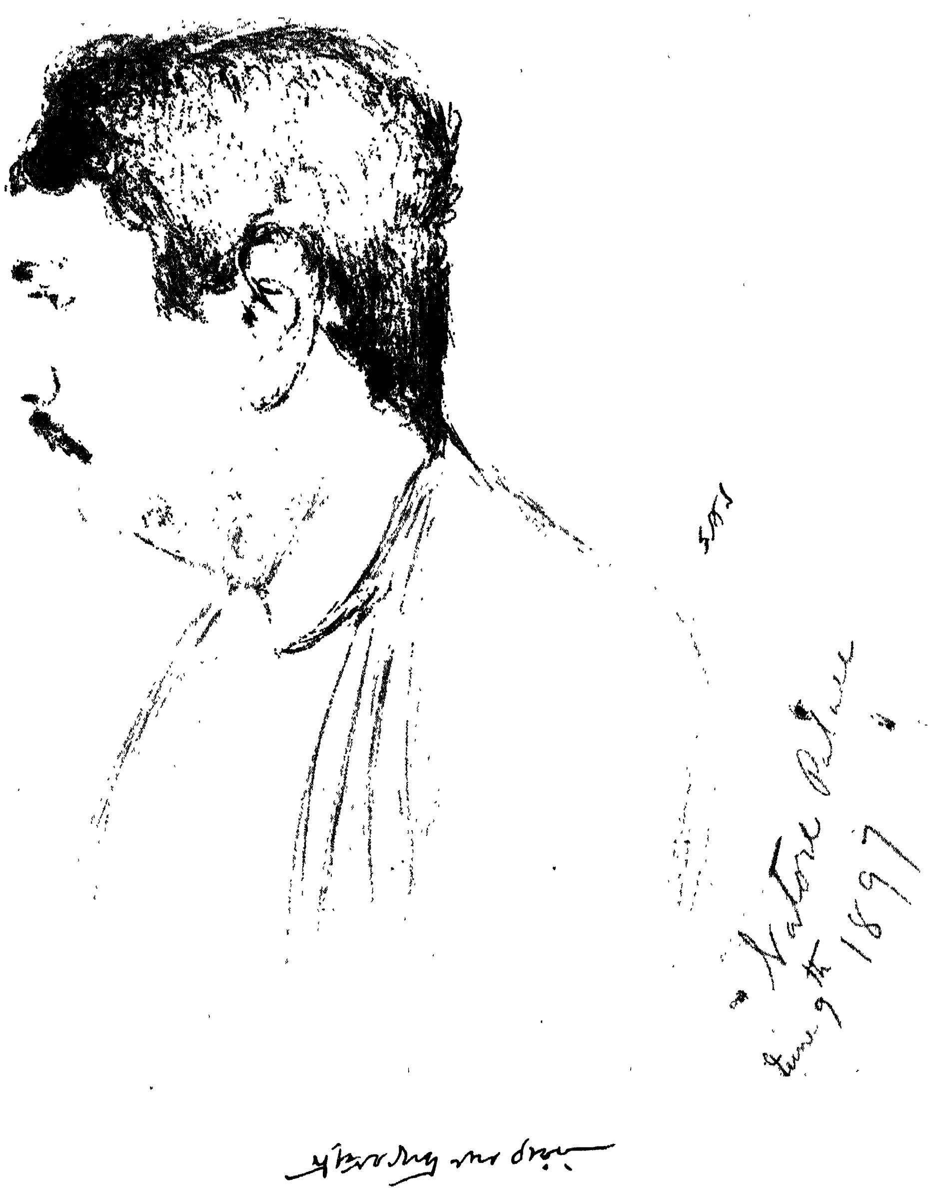

১৮৯৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত পেনসিল স্কেচ

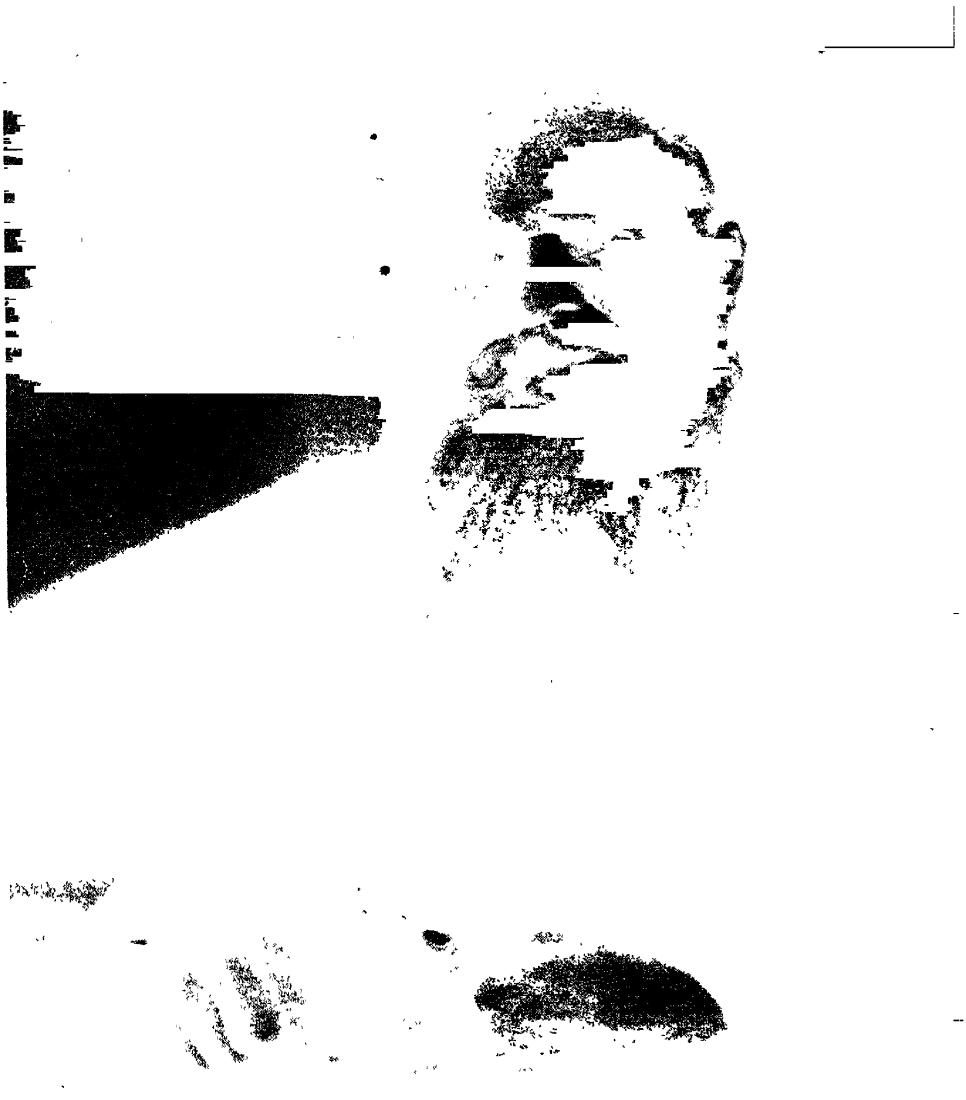

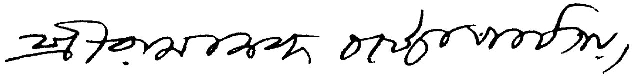

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী গৃহীত ফটোগ্রাফ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও নেপালচন্দ্র রায়

যে-কোন দেশে এবং যে-কোন কালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন, দৃঢ়চরিত্র, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অনন্যকর্ম্মা ও প্রগতিশীল দেশসেবীর তিরোধান দেশের ও দশের নিকট অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশের পক্ষে ইহা আরও নিদারুণ। কেন না, বর্ত্তমান দুরবস্থায় দেশের জনমত নিপুণতার সহিত এবং উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিতে ও ব্যক্ত করিতে এবং তাহা পৃথিবীর সমক্ষে নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে চিত্রিত করিতে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ এবং শক্তিমান ব্যক্তির বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেশনায়কগণের অনেকেই আজ হয় কারারুদ্ধ কিম্বা পরলোকগত অথবা তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। সুতরাং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়োগে আমাদের ব্যথিত হইবার বিশেষ কারণ আছে।

দেশের শাসনতন্ত্র সর্ব্বদাই জনমতের সমর্থনের ভিত্তিতে এবং জনহিতার্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকৃত, সেই কারণে তাঁহাদের সর্ব্বদাই সত্যসন্ধ, বহুদর্শী, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা হওয়া আবশ্যক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে এই গুণগুলি প্রত্যেকটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। জীবনে যখনই তিনি জনসেবী ও সংবাদপত্রসেবী হিসাবে কঠিন কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখনই অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সরকারী নীতির অদূরদর্শিতা এবং ত্রুটির গুরুত্ব লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আবার প্রয়োজনমত দেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষ বা দল-বিশেষের কঠোর সমালোচনা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার ফলে তাঁহাকে অনেক সময় বহু বিরোধিতা সহ্য করিতে হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি প্রশংসনীয় সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন।

দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন যে সর্ব্বাগ্রে, এই সত্যটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কখনও বিস্মৃত হন নাই। ভারতে রাজশক্তির মহিমায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু নির্ভীক স্বাধীনচেতা সংবাদপত্রসেবী হিসাবে যখনই সরকারের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সাংবাদিক প্রতিভা দ্বারা তিনি সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সংঘর্ষের মধ্যে কদাপি তিনি নিজের মতামতের স্বাধীনতা কিম্বা দেশের কল্যাণ বিসর্জ্জন দেন নাই। বর্ত্তমানে সরকারের বা সরকারী নীতির বা যুদ্ধনীতির প্রতিকূল সমালোচনা করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন একস্থানে বলিয়াছিলেন: "If the public are not allowed to know the facts but are only allowed to hear what their rulers choose them to hear—that people is in danger of being led to march on a course which may presently lead it to disaster...... Free speech and a free press are great educators as well as great

guardians of people's liberty." ইংলণ্ডের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী যে disasterএর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশে তাহার সম্ভাবনা স্বাধীন দেশসমূহ হইতে অনেক পরিমাণে অধিক। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ সাংবাদিকমহলের এ বিষয় দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাংবাদিকের অভাব আরও তীব্রভাবে অনুভূত হইবে।

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকরূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব এই পত্রিকাদ্বয়ের ও সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নিজের বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব। সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্বের সহিত সম্পাদিত পত্রিকার ব্যক্তিত্বের যোগাযোগ অবশ্য সর্ব্বদাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পত্রিকার গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন তাহার ব্যক্তিত্বের সূচক তেমনই সম্পাদকীয় বুদ্ধি, মনীষা ও নৈতিক উৎকর্ষ সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। এ কথা সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করিবেন যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষে সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যাপারে নূতন এবং উচ্চ আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বাধীনচিত্ততা, সত্যের প্রতি অনুরাগ, ঐকান্তিক শ্রমনিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য ও নির্ভীকতার দিক দিয়া তিনি চিরদিনই সাংবাদিকজগতের আদর্শস্থল। ইহার কারণ ছিল। তিনি প্রথম হইতেই উচ্চ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন এবং এই মনোবৃত্তির মূলে ছিল গভীর আধ্যাত্মিকতা। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। হিন্দী মাসিক পত্রিকা বিশাল ভারত প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং অন্যান্য নানা প্রকারে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁহার প্রচেষ্টাও অবশ্যপ্রশংসনীয়।

লেখক এবং সাংবাদিক হিসাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি নেতৃস্থানীয় হইলেও তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত জনসেবা কেবলমাত্র তাহাতেই আবদ্ধ ছিল না। এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে এমন কোন স্বদেশের উন্নতিমূলক কার্য্য ছিল না যাহার সহিত তিনি যুক্ত না ছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিরদিন একনিষ্ঠভাবে বহুক্ষেত্রে প্রগতি ও মানবসমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার নানা সদগুণসমন্বিত চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠা ও জনসেবায় অনাড়ম্বর ও নিরাসক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে দেশের অগ্রণী ব্যক্তিগণের মধ্যে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তাঁহার আদর্শ কত উদার ও মহান এবং দূরদর্শিতা কত বহুপ্রসারী ছিল।

কোন জনহিতকর কার্য্য কিংবা সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, যাহাতে উদ্যম, উৎসাহ এবং ত্যাগের প্রয়োজন, সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে আছেন যাঁহারা এই প্রকার কার্য্যের উন্নতি এবং প্রসার ইচ্ছা করেন, কিন্তু কার্য্যসাধনে কোন প্রকার ত্যাগ, পরিশ্রম বা উদ্যোগে প্রস্তুত নন। তাঁহারা বলেন, এ কার্য্য হওয়া উচিত, এ কথা

সত্য; কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাদের পরিশ্রম বা সমর্থনের কি প্রয়োজন? অন্য অনেকে আছেন যাঁহারা এ বিষয় তৎপর হইতে পারেন এবং আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই বলিয়া উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকেন এবং তাঁহাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ হইল মনে করেন। আর এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় যাঁহারা আগ্রহের সহিত এবং সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়া প্রস্তাব সমর্থন করেন। কার্য্য অতি দুরূহ হইলেও তাহার মধ্যে তাঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সমগ্র শক্তি দিয়া উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য নিজেদিগকে নিয়োজিত করেন। বিরুদ্ধ পক্ষের বিপক্ষতা, বিদ্রূপ ও উপহাস এবং নির্য্যাতন সহজেই উপেক্ষা করিয়া সমুদায় বাধাবিঘ্ন অপসারণে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন। পৃথিবীতে সকল প্রকার উন্নতি এবং সংস্কারের প্রবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে এই জাতীয় লোক দ্বারা। মানব সমাজের উন্নতি সাধনে তাঁহাদের দান অমূল্য। এই বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে আমেরিকার সুবিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস বলেন: "Such men do not remain mere critics and understanders with their intellect. Their ideas possess them, they inflict then, for better or worse, upon their companions, or their age. It is they who get counted when·········others invoke statistics to defend their paradox." এই রকমের মানুষকে অসাধারণ বলা হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সকল দেশেই অত্যন্ত বিরল। পরলোকগত নেপালচন্দ্র রায়ের দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন যৌবনের একপ্রকার প্রথম হইতেই জাতীয় উন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট এবং বড় নানা প্রকার জনহিতকর এবং সংস্কারমূলক কার্য্যে তিনি এইরূপভাবে অনেক সময় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

নেপালচন্দ্র রায়, ছাত্রজীবন শেষ হইলে, তাঁহার গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত এনট্রান্সস্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। ইহার পর কলিকাতায় কোন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া, ১৯০০ সালে এলাহাবাদে অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় ১৯০৯ সালে তাঁহাকে এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। এই বিরোধিতার জন্য ভবিষ্যতে প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য করা সম্ভব না হইতে পারে বিবেচনা করিয়া তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন স্থির করেন। এই সময় শিক্ষকতার কাজ করিতে করিতে বি এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন হইতে আহ্বান আসায় আইন ব্যবসায় অবলম্বন করার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সেখানকার বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষরূপে ১৯৩৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নেপালচন্দ্র রায় সুলেখক এবং সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার একাধিক পুস্তক ম্যাট্রিকিউলেশন এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য মনোনীত হইয়াছে। তিনি উৎসাহের সহিত স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতেই কংগ্রেসের সেবক ছিলেন। কিন্তু 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড' সম্বন্ধে "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি না গ্রহণ করিয়া কনগ্রেস জাতীয় দল গঠনে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত করেন এবং পরে হিন্দু মহাসভা সমর্থন করেন।

নেপালচন্দ্র রায়ের শিক্ষকতার কার্য্য প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর কাছাকাছি হইবে। এই দীর্ঘকাল তাঁহার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া এবং যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সহিত তিনি তাঁহার কার্য্য করিয়া

আসিয়াছেন। যদিও শিক্ষাদানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল, তাহার সঙ্গে তিনি যৌবনকাল হইতেই স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি শিক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার প্রায় সমস্ত সময়ই রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষা-বিস্তার ও সংস্কার, সমবায় আন্দোলন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক এবং জনহিতকর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, এবং তাঁহার নিজের গ্রামের নানাবিধ উন্নতিসাধনে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অনেক সময় যে সকল ক্ষেত্রে অন্য কেহ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ত্রস্ত হইত তিনি উৎসাহের সহিত সেই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টায় অনেককে তাঁহার মতে প্ররোচিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি কখনও নিজেকে প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখান নাই এবং এই সকল প্রচেষ্টা যখন পরিণামে সফল হইয়াছে তিনি একজন অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে তিনি কখনও কোন অনুযোগ বা ক্ষোভ করেন নাই। যৌবনকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখাইয়াছেন। নির্য্যাতন সত্ত্বেও এই অনুরাগ কখনও ক্ষুণ্ন হয় নাই। তিনি স্বাধীনচিত্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা জ্ঞান ও চিন্তার দ্বারা নিজের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিতেন ; স্তাবকের ন্যায় কাহারও মত গ্রহণ করিতেন না। শরীর রুগ্ন ও অপটু হইলেও একপ্রকার জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সাধারণ ও জনহিত সম্বন্ধে নানা সমস্যা সমাধানের চিন্তায় নিজেকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। নেপালচন্দ্র রায়ের অনাবিল দেশপ্রেম, মহানুভাবকতা এবং নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত সকলকে অনুপ্রাণনা দান করুক।

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

আশ্রমবন্ধু

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে ভারতবর্ষের একজন নির্ভীক সত্যসন্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠের তিরোধান ঘটল, নেপালচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশের বহু হিতপ্রতিষ্ঠান একজন অক্লান্ত সেবককে হারালেন, কিন্তু বিশ্বভারতীর পক্ষে এই দুজনের মৃত্যু সুদুর্বহ আত্মীয়বিয়োগ, মৃত্যুকালে এঁদের পরিণত বয়সের কথা স্মরণ করেও যার কোনো সান্ত্বনা নেই। শান্তিনিকেতন যখন ছোটো একটি বিদ্যালয়মাত্র, তার খ্যাতি যখন বাংলাদেশেও সর্বত্র প্রচারিত ছিল না, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগীরাই মাত্র যখন সন্ধান রাখতেন কি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই সময় থেকে যাঁরা এই আশ্রমের পরিচালনায় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করে এসেছেন কালধর্মে তাঁদের অনেকেই গত কয়েক বৎসরে ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন ; বিশেষ ক'রে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের পরলোকযাত্রার পর পুরাতন ধারার সঙ্গে যোগ রক্ষার প্রয়োজন যখন বিশ্বভারতীর পক্ষে এমন একান্ত, এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও নেপালচন্দ্র রায়ের মৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গুরুভার বেদনার বিষয়। শান্তিনিকেতনে বাস করুন বা দূরে থাকুন, রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বভারতীর মঙ্গলকামনা এঁদের জীবনের নিত্যধর্ম ছিল—শান্তিনিকেতন এঁদের জীবনকে এতখানি অধিকার করেছিল যা, পরবর্তীকালে যাঁরা এখানকার কাজে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন তাঁদের অনেকের পক্ষে যা বিস্ময়ের কারণ হবে।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে আঘাত পেয়েছিলেন তা প্রিয়জনবিচ্ছেদের মর্মান্তিক দুঃখ, জীবনান্তকাল পর্যন্ত সে বেদনা তিনি বহন করে গিয়েছেন ; "বন্ধুবিয়োগ ও বৈধব্য" এই আখ্যায় প্রবাসীর সম্পাদকীয় একটিমাত্র উদ্ধৃতিসার মন্তব্যে, রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না ক'রেও সে গভীর বেদনা ইঙ্গিতে তিনি একবার মাত্র ব্যক্ত করেছিলেন :

"বন্ধুবিয়োগ ও বৈধব্য। মহাকবি টেনিসন তাঁর "স্মরণে" ("In Memoriam") কাব্যে বন্ধুবিয়োগ ও বৈধব্যকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন :

Sleep, gentle winds, as he sleeps now
My friend, the brother of my love;
My Arthur, whom I shall not see
Till all my widow'd race be run;
Dear as the mother to the sons,
More than my brothers are to me."

একসময় কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পড়ানোর ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন এই অধিকারে তিনিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য, কৌতুকের সঙ্গে এই কথাটি বারংবার বলতে এবং তাঁর "সহাধ্যায়ী"দের মধ্যে দুজন ছাত্রছাত্রীর নাম স্মরণ করতে তাঁর বিশেষ একটি আনন্দ ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে যে অভিনন্দনপত্র দিয়েছিলেন তার একস্থানে প্রসঙ্গক্রমে আচার্য যদুনাথ তাঁকে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ব'লে উল্লেখ করেছিলেন ; এতে যে তিনি অত্যন্ত পুরস্কৃত হয়েছেন, অভিনন্দনের উত্তরে তিনি সে-কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তার পরে যখন আশ্রমিক সংঘ ও বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিগণ তাঁর রোগমুক্তি কামনা করে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন, তখন এই দৃঢ়চিত্ত স্বল্পবাক্ মানুষটিও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের "দীনাতিদীন অযোগ্য সেবক" তিনি বিশ্বভারতীর অধিকতর সেবা করতে পারেননি ব'লে, হৃদয়ের একান্ত সরলতায় উচ্চারিত যে-ভাষায় তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন তা উপস্থিত সকলেরই হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে থাকবে। অনুষ্ঠানান্তে এই পত্রিকার বর্তমান সম্পাদককে বিশেষভাবে আহ্বান করে তিনি তাঁর অন্তরের বেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিবরূপে তাঁর স্কন্ধে এখন কি গুরুভার ন্যস্ত ; সাধারণের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত রামানন্দ-সংবর্ধনায় এই পত্রিকার সম্পাদকের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তিনি যে সর্বাধিক পরিতোষ লাভ করেছিলেন এ আমাদের পক্ষে বিশেষ পুরস্কার।

পূর্বেই বলেছি, শান্তিনিকেতন বা তার প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিশ্রুত হবার বহুপূর্ব থেকেই এই উভয়ের সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিবিড় সম্বন্ধ। শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা সে-সময় অতি দীন, রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধ সংগতি ও অসীম ভরসাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্ভর ; রামানন্দবাবুর সম্পাদিত পত্রিকা দুখানি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি ; এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে রচনার দক্ষিণাদানের ব্যপদেশে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনেক সহায়তা করেছেন। এই সময়ের কথা স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবি করলে বিনামূল্যেই পেতেন। সে-কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যা-

নিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয়নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।"

রবীন্দ্রনাথের 'পাঠসঞ্চয়' গ্রন্থখানি প্রকাশ করে বিদ্যালয়ের অর্থাগম করবার যখন চেষ্টা হয়, আমরা যতদূর জানি রামানন্দবাবু তার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন; 'মুক্তধারা' গ্রন্থখানি কয়েক হাজার ছেপে তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন; এই রকম আরো নানাভাবে তিনি বিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্য করে গিয়েছেন, পরিমাণের দ্বারা সে দানের মূল্য বিচার করা চলে না। আরো মনে রাখতে হবে যে

"অর্থ ই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অন্যতম।"

এই প্রতিষ্ঠানের বাল্যদশা থেকে রামানন্দবাবু যেভাবে এর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে চেষ্টা করে গিয়েছেন তার ঋণ পরিশোধ করবার নয়। শিক্ষাবিস্তার বা লোকহিতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর সামান্যতম উদ্যোগও তাঁর উদার প্রশস্তি থেকে বঞ্চিত হয়নি; এই সকল উদ্যোগের ক্ষীণ আরম্ভ দেখে তার বিপুল সম্ভাবনা কল্পনা করবার দৃষ্টি তাঁর সদাজাগ্রত ছিল, এবং তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ-সকলের প্রচারভার গ্রহণ না করলে এ-সব প্রয়াস হয়ত অনেককাল লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যেত। চিরকালই প্রবাসী মডার্ন রিভিউকে শান্তিনিকেতনের প্রধান মুখপত্র ব'লে লোকে জেনে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কখনো কখনো দেশে যে সাময়িক বিরুদ্ধতা ঘটেছে সে-সময়ে প্রধানত রামানন্দবাবুর সম্পাদিত পত্রিকা দুটিতেই রবীন্দ্রনাথের মত ও আদর্শ সমর্থন লাভ করেছে। প্রবাসী মডার্ন রিভিউর একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রধান লেখক, যাঁদের রচনা বহন করে এই পত্রিকা দুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তাঁদের যিনি অন্যতম, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণ করেন না এই কল্পনার বশবর্তী হয়ে রামানন্দবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে একসময় তাঁর আনুকূল্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন। আমাদের দৃঢ় অনুমান, রামানন্দবাবু

উক্ত লেখক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাটি তাঁর গভীর রবীন্দ্রানুরাগের নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য এই ক্ষতিস্বীকারের কথা রবীন্দ্রনাথকে তিনি কখনো জানতে দেননি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ অবশ্য অন্ধ ছিল না; কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে মতভেদ যে ঘটেনি তা নয়, এবং প্রয়োজনমত তা প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ১৯২০ সালে মণ্টেগু সাহেবকে ভারতের বড়লাট করে পাঠানোর প্রস্তাব যখন বিলাতে হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে প্রথম ও প্রধান স্বাক্ষরকারী ব'লে যখন এ-দেশে সংবাদ আসে তখন নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তার যথোচিত সমালোচনা তিনি করেছিলেন। এ-রকম দৃষ্টান্ত আরো আছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দীর্ঘকাল প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ রবীন্দ্র-বাণীর প্রধান বাহন হতে পেরেছিল। মডার্ন রিভিউর পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ ক'রে বিদেশী গুণীরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু যে সাগ্রহে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা গান উপন্যাস গল্প নাটক প্রবন্ধ চিঠিপত্র ছবি সংগ্রহ করে তাঁরা এই পত্রিকা দুটির পরিপুষ্টি সাধন করেছেন তা নয়, সুপরিচিত ও অপরিচিত বহু সাময়িক পত্র থেকে রবীন্দ্র-রচনা এই দুটি কাগজে সংকলন করে এসেছেন, তার মূল্য এখন উপলব্ধি করা যাচ্ছে—এই সব সাময়িকের অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য, অনেকগুলি অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং এখন কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই—ফলে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজে এই পত্রিকা দুটি এখন অমূল্য সহায়। বস্তুত রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্র-জীবনের আলোচনা প্রবাসী মডার্ন রিভিউর সহায়তা ছাড়া সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবই নয়। দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সামান্যতম ঘটনার উল্লেখও এই পত্রিকা দুটিতে সসম্মান স্থান পেয়েছে—রবীন্দ্র-জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিবরণ অন্য কোথাও আজ আর পাবার উপায় নেই।

এই সকল তথ্যের চেয়েও আমাদের পক্ষে আজ স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা যা ক্রমশ সুনিবিড় প্রীতিকে পরিণতি লাভ করেছিল, এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর অনুরাগ—শুধু এখানকার আদর্শের প্রতি নয় এখানকার মাটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ; অকালপরলোকগত প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের স্মৃতিতে এই অনুরাগ বিশেষ একটি বেদনার রাগে রঞ্জিত হয়েছিল; হৃদয়ের গভীর ভাব মেলে ধরবার মানুষ রামানন্দবাবু ছিলেন না, কিন্তু মনে পড়ে, কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—হয়ত তখনই তিনি বুঝেছিলেন এখানকার মাটি-জল-হাওয়ার মধ্যে আর তিনি ফিরে ফিরে আসতে পারবেন না—শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে, নানা অপরিচিত বিস্মৃত প্রান্তে তখন তিনি ঘুরে বেড়াতে চাইতেন; বহুদিন তিনি এখানকার অধিবাসী ছিলেন, সেই সব দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ, তাঁর পুত্র প্রসাদের প্রাণোচ্ছল মূর্তি, বিগত জীবনের নানা স্মৃতি হয়ত তাঁকে আবিষ্ট করত। কঠিন রোগের মধ্যেও তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, শান্তিনিকেতনের যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁদের কাছে সেই আশা তিনি প্রকাশ করতেন—মৃত্যুর পূর্বে আর-একবার শান্তিনিকেতনে যেতে তাঁর ইচ্ছা করে। সে-বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়নি।

নেপালচন্দ্র রায় সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন; তার পর পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল এখানকার সুখে দুঃখে যুক্ত হয়ে এখানেই থেকে গেলেন। একাধিকবার তিনি

শান্তিনিকেতনের কাজ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান তাঁকে মাঝে মাঝে উতলা করত, সে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করবার বিশেষ যোগ্যতাও তাঁর ছিল—কিন্তু বেশিদিন অন্যত্র অন্য কাজে তিনি থাকতে পারতেন না। বয়োভারবৃদ্ধিতে অগত্যা তাঁকে যখন অবসরগ্রহণ করতে হল তখনো বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর বন্ধন ছিন্ন হয়নি। যে-সকল অধ্যাপকের অকৃপণ হৃদয়ের ঔদার্যে শান্তিনিকেতন একটি আত্মীয়পল্লীতে পরিণত হয়েছিল নেপালচন্দ্র রায় তাঁদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনে এসে স্থায়ীভাবে আবার বাস করবার তাঁর মনে বিশেষ ইচ্ছা ছিল, এইজন্য সম্প্রতি এখানে তিনি একটি বাড়িও তৈরি করাচ্ছিলেন, কিন্তু জরা ও মৃত্যু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হতে দেয়নি। শান্তিনিকেতনের অগণ্য ছাত্রছাত্রী ও কর্মী তাঁর যুবকোচিত উৎসাহপ্রাচুর্য, তাঁর একান্ত আত্মীয়োপম ব্যবহার বহুদিন ব্যথিত অন্তরে স্মরণ করবেন, তাঁর প্রসন্ন মূর্তি তাঁর উদার কণ্ঠস্বর এখনো বহুদিন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে পড়বে।

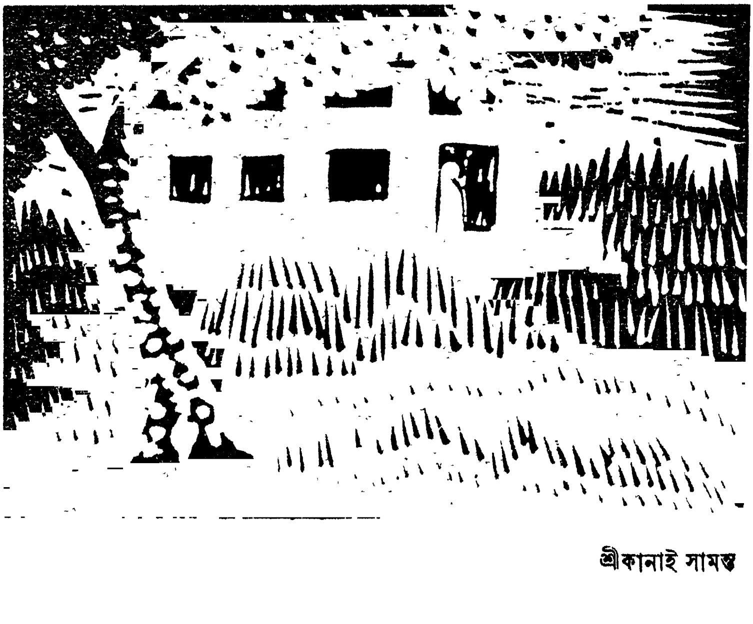

শ্রীকানাই সামন্ত

আলোচনা

বাংলাভাষায় যতিচিহ্নের প্রথম প্রবর্তন

বাংলাভাষায় আমরা কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যে সকল যতিচিহ্ন ব্যবহার করি সেগুলি প্রথম প্রবর্তিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলাগদ্যের প্রথমযুগে যতিচিহ্ন প্রচলিত না থাকায় জটিল দীর্ঘ বাক্যসমষ্টির অন্বয়বোধে ও অর্থবোধে নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাংলাভাষায় এই সকল যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়া বাংলাগদ্যকে অন্বয়-বিভ্রাট ও অর্থ-বিভ্রাট হইতে রক্ষা করিয়াছেন এরূপ ধারণা সাধারণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ-প্রকাশ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পূর্বেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাগদ্যে কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নগুলি প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই 'ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি সহজ সরল গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হয়। এই সমিতিকর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নীতিকথা দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থে সর্বপ্রথম যতিচিহ্ন প্রবর্তিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারীদের সহযোগিতা ছিল এবং ইউস্টেস কেরী ও ইয়েট্স এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে এই গ্রন্থখানির বিবরণ হইতে আমাদের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধার করিতেছি:

> "In these lessons will be found a novelty, for the suggestion of which the public are indebted to the Rev. Messrs. E. Carey and Yates, namely, the introduction of a regular punctuation, similar in its principles, and for the most part in its marks, to that employed in books printed in the Roman character. If a judgment may be formed from the sentiments already expressed by intelligent natives, after seeing these and other specimens of the adoption of the Roman stops, the innovation will soon be as generally acceptable, as it evidently is convenient, and conducive to perspicuity."
>
> —First Report of the Calcutta School-Book Society, 1818, p. 3.

এই গ্রন্থে প্রবর্তিত যতিচিহ্নগুলি বাংলাভাষায় অনুসৃত হইবে বলিয়া সমিতি যে আশা করিয়াছিলেন তাহা যে সফল হইয়াছে পরবর্তীকালই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নীতিকথা দ্বিতীয় ভাগ সে যুগের একখানি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণের পুস্তকেই সর্বপ্রথম যতিচিহ্নগুলি প্রবর্তিত হয়—এই সংস্করণের একখানি বই বর্তমান লেখকের নিকট আছে। উহার প্রথম নিবন্ধ হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া হইল:

"মনুষ্য পাত্রের ন্যায়, জ্ঞান জলের ন্যায়, এবং যেমন জল নীচগামী, তেমন জ্ঞানি ব্যক্তি কদাচ আপনাকে বড় করিয়া জানে না। যেমন বৃক্ষাদির যে ডালে ফল ধরে, সে ডাল ফলের ভারেতে অবশ্য

নত হয়। বড় গাছ হইলে যে ফলবান্ হয়, তাহা নয়। দেখ, ধান্যের শিষ যত শস্য পূর্ণ হয়, তত নম্র হইয়া ভূমিতে পড়ে; তাদৃশ জ্ঞানী, যত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তত নম্র ও শিষ্ট হয়॥"

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে এ ভাষা আশ্চর্যরূপে সরল এবং বাক্যের স্বার্থ-পর্বগুলিকে (sense-group) যতিচিহ্নের দ্বারা এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্কুলবুক সোসাইটি তাঁহাদের প্রকাশিত পরবর্তী বাংলা গ্রন্থগুলিতে কমা-সেমিকোলনের সহিত দাঁড়ির পরিবর্তে ফুলস্টপ ব্যবহার করেন। পরে তাঁহারা ফুলস্টপ তুলিয়া দিয়া আবার দাঁড়িই ব্যবহার করেন। গুজরাটী ও মারাঠীতে দাঁড়ির স্থানে এযাবৎকাল ফুলস্টপই ব্যবহৃত হইতেছিল, সম্প্রতি কোন কোন মারাঠী ও গুজরাটী গ্রন্থে দাঁড়ির প্রবর্তন করা হইয়াছে।

শ্রীমদনমোহন কুমার

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে আমরা অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার লিখিত "য়ুরোপযাত্রী ডায়ারি"তে নিম্নলিখিত আরবী ফারসী শব্দ পাওয়া যায়—এই সংকলনে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে; বন্ধনীর মধ্যে পত্রাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে।

বদলি (৫৮৭) জাহাজ, বন্দর, দরজা (৫৮৮) সাফ, কম (৫৯০) বাজি (৫৯১) আরাম (৫৯২) গরম (৫৯৩) বেআব্রু বেআদবি (৫৯৪) আরামজনক, তামাসা, জাদু (৫৯৬) জিনিসপত্র, রঙিন, রুমাল (৫৯৭) জমি, জরিজড়াও, তলোয়ার (৫৯৮) মাস্তুল, জায়গা (৫৯৯) জঙ্গল (৬০০) বদল, হাঙ্গাম (৬০১) দোকান, বাগান, দরজা (৬০২) খবরের কাগজ, রকম (৬০৩) জোর (৬০৫) দুরবিন (৬০৬) কৈফিয়ত, শহর (৬০৭) বালাই (৬০৯) জোয়ান (৬১১) নালিশ, কায়দা (৬১২) বেচারা, গরিব, সাহেব, আদম (৬১৩) খামকা (৬১৪) পালোয়ান (৬১৫) মক্কেল, বাদে, ইশারা (৬১৭) গোরস্থান, গোর, পর্দা, খুশি (৬১৮) আরব, নমাজ, খালাস, জেদ, দরকার (৬১৯) গল্পগুজব (৬২০) কাগজ, কলম (৬২১) শরবৎ (৬২২) পার্সি, মুশকিল, জবাব, খানা, নারাজ (৬২৩) বালিশ (৬২৪)

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন